গণপতি-তত্ত্ব এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গণপতি প্রসঙ্গ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে

পিএইচ.ডি. উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভ

গবেষক

সৌম্যদীপ বসু

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক অনন্যা বড়ুয়া

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০ ০৩২

২০২৩

Certified that the thesis entitled

‘গণপতি-তত্ত্ব এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গণপতি প্রসঙ্গ’ submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Professor Ananya Baruya, Department of Bengali, Jadavpur University, And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by the Supervisor :

Candidate :

Dated :

Dated :

নিবেদন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে পিএইচ. ডি. স্তরের গবেষণা-অভিসন্দর্ভ হিসেবে রচিত হয়েছে ‘গণপতি-তত্ত্ব এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গণপতি প্রসঙ্গ’। ‘দেবতত্ত্ব’ বিষয়ে আগ্রহ অনেকদিনের। দেবতত্ত্বের পরিসর ব্যাপক এবং বিস্তৃত। এর মধ্যে বিশেষ কোনও দেবতার রূপ, অঙ্গসংস্থান, আয়ুধ, বাহন এবং সর্বোপরি দেবমণ্ডলে তাঁর মর্যাদা বা status যেমন আলাদাভাবে লক্ষ করার, তেমনই ভারতীয় ধর্ম-দর্শনে তাঁর প্রকাশরূপ কীভাবে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র হয়ে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ধারাবাহিকভাবে জায়মান রয়েছে, তারও সন্ধান জরুরি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পাঠগ্রহণকালে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশের বহুমাত্রিক ধর্ম-সংস্কৃতি আমাদের ভাবনা-চিন্তার পরিসর বাড়িয়েছে। সেই সূত্রে লক্ষ করেছি, বাংলায় স্মার্ত হিন্দুধর্মের পঞ্চোপাসনায় শিব, শক্তি এবং বিষ্ণু (বা কৃষ্ণ) বিভিন্ন প্রেক্ষিতে যতটা আলোচিত, সূর্য ও গণেশ তুলনায় খানিকটা পিছিয়ে। স্নাতক পর্বে আমার শিক্ষক এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক স্বর্গীয় দীপান্বিতা ঘোষের ‘সূর্য উপাসনা এবং বাংলা সূর্যকেন্দ্রিক সাহিত্য’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সৌর ধর্ম-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার অভাব অনেকখানি পূরণ করেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিচ্ছিন্ন কতকগুলি প্রবন্ধ, পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা অথবা হাতে গোনা কয়েকটি বইপত্রের একটি-দুটি অধ্যায়ের আলোচনা বাদ দিলে নির্দিষ্টভাবে বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতিতে গণেশ বা গাণপত্য সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ গবেষণা academic স্তরে অন্তত চোখে পড়েনি। সংগত কারণেই, গণপতি-তত্ত্ব এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গণপতি প্রসঙ্গের পরিগ্রহণ বিষয়ে চিন্তন ও অধ্যয়নের তাগিদ অনুভব করি। অবশেষে ২০১৮-র সেপ্টেম্বরে (১৯. ০৯. ২০১৮) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চিন্তা-চর্চার সুযোগ পাই।

অনেকদিন ধরে লালিত ধারণাটিকে একটি সংবদ্ধ রূপে বিন্যস্ত করতে গবেষণার পদ্ধতি ও প্রকরণ বিষয়ে বিভাগীয় অধ্যাপকদের পাঠদান প্রাথমিক পর্যায়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। পরবর্তীকালে আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অনন্যা বড়ুয়ার নাম নির্দিষ্ট হয়। স্নাতকোত্তর পর্বেও তিনি আমার বিশেষ পত্রের শিক্ষক ছিলেন। বস্তুত, গবেষণার কাজটি শুরু করার আগে থেকেই তাঁর দিকনির্দেশনা এবং উৎসাহদান এই জাতীয় বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে আমার আস্থা বাড়িয়েছে। পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়েছেন যেমন, তেমনই আমাকে আমার-মতো-করে কাজ করার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। গবেষণা-অভিসন্দর্ভের খসড়াগুলি পরীক্ষার

ক্ষেত্রে তাঁর সযত্ন পর্যবেক্ষণ এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা যে কোনও গবেষকের পক্ষেই শিক্ষণীয়। কোনও কারণে গবেষণার গতি মন্থর হয়েছে যখনই, উৎসাহ যুগিয়ে লেখায় ফিরতে বাধ্য করেছেন তিনিই। সর্বোপরি গবেষকের সামর্থ্যে ভরসা রেখে প্রথম দিন থেকেই বিষয়ের সঙ্গে একটা লাগাতার অংশগ্রহণের ক্ষেত্র হাতে ধরে তৈরি করিয়েছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই।

প্রথম অবস্থায় গবেষণা-প্রস্তাব সহ আলোচ্য বিষয়ের নানা দিক নিয়ে কথা বলে উপকৃত হয়েছি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্বে আমার শিক্ষক এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সত্যবতী গিরির সঙ্গে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক দেবার্চনা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ তিনিই আমায় দেন। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই।

পরবর্তী ক্ষেত্রে আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক অনন্যা বড়ুয়ার উদ্যোগেই অধ্যাপক দেবার্চনা সরকার Research Advisory Committee-এর বহির্বিভাগীয় নির্দেশক হিসেবে বর্তমান গবেষণা-কর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছেন। এই দীর্ঘ পাঁচ বছরের গবেষণাপথে প্রকৃত অর্থেই তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। বহু দুরূহ-জটিল সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়, অর্থ এবং তাৎপর্য অনুধাবনে তিনি যে'ভাবে সাহায্য করেছেন, তা ভোলবার নয়। সামগ্রিকভাবে গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক সমস্যার গ্রন্থিমোচনেও তাঁর মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। তাঁকে আমার অনিঃশেষ শ্রদ্ধা জানাই।

আরেক মাস্টারমশাই, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শেখর সমাদ্দার Research Advisory Committee-এর আন্তর্বিভাগীয় নির্দেশক হিসেবে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁকেও আমার প্রণাম জানাই। শ্রদ্ধা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক এবং বর্তমান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ-কে। প্রাথমিক স্তরে তিনি অভিসন্দর্ভের শিরোনাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেকগুলি বিকল্পের মধ্যে 'তত্ত্ব' শীর্ষক শব্দটি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। গবেষণা-অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত রূপেও শিরোনাম হিসেবে তাঁর প্রস্তাবিত 'তত্ত্ব' শব্দটিই রইল।

বলাগড় মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পারঙ্গম প্রসেনজিৎ বসুর সুচিন্তিত পরামর্শ গবেষণার কয়েকটি ক্ষেত্রে চিন্তার অভিমুখ তৈরিতে সাহায্য করেছে। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রয়োজনমতো বইপত্র যেমন ব্যবহার করেছি, তেমনই কয়েকটি টেক্সটের নির্বাচিত অংশ তিনি ডিজিট্যাল মাধ্যমেও পাঠিয়েছেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বর্তমান বিভাগীয় প্রধান

অভিষেক ঘোষাল গবেষণাকালে সর্বদা উৎসাহিত করেছেন। একটি জরুরি প্রবন্ধ তিনি ডিজিট্যাল মাধ্যমে পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন। আমার বর্তমান কর্মক্ষেত্র বাসন্তী দেবী কলেজের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনারত স্বর্ণাভ বালা ইদানীংকালে অমুদ্রিত গণপতি বিষয়ক একটি উপন্যাস আমার জন্য সংগ্রহ করে এনেছেন। বাসন্তী দেবী কলেজের বরিষ্ঠ অধ্যাপক এবং লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট গবেষক ইন্দ্রাণী দত্ত শতপথীর স্নেহসঙ্গ ও নিরন্তর উৎসাহ প্রতিনিয়ত আমার সঙ্গে থেকেছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বই তিনি উপহার হিসেবে দিয়েছেন। এঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণায় ব্যবহৃত উপাদান সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে সংগ্রহ করেছি। এদের মধ্যে ইদানীংকালে বাংলায় গাণপত্য ধর্মের অন্যতম প্রচারক সুরজ কুমার দাস পরিচালিত 'স্বানন্দাদ্বৈত' গ্রুপটির কাছে বিশেষভাবে ঋণী। প্রয়োজনবিশেষে তাঁর প্রকাশিত কোনও কোনও তথ্য ও ব্যাখ্যান স্বীকৃতিসহ অনুসরণ করেছি।

অনিঃশেষ শুভেচ্ছা রইল রিয়া চক্রবর্তীর প্রতি, যার উৎসাহ, সাহচর্য ও প্রত্যক্ষ সহায়তা এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচনার প্রথম দিন থেকে সঙ্গে থেকেছে। গবেষণা-অভিসন্দর্ভের ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক অংশগুলিতে যাত্রাসঙ্গী হয়েছিল দীর্ঘদিনের বন্ধু সৈকত সরকার। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত অনেকগুলি আলোকচিত্রের জন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী।

গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তথ্যসম্ভার ও আনুষঙ্গিক বইপত্রের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং ইন্টারনেট মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ করেছি। এদের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই JSTOR, INTERNET ARCHIVE ও LIBRARY GENESIS-এর মতো ওয়েবসাইটগুলিকেও। এদের মাধ্যমেই করোনাকালে বহু দুষ্প্রাপ্য বই, প্রবন্ধ এবং পত্র-পত্রিকা আমাদের হস্তগত হয়েছে। বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের কিউরেটর তুষার সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর সাহায্যে সংগ্রহশালার গণেশমূর্তি এবং অন্যান্য প্রত্ন-ভাস্কর্যগুলি দেখার সুযোগ হয়েছিল। ধন্যবাদ জানাই শান্তিপুরের সুত্রাগড়ের গণেশ মন্দিরের পূজারী শঙ্কর চক্রবর্তী-কেও। এ ছাড়া ক্ষেত্রসমীক্ষাপর্বে বহু আপাত-অচেনা মানুষের প্রদেয় তথ্যে উপকৃত হয়েছি। তাদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেকশন এবং পিএইচ. ডি. সেল-এর আধিকারিক কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানাই।

সতর্কতা সত্ত্বেও গবেষণার ক্ষেত্রে যদি কোনও ভ্রান্তি, বিচ্যুতি বা বানান প্রমাদ থেকে যায়, তার জন্য গবেষক ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে, এই পাঁচ বছরের বোঝা-পড়া এবং সিদ্ধান্তের সারবদ্ধ রূপ হিসেবে বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকদের কাছে সবিনয়ে উপস্থাপন করছি।

২২/এ, পি. কে. বিশ্বাস রোড, খড়দহ

উত্তর চব্বিশ পরগণা, কলকাতা-৭০০১১৭ (সৌম্যদীপ বসু)

সূচিপত্র

পৃ.

ভূমিকা ১ - ৮

প্রথম পর্যায় : গজানন গণেশের দেবত্বের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রথম অধ্যায় গণপতি গণেশের বিবর্তন এবং দেবত্বের উদ্ভব ৯ - ৪৫

১.১ গণপতি অনেকান্ত

১.২ বিনায়ক কথা : বহু থেকে এক

১.৩ মহাকাব্যে গণেশ প্রসঙ্গ

১.৪ প্রাগার্য হস্তীদেবতার ঐতিহ্য ও গণপতি

১.৫ গণপতি, বিনায়ক ও হস্তীদেবতা থেকে গণেশ : একটি ক্রম-বিবর্তিত সমীকরণ

দ্বিতীয় অধ্যায় সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে গণপতি গণেশের ক্রমবিকাশ ৪৬ - ১৩৬

২.১ পুরাণকথায় গণপতি প্রসঙ্গ

২.২ স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও মূর্তিকলায় গণপতি

২.৩ গণেশকেন্দ্রিক শাস্ত্রগ্রন্থ

২.৪ গণপতির রূপভেদ এবং গাণপত্য সম্প্রদায়

২.৫ জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে গণপতি

২.৬ সাধনমার্গীয় ব্যাখ্যায় গণপতি

দ্বিতীয় পর্যায় : বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গণপতি প্রসঙ্গ

তৃতীয় অধ্যায় গণপতি উপাসনা এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশ ১৩৭ - ৩১২

৩.১ বঙ্গীয় লেখমালায় গণেশ

৩.২ পুরাণকথায় গণেশ প্রসঙ্গ

৩.৩ মূর্তিশিল্প এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্যে গণেশ

৩.৪ বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্যে গণপতি

৩.৫ স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাসনা এবং গণপতি

৩.৬ তন্ত্রমার্গে গণপতি প্রসঙ্গ

৩.৭ অনুবাদ সাহিত্যে গণপতি

৩.৮ মঙ্গলগীতে গণেশ প্রসঙ্গ

৩.৯ শাক্ত পদাবলীতে গণেশ প্রসঙ্গ

৩.১০ গণেশকেন্দ্রিক ব্রতাচার ও পূজাপার্বণ

চতুর্থ অধ্যায় বিবর্তনের ধারায় গণপতি এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পরিগ্রহণ ৩১৩ - ৩৫৬

৪.১ কাব্য-কবিতায় গণেশ প্রসঙ্গ

৪.২ গল্প-উপন্যাস ও গদ্যধর্মী রচনায় গণপতি

৪.৩ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে গণপতি বিষয়ক চিন্তা-চর্চার হালহকিকত

পঞ্চম অধ্যায় বঙ্গসংস্কৃতির নানা পরিসর এবং গণপতি ৩৫৭ - ৩৭৬

উপসংহার ৩৭৭ - ৩৮৫

গ্রন্থপঞ্জি ৩৮৬ – ৪০০

চিত্রসূচি ৪০০ - ৪২৩

ভূমিকা

'গণপতি-তত্ত্ব এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গণপতি প্রসঙ্গ' কার্যত একটি দেবতাভিত্তিক পর্যালোচনা। দেবতত্ত্বের বিবর্তনের দৃষ্টিতে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে গণপতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাটিকে যেমন এই প্রস্তাবে বুঝতে চাওয়া হয়েছে, তেমনই বিশেষভাবে বঙ্গদেশের সাহিত্য তথা সংস্কৃতির অন্যান্য প্রকরণে গজানন-গণেশের প্রকাশরূপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাগুলি সন্ধান করা হয়েছে। ভারতীয় ধর্মের প্রেক্ষিতে গণপতি সংক্রান্ত তত্ত্বালোচনা আগেও ঢের হয়েছে। তবে বেশিরভাগ সন্ধানই উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতকে কেন্দ্র করে। বস্তুত গণেশ কাল্ট বিষয়ে ভারতীয় প্রেক্ষিতে এই জাতীয় আলোচনার হারই বেশি। যেহেতু দক্ষিণে ও মহারাষ্ট্রে গণপতির মহিমাপ্রচার সবচেয়ে বেশি হয়েছে এবং গণেশের একভক্ত সম্প্রদায় বা গাণপত্যরা ওই অঞ্চলেই সক্রিয়ভাবে উপস্থিত, ফলে গণেশ বা গণপতি বললেই একধরনের বহির্বঙ্গীয় সংস্কৃতির স্পর্শ জোরালো হয়ে ওঠে। পূর্বভারত, বিশেষত বঙ্গদেশে গণেশ কাল্টের বিবেচনায় পণ্ডিত বা গবেষকদের মনোযোগ প্রথম থেকেই কম। বঙ্গদেশে পঞ্চদেবতার মধ্যে গণেশের প্রথমপূজ্যতার খতিয়ান দিয়ে সবসময় এই পরিস্থিতিকে বুঝলে চলবে না। আপামর বাঙালির কাছে গণেশের গ্রহণযোগ্যতায় ভাঁটা না পড়লেও বাংলায় একভক্ত সম্প্রদায় হিসেবে গাণপত্যের অনুপস্থিতি গজানন-গণেশের গৌণতার অন্যতম কারণ। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে গণেশ বা গাণপত্য সম্প্রদায়ের অবস্থান, গণপতির বহুবিচিত্র রূপ, ভূমিকা এবং দেবতা হিসেবে তাঁর উদ্বর্তনের নানাবিধ স্তর পুরাতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ইংরেজি ভাষায় রচিত একাধিক বইয়ের প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে পূর্বপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বইপত্রের নিদর্শন হল – Alice Getty, *Ganesa : A Monograph of the Elephant-faced God* (1936), Haridas Mitra, *Ganapati* (1959), H. Heras, *The Problem of Ganapati* (1972), Paul B. Courtright, *Ganesa : Lord of Obstacles, Lord of Beginnings* (1985), *Ganesh : Studies of an Asian God* (1991), Shanti Lal Nagar, *Cult of Vinayaka* (1992), Anita Raina Thapan, *Understanding Ganapati : Insights into the dynamics of a Cult* (1997), Yuvraj Krishan *Ganesa : Unravelling an Enigma* (1999), M. K. Dhavalikar, *Ganesa : The God of Asia* (2016)। লক্ষণীয়, গণপতি বিষয়ক গবেষণার ধারায় এই জাতীয় বইপত্র উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলেও বঙ্গদেশীয় ধর্ম ও সমাজে গণেশের স্বরূপ বিষয়ে এগুলি প্রায়শই নীরব। মুখ্যত সর্বভারতীয় স্তরে গণেশ প্রসঙ্গের বিবেচনা-ই এইসব রচনার প্রতিপাদ্য।

প্রয়োজনের নিরিখে পূর্বভারত তথা বাংলার অংশত উল্লেখ দেখা গেলেও মূল আলোচনার নিরিখে এগুলি বহির্বঙ্গীয় গণেশ কাল্টের প্রবণতাগুলিকেই খেয়াল করেছে। গণেশ যেহেতু ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই কেবল আলোচ্য নন, একইসঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, ফলে ভারতের বেষ্টনী ছাড়িয়ে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে এই Pan-Asian God-কে কেন্দ্র করে নানা অভিমুখ থেকে বিশ্লেষণ উল্লিখিত বইপত্রে প্রায়শই হয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত যেটা, তা হল পূর্বভারত, বিশেষত বাংলার ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে গণপতির স্বরূপ-সন্ধান।

আমাদের বর্তমান প্রস্তাব পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তগুলির থেকে স্বভাবত স্বতন্ত্র। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে আমাদের চিন্তন ও মননের ক্ষেত্রটি কেবল সাহিত্যখণ্ডেই আটকে থাকতে পারে না। ‘বাংলা সাহিত্য’ বিষয়ক গবেষণার পাশাপাশি বঙ্গদেশ, বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতি, সাহিত্য ছাড়াও সংস্কৃতির অন্যান্য পরিসরে বিশেষ কোনও দেবতার প্রকাশরূপের বৈচিত্র্য— এই ধরনের বিষয়-ভাবনাও একইভাবে অনুসন্ধিৎসু গবেষককে প্রাণিত করতে পারে। বিশেষত বঙ্গদেশ বা বঙ্গসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রটি কখনওই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত কতকগুলি গ্রন্থের চৌহদ্দিতে নিঃশেষ হতে পারে না। তা ছাড়া দেবতার ধারণা পরিব্যাপ্ত বলেই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ধর্ম-সমাজ-সাহিত্যে তাঁর রূপায়ণের মাত্রাগুলি চিহ্নিত করা সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। আমরা বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভের ডৌলটি কার্যত এই অভিমুখেই সাজিয়েছি। উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যে গণপতি-গণেশের অবস্থান ঠিক কেমন, তা বিভিন্ন সময়ের সাহিত্য-সংরূপে তো বটেই, এমনকী সংস্কৃতি চর্চার অন্যান্য পরিসরেও গুরুত্বের সঙ্গে খেয়াল করা হয়েছে। নির্দিষ্টভাবে বঙ্গদেশের প্রেক্ষিতে গণপতি-গণেশের বহুমাত্রিক উপস্থাপনা ঘিরে এই জাতীয় অন্বেষণ হালফিলেও একটি অল্পচর্চিত ডিসকোর্স বলা যায়।

বাংলা ভাষায় গণপতি সম্পর্কিত সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। চন্দ্রনাথ বসুর *ত্রিধারা* সংকলনভুক্ত ‘সিদ্ধিদাতা গণেশ’ শীর্ষক প্রবন্ধটিকে এক্ষেত্রে প্রথম নিদর্শন ধরা যেতে পারে। এরপর বিশ শতক জুড়ে গণেশের দেবত্বের উদ্ভবের কালগত তথ্যতল্লাশ সমালোচকদের কাছে একটি তর্কযোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। এ ছাড়া প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ভারততত্ত্ববিদ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের ‘গণেশ’ (কার্তিক) ও ‘মূর্তিতত্ত্বে গণেশ’ (পৌষ) শীর্ষক প্রবন্ধ দুটি ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণেশ বিষয়ক প্রসঙ্গগুলি বিবেচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সাধনমার্গের ব্যাখ্যান বা সম্প্রদায়নির্ভর তত্ত্ব-ব্যাখ্যার আশ্রয়ে লেখক গণপতি প্রসঙ্গের

বিশ্লেষণ করেছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর এই আলোচনাগুলি পুরোগামী থেকে প্রকাশিত *লক্ষ্মী ও গণেশ* বইটির (১৯৬৩) অন্তর্ভুক্ত হয়। শুধু পত্রিকার পাতাতেই নয়, ধর্মতত্ত্বের প্রেক্ষিতে শাস্ত্রমূলক দৃষ্টান্তের সমর্থনে গণপতি-তত্ত্বের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত আলোচনা পাওয়া যাবে ভারতী পাবলিশিং কোং প্রকাশিত সতীশচন্দ্র শীলের *দেবদেবীতত্ত্ব* বইয়ের (১৯৪৭) প্রথম খণ্ডের 'গণেশ' কিংবা ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড প্রকাশিত হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের *হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*-এর (১৯৬০) দ্বিতীয় পর্বের 'রুদ্রগণ ও গণেশ' শীর্ষক অংশে। এর একেবারে বিপরীত কোটিতে দাঁড়িয়ে গণপতি প্রসঙ্গের মূল্যায়ন করেছেন বিশিষ্ট দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। নিউ এজ প্রকাশিত *লোকায়ত দর্শন*-এর (১৯৫৬) দ্বিতীয় খণ্ডের 'গণপতি – বস্তুবাদের উৎস সন্ধানে' শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি প্রাচীন ভারতীয় সমাজ বিকাশের পটভূমিতে গণপতি সংক্রান্ত তত্ত্বভাবনার বস্তুভিত্তি অনুসন্ধান করেছেন। যদিও বিশেষ এই সমীক্ষায় গণপতির ভাব-রূপের নির্মাণে লেখকের রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক অভিমুখ স্পষ্ট ধরা পড়েছে। ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা বা ধর্মতত্ত্বগত দৃষ্টিকোণ থেকে গণপতি প্রসঙ্গ সেখানে বিবেচিত হয়নি। ইতিহাসের বাহ্য উপাদানের সাক্ষ্যে দেবতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সূত্রগুলি লেখক ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করেছেন। হস্তীমুখ ইঁদুরবাহন গণেশের identity-র নির্মাণে totem সংক্রান্ত ধারণা কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা প্রাগার্য ভারতে নানাবিধ উৎস থেকে গজাননের ধারণা কীভাবে বিবর্তিত হয়ে আর্যীকরণের মধ্য দিয়ে শেষে পৌরাণিক যুগে এক দেবতার জন্ম সম্ভব করল, এই জাতীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর আলোচনায় অনুসৃত হয়েছে।

এবার একুশ শতকের গণপতি বিষয়ক চর্চার কয়েকটি নিদর্শন সামনে আনা যাক। গিরিজা লাইব্রেরি প্রকাশিত পৃথ্বীরাজ সেনের *সিদ্ধিদাতা গণেশ* (২০১৭) এবং অরুণা থেকে প্রকাশিত শিবেন্দু মান্নার *বঙ্গহৃদি গণপতি-গজানন* (মে, ২০১৭)— বই দুটি বাংলা ভাষায় রচিত গণপতি বিষয়ক গ্রন্থ। এ ছাড়া অতি সম্প্রতি (২০২৩) টেরাকোটা প্রকাশনী থেকে ইন্দ্রাণী সেনের *গণপতির অন্বেষণে* (*গণপতির উৎস সন্ধানে* শীর্ষক পূর্বতন গ্রন্থের পরিবর্ধিত রূপ) শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাধর্মী সংকলন হিসেবে এগুলিকে মান্যতা দেওয়া একটু মুশকিল। কারণ, ভারতীয় ধর্মসাহিত্য বা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রমাণগুলিকে এইসব ক্ষেত্রে সামগ্রিক ঐক্যে উপস্থিত করা হয়নি। একটি বিশেষ প্রদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে কোনও দেবতার অবস্থানকে চিহ্নিত করতে গেলে ওই ভূখণ্ডের অন্যান্য ধর্মধারার সঙ্গে তাঁর তুলনামূলক সম্পর্ক নিরূপণও জরুরি। কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে চিরচেনা কয়েকটি মঙ্গলগীতের গণেশ বন্দনা বা সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধার করলেই

বঙ্গদেশে গণেশের বিশিষ্ট স্বরূপটিকে শনাক্ত করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন ভারতীয় ধর্মমার্গে গণপতির দেবত্বের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের স্তরগুলির সঙ্গে মিলিয়ে বাংলায় গজানন-গণেশের বহুমাত্রিক উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামগ্রিকতার প্রশ্নে এই ধরনের সমীক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। পাশাপাশি গণেশের উদ্ভব সংক্রান্ত আলোচনায় সংস্কৃত পুরাণ বা অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ যা যা ব্যবহৃত হয়েছে, বেশিরভাগটাই secondary source থেকে সংগৃহীত। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার স্তরে এই ধরনের মূল্যায়ন কতটা গ্রাহ্যতা পাবে, এ নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। উৎস-নির্দেশের যাথার্থ্য রক্ষার দিকটি উপেক্ষিত তো হয়েছেই, উপরন্তু তথ্যাদি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও বঙ্গীয় ধর্ম-সংস্কৃতির নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতগুলি যাচাই করার কোনও প্রয়াস দেখা যায় নি। বিচ্ছিন্নভাবে বঙ্গীয় ধর্মাচারে, উৎসব-পার্বণে বা মধ্যযুগের মঙ্গলগীতে গণপতির উপস্থিতি দর্শানোর বাইরেও একটি ধর্মকাল্টের সামগ্রিক পরিচয় বা তার বিবর্তনের নানামুখী স্তর, কালভিত্তিতে স্পষ্টভাবে তাদের চিহ্নিতকরণ— কোনওটাই বাংলা ভাষায় গণেশ বিষয়ে রচিত এই ধরনের বইপত্রে মিলবে না। content analysis-এর থেকে অগোছালোভাবে তথ্য সন্নিবেশ গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক প্রমাণও বেশ কিছু উদ্ধার করা হয়েছে। তবে কোনওটাই বাংলার গণেশ কাল্টকে ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তেমন জুতসই নয়। যে কোনও দেবতা বা তদনুসারী ধর্ম-সম্প্রদায়কে নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডের ধর্ম ও সমাজের প্রেক্ষিতে বুঝতে হলে সেই মূল্যায়ন অভিলেখ বা মূর্তিলেখ, স্থাপত্য-ভাস্কর্য বা মূর্তি এবং সাহিত্য-প্রমাণের ভিত্তিতে হওয়া জরুরি। কারণ, সাহিত্য-প্রমাণের পাশাপাশি লেখপ্রমাণ ও মূর্তিপ্রমাণের নিক্তিতেও সময় থেকে সময়ান্তরে দেবতার রূপ-রূপান্তর বুঝে নিতে হয়। সঙ্গে বিশ্বাসীর মনস্তত্ত্বের নিবিড় পাঠও আবশ্যক হয়ে পড়ে।

উল্লেখ্য, বর্তমান প্রস্তাবটি একান্তভাবেই দেবতা বিষয়ক সমীক্ষা হওয়ায় দেবতত্ত্বের বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে অপরিহার্য ব্যাপার। আমাদের মনে হয়েছে, দেবতার ধারণার উদ্বর্তনে সমাজ-ইতিহাসের যত ধরনের প্রেরণাই ক্রিয়াশীল থাক, সেইসব বাহ্য উপাদানের ভিত্তিতে তাঁর দেবত্বকে নিতান্ত ঐতিহাসিক স্তরে আটকে রাখা চলে না। যে কোনও দেবতার রূপাবয়ব অথবা বাহন পর্যালোচনার সূত্রে প্রাগৈতিহাসিক পর্বের totem সংক্রান্ত ভাবনা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে ওঠে, কিন্তু দেবতার complete identification-এর ক্ষেত্রে কি তাঁর totemic origin সংক্রান্ত ধারণাটুকুই যথেষ্ট? বোধহয় নয়। কেননা, ইতিহাসের স্তরেই totem ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা। ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব সেখানেই, যেখানে ঐতিহাসিক স্তর থেকে এক-একটি totem-এর পূর্ণ বিস্ফার ঘটে ধর্ম-দর্শনের স্তরে পৌঁছোয় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ দেবপরিচয়ে সম্প্রসারিত হয়ে যায়, তখন কেবল

উৎসগত ইতিহাসভিত্তিকে প্রধান ভাবলে চলে না। কাজেই, কোনও এক দেবতার উৎসমূলে কতটুকু জনজাতিক বা উপজাতিক প্রেরণা আছে, তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্য বা বাহন দেখে কোন উপজাতি বা জনজাতির একটি বিশেষ clan-এর সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘনীভূত হচ্ছে— কেবল এই জাতীয় তথ্যসাপেক্ষে দেবতত্ত্বের বিশ্লেষণ অসম্ভব। দেবতার জন্মমূলে যদি কোনও প্রাগার্য উপাদানের প্রভাব থেকেও থাকে, তা Religion Studies-এর দৃষ্টিতে নিতান্ত বাহ্যস্তরের প্রমাণ। আজ আর তাকে আলাদা করাও সম্ভব নয়। কারণ, বেদের মধ্যেই প্রাগার্য উপাদানের syncretism এই হারে ঘটেছে যে, শ্রুতিপ্রমাণে সেই দেবতা যখন গৃহীত হয়ে যাচ্ছেন, অর্থাৎ তাঁর রেকর্ড যখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে, ভারতীয় ধর্মপ্রস্থানে এক নির্দিষ্ট দেবপরিচয়ে সেই থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু। ওই শ্রুতিমূল ধরেই ধর্ম-পরম্পরায় তাঁর archetypal বিবর্তন শনাক্ত করতে হবে। সুতরাং 'দেবতা'-র ধারণা পরিব্যাপ্ত এবং একটি বিশেষ ধর্ম-দর্শন আধারিত বলেই তাঁকে কেবল totem প্রভৃতি বাহ্য উপাদানের নিরিখে বিশ্লেষণ করা নিরর্থক। আমাদের মনে হয়, নির্গুণ, নিরাবয়ব, নিরূপাধিক ব্রহ্মের সগুণ রূপকল্পনায় যে দেবতত্ত্বের উৎপত্তি, একমাত্র সাধকের ধ্যানমার্গেই যাঁর আত্মপ্রকটন, সেই দেবতার ধারণাকে ভাব, শাস্ত্র ও তত্ত্বভিত্তিতে বিশ্লেষিত করতে গেলে অধ্যাত্মমার্গেই তা করণীয়। একবাক্যে বললে, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র— ভারতীয় ধর্মমার্গের এই প্রস্থান-চতুষ্টয়ে কোনও দেবতার আত্মসাৎ যতক্ষণ না সম্পূর্ণত ঘটেছে, স্মার্ত হিন্দুর ধর্মমানসে ততক্ষণ তিনি দেবরূপে গৃহীত হন না। মনে রাখতে হবে কোল, খাড়িয়া, খারোয়ার, কুমহার প্রভৃতি উপজাতি গোষ্ঠী যেমন হাতিকে তাদের কুলপ্রতীকরূপে গণ্য করে, তেমনই ওঁরাওদের টিকরি, টিগা প্রভৃতি গোষ্ঠী ইঁদুরকে টোটেম বলে মানেন। এখন কোল বা ওঁরাওদের বিশেষ এই কৌমগুলির totem ভাবনার সূত্রে প্রাগার্য ভারতে যদি গণপতি-গণেশের idea সুগঠিত হয়-ও, তাহলেও এই বাহ্য উপাদানের সমর্থনটুকু ছাড়া দেবতত্ত্বের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এরা কি সত্যিই গভীর কোনও প্রয়োজন পূরণ করে? সম্ভবত না। কারণ, হাতি বা ইঁদুরকে কি আমরা আক্ষরিক অর্থেই গণেশ ভাবি? হয়তো আধুনিক কোনও আখ্যানে হাতি বা ইঁদুরের অনুষঙ্গে রচনাকার গণেশকে সামনে আনার চেষ্টা করেন, হয়তো গণেশের বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট্যের রূপক হয়েও এরা জায়গা করে নেয়, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে হাতি বা ইঁদুর = গণেশ, এমন সমীকরণ সম্ভব নয়। হাতিমুখ, স্থূল দেহ এবং ইঁদুর বাহনের সূত্রে যাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে, তিনি 'দেবতা' হিসেবে অন্তত কোনও অর্থেই হাতি বা ইঁদুরের সমার্থক নন। কাজেই, এইসব শারীর-সূত্রের অবলম্বনে যাঁরা গণেশকে Tribal God হিসেবে চিহ্নিত করতে চান, ভারতীয় অধ্যাত্মমার্গে তাঁদের প্রবেশাধিকার কুণ্ঠিত হতে বাধ্য। আমাদের বিচারে, বাংলার গণেশ সর্বার্থেই পৌরাণিক দেবতা।

লোকসমাজ পূজা না করলে কোনও দেবতাই দেবতা হিসেবে গৃহীত হন না। সেই অর্থে লোকপূজ্য তো তিনি বটেই। তবে Folkloristics-এর 'folk'-সংক্রান্ত প্রচলিত তত্ত্বভাবনার সূত্রে আমরা কখনওই গণেশকে 'লৌকিক দেবতা' বলে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী নই। খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে সর্বভারতীয় পুরাণগুলিতে একটি নির্দিষ্ট দেবপরিচয়ে গৃহীত হয়েই বঙ্গদেশে গণপতি-গণেশের প্রবেশ সম্ভব হয়েছে। শুরুতে হয়তো তিনি প্রথমপূজ্য ছিলেন না। কিন্তু, বিঘ্নকর অপশক্তিরূপে নয়, বিঘ্নবিনাশক সিদ্ধিদাতা হিসেবেই বঙ্গীয় ধর্মচর্যায় প্রথম থেকে গজাননের অধিষ্ঠান। তা ছাড়া গণেশ যদি ভারতের সর্বত্র পূজিত না হয়ে কেবল বঙ্গের-ই উপাস্য দেবতা হতেন, তবে তাঁর উদ্ভব সংক্রান্ত আলোচনায় totem জাতীয় আলোচনার একটা আবশ্যকতা থাকত। তা যখন নয়, তখন বাংলার গণেশের আলোচনায় এই totem সংক্রান্ত বাগবিস্তার অপ্রাসঙ্গিক বলেই বর্জন করেছি।

অভিসন্দর্ভটি বিন্যস্ত হয়েছে দুটি পর্যায়ে— প্রথম পর্যায়ে সর্বভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে গণপতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর পুনর্গঠিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্দিষ্টভাবে বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির নানা প্রকরণে গণেশ কাল্‌টের স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে। দুটি অধ্যায় প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে গণপতি-গণেশের বিবর্তন এবং দেবত্বের উদ্ভবের বিভিন্ন সূত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। 'গণপতি', 'বিনায়ক' এবং 'হস্তীদেবতা'-র পৃথক ঐতিহ্য থেকে কীভাবে খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে পুরাণ সংকলনের পর্বে এক নির্দিষ্ট দেবতার identity নির্মিত হল, আলোচনায় সেই যোগবন্ধনের ধাপগুলি স্পষ্ট করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্বভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে গজানন গণেশের উত্তরোত্তর প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির স্তরগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পুরাণকথায়, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও মূর্তিকলায় এবং গণেশ-কেন্দ্রিক শাস্ত্রগ্রন্থে গণেশের ক্রমবিকাশের প্রসঙ্গগুলি বিবেচনা করেছি আমরা। পাশাপাশি গাণপত্য কুলদেবতার বিভিন্ন রূপভেদ ও তদনুসারী ছ'টি শাখা-সম্প্রদায়ের মতবাদ-ও সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী অংশে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে কোন কোন বৈশিষ্ট্যে এবং মাত্রায় গণেশ গৃহীত হয়েছেন, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শেষে সাধক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণপতি-তত্ত্বের ধর্ম-দার্শনিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচ্য মুখ্যত তিনটি বিষয়— এক, লেখপ্রমাণ, মূর্তিপ্রমাণ এবং সাহিত্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশে গণপতি উপাসনার চিহ্নগুলি সন্ধান; দুই, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপে গণপতি প্রসঙ্গের পরিগ্রহণ; তিন, সাহিত্য ছাড়া বঙ্গসংস্কৃতির অন্যান্য পরিসরে গণপতির রূপায়ণ।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশে গণেশ প্রসঙ্গের বহুমাত্রিকতার সন্ধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাচীন বঙ্গে গণেশ উপাসনার চিহ্নগুলি অভিলেখ, মূর্তি এবং পুরাণকথার সূত্রে বিবেচনা করেছি আমরা। এ ছাড়া একাদশ-দ্বাদশ শতকের কোষকাব্য বা সংস্কৃত শ্লোক সংগ্রহমূলক গ্রন্থে গণপতির বহুবিচিত্র রূপায়ণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আমরা স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাসনায় গণেশের অন্তর্ভুক্তির পরিপ্রেক্ষিতটি দেবতত্ত্বের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি মূল স্মার্ত ধারার সমান্তরালে তন্ত্রমার্গে গণেশের প্রতিষ্ঠার সূত্রগুলিও আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। পরবর্তী অংশে মধ্যযুগের বাংলায় সাহিত্য-প্রমাণের ভিত্তিতে গণপতির অবস্থানটিকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলগীত এবং শাক্তপদাবলীতে গণেশ প্রসঙ্গ একে একে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষাংশে বাংলার ধর্মীয় ঐতিহ্যে গণেশকেন্দ্রিক ব্রতাচার এবং পূজা-পার্বণের চিহ্নগুলিকে খোঁজার চেষ্টা করেছি আমরা। শান্তিপুরের 'সুত্রাগড়'-এ ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে বাংলার একমাত্র গণেশ মন্দিরের (কেন্দ্রীয় দেবতা গণেশ) যে নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেখানকার গণেশমূর্তির বিশেষত্ব, পূজা-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি বাংলায় গণেশপূজার বিভিন্ন দিকও এই পর্বে বিশ্লেষিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপে গণপতি ও তদ্বিষয়ক প্রসঙ্গের পরিগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন কোন প্রবণতা লক্ষ করা যায়, তা বিচার করার চেষ্টা করেছি আমরা। উনিশ-বিশ শতকীয় কাব্য-কবিতায়, গল্প-উপন্যাস ও অন্যান্য গদ্যধর্মী আখ্যানে এবং পত্র-পত্রিকা ও সমালোচনামূলক নিবন্ধে গণপতি কীভাবে এবং কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সময়োচিত মুদ্রায় উপস্থাপিত হয়েছেন, তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে সাহিত্য-মাধ্যম ছাড়া বঙ্গসংস্কৃতির অন্যান্য প্রকরণে গণেশের উপস্থাপনার ধরনগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে। এই পর্যায়ে লোকশিল্পের বিভিন্ন উপকরণে, ছৌ প্রভৃতি লোকনৃত্যের প্রারম্ভিক পর্যায়ে বন্দনা-নৃত্যের মধ্যে, পটচিত্রকলায়, এমনকী ধ্রুপদী চিত্রকলাতেও গণপতির ভাবরূপের বৈশিষ্ট্যগুলি খোঁজার চেষ্টা করেছি আমরা।

সমগ্র অভিসন্দর্ভটি Mixed Method Approaches-এর আশ্রয়ে রচিত। এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে 'বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি' (Descriptive Research Method), 'পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি' (Text Analytical Method) এবং 'তুলনামূলক পদ্ধতি' (Comparative Method) অনুসৃত হয়েছে। এ ছাড়া ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক অংশগুলিতে Survey Method (questionnaires, interviews and random data sampling) অবলম্বন করা হয়েছে।

উল্লেখসূচি এবং গ্রন্থপঞ্জির ক্ষেত্রে MLA HANDBOOK-এর নবম সংস্করণ-এ (April, 2021) প্রদত্ত বিধি অনুসৃত হয়েছে। যদিও বাংলা বা যে কোনও ভারতীয় ভাষার গবেষণায় ইউরোপীয় রীতি হুবহু মান্য করার ক্ষেত্রে কিছু তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সমস্যা থেকেই যায়। সেগুলি এড়াতে আমরা ভারতীয় ভাষায় লেখা বইপত্রে ভারতীয় ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক যুক্তিবোধ অনুযায়ী প্রথমে নাম ও পরে পদবী ব্যবহার করেছি। বহির্ভারতীয়দের ক্ষেত্রে অবশ্য পদবী আগে এবং নাম পরে ব্যবহারের MLA-নির্ধারিত বিধিটি মান্য করা হয়েছে। এ ছাড়া গ্রন্থপঞ্জি রচনার ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন। এতদিন গ্রন্থপঞ্জির ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট বই যে প্রকাশনা সংস্থা থেকে বেরিয়েছে, সেই প্রকাশনালয়ের স্থাননির্দেশ করা হত। কিন্তু, বর্তমানে এই নিয়মে বদল এসেছে। এখনও পর্যন্ত শেষ প্রকাশিত MLA ভার্সন অনুযায়ী (April, 2021) শুধুমাত্র প্রকাশনীর নামটুকুই দিতে হবে, স্থাননাম উল্লেখের প্রয়োজন নেই। বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভে আমরা এই বিধি অনুসরণের চেষ্টা করেছি। তবে উনিশ বা বিশ শতকে প্রকাশিত বইপত্রের ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে, যেখানে স্থাননাম হিসেবে কোনও ব্যক্তিবিশেষ অথবা বিশেষ কোনও স্থানের বিশেষ একটি মুদ্রাযন্ত্রের নামের উল্লেখ রয়েছে। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে স্থাননাম উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি আমরা। গ্রন্থের প্রকাশকাল উল্লেখের ক্ষেত্রে সর্বত্র একইরকম বিধি মান্য করা সম্ভব হয়নি। ফলে সাল-তারিখ লেখবার সময় বঙ্গাব্দ ও খ্রিস্টাব্দ এই দুই রীতির-ই আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের বানানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত বাংলা বানানবিধি মান্যতা পেয়েছে, যদিও উদ্ধৃতির বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশে সাহিত্য-প্রমাণ হিসেবে যে সব উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে, সময়কালের ভিত্তিতে সেগুলি সপ্তম-অষ্টম থেকে অষ্টাদশ শতকের অন্তর্বর্তীকালীন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গণেশ প্রসঙ্গের নানা রূপ খুঁজতে যেসব টেক্সট নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলি উনিশ শতক থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কিংবা সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণে গণপতি-গণেশের উপস্থাপন মোটের ওপর এক ক্রমজায়মান প্রক্রিয়া। ফলে সাহিত্যিকের কলমে বা কারিগরের দক্ষতায় দেবতার নতুন জন্ম হতেই থাকবে। বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিতে গণপতি-গণেশের প্রকাশরূপের বহুমাত্রিক প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায় : গজানন গণেশের দেবত্বের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রথম অধ্যায়

গণপতি গণেশের বিবর্তন এবং দেবত্বের উদ্ভব

ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির চরিত্র তথা পরিসর এমনই বহুধা-বিচিত্র এবং প্রতিটি স্তরে এর চলন এতই জটিল ও বহুকৌণিক যে নির্দিষ্ট কোনও 'দেবতা'-র আদিতম উৎস কিংবা মূল-এর সন্ধান থেকে তাঁর বিবর্তিত হওয়ার ক্রমগুলি ইতিহাসরেখা ধরেই চলে না কেবল, একটি পৃথক গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম-দার্শনিক প্রক্রিয়ারও অন্তর্গত হয়ে পড়ে। ভারতীয় ধর্ম-মানসের এই ব্যাপকতার কারণেই কোনও বিশেষ দেবতার উৎস থেকে বিবর্তন পর্যন্ত একমাত্রিকভাবে চিহ্নিত করা সচরাচর সম্ভব নয়। বর্তমান প্রচলিত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে অবধি তাঁকে বার বার বিবর্তনের মুখোমুখি হতেই হয়। সংস্কৃতায়ণ বা aculturation-এর সূত্রেও দেবতার উদ্ভব সংক্রান্ত ধারণায় বহু সময় মিশ্রণও ঘটে যায়। কোনও দেবতার উদ্বর্তনের ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায় যে, তাঁর আদিকল্পের সন্ধানে গবেষক যতই বেদ-পূর্ব আদিম উপজাতিক totem চিহ্নের দ্বারস্থ হোন না কেন, যতক্ষণ না ভারতীয় ধর্মের শাস্ত্রবদ্ধ অংশে উদ্দিষ্ট দেবতা সমগ্ররূপে গৃহীত হচ্ছেন বা তাঁর পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ ঘটছে, ততক্ষণ পর্যন্ত হিন্দুর ধর্ম-মানসে 'দেবতা' হিসেবে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় স্বীকৃত হয় না। অর্থাৎ, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র হিন্দুধর্মের এই অতি-প্রসারিত জ্ঞানকাণ্ড এবং ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিটি শাখায় উক্ত দেবতাকে এমনভাবে সংশ্লেষিত হতে হয় যাতে সেই 'দেবতা'-র উপাসকমণ্ডলী বা অনুগামী সম্প্রদায়ও এক ক্রম-পরম্পরিত ধর্ম-দার্শনিক মার্গের অংশীদার হতে পারে। এই সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠার সমীকরণটি যে কোনও দেবতার উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রেই খাটবে। গজানন গণেশের দেবত্বের ক্রমবিকাশও কার্যত এই রেখা ধরেই এগিয়েছে। বর্তমান প্রচলিত হস্তীমুখ গণেশের যে মূর্তি, তা মুখ্যত পুরাণকালীন। পুরাণ-পূর্বকালে গণপতি বা গণেশের চিহ্ন খুঁজতে গেলে সাধারণভাবে তিন ধরনের মতামতের মুখোমুখি হতে হয়। এক, বৈদিক গণপতি-তত্ত্বের উত্তরাধিকার কীভাবে পৌরাণিক গজানন গণেশের ওপর বর্তেছে, সেই বিষয়ক ধারণা। দুই, ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত সূত্র-সাহিত্য থেকে স্মৃতিশাস্ত্র হয়ে বিনায়ক সম্পর্কিত ধারণা কীভাবে পুরাণ সংকলনের পর্বে গজমুখ গণেশের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তিন, গণেশের হস্তীমুখ এবং ইঁদুর বাহনের সূত্রে তাঁকে প্রাগার্য ভারতের হস্তীপূজা এবং হস্তী সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপনা। এই ধারণাটি বিশেষত আর্য-পূর্ব ঔপজাতিক সংস্কৃতির প্রভাব-সঞ্জাত বলে মনে হয়। বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর কুলপ্রতীক রূপে হাতি বা ইঁদুর টোটেমের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে হস্তীদেবতার ধারণা বিকশিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই উপজাতি-পূজ্য হস্তীদেবতা পৌরাণিক গণপতি-বিনায়কের সঙ্গে একাধারে সংশ্লিষ্ট হয়। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখলে পুরাণ সংকলনের কালে এই ধরনের সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রাক-বৈদিক পশুদেবতা zoomorphism-এর স্তর পার হয়ে theri-anthropomorphic deity বা আধা

মানুষ-আধা পশুদেহযুক্ত দেবতা রূপে একটি পূর্ণায়ত দেব পরিচয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। গজানন-গণপতি বা গণেশ নামের এই নরাকৃতি পশুদেবতার উদ্ভবের মধ্যে 'great tradition'-এর সঙ্গে 'little tradition'-এর যোগবন্ধনের আকাঙ্ক্ষা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনেকেই গণপতির উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের রূপরেখাটি খতিয়ে দেখে এর বৈদিক এবং প্রাক-বৈদিক উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যদিও আমাদের প্রস্তাবে বর্তমান গজানন গণেশ আদ্যন্ত পৌরাণিক দেবতা। তাঁর মধ্যে পূর্বসূত্র হিসেবে বৈদিক এবং প্রাক-বৈদিক ঐতিহ্যের আত্তীকরণ ঘটেছে ঠিকই, তবে নির্দিষ্টভাবে গজমুখ গণেশের সুস্পষ্ট-চিহ্নিত আবির্ভাব পুরাণ সংকলনের পর্বেই। খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের আগে নয়। এই পর্যায়ে প্রধানত সাহিত্যিক প্রমাণের সাহায্যে বিভিন্ন উৎস থেকে গণপতি-গণেশের এক পরিচয়ের আধারে সংহত হওয়ার ধাপগুলিকে বিশ্লেষণপূর্বক বিবেচনা করা হয়েছে।

১.১

গণপতি অনেকান্ত :

বর্তমান গজমুখ সিদ্ধিদাতা গণেশের বিকল্প নাম 'গণপতি' হলেও হস্তীমুখ দেবতার এই নামধারণ পুরাণ সংকলন পর্বে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের আগে নয়। পূর্বতন গবেষকদের প্রায় প্রত্যেকেই দৃষ্টান্ত সহ প্রমাণ করেছেন বৈদিক সাহিত্যে গণপতির বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত দেবগণের মধ্যে পৌরাণিক গজানন গণেশ অনুপস্থিত। বস্তুত, বেদগ্রন্থমালায় গণপতি নামপদবাচ্য শব্দমাত্র নয়, একটি নির্বিশেষ মর্যাদাসূচক বিশেষণ। গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে একাধিক দেবতা গণপতির পদাধিকার লাভ করেছেন। বাহ্যত এঁরা কেউই পুরাণকালীন গজমুখ, প্রলম্বজঠর, বক্রতুণ্ড গণেশের প্রতিমূর্তি নন। তবে একথা ঠিক যে, আভ্যন্তর ক্ষেত্রে বৈদিক গণপতিদের অনেক বৈশিষ্ট্য পৌরাণিক গণেশের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বেশ কিছু স্বতন্ত্রধর্মী theriomorphic elephant deity বা হস্তীসদৃশ পশুদেবতার ইতস্তত উল্লেখ পাওয়া গেলেও প্রকৃত পরিচয়ে তারা কেউই গজানন গণেশের সমানধর্মা নয়। ফলত, পুরাণ সংকলনের পূর্বকালে ভারতীয় ধর্ম-মানসে 'গণপতি' বিষয়ক তত্ত্ব মূলত শ্রুতিমার্গ-কেন্দ্রিত এবং বেদের প্রস্থানে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবেই এই গণপতিত্বের নির্মাণ ঘটেছিল।

'গণপতি' বেদ-বাহিত ধারণা। ঋকমন্ত্রে গণপতি শব্দের মূল প্রোথিত। বেদে উল্লিখিত গণপতি এক নয়, বহু দেবতার পরিচয়জ্ঞাপক। গণপতি শব্দের আক্ষরিক অর্থ গণ-সমূহের নেতা বা প্রধান অর্থাৎ দলনেতা বা নায়ক

বিশেষ। এই প্রাধান্য কর্তৃত্বমূলক। এক-একটি গণের একেকজন পৃথক পৃথক প্রধান অর্থাৎ গণপতি। গণ যেমন অনেক, গণপতিও অসংখ্য। যেমন, বৃহস্পতির গণ, ইন্দ্রের গণ, রুদ্র-শিবের গণ প্রভৃতি। পৃথকভাবে উল্লিখিত হলেও এই গণপতিদের ধারণা তত্ত্বত আন্তঃসম্পর্ক যুক্ত। *শুক্লযর্জুর্বেদ*-এর *বাজসনেয়ী সংহিতা*-য় এবং *কৃষ্ণযর্জুর্বেদ*-এর *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-য় বহুসংখ্যক গণ ও গণপতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে– 'গণেভ্যো গণপতিভ্যশ্চ বো নমো নমঃ'।[১] সায়ণ এবং মহীধরাচার্যের ভাষ্যে 'গণপতিভ্যঃ' বলতে দেবানুচর, দেবতার অনুগামী বা 'ভূতবিশেষ' বুঝিয়েছে।[২] মহীধর গণপতি শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন গণেদের রক্ষাকর্তা বা অভিভাবক রূপে।[৩] *শুক্লযজুর্বেদ*-এর *মাধ্যন্দিন-সংহিতা*-র ভাষ্যকার উভট 'গণানাং' শব্দের বিশ্লেষণে 'গণসমূহ' অর্থাৎ গণেদের সমাবেশ বুঝিয়েছেন।[৪] বৈদিক 'গণ'-এর মতোই 'গণপতি' সংক্রান্ত ধারণাও বহুমাত্রাযুক্ত। সেগুলির নিম্নরূপ:

ক। *ঋগ্‌বেদ-সংহিতা*-র দ্বিতীয় মণ্ডলে গণপতি শব্দের আদি উল্লেখ পাওয়া গেছে, যা ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতির নির্দেশক: 'গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপশ্রবস্তমম্।/ জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পতে আ নঃ শৃণ্বন্নুতিভিঃ সীদসাদনম্।।'[৫] অর্থাৎ, 'হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি দেবগণের মধ্যে গণপতি, কবিগণের মধ্যে কবি, তোমার অন্ন সর্বোৎকৃষ্ট ও উপমানভূত। তুমি প্রশংসনীয়দিগের মধ্যে রাজা এবং মন্ত্রসমূহের স্বামী। আমরা তোমাকে আহ্বান করি। তুমি আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ করিয়া আশ্রয় প্রদানার্থ যজ্ঞগৃহে উপবেশন কর।'[৬] এই মন্ত্রে ব্রহ্মণস্পতি একাধারে গণপতি, কবিশ্রেষ্ঠ, অন্নপতি, শীর্ষকীর্তি এবং মন্ত্রপতি। যাস্ক বৈদিক ব্রহ্মণস্পতির পরিচয় দিয়েছেন ব্রহ্মের রক্ষক বা পালনকর্তা ('ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মণঃ পাতা বা পালয়িতা বা'[৭]) রূপে। কাজেই, 'ব্রহ্মণ' শব্দের অর্থ অন্ন ও ঋগাদি মন্ত্র বোঝালে বৃহস্পতি অন্নপতি ও মন্ত্রপতি রূপে এ দু'য়েরই রক্ষক। স্তুতিকারক রূপে তিনি পুরোহিতগণের প্রধান এবং সর্বজ্ঞানী।[৮] *ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ*-এ ব্রহ্মণস্পতির নামভেদ বৃহস্পতি।[৯] *কৌষীতকী-ব্রাহ্মণ* এবং *সাঙ্খ্যায়ন-ব্রাহ্মণ*-এর মন্ত্রেও গণপতি এবং ব্রহ্মণস্পতি অভিন্ন।[১০] এখানে তিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ('অভিরূপম্') ও রক্ষকর্তা। বৃহস্পতির গণেরা সংগীতকলায় নিপুণ, কলা-প্রদর্শনের জন্য তারা বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। উদ্দিষ্ট ঋকমন্ত্রে তাঁকে 'জ্যেষ্ঠরাজ' বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই 'জ্যেষ্ঠ' বা জ্যেষ্ঠরাজ' শব্দগুলি *স্কন্দপুরাণ*-এ গণেশের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[১১] এই পরিচয়ের বাইরেও ঋগ্‌বেদে বৃহস্পতি শত্রুঘাতী, 'বল' নামক দানবের হন্তারক।[১২] পাপ, অকল্যাণ ও দুর্গতি দূর করে তিনি যজমানের যাগনাশ ও ভয় দূর করেন।[১৩] তাঁর হস্তধৃত আয়ুধ স্বর্ণকুঠার বিশেষ, যা পরবর্তী সময়ে গণেশের প্রধান অস্ত্র রূপে গৃহীত হয়েছে।

খ। *কৃষ্ণযর্জুর্বেদ*-এর *কাঠক-সংহিতা*-য় পূর্বোক্ত ঋকমন্ত্রের সূত্রে ‘গণপতি’ দ্বিবিধ, অগ্নি এবং বিষ্ণু (‘অগ্নাবৈষ্ণবম্’)।[১৪] *তৈত্তিরীয়-সংহিতা*-য় ‘গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে’ শীর্ষক মন্ত্রের সূত্রে ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি গণপতি পদবাচ্য। যদিও কাম্য যাগের ক্ষেত্রে বৃহস্পতি ছাড়াও বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে উচ্চারিত মন্ত্রে অগ্নি, মরুৎ, বরুণ, ইন্দ্র, সোম, রুদ্র প্রমুখের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৫]

গ। *ঋগ্‌বেদ*-এর দশম মণ্ডলে ইন্দ্র ‘গণপতি’ এবং কবিশ্রেষ্ঠ রূপে (“নি ষু সীদ গণপতে গণেষু ত্বমাহুর্বিপ্রতমং কবীনাং।/ ন ঋতে ত্বৎ ক্রিয়তে কিং চনারে মহামর্ক মঘবশ্চিত্রমর্চ।।”[১৬]) বন্দিত। তিনি দেবতাদের আদিতে বিরাজমান। ইন্দ্র দেবরাজ (৩। ৪৬। ৩), বিশ্বভুবনের রাজা ও নায়ক (১০। ১০১। ৫, ৫। ৩০। ৫), আজন্ম যোদ্ধা, অজেয় ও শত্রুনাশী। তিনি বজ্রধারণ, ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রের দেবতা। শৌণক *বৃহদ্দেবতা*-য় তাঁকে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যস্তরের গণাধিপতি বলেছেন।[১৭] তাঁর গণ রুদ্র বা মরুৎ। একটি ঋকে তিনি রুদ্র বা মরুদ্‌গণের পিতা।[১৮] ইন্দ্রপুত্র রুদ্র (মরুৎ) গণের সাহায্যে বলীয়ান হয়ে মনুষ্যের সংগ্রামে শত্রুদের পরাস্ত করেছিলেন।[১৯] বজ্র ছাড়াও অঙ্কুশ (‘দীর্ঘস্তে অঙ্কুশঃ’) ইন্দ্রের অন্যতম আয়ুধ। এই অঙ্কুশ হস্তী তাড়নার কাজে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। এর সূত্রেও বৈদিক ইন্দ্রের সঙ্গে পৌরাণিক গণেশের সেতুবন্ধন ঘটতে পারে। পুরাণে গণেশের অস্ত্র হিসেবে অঙ্কুশ গৃহীত হয়েছে। তা ছাড়া অঙ্কুশের সঙ্গে হস্তীর সম্পর্কটাও উপেক্ষণীয় নয়। তবে ঋগ্‌বেদোক্ত ইন্দ্র অশ্ববাহন। তাঁর বাহনরূপে ঐরাবতের অন্তর্ভুক্তি ঋগ্‌বেদ পরবর্তী পুরাণের সময়কালের।

ঘ। ঋগ্‌বেদোক্ত ‘গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে’ শীর্ষক মন্ত্রের একটি পাঠান্তর পাওয়া যায় *শুক্লযজুর্বেদ*-এর *বাজসনেয়ী সংহিতা* (*মাধ্যন্দিন সংহিতা* এবং *কাণ্ব সংহিতা*) এবং *কৃষ্ণযজুর্বেদ*-এর *মৈত্রায়ণী সংহিতা*-য়: “গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে।/ নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে বসো মম।।”[২০] অর্থাৎ “গণসমূহের মধ্যে তুমি গণপতি, তোমাকে হবি প্রদান করি; প্রিয়গণের মধ্যে তুমি প্রিয়, তোমাকে হবি প্রদান করি; রত্নসমূহের মধ্যে তুমি রত্ন, তোমাকে হবি প্রদান করি, তুমিই আমার ধন।”[২১] আচার্য মহীধর এই মন্ত্রের উদ্দিষ্ট হিসেবে যজ্ঞাশ্বের কথা বললেও গণপতি যে অশ্ব নয়, বৃহস্পতি, তা পূর্বোক্ত ঋগ্‌বেদোক্ত মন্ত্রেই স্পষ্ট। তা ছাড়া অশ্বমেধ যজ্ঞকালীন অনুষ্ঠানে আবৃত্তিযোগ্য এই মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতারা হলেন হিরণ্যগর্ভ, বায়ু, প্রজাপতি প্রমুখ। *শুক্লযজুর্বেদ*-এর *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এর মন্ত্রে ‘গণপতি’ অশ্বরূপে চিহ্নিত।[২২] এই অশ্ব দেবতাদের স্বর্গে নিয়ে আসার জন্য ব্যবহৃত হয়।

চ। যজুর্বেদের স্তরেই রুদ্রের গাণপত্য আকাঙ্ক্ষিত হয়েছিল। *শুক্লযজুর্বেদ*-এর *বাজসনেয়ী সংহিতা* এবং *কৃষ্ণযজুর্বেদ*-এর *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-য় রুদ্রকে গণপতি রূপে ('রুদ্রস্য গাণপত্যং ময়োভূরেহি'[২৩]) সম্বোধন করা হয়েছে। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ ব্রহ্মা ও রুদ্র গণপতি রূপে উপস্থাপিত।[২৪] এ ছাড়া *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-য় যে সকল বৈদিক দেবতার প্রভুত্ব বা নেতৃত্বের বর্ণনা আছে, রুদ্র এবং মরুদ্‌গণ তাঁদের অন্তর্গত।[২৫] উদ্দিষ্ট দেবতারা প্রত্যেকেই এক-একটি গণের অধীশ্বর। যেমন, অগ্নি জীবগণের অধিপতি, সোম ভেষজ বা ওষধির অধিপতি, সবিতা সৃষ্টির অধিপতি, রুদ্র পশুপতি, বিষ্ণু পর্বতের অধিপতি এবং মরুৎ গণাধিপতি ('মরুৎ গণানাম্‌ অধিপতয়ে')। ইন্দ্রপুত্র রুদ্রের গণ রূপে স্বীকৃত যে মরুৎ, সেই মরুদ্‌গণের পিতা বা অধিপতি হিসেবে প্রকারান্তরে রুদ্র-শিবও গণপতি। রুদ্র এবং তাঁর গণ অর্থাৎ মরুৎসমূহ একই দেবসংঘ। শৌণকের *বৃহদ্দেবতা*-য় মরুদ্‌গণের অধিকর্তা হিসেবে রুদ্রকে বন্দনা ('মরুতাম্‌ তু গণসৈতান্‌ নমো রুদ্র') করা হয়েছে।[২৬] বৈদিক রুদ্র অপশক্তির প্রতিভূ। তাঁর শক্তির নঞর্থক প্রভাব হ্রাসের জন্য পূজার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করে তাঁর আনুকূল্য লাভ করতে হয়।[২৭] রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণও অনুরূপ লক্ষণাক্রান্ত। তাদের প্রকৃতিও ধ্বংসমূলক, স্বেচ্ছাচারী। তাদের দৈবসত্তার সুপ্রভাব ও কুপ্রভাবগুলি সম্ভবত রুদ্র-শিবের থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন।[২৮] দুর্ধর্ষ অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে তারা যেমন অরণ্য বা পর্বত ধ্বংস করে[২৯], আকাশের মেঘরাজিকে ঘিরে ফেলার ক্ষমতা রাখে[৩০], তেমনি বৃষ্টিদানের মাধ্যমে অভীষ্টসিদ্ধিও করে থাকে। এই ধ্বংসাত্মক অপকারী শক্তিকে তুষ্ট করতে পারলে তা ভক্তগণের জন্য হিতপ্রদ হয়ে ওঠে। রুদ্র বা মরুদ্‌গণের এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে গণেশের বিঘ্নকর্তা থেকে বিঘ্নহর্তায় রূপান্তরের সমীকরণ নির্মাণে সহায়তা করেছিল। মান্য আলোচক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য এই সামঞ্জস্যের বিশ্লেষণে লিখেছেন, "সূর্যাগ্নির সর্বব্যাপী শুভ্র কিরণ--- যা নিদাঘকালে তীব্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে--- সৃষ্টি করে ঝঞ্ঝাবায়ু, আনে মৃত্যুর দূত বজ্র,--- আবার নিয়ে আসে বৃষ্টি,--- পরিণামে শস্য,--- সেই কিরণসমূহই রুদ্রগণ বা মরুদ্‌গণ। তাঁদেরই অধিপতি গণেশ রুদ্র-শিব। সুতরাং মরুদ্‌গণ বা রুদ্রগণের ধর্ম বিঘ্নকর্তা এবং বিঘ্ননাশক গণেশে আরোপিত হবেই।"[৩১]

বৈদিক গণপতি সত্তার স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রমাণগুলি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। তবে এইসব দৃষ্টান্তের বেশিরভাগই পূর্বালোচিত। পৌরাণিক গণেশের উদ্ভবের মূলে বৈদিক গণপতি-তত্ত্বের প্রভাব নিয়ে কম-বেশি আলোচনা করেছেন যাঁরা, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই বেদোক্ত বৃহস্পতি, ইন্দ্র, সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্র-শিব এবং মরুৎগণের সঙ্গে উত্তরকালীন পৌরাণিক গণেশের সংযোগের সূত্রনির্দেশ করেছেন। মুখ্যত 'গণপতি' শব্দের

অনুষঙ্গ ধরেই এই ধরনের চর্চা চলেছে। বেদের গণপতিদের চরিত্র, ক্ষমতা এবং বৈশিষ্ট্য-গুণের ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান গজানন গণেশের প্রাক-পৌরাণিক রূপের সন্ধান করেছেন গবেষকরা। এ প্রসঙ্গে আলোচকদের একটি বিষয়ে দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে যে, 'গণপতি' বিশেষণে সরাসরি চিহ্নিত দেবতাদের বাইরেও বৈদিক সাহিত্যে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ দেবতার অস্তিত্ব আছে, যাঁর সঙ্গে পৌরাণিক সর্বসিদ্ধিপ্রদ গণেশের তাত্ত্বিক যোগবন্ধন ঘটতে পারে। এই সমীকরণ দূরান্বয়ী তো নয়ই, বরং আদিকল্প হিসেবে উক্ত দেবতা তাঁর সমস্ত বৈশিষ্ট্য সমেত পৌরাণিক গণেশের মধ্যে একীভূত হয়েছেন। তিনি ঋগ্বেদোক্ত আদিদেব, হব্যবাহী অগ্নি। অগ্নিস্তুতি দিয়েই ঋগ্‌বেদের সূচনা এবং সমাপ্তিও। ইন্দ্রকে বাদ দিলে প্রায় দুই শতাধিক সূক্ত অগ্নিকে উৎসর্গীকৃত। তাঁকে দিয়েই ঋকমন্ত্রের নান্দীমুখ। বৈদিক সাহিত্যে অগ্নির ধারণা ত্রিমাত্রিক: আগুন (fire), আগুনের দেবতা (god of fire) এবং যজ্ঞাগ্নি বা অগ্নিহোত্র (sacrificial fire)।[৩২] অগ্নি মর্ত্য এবং অমর্ত্যলোকের সংযোগ রক্ষাকারী। বায়ুসখা অগ্নি দেবতাদের মুখ। অগ্নিমুখেই দেবগণ ভোজন করেন।[৩৩] এই ভূমিকার বাইরেও বৈদিক অগ্নি সর্বদেবময়। নিরুক্তকারের ব্যাখ্যায় অগ্নিই পরিব্যাপ্ত অর্থে এক সুমহান আত্মা হিসেবে মিত্র, বরুণ, সূর্য, ইন্দ্র ইত্যাদি রূপে ঋষিগণের দ্বারা স্তুত হয়েছেন।[৩৪] *সাঙ্খ্যায়ন-ব্রাহ্মণ* বলেছেন, 'ব্রহ্ম বা অগ্নিঃ', অর্থাৎ অগ্নিই ব্রহ্ম।[৩৫] এইরূপ ব্রহ্মবাচক সপ্রাণ অগ্নি কোন কোন বৈশিষ্ট্যে পৌরাণিক গণেশের সঙ্গে অভিন্ন-তত্ত্ব হয়েছেন, তার সপক্ষে কয়েকটি প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে।

এক, 'অগ্নি' শব্দের আক্ষরিক অর্থে আদি বা প্রথমের চিহ্ন স্পষ্ট। বৈদিক শব্দকোষ নিঘণ্টুতে 'অগ্নি' শব্দের গঠন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। অগ্নি শব্দ 'অগ্র' শব্দের সঙ্গে 'নী' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন। সেনাপতি যেমন অগ্রে সেনা নিয়ে যান, তেমনই অগ্নিও দেবগণের সেনানী ('অগ্নির্বৈ দেবানাং সেনানীঃ'[৩৬]) অর্থাৎ অগ্রণী। এ ছাড়া সায়নাচার্য *বাজসনেয়ী সংহিতা*-র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন, 'স বা এষোহগ্রে দেবানামজায়ত তস্মাদগ্নির্নামেতি'[৩৭] অর্থাৎ সমস্ত জীবের অগ্রে জন্মেছেন বলে তাঁর এই নাম। শৌণক *বৃহদ্দেবতা*-য় বলেছেন, 'যেহেতু জীবগণের অগ্রে জাত হয়েছেন, যজ্ঞেও যেহেতু অগ্রে অবস্থান করেন, স্বীয় অঙ্গ বা শরীর নিয়ে আসেন কাষ্ঠদাহ অন্নাদি পাক করতে, এই জন্যই জ্ঞানিগণ তাঁকে অগ্নিনামে স্তব করেন।'[৩৮] আগেই বলা হয়েছে, হব্যবাহক অগ্নির মাধ্যমে দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত যজ্ঞার্ঘ্য স্বর্গে পৌঁছোয়। অতএব তিনি দেব এবং মানবের মধ্যস্থ। দেবতাদের উদ্দেশে প্রদেয় আহার্য গ্রহণ করেন বলে *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* অগ্নিকে দেবতাদের জঠর বা পাকস্থলী বলেছেন।[৩৯] যজ্ঞানুষ্ঠানে অগ্নির উদ্বোধনই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কেননা, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত না হলে যজ্ঞকর্মের সূচনাই হবে না।

'পুরঃ' অর্থে সর্বাগ্রে, 'হিত' অর্থে সম্মানিত, অর্থাৎ পূজিত ও প্রীতিপ্রাপ্ত হন বলে অগ্নিকে যজ্ঞের 'পুরোহিত' রূপে গণ্য করা হয়। যাগকর্মে তাঁর একচেটিয়া প্রাধান্য। মান্য ভারতবিদ ম্যাকডোনেল মন্তব্য করেছেন, 'Agni's priesthood is the most salient feature of his character'।[৪০] পুরোহিতের কাজ যেমন যজমানের ইচ্ছাপূরণ, অগ্নিও তেমনি যজ্ঞের পূর্বভাগে 'আহবনীয়' রূপে অপেক্ষিত হোম সম্পাদন পূর্বক যজমানের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। দেবতাদের তিনিই যজ্ঞস্থলে আনেন বলে তাঁকেই ঋত্বিক বা হোতার মর্যাদা দেওয়া হয়। আমাদের বক্তব্য, শ্রুতির এই প্রথমপূজ্য অগ্নি-ই পৌরাণিক গণেশের আদিকল্প। পুরাণাদি গ্রন্থে গণেশের আদিদেব রূপে যে সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল, একমাত্র বৈদিক অগ্নিই এক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরিতা দাবি করতে পারে। *পারস্করগৃহ্যসূত্র*-এর একটি শ্লোকাংশে অগ্নির এই আদিদেবত্বের লক্ষণ সুস্পষ্ট: 'অগ্নিরৈতু প্রথম দেবতানাং', অর্থাৎ প্রথম দেবতা রূপে অগ্নি স্বীকৃত।[৪১] *কৃষ্ণযজুর্বেদ* অগ্নিকে 'সকল জীবের অধিপতি' বলেছেন।[৪২] কাজেই, জীবগণাধিপতি অগ্নি এক অর্থে 'গণপতি'-ও বটে। শৌণকের *বৃহদ্দেবতা*-য় (১। ১১৯-১২০) 'গণ' শব্দের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অগ্নিকেই ভূলোকের দেবগণের অধিপতি বলা হয়েছে। ফলত, শ্রুতিমার্গে আরম্ভ-দেবতা রূপে গণপতি অগ্নির এই স্থানপ্রাপ্তি পূর্বসূত্র হিসেবে পৌরাণিক গণেশের অগ্রমুখ্যতার গভীরে প্রচ্ছন্ন ছিল।

দুই, বৈদিক অগ্নি এবং পৌরাণিক গণেশের বর্ণগত সাযুজ্য লক্ষণীয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে অগ্নিকে বলা হয়েছে 'অয়োদংষ্ট্র' অর্থাৎ লৌহসদৃশ বা লৌহময় দন্তযুক্ত এবং জিহ্বা দ্বারা রাক্ষস আক্রমণকারী।[৪৩] অগ্নির এই রক্তাভ দন্তপঙ্ক্তি এবং শত্রুনাশী ভূমিকার সঙ্গে গণেশের পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্রে উল্লিখিত 'দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুর-শোভাকরং'[৪৪] শীর্ষক শ্লোকাংশটি মিলিয়ে পড়লে কেবল বর্ণসাযুজ্যেই নয়, দুই দেবতার ক্রিয়াপরতাতেও আশ্চর্য মিল লক্ষ করা যাবে। গণেশ তাঁর দন্তাঘাতে বিদীর্ণ শত্রুর শরীর-নিঃসৃত রক্তের দ্বারা নিজদেহ রক্তবর্ণ সিঁদুরের মতো শোভাময় করে তুলেছেন। *নারসিংহ পুরাণ*-এর 'বিনায়ক স্তব'-এ শত্রুনাশী বলে তাঁকে 'আরক্তদন্তী' বলা হয়েছে।[৪৫] এই শত্রু-রক্তরাঙা দন্তের চিত্রকল্পের মধ্যে একধরনের archetypal continuity নিঃসন্দেহে বর্তমান। তা ছাড়া গাত্রবর্ণেও অগ্নি এবং গণেশ সমানধর্মা। প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের বর্ণ রক্তিম। *বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ*-এর প্রমাণ অনুসারে, আগুনের তেজ রক্তবর্ণ হওয়ায় ('রক্তং হি তেজসো রূপং রক্তবর্ণং ততঃ স্মৃতম্'[৪৬]) অগ্নির গাত্রও রক্তবর্ণ হবে। *শারদাতিলকতন্ত্র*-এ অগ্নির ধ্যানমূর্তির বর্ণনায় বলা হয়েছে 'রক্তাভমগ্নিংভজে'[৪৭] অর্থাৎ ভজনীয় অগ্নি রক্তবর্ণ। *মহানির্বাণতন্ত্র*-এ উল্লিখিত ধ্যানে অগ্নি প্রভাতসূর্যতুল্য রূপে ('বালার্কারুণসংকাশং'[৪৮]) ব্যাখ্যাত হয়েছেন। *তন্ত্ররাজতন্ত্র*-এর বর্ণনায় অগ্নিকে রক্তপদ্মসদৃশ অরুণবর্ণ

('অরুণোহরুণপঙ্কজসন্নিভঃ'[৪৯]) বলা হয়েছে। *প্রপঞ্চসারতন্ত্র*-এর বর্ণনায় তিনি ত্রিনয়নযুক্ত, জটাবদ্ধমস্তক, অরুণবর্ণ দেবতা ('ত্রিনয়নমরুণাপ্তবদ্ধমৌলিং'[৫০]) রূপে কল্পিত। *সৌরপুরাণ*-এও অগ্নি রক্তবর্ণ উদরবিশিষ্ট এবং স্থূলদেহ ('জঠরোরুণঃ'[৫১])। অনুরূপে, *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এর প্রমাণ অনুসারে গৌরীর রক্তপট্টবস্ত্র-জাত গণেশ রক্তবর্ণ দেবতা।[৫২] অগ্নির সঙ্গে গণেশের বর্ণসাদৃশ্যের পাশাপাশি পৌরাণিক উল্লেখে অনেকসময় সরাসরি অগ্নির নাম করেই গণেশের মুখমণ্ডলের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যেমন, *নারসিংহ পুরাণ*-এর ষড়বিংশ অধ্যায়ের 'বিনায়কস্তব' অংশে ইক্ষ্বাকুর বর্ণনায় তাঁকে 'বহ্নিবক্ত্র' অর্থাৎ অগ্নিমুখ বলা হয়েছে।[৫৩] ত্রয়োদশ শতকের কাশ্মীরি অলংকারশাস্ত্র *হরচরিতচিন্তামণি*-র 'অষ্টাদশ প্রকাশ'-এও গণেশকে 'বহ্নিতেজসা' অর্থাৎ অগ্নিতেজযুক্ত বলা হয়েছে।[৫৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অগ্নির সঙ্গে গণেশের অভিন্নতার সূত্রটি সূক্ষ্মভাবে কালপরম্পরায় জায়মান থেকেছে। বহু পরবর্তী সময়ের পৌরাণিক বা অন্যান্য শাস্ত্রীয় ভাষ্যেও অগ্নি ও গণেশের একত্বের চিহ্নটি গণেশের নামাবলী বা পরিচয়জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়ে গেছে।

তিন, *ঋগ্বেদ*-এ অগ্নিকে জলের গর্ভস্বরূপ[৫৫] বলা হয়েছে। *শুক্লযজুর্বেদ*-এ অগ্নি সমুদ্রমধ্যস্থ জলের গর্ভরূপ।[৫৬] *অথর্ববেদ*-এ অগ্নির তনু বাড়বাগ্নিরূপে জলে বর্তমান বলা হয়েছে।[৫৭] সৃষ্টিচক্রে অগ্নি এবং জল এ'ভাবেই অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে, দুই ধারণায় অন্তর্লীন এক যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*-এ সৃষ্টির ক্রমবিকাশের ধারায় অগ্নি বা তেজেরই এক বিশেষ পরিণাম জল– 'অগ্নেরাপঃ', অর্থাৎ অগ্নি জলের ভ্রূণ, বীজ বা কারণস্বরূপ।[৫৮] এই অগ্নিতত্ত্বেরই ক্রমপরিণতি ঘটেছে জলতত্ত্বে। আপাতবিরোধী মনে হলেও দুই তত্ত্বের মধ্যে গূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রাকৃতিক সত্য হিসেবেও অগ্নিতত্ত্ব এবং জলতত্ত্ব আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিকতাতেই তার প্রমাণ মেলে। তা ছাড়া সমুদ্রগর্ভস্থ অগ্নির ধারণাও শাস্ত্রসম্মত। বৈদিক অগ্নির যে উত্তরকালীন রূপ পৌরাণিক গণেশের মধ্যে একীভূত হয়েছে, সেই গণপতি-গণেশ জ্ঞানভাবে জলতত্ত্ব-প্রধানের দেবতা। স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী তাঁর *পূজা-প্রদীপ* গ্রন্থের দ্বিতীয় উল্লাসে জলতত্ত্ব-প্রধান ব্যক্তির উপাস্য হিসেবে গণপতির ('জীবনস্য গণাধিপঃ'[৫৯]) নামোল্লেখ করেছেন। ফলত, অগ্নিতত্ত্ব এবং জলতত্ত্বের পারস্পরিকতার সূত্রে বৈদিক অগ্নি এবং পৌরাণিক গণেশের অন্তর্গত সংযোগ টের পাওয়া যায়।

চার, আয়ুধসাদৃশ্যেও অগ্নি এবং গণেশের সমত্ব লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে গবেষক মোঃ মোশারফ হোসেনের *হিন্দু জৈন বৌদ্ধ মূর্তিতাত্ত্বিক বিবরণ* (পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ) শীর্ষক গ্রন্থের কয়েকটি মূর্তিপ্রমাণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে।[৬০] অগ্নির ক্ষেত্রে প্রধানত এক মুখ ও দুই হাত অথবা এক মুখ ও চার হাতের মূর্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ-এর বর্ণনায় অগ্নিকে ‘চতুর্বাহু’-ই বলা হয়েছে। একটি নিদর্শনে তাঁর হাতে আগুনের শিখা, জপমালা ও ত্রিশূল পাওয়া যায়। অন্য আরেকটি নিদর্শনে দেখা গেছে জপমালা, কমণ্ডলু, পদ্ম ও পাণ্ডুলিপি। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের একটি নিদর্শনে তাঁর হাতে চামচ, কমণ্ডলু, বই ও শক্তি পাওয়া গেছে। এ ছাড়া আরেকটি নিদর্শনে তাঁর হাত দুটি বরদ ও অভয়মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকতে দেখা যায়। ভারতে মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোর লক্ষণ মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে একটি চতুর্ভুজ অগ্নিমূর্তিতে বাঁদিকের ওপরের হাতে পাণ্ডুলিপি ও নিচের হাতে কমণ্ডলু এবং ডানদিকের ওপরের হাতে আহুতিদানের উপযোগী বড়ো হাতা বা চামচ ও নিচের হাতে অক্ষমালা ধারণ করতে দেখা যায়।[৬১] (চিত্র ১) লক্ষ করার বিষয় হল, গণেশের হস্তসংখ্যার বিভিন্নতা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁকে আমরা চতুর্ভুজ মূর্তিতে দেখতেই অভ্যস্ত। তা ছাড়া অগ্নির হস্তধৃত এই বই বা পাণ্ডুলিপি, অক্ষমালা, পদ্ম ও কমণ্ডলু গণেশের ক্ষেত্রেও অতিপরিচিত হস্তভূষণ। পুথি, লেখনী বা পাণ্ডুলিপি ধারণের সূত্রে গণেশের সঙ্গে বিদ্যাবত্তা বা মেধা জাতীয় উৎকর্ষের সংযোগ থাকায় তাঁকে বৃহস্পতির সগোত্র ভাবেন অনেকে। যদিও মূর্তিপ্রমাণের সূত্রে আমরা দেখলাম, সমজাতীয় বৈশিষ্ট্যে অগ্নিও গণেশের পূর্বসূরী হতে পারেন।

পাঁচ, অগ্নি ও গণেশের সাধর্মের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এঁদের ভূমিকাগত অভিন্নতা। অগ্নি সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি ‘জাতবিত্ত’, অর্থাৎ তাঁর থেকেই ধনের উৎপত্তি হয়। এই কারণেও তিনি ‘জাতবেদা’। প্রাচীন ভারতে এমন লোকপ্রবাদ প্রচলিত ছিল, যেখানে বলা হয়েছে, অগ্নির থেকেই ধন ইচ্ছা করবে (‘ধনমিচ্ছেদ্ হুতাশনাৎ’)।[৬২] *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ তাঁকে সুবর্ণ বা স্বর্ণের অধিষ্ঠাতা দেবতাও (‘অগ্নিঃ সুবর্ণস্য গুরুঃ’, ৩। ১২) বলা হয়েছে।[৬৩] লক্ষণীয়, গণেশ-ও ধনদাতারূপে ব্যবসায়ী মহলে সমাদৃত। আবার, সিদ্ধিদাতা বিঘ্নহর্তা গণেশের মতো অগ্নিও কল্যাণকারী। নিরুক্তকার অগ্নিকে ‘সুদত্র’ অর্থাৎ কল্যাণদাতা (নিরুক্ত ৭। ১৭। ১) বলেছেন।[৬৪] ঋগ্‌বেদে অগ্নিকে ‘দ্বিজ’ অর্থাৎ দ্বিজন্মবিশিষ্ট বলা হয়েছে।[৬৫] অধিকাংশ পৌরাণিক আখ্যানে গণেশেরও দুটো জন্ম। আবার, অগ্নি ‘দ্বিমাতা’ হিসেবে উল্লিখিত।[৬৬] গণেশও ‘দ্বৈমাতুর’ (গঙ্গা ও পার্বতীর সন্তান)। হব্যবাহী অগ্নির মতোই *নারসিংহ পুরাণ*-এর ‘বিনায়ক স্তব’-এ গণেশকে ‘হুতপ্রিয়’ বলা হয়েছে।[৬৭] তা ছাড়া বৈদিক অগ্নি যেমন ঘি-খেকো, গণেশ-ও তেমনই মোদকপ্রিয়। অগ্নির দুই পত্নী স্বাহা ও স্বধার মতোই কোনও কোনও পৌরাণিক উল্লেখে গণেশেরও দু’জন স্ত্রী, ‘ঋদ্ধি’ ও ‘বুদ্ধি’ (মতান্তরে ‘সিদ্ধি’ ও বুদ্ধি’)। বেদোক্ত অগ্নি মেধাবী, বিদ্বান, ঋষি, সর্বজ্ঞ, কবি, সত্যপরায়ণ, প্রভূত রত্নধারী, ধন, প্রজা ও অন্নদাতারূপে বর্ণিত হয়েছেন।[৬৮] এই গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি গণেশের ভাবরূপেও সমভাবে প্রযোজ্য। অতএব দেখা যাচ্ছে, কবিরূপে, মেধাবী ও বিদ্বানরূপে গণেশ কেবলমাত্র বেদোক্ত

ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতির-ই উত্তর-প্রতিনিধি নন। সাধারণত বিদ্যাবত্তা তথা চারুকলায় গণেশের পারঙ্গমতার সূত্রে তাঁর সঙ্গে বৃহস্পতির সম্পর্ক কল্পনা করা হয়। অথচ এই জাতীয় গুণাধিকার অগ্নির সূত্রেও গণেশ লাভ করতে পারেন। বস্তুত, প্রথমপূজ্য অগ্নি যেহেতু পৌরাণিক গণেশের vedic antecedent, ফলত archetypal deviation-এর দৃষ্টিতে গণেশের ভাবপ্রবণতায় অগ্নির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের আত্তীকরণ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। আসলে, বিভিন্ন বৈদিক দেবতার গুণ বা বৈশিষ্ট্য-ই বিচ্ছিন্নভাবে পৌরাণিক গণপতির ভাবমূর্তির মধ্যে বর্তেছে। তবে গণেশের prototype হিসেবে অগ্নির সঙ্গে তাঁর রূপগত এবং ভাবগত ঐক্য যেমন সামগ্রিকভাবে লক্ষ করা যায়, অন্য কোনও দেবতার ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি।

এখানে আরেকটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। দেবতত্ত্বের বিবর্তনের দিক থেকে ভাবলে বৈদিক অগ্নির পৌরাণিক উত্তরপুরুষ সরাসরি গজানন গণেশ-ও নন। কারণ, প্রত্নকল্পভিত্তিক বিচারে এই দুই দৈব অস্তিত্বের মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রহ্মা। ষট্‌কোণবিশিষ্ট ব্রহ্মভাবচক্রের নিম্নমুখী ত্রিকোণের আনন্দ-প্রতিবিম্ব বিন্দুতে ব্রহ্মার অবস্থান। জ্ঞানানন্দময় গণেশ এবং সদানন্দময় সূর্যের মিলনবিন্দুস্থ মিশ্র বা মলিন রজোগুণাত্মক ব্রহ্মা লৌকিক আনন্দের সৃজনকর্তা। এক্ষেত্রে archetypal criticism-এর দৃষ্টিতে শ্রুতির অগ্নির পৌরাণিক সম্পূরক হিসেবে ব্রহ্মাকে বিবেচনা করা যায়। ইনি একাধারে জ্ঞানময় গণেশ এবং তেজোময় সূর্যের মিলিত তত্ত্ব। ফলে তিনি যেমন বেদ বা শব্দব্রহ্মের প্রকাশক, তেমনই জীবকল্যাণের উপায় হিসেবে কর্মকাণ্ড ও যজ্ঞাদি সাধনার আধার 'ব্রহ্মাগ্নি বা যজ্ঞাগ্নির' অধিষ্ঠাতা। আগেই দেখানো হয়েছে, আদিকল্পে শ্রুতির অগ্নিই ব্রহ্মস্বরূপ এবং প্রথম দেবতা। পুরাণের ব্রহ্মা সেই বৈদিক অগ্নিরই সম্পূরক প্রতিনিধি। তবে পুরাণ-প্রমাণে ব্রহ্মা কলিতে পুষ্কর ছাড়া অন্যত্র অপূজ্য। তা ছাড়া ব্রহ্মা পূজায় শাপমোচনাদির ঝামেলা থাকায় গৃহস্থগণের অনুপযুক্ত। *পূজা-প্রদীপ* বলছেন, ' 'ব্রহ্মা' সাধারণ ভাবে কোনও ভক্ত বা উপাসক-বিশেষের উপাস্য না হইলেও, উপাসকমাত্রেরই যে কোন যজ্ঞানুষ্ঠান-সময়ে আহূত ও সর্ব্বদেবতার প্রতিভূ বা প্রতিনিধিরূপে পূজা-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।'[৬৯] এই মন্তব্য থেকে যজ্ঞাগ্নি রূপে ব্রহ্মার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। পূজানুষ্ঠানে অগ্নি থাকেন বলেই ব্রহ্মার প্রয়োজন পড়ে না। অগ্নিপ্রতীকেই তিনি পূজিত হন। আমাদের মনে হয়, বেদোক্ত অগ্নির ভাব-রূপ পৌরাণিক ব্রহ্মা হয়ে গজানন গণেশের মধ্যে তত্ত্বত সঞ্চারিত হয়েছে। বর্ণসাযুজ্য ছাড়াও ভাব-সম্বন্ধ এবং ক্রিয়াপরতাতেও এই তিন দেবতা একমাত্রায় আসীন। বিশেষভাবে বঙ্গীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে প্রথমপূজ্য গণেশের প্রতিষ্ঠা এই সমীকরণ ধরেই এগিয়েছে। এই বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অগ্নি এবং গণেশের

একত্বের বিষয়টি পূর্ববর্তী ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আলোচনায় তেমনভাবে না এলেও অগ্নিরূপে গণেশকে বিষ্ণু এবং শিবের সঙ্গে সমানধর্মা দেখিয়েছেন একজন গবেষক, চার্লস এলিয়ট। তাঁর ব্যাখ্যায় অন্তত 'অগ্নি'-রূপে গণেশ বিষ্ণু ও শিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েছেন।[৭০] পণ্ডিত হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য-ও তাঁর 'রুদ্রগণ ও গণেশ' শীর্ষক আলোচনায় এলিয়টের এই সূত্রটি অনুসরণ করেছেন। যদিও এলিয়ট এককভাবে অগ্নির সঙ্গে গণেশের ধারণাগত একত্ব বিষয়ে কোনও আলোকপাত করেননি। বর্তমান অভিসন্দর্ভে অগ্নির গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে হস্তীমুখ গণেশের সাদৃশ্য নির্ণয় আমাদের নিজস্ব প্রস্তাব।

১.২

বিনায়ক কথা : বহু থেকে এক

হস্তীমুখ গণেশের বিবিধ নামাবলীর মধ্যে 'বিনায়ক' নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, পৌরাণিক গণেশের উৎসমূলে যে একটি malevolent সত্তার আদিসূত্র প্রচ্ছন্ন রয়েছে, একমাত্র 'বিনায়ক' সংক্রান্ত ধারণার বিশ্লেষণ সূত্রেই তার হদিশ পাওয়া সম্ভব। বিনায়কের malevolent সত্তা-ই কালিক পরম্পরায় বিবর্তিত হয়ে সিদ্ধিদাতা গণেশের benevolent সত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। কেবল বিবর্তনের নিরিখেই নয়, 'বিনায়ক' শব্দ বুৎপত্তিগত অর্থেও বহু ব্যাখ্যাপ্রসূ। যেমন :

এক, 'বিনায়ক' অর্থে (বি > নায়) বিশেষরূপে যিনি নায়ক অর্থাৎ বিশিষ্ট নেতা, দলপতি বা সংগঠক; যাঁর সুদক্ষ পরিচালনায়, পদ্ধতি প্রয়োগে, নিয়ন্ত্রণে কোনও দল, সংগঠন বা ব্যবস্থা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। দ্রষ্টব্য মনিয়ের উইলিয়ামস।[৭১] এই দলপতি 'বিনায়ক' বেদোক্ত 'গণপতি'-র সগোত্র।

দুই, 'বিনায়ক' অর্থে বি> নি (=নায়তি) অর্থাৎ বাধা-বিঘ্ন বিদূরণকারী চালকশক্তি, যা পরিব্যাপ্ত অর্থে বিঘ্ননাশকারী পৌরাণিক 'গণেশ'-এর ভূমিকার (remover of obstacles) সমতুল্য বটে।[৭২] এই দিক থেকে 'বিনায়ক' শব্দ সিদ্ধিদাতা 'গণেশ'-র সমপর্যায়ী।

তিন, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*-র নবম শতকীয় টীকাকার বিশ্বরূপাচার্যের ভাষ্যে 'বিনায়ক' (বি = বিবিধ) শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে এমন এক দলমুখ্য বা প্রধান, যাঁকে বহুজনের নেতৃস্থানীয় হিসেবে কর্তৃত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।[৭৩] এখানে লক্ষ করার বিষয় হল, 'বিনায়ক' শব্দের 'বি' উপসর্গ যেমন 'বিশিষ্ট' (individual) অর্থে

কোনও একজন সংগঠক বা প্রধানকে নির্দেশ করে অর্থাৎ ‘বহু’-র মধ্যে নির্দিষ্ট ‘এক’-কে বোঝায়; তেমনই অন্য অর্থে ‘বিশিষ্ট নায়ক ব্যতিরেকে’ যে দল, ‘বিনায়ক’-এর মাধ্যমে সেই ‘নেতৃত্ববিহীন’ (plurality of a group without a leader) সংগঠন বা নির্দিষ্ট ‘একক’-এর উপস্থিতি ভিন্ন ‘বহু’-র কল্পনা করা যেতে পারে।[৭৪] এরই সূত্রে বলা যায়, ‘গণপতি’ (বা ‘গণেশ’) এবং ‘বিনায়ক’— এই দুই ধারণার মধ্যে বিপ্রতীপতা স্পষ্ট। বেদোক্ত ‘গণপতি’ বিবিধ দেবতার পরিচয়জ্ঞাপক হলেও আক্ষরিকভাবে ‘গণপতি’ শব্দে একজন ‘গণপ্রধান’-কেই বোঝায়। এর ধারণা একবচনান্ত, বিশেষভাবে এককের। অন্যদিকে, ‘বিনায়ক’ শব্দ দ্ব্যর্থক, বহুবচনান্ত। এর দ্বারা যেমন বিশিষ্ট ‘এক’-কে বোঝানো যায়, তেমনই নির্দিষ্ট ‘এক’-বিহীন অনেকাংশকেও চিহ্নিত করা যায়। কাজেই, ‘বিনায়ক’ শব্দের এই দ্বিবিধ অর্থধারণের দিকটিও এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরত্ব পেয়েছে।

এবার ‘বিনায়ক’ শব্দের অর্থ-ব্যাখ্যার উপরিতল ছেড়ে প্রবেশ করা যাক এর ব্যবহারিক প্রয়োগের বৃত্তে। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে বিনায়ক বিষয়ক তত্ত্ব বেশ জটিল এবং বিবর্তনমুখী। শব্দটির আদিরূপ পাওয়া যাবে স্মৃতি-সংহিতার প্রথম স্তর খ্রিস্টপূর্ব সময়ের সূত্র-সাহিত্যে।

১. *মানবগৃহ্যসূত্র* (পঞ্চম-সপ্তম খ্রিস্টপূর্ব)-এর ২। ১৪ নং শ্লোকে উল্লিখিত ‘বিনায়ক’ বহুবচনান্ত ধারণা। এরা বিঘ্নপ্রদায়ী, অপশক্তির প্রতিভূ। বর্তমান হস্তীমুখ গণেশের সঙ্গে এই জাতীয় বিনায়কগণ আদ্যোপান্ত সম্পর্কহীন।[৭৫] সংখ্যায় এরা চার (‘বিনায়কান’): ‘শালকটংকট’, ‘কুষ্মাণ্ডরাজপুত্র’, ‘উষ্মিত’ এবং ‘দেবায়জন’। এই চার গৌণ বা উপদেবতা সমন্বিত একটি সম্মিলিত বহুবচনাত্মক বিনায়ক গোষ্ঠী। যদিও গৃহ্যসূত্রের ২। ১৪। ২৯ নং শ্লোকে দেবতাদের মধ্যে বিনায়ককে এককভাবেই বন্দনা করা হয়েছে এবং ‘কুষ্মাণ্ডরাজপুত্র’-কে বিনায়ক-বর্গ থেকে পৃথক আসন দেওয়া হয়েছে।[৭৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গৃহ্যসূত্রের বিনায়কদের সঙ্গে রুদ্র-শিবের প্রত্যক্ষত কোনও সম্পর্ক নেই। এমনকি তাদের সঙ্গে গণপতি বিষয়ক ধারণারও কোনও যোগ নেই। অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, বরুণ, বায়ু, বিষ্ণুর মতো বৃহস্পতি এখানে একজন পৃথক দেবতা রূপে উপস্থিত। তাঁর মধ্যে গণপতিত্বের চিহ্নমাত্র নেই। হস্তীমুখ হিসেবেও এখানে বিনায়কদের বর্ণনা করা হয়নি। এরা আসলে ভিন্ন ভিন্ন little tradition-এর প্রতিনিধি। অঞ্চলভিত্তিক নানা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এদের প্রাধান্য ছিল। ধর্মশাস্ত্র সংকলনের প্রথম পর্যায়ে little tradition-ভুক্ত এই বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক সত্তাগুলি great tradition-এর সঙ্গে একধরনের বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে আসতে থাকে। বস্তুত, গৃহ্যসূত্রাদি রচনার সময় ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্ব শুরু হয়। বিনায়কগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত ধর্মীয় আচরণবিধি অথবা তাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জাতিগোষ্ঠীগুলি মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় বিকাশলাভ

করেছিল।[৭৭] এইসব অঞ্চলে বৈদিক ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক আচরণ বা প্রথাসমূহের অনুবর্তন সঙ্গত কারণেই ঘটেনি। গৃহ্যসূত্রের রচনাকার্যে মুখ্যত মৈত্রায়ণীয় মতাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা যুক্ত ছিলেন এবং তাঁরা মধ্যভারতে বিশেষত বেনারস ও গুজরাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হন।[৭৮] স্বভাবতই এই শ্রেণির ব্রাহ্মণদের ক্রমবিকাশের ফলে তাঁদের ধর্মীয় অনুশাসনে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্তর্গত দেবতাদের থেকে তথাকথিত আঞ্চলিক জাতিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়-পূজ্য স্থানীয় দেবতাদের অপেক্ষাকৃত হীনতরভাবে উপস্থাপনের প্রবণতা দেখা যায়। আপাত অর্থে স্থানীয় দেবতাদের এই অবনমন সত্ত্বেও তারা demi god হিসেবে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের মধ্যে নিজেদের বিকল্প অবয়বে প্রতিষ্ঠা দিতে শুরু করে। এর মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে একধরনের অন্তর্ঘাত ঘটানোর প্রবণতা স্পষ্ট। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এইসব স্থানীয় দেবতাদের অনুর্ভুক্তির মাধ্যমে শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণ্যবাদকে ওই সমস্ত অঞ্চলে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেন, পরবর্তীকালে পুরাণাদির ক্রমবিকাশের মাধ্যমে যা আরও সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে।

২. গৃহ্যসূত্রোক্ত এই চতুর্বিধ 'বিনায়ক'-এর ধারণা পরবর্তীকালীন স্মৃতিশাস্ত্রের যুগেও গৃহীত হয়েছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*-র (প্রথম-তৃতীয় শতাব্দী) প্রসঙ্গ। *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*-র চারজন টীকাকার-ও তাঁদের ভাষ্যে অনুরূপ বিনায়কের উল্লেখ করেছেন। গৃহ্যসূত্রের বিনায়ক গোষ্ঠীর সঙ্গে এদের ভূমিকা বা কার্যকারিতার তফাত বিশেষ নেই। সামান্য হেরফের আছে নামে বা সংখ্যায়। তবে আসল ফারাক ঘটেছে অবস্থানগত গুরুত্বের ক্ষেত্রে। *মানবগৃহ্যসূত্র* এবং *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*-র তুলনামূলক আলোচনা করলেই এই প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য চোখে পড়বে। যথা :

প্রথমত, গৃহ্যসূত্রোক্ত চতুর্বিধ 'বিনায়ক'-এর ধারণা *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*-র ভাষ্যে নাম বা সংখ্যায় বহু-চিহ্নিত হলেও স্মৃতি-সংহিতার স্তরে এই 'বিনায়ক' গোষ্ঠী নির্দিষ্ট এককের অধীনে ক্রমশ সংহত হয়েছে। রুদ্র ও ব্রহ্মার (*মিতাক্ষরা* ভাষ্যে বিষ্ণুও যুক্ত হয়েছেন) দ্বারা কর্মে বিঘ্ন সংঘটনের জন্য 'বহুগণের অধিপতি'-রূপে নিযুক্ত করা হয়েছে এক 'বিনায়ক'-কে। অনিবার্যভাবেই সেই নায়ক-প্রধান 'গণাধিপতি': "বিনায়কঃ কর্মবিঘ্নসিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োজিতঃ। গণানামাধিপত্যে রুদ্রেণ ব্রহ্মণা তথা।।"[৭৯] বহু বিনায়ক এইভাবে নির্দিষ্ট একতমের অধীনে শৃঙ্খলিত হয়েছে। 'বিনায়ক' শব্দের অর্থসার এইখানে ঠিক বুঝতে পারা যায়। একাধারে দ্বিবিধ অর্থধারণের ইঙ্গিত স্পষ্ট। গৃহ্যসূত্রের 'নায়ক'-বিহীন বহু বিনায়ক স্মৃতির ভাষ্যে বহু পরিচয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেও বিশিষ্ট একজন 'নায়ক'-এর ('বিনায়ক') গণাধিপত্যে স্থিত হয়েছে— নিহিতার্থে এইখানে 'বিনায়ক' সত্তার ক্রমোত্তরণ ঘটেছে 'গণপতি' সত্তায়।

দ্বিতীয়ত, গৃহ্যসূত্রের বহু সংখ্যক 'বিনায়ক' *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*-তে এক 'গণাধিপতি'-র ('গণানামাধিপত্যে') আওতায় এলেও বিনায়কদের পরিচয়ের বহুত্ব স্মৃতির ভাষ্যেও অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে সূত্রের বিনায়কদের সঙ্গে এদের সংখ্যা বা নামগত তারতম্যের বিষয়টি খেয়াল করা যেতে পারে। *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*-র নবম শতকীয় ভাষ্যকার বিশ্বরূপের *বালক্রীড়া* ভাষ্যে চারজন বিনায়কের নামসহ মন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। গৃহ্যসূত্রের চার বিনায়কের মধ্যে 'শালকটংকট' ও 'কুষ্মাণ্ডরাজপুত্র' থাকলেও 'উস্মিত' এবং 'দেবায়জন' বিনায়ক এখানে অনুপস্থিত। পরিবর্তে 'মিত' এবং 'সম্মিত' বিনায়ক রয়েছেন। সম্ভবত 'উস্মিত' বিনায়কের সঙ্গে ধ্বনিসাযুজ্য রক্ষা করে 'মিত' এবং 'সম্মিত' বিনায়কের পরিকল্পনা। বাদ পড়েছেন 'দেবায়জন' বিনায়ক। এরপর দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তী সময়ের ভাষ্যকার বিজ্ঞানেশ্বরের *মিতাক্ষরা*-য় পূর্বোক্ত চার বিনায়ক-ই বিদ্যমান। কেবল সংখ্যাটা বেড়ে চার থেকে ছয় হয়েছে। কারণ, 'মিত' ও 'সম্মিত' বিনায়কের সঙ্গে 'শালকটংকট' এবং 'কুষ্মাণ্ডরাজপুত্র' এই দুই বিনায়কের নাম বিশ্লিষ্ট হয়ে 'শাল', 'কটংকট', 'কুষ্মাণ্ড' ও 'রাজপুত্র' নামে মোট ছ'জন বিনায়কের ধারণা তৈরি করেছে। দ্বাদশ শতাব্দীর ভাষ্যকার অপরার্ক পূর্বজ বিশ্বরূপের মতোই চার বিনায়কের নামোল্লেখ করেছেন এবং প্রমাণস্বরূপ *বৈজভপাগৃহ্যসূত্র* থেকে উদ্ধৃত করেছেন। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের ভাষ্যকার শূলপাণি *দীপকালিকা* ভাষ্যে অনুরূপে চার বিনায়কের উল্লেখ করেছেন। স্মৃতিধৃত এই চতুর্বিধ বিনায়কের ধারণা পরবর্তীকালীন পুরাণ গ্রন্থেও প্রবিষ্ট হয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, *বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ*-এ *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*-র বিশ্বরূপাচার্যের ভাষ্য অনুসরণে 'মিত', 'সম্মিত', 'শালকটংকট' এবং 'কুষ্মাণ্ডরাজপুত্র' শীর্ষক বিনায়কের উল্লেখ আছে।[৮০] এমনকী সেখানে বিনায়কের জননী রূপে 'অম্বিকা'-র (১১। ১০৫। ২২ নং শ্লোক) নামও পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত, নামে বা সংখ্যায় সামান্য বদল এলেও *মানবগৃহ্যসূত্র* থেকে *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি* পর্যন্ত মোটের ওপর বিনায়কদের ক্রিয়াপরতা অপরিবর্তনীয়। দুটি গ্রন্থেই নঞর্থক শক্তিরূপে এদের উপস্থাপনা। এরা বিঘ্নসূচক, অপকারী, যাবতীয় অমঙ্গল ও দুর্ভাগ্যের কারণ। এহেন বিনায়কের কু-প্রভাব কবলিত ব্যক্তিমাত্রেই পার্থিব বিঘ্নের শিকার হন। স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য এই জাতীয় বিড়ম্বনার দীর্ঘ তালিকা পেশ করেছেন, যেমন– 'বিনায়ক'-জনিত উপসর্গ হলে রাজপুত্রের রাজত্বপ্রাপ্তি ঘটে না, বিবাহযোগ্য কন্যার পাত্র লাভ হয় না, গর্ভসম্ভবা স্ত্রী সন্তান প্রসবে ব্যর্থ হন, ঋতুমতী স্ত্রীর গর্ভধারণ সম্ভব হয় না, শ্রোত্রিয় আচার্যের সম্মান পান না, শিষ্যের অধ্যয়নকার্য ব্যাহত হন, ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয় এবং কৃষকের ফলনপ্রাপ্তি ঘটে না।[৮১] অনুরূপে *মানবগৃহ্যসূত্র*-এ ব্যক্তির শিক্ষাগ্রহণকালে বিনায়কদের দ্বারা প্রভূত বাধাসৃষ্টির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।[৮২]

তবে *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*-র ভাষ্যে বিনায়ককে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ করা হয়েছে কর্ম-বিঘ্ন সিদ্ধ করার জন্য। ফলত, স্মৃতি-প্রমাণে বিঘ্নকর্তা হিসেবে ('কর্ম্মবিঘ্নসিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োজিতঃ') তাঁর ভূমিকা সরাসরি। এমনকি বিনায়কের উপসর্গ-দুষ্ট ব্যক্তি সর্বদাই অন্যমনস্ক থাকেন, আরব্ধ কোনও কার্যই সিদ্ধ হয় না এবং অকারণে বিষণ্ণতা গ্রাস করে 'বিমনা বিফলারম্ভঃ সংসীদত্যনিমিত্ততঃ' (১। ১১। ২৭৩)।

চতুর্থত, বিজ্ঞানেশ্বরের *মিতাক্ষরা* ভাষ্যে ১। ২৯০ নং শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিনায়কের শারীরিক বৈশিষ্ট্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এখানে বিনায়ক 'বক্রতুণ্ড' (বাঁকা শুঁড়) এবং 'দন্তী' (দাঁতযুক্ত) রূপে বন্দিত হয়েছেন।[৮৩] বিনায়কের এই দুটি শারীর-বৈশিষ্ট্য পৌরাণিক গজমুখ গণেশের পরিচয়ের সূচক বা সমনাম রূপে গৃহীত। *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*-র ১। ১১। ২৯২ নং শ্লোকে বিনায়ক সকল কার্যের ফলদাতা রূপে গ্রহদেবতাদের সঙ্গে একপঙ্‌ক্তিতে পূজিত হয়েছেন। লক্ষণীয়, সর্বকার্যের সুফলদাতা হিসেবে পৌরাণিক 'সিদ্ধিদাতা' গণেশের যে প্রতিষ্ঠা, প্রাক-পৌরাণিক যুগে যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিপ্রমাণেই তার পূর্বাভাস রয়ে গেছে।

পঞ্চমত, *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*-র ১। ১১। ২৮৯ নং শ্লোকে ('বিনায়কস্য জননীমুপতিষ্ঠেৎ ততোহম্বিকাম্') বিনায়ক-জননীরূপে 'অম্বিকা'র উল্লেখ বিনায়কের গণপতি-গণেশে উত্তরণের একটি প্রমাণস্বরূপ বিবেচনা করা হয়। যদিও এই উল্লেখ বিতর্কিত। ভাণ্ডারকর উক্ত শ্লোকাংশের সমর্থনে অম্বিকা (বা পার্বতী) এবং বিনায়কের মধ্যে মাতা-পুত্রের সম্পর্কের সূচনা দেখেছেন।[৮৪] যদিও পৌরাণিক ঐতিহ্যের সূত্রেই এই সম্পর্কের প্রারম্ভ। গৃহ্যসূত্রের স্তর পার হয়ে স্মৃতি-সংহিতার স্তরে বহু বিনায়কের এক গণাধিপতির আশ্রয়লাভ ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু গণপতি-গজানন রূপে বিনায়কের শিব-শক্তি পরিবারে অন্তর্ভুক্তি তখনও বেশ দূরকল্পিত। কয়েকজন গবেষকের মতে উক্ত শ্লোকাংশে বিনায়ক-জননীর উপাসনা সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছে এবং অব্যবহিত পরে পৃথকভাবে অম্বিকার প্রসঙ্গ এসেছে।[৮৫] এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি প্রসঙ্গের একবাক্যতা ঘটিয়ে *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*-র বিনায়কের সঙ্গে অম্বিকা তথা পার্বতী-দুর্গার এই সমন্বয় কল্পনা অযৌক্তিক।

অতএব দেখা গেল, উত্তর-বৈদিক কিন্তু প্রাক-মহাকাব্য যুগের গৃহ্যসূত্রোক্ত বিনায়কগণের অবস্থান থেকে মহাকাব্য যুগের স্মৃতি-সংহিতায় এক গুরুত্বপূর্ণ সরণ ঘটেছে। *মানবগৃহ্যসূত্র*-এর বিনায়কগণ যেখানে বহুসংখ্যক অপশক্তি রূপে উল্লিখিত, *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*-র বিনায়ক সেখানে বিবিধ রূপভেদ সত্ত্বেও কেবলমাত্র একটি প্রধান অপশক্তির আধার রূপে গৃহীত। এ ছাড়া *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*-তে অম্বিকা পূজার পর গ্রহ ও আদিত্যদের পূজা এবং শেষে স্বামী

(কার্তিক) ও 'মহাগণপতি'-র উদ্দেশ্যে তিল প্রদানের কথা বলা হয়েছে।[৮৬] এক্ষেত্রে মহাগণপতি, অম্বিকা, কার্তিক এবং গ্রহদের সঙ্গে বিনায়কের একত্র উল্লেখ ঘটেছে।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি-র মিতাক্ষরা ভাষ্যে (১। ২৯২) বিনায়কের উদ্দেশে কৃত প্রার্থনার মধ্যে 'ভগবন্‌' শব্দটির প্রয়োগও বেশ তাৎপর্যবাহী।[৮৭] কারণ, এই জাতীয় সংকেত থেকেই বিনায়কদের চরিত্রগত evilness-এর পরিবর্তে একধরনের divinity বা দৈবত্বের স্তরে উর্ধ্বায়ণ অনুমান করা যায়। আগেই বলা হয়েছে, স্মৃতি-সংহিতার ভাষ্যে গ্রহদেবতাগণের সঙ্গে বিনায়ক একপঙ্‌ক্তিতে অর্চিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে কর্মফলদায়ী গ্রহদের অবস্থান এবং কার্যকারিতার সঙ্গে বিনায়কের ভূমিকার একত্ব লক্ষণীয়। গবেষক Y. Krishan-এর মতে, এই প্রসঙ্গটি কার্যত বিশেষ একটি সময়পর্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, যখন বেদাঙ্গ জ্যোতিষের জায়গায় সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের ধারণা ক্রমে গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। কার্যত এই সময় থেকেই মানবভাগ্যের পক্ষে প্রতিকূলতা সৃষ্টিকারী গ্রহদের কার্যধারায় পরিবর্তন সূচিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গ্রহশান্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কৃত্য হিসেবে গ্রাহ্যতা পেতে থাকে।[৮৮]

ষষ্ঠত, দুটি গ্রন্থেই অপশক্তির কু-প্রভাব হ্রাস এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য শুদ্ধিকরণ বিষয়ক কৃত্যাদির বর্ণনা আছে। যদিও সামান্য পার্থক্য লক্ষণীয়। *মানবগৃহ্যসূত্র*-এ (২। ১৪। ২২-২৬) প্রায়শ্চিত্তকর্মের মধ্য দিয়ে শুদ্ধিকরণের ধারণা ব্যাখ্যাত হয়েছে। এখানে বৈদিক দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, বরুণ ও বিশ্বদেবগণ বন্দিত হয়েছেন। পক্ষান্তরে, *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*-তে (১। ১১। ২৭৭) বিঘ্নমুক্তি বা 'বিনায়কশান্তি'-র জন্য পুণ্যস্নানের পর শান্তিকর্ম এবং স্বস্তিবচনের মাধ্যমে শুদ্ধি প্রক্রিয়ার নির্দেশ আছে।

মানবগৃহ্যসূত্র-এ বলিদানের বিচিত্র বর্ণনা আছে। বলিকর্মে প্রদত্ত দ্রব্যের মধ্যে চাল, দানাশস্য, কাঁচা এবং রান্না করা মাছ, মাংস, ময়দা দিয়ে প্রস্তুত পিঠা, সুগন্ধি পদার্থ, সুরা জাতীয় পানীয় প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে অ-বৈদিক দেবতাদের বন্দনার প্রসঙ্গও এসেছে। যেমন, পার্থিব চাহিদাপূরণের উদ্দেশ্যে বিমুখ, শ্যেন, বাকা, যক্ষ, বিনায়ক, বিরূপাক্ষ, বৈস্রবন, লোকহিতকেশ প্রভৃতি দেবতার অর্চনা (২। ১৪। ২৯) করা হয়। অনুরূপে *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*-তেও (১। ২৮৫-২৮৮) মাংস, পানীয় ইত্যাদি বলিপ্রদও দ্রব্যের উল্লেখ আছে। যদিও অ-বৈদিক দেবতারা সেখানে অনুপস্থিত।

বিনায়কের সমপর্যায়ী শব্দ হিসেবে বিঘ্নেশ, বিঘ্নেশ্বর, বিঘ্নহর্তা প্রভৃতি বিঘ্নবাচক শব্দের অনুষঙ্গ চলে আসে, যা

পরবর্তী সময়ে গজানন গণেশের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বিঘ্নেশ বা বিঘ্নেশ্বর শব্দে যেমন বিঘ্নসৃষ্টির ইঙ্গিত স্পষ্ট, তেমনি বিঘ্নহর্তা শব্দ আবার বিঘ্ননাশের ইঙ্গিতবাহী। বিশেষ ক্ষেত্রে বিঘ্ন শব্দ নামপদ রূপেও ব্যবহৃত হয়, যা ধ্বংসকারী এক উপদেবতাকে চিহ্নিত করে। উপরের আলোচনাতেই দেখা গেছে, সূত্র-সাহিত্যের বিনায়কগণ উৎসগতভাবে বিঘ্নপ্রদ, ফলে বিঘ্নকারক শক্তি হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠা শাস্ত্রবিহিত। পরবর্তী যুগে স্মৃতি-সংহিতার স্তরে এই বিঘ্নসংঘটনকারী শক্তিসমূহ এক কেন্দ্রীয় দলমুখ্যের অধীনে সংহত হয়েছে। এই গণাধিপতি একতম বিনায়কের আশ্রয়ে থেকেই বিঘ্নকারণ শক্তিসমূহ প্রকারান্তরে তাদের মূলগত অপত্ব খসিয়ে ধীরে ধীরে বিঘ্নহারকের বৈশিষ্ট্যে উত্তীর্ণ হতে শুরু করেছে।[৮৯]

১.৩

মহাকাব্যে গণেশ প্রসঙ্গ :

আদি-বৈদিক বা উত্তর-বৈদিক সাহিত্যে যেমন 'গণেশ' শব্দটি পাওয়া যায় না, তেমনি মূল *রামায়ণ* বা *মহাভারত*-এও গণেশ প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। আদি *রামায়ণ*-এর কোনও স্থানেই গণেশের নামের উল্লেখ নেই। যদিও পরবর্তী সময়ের প্রক্ষেপ বা সংযোজন হিসেবে *রামায়ণ*-এর চতুর্থ কাণ্ডে গণেশের নাম যুক্ত হয়েছে। সেখানে শিবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনারত রাবণ বলেছেন, "গণেশো লোকশম্ভুশ্চ লোকপালো মহাভুজঃ।/ মহাভাগো মহাশূলী মহাদ্রংষ্টি মহেশ্বরঃ।।"[৯০] রামায়ণোক্ত এই গণেশ রুদ্র-শিবের সঙ্গে অভিন্নধর্মা। উল্লেখ্য, আদি *রামায়ণ* বা মহাভারত সংকলন পর্বে গণেশ শব্দটি মূলত রুদ্র-শিবের দ্যোতক। এমনকি 'গণাধ্যক্ষ' নামে শিবকেই ('ভূতেশ্বরো গণাধ্যক্ষঃ সর্বাত্মা সর্বভাবনঃ') অভিহিত করা হয়েছে।[৯১] এর সঙ্গে পৌরাণিক গজমুখ গণেশ নিঃসম্পর্কিত। কারণ, খ্রিষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের আগে গণপতি, বিনায়ক কিংবা হস্তীদেবতার ধারণা পৃথক পৃথক ঐতিহ্যের অংশ ছিল। এদের সমবায়ে পৌরাণিক হস্তীমুখ গণেশের একত্ব তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কাজেই, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে সংকলিত আদি *রামায়ণ*-এ পৌরাণিক দেবতা গণেশকে চিহ্নিত করা বাস্তবিক অসম্ভব। তখনও পর্যন্ত 'গণেশ' বা 'গণপতি' জাতীয় অভিধা শৈব ঐতিহ্যেরই সংলগ্ন ছিল।

রামায়ণের মতোই আদি *মহাভারত* বা মূল *মহাভারত*-এর 'original version'-এ (critical edition) গজবদন 'গণেশ' বা 'বিনায়ক'-এর উল্লেখ নেই। দু'একটি জায়গায় গণেশের সমপর্যায়ী শব্দ পাওয়া গেলেও অর্থান্তর ঘটেছে নিঃসন্দেহে। যেমন, গণেশের বিকল্প নাম হিসেবে 'গণেশ্বর' বা 'গণেশন' পাওয়া গেছে ঠিকই, কিন্তু তা

হস্তীমুখ গণেশের পরিবর্তে রুদ্র-শিবকে বুঝিয়েছে। লক্ষণীয়, দক্ষপ্রোক্তশিব-সহস্রনামস্তবে 'গণাধীপ', 'গণেশ্বর', 'গণ', 'গণাধ্যক্ষ', 'গণাকার', 'গণকৃত', 'গণপতি' প্রভৃতি বিশেষণ শিব সম্পর্কে প্রযোজ্য।[৯২] এই স্তোত্র পরবর্তীকালের সংযোজন বলে স্বীকৃত হওয়ায় *মহাভারত*-এর সমালোচনামূলক সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আবার, *মহাভারত*-এর কোনও একটি পাঠে বনপর্বে গণেশ শম্ভু তথা শিবের সঙ্গে অভিন্ননামা– 'গণেশং জগতঃ শম্ভুং লোককারণ কারণম্'।[৯৩] বিশিষ্ট গবেষক ওয়াই. কৃষান *মহাভারত*-এর ১০। ৭। ৮ শীর্ষক শ্লোকের সমর্থনে 'গণাধ্যক্ষ' উপাধিধারী ত্রিনয়নবিশিষ্ট ('ত্র্যক্ষম্') শিবের উল্লেখ করেছেন।[৯৪] এইসব প্রমাণের সাক্ষ্যে মহাভারতে গণেশ সংক্রান্ত ধারণা অনেকখানি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়।

আগের অংশেই দেখানো হয়েছে, অগণিত বিচিত্রদর্শন গণের অধিপতি রূপে রুদ্রের গণপতির ভূমিকা যর্জুবেদের যুগেই আকাঙ্ক্ষিত হয়েছিল। *মহাভারত*-এর অনুশাসনপর্বে রুদ্রের সেই এককত্ব ভেঙে তেত্রিশ জন গণেশ্বরের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে, যাদের মধ্যে গণেশ্বররূপী বিনায়ক অন্যতম। এখন প্রণিধানযোগ্য এই যে, 'গণেশ্বর'-এর epithet বা সমার্থক অভিধারূপে 'বিনায়ক'-এর উল্লেখ মহাভারতীয় ভাষ্যে মিললেও এবং সেই ধরনের উল্লেখের বেশিরভাগই পরবর্তীকালীন প্রক্ষেপ বলে বিবেচিত হলেও বিনায়ক বিষয়ক উপস্থাপনায় একধরনের বিশেষত্ব চোখে পড়ে। অনুশাসনপর্ব এবং শান্তিপর্বে বিনায়কের উল্লেখযুক্ত দুটি শ্লোক ধরলে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য টের পাওয়া যাবে। প্রথম ক্ষেত্রে সর্বভূতগণের ঈশ্বর রূপে চিহ্নিত তেত্রিশ সংখ্যক গণেশ্বরের তালিকায় 'বিনায়ক'-এর অধিষ্ঠান। বিশ্বনিয়ন্তা রূপে গণেশ্বর-বিনায়কগণ ('ঈশ্বরাঃ সর্ব্বলোকানাং গণেশ্বর-বিনায়কাঃ') এখানে স্বীকৃত।[৯৫] সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর এবং নিয়ন্ত্রক হলেও প্রকৃতিতে এরা অনিষ্টকারী এবং সংখ্যায় বহু। এই 'গণেশ্বর' শব্দটি অপশক্তির প্রতিভূ হিসেবে *হরিবংশ*-এও উল্লিখিত হয়েছে।[৯৬] দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ শান্তিপর্বের শ্লোকে শিবস্তোত্র উচ্চারণের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে রাক্ষস, পিশাচ ও ভূতগণের সঙ্গে বিনায়কেরা এক বর্গভুক্ত হয়েছে।[৯৭] এই বিনায়কগণ কার্যধারায় শিব অথবা তাঁর গণের সম্পূর্ণ বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। শ্লোকের প্রতিপাদ্য এই যে, উক্ত স্তব পাঠের মাধ্যমে শিবানুগৃহীত ভক্ত নিজ গৃহ থেকে বিনায়কাদি অপশক্তির প্রভাব দূরীভূত করতে সমর্থ হবেন। মনে হয় মহাভারতীয় বিনায়কের এই ধারণা *মানবগৃহ্যসূত্র*-এর ঐতিহ্য থেকে গৃহীত। বিশিষ্ট গবেষক পি. ভি. কানেও এই মতের সপক্ষতা করেছেন।[৯৮] *মহাভারত*-এর বনপর্বের একজায়গায় 'বিঘ্নকর্তৃনাম' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার দ্বারা বিঘ্নসৃষ্টিকর্তাকে বোঝানো হয়েছে।[৯৯] তবে এই উল্লেখটিও পরবর্তী সময়ের প্রক্ষেপ বলে গণ্য হয়। ফলত, এটি *মহাভারত*-এর সমালোচনামূলক সংস্করণে অরণ্যপর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এ ছাড়া *মহাভারত*-

এর কোনও কোনও পাঠে বিরাটপর্ব এবং উদ্যোগপর্বের প্রারম্ভিক মন্ত্রে 'গণেশায় নমঃ'-র মতো বন্দনামূলক বাক্যাংশ থাকলেও গবেষকরা এগুলিকে পরবর্তী সময়ের সংযোজন বলে মনে করেছেন।[১০০] ফলে মান্য সমালোচনামূলক সংস্করণে সেগুলি গৃহীত হয়নি। আবার, *মহাভারত*-এর অরণ্যপর্বের ৩। ৮০। ৭০, ৮১। ১৮, ৮২। ১০ ও ৮৩। ৬৪ শীর্ষক শ্লোকে বলা হয়েছে, তীর্থক্ষেত্র থেকে পবিত্র নদীর দিকে প্রবাহিত সুফলগুলির মধ্যে একটি বিশেষ প্রাপ্তি হল তীর্থস্থানগুলির গাণপত্য ('গাণপত্যম্') লাভ, যা জনৈক গণপতির অবস্থানগত মর্যাদাপ্রাপ্তি ('the rank of a ganapati') বোঝায়। এক্ষেত্রে 'গণপতি' শব্দের প্রয়োগ সুউচ্চ মর্যাদার অভিব্যক্তি রূপে, বিশেষ কোনও দেবতার ব্যক্তিনাম হিসেবে নয়।

ভারতকথার অনুলেখক রূপে গণেশের প্রসিদ্ধি *মহাভারত*-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রসঙ্গ। আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মার পরামর্শে ব্যাসদেব জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ গণেশকে *ভারতকথা*-র অনুলিপিকার হতে প্রার্থনা জানিয়েছেন। গণেশও শর্তসাপেক্ষে লিপিকরণে সম্মত হয়েছেন।[১০১] উদ্দিষ্ট অংশে তাঁকে 'হেরম্ব', 'গণেশ', 'বিঘ্নেশ', 'গণনায়ক' এবং 'সর্বজ্ঞ' রূপে সম্বোধন করা হয়েছে। ব্যাসের মুখনিঃসৃত বাণীর অনুলিখন সূত্রে গণেশের এই ভূমিকা বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও ঐতিহাসিকভাবে এই অনুষঙ্গটি যথেষ্ট বিতর্কিত। কেননা, উপরোক্ত প্রমাণাদি থেকে এটা স্পষ্ট যে, মূল *মহাভারত* রচনা ও সংকলনের পর্বে (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক) 'গণেশ', 'গণপতি', 'গণেশ্বর', 'গণাধ্যক্ষ'-রূপে রুদ্র-শিবই সমধিক পরিচিত ছিলেন। গৃহ্যসূত্রের পরম্পরায় 'গণেশ্বর-বিনায়ক' রূপে প্রভূত অপশক্তির অস্তিত্ব-ও ছিল। কিন্তু, তখনও পর্যন্ত বর্তমান গজমুখ গণেশের সঙ্গে গণপতি বা বিনায়কের আদৌ কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বিশেষজ্ঞ কুমারস্বামী-ও 'Ganesha' শীর্ষক প্রবন্ধে এই জাতীয় অংশকে পরবর্তী সময়ে সংযোজিত একটি জনপ্রিয় কিংবদন্তী বলেছেন। তাঁর মন্তব্য, 'He is not mentioned as an individual in the Mahabharata (where, however, Siva is styled Ganesa, chief of the Ganas), but a popular legend forming a late addition to the text asserts that Vyasa, the author, or rather "compiler," of the epic, finding himself unable to write down the verses as quickly as they came into his mind, called upon Brahma, who sent Ganesa; and he, with his four hands, undertook to write as much as two men could.'[১০২] তা ছাড়া *মহাভারত*-এর উত্তর ভারতীয় পাণ্ডুলিপি পাঠে লিপিকর রূপে গণেশের প্রসঙ্গ পাওয়া গেলেও দক্ষিণী পাণ্ডুলিপিতে কিন্তু এই প্রসঙ্গ অনুপস্থিত।[১০৩] এই বিষয়ে গবেষকরা সকলে একমত নন। এইচ. লুডার্সের মতে, *মহাভারত*-এর আদিপর্বে

লিপিকর গণেশের উপস্থিতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় পাণ্ডুলিপি পাঠে সমভাবে পাওয়া গেছে। যদিও এর প্রকৃত উৎস হিসেবে লুডার্স দক্ষিণ ভারতকেই নির্দিষ্ট করেছেন। যেহেতু *মহাভারত*-এর তেলেগু এবং মালায়ালম ভাষার পাণ্ডুলিপিতে উক্ত প্রসঙ্গটি উপস্থিত, ফলে আদিপর্বের এই গণেশ-কেন্দ্রিক ধারণাটি যে দক্ষিণ ভারত থেকেই অন্যত্র পরিবাহিত হয়েছিল, এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত থাকার কথা নয়।[১০৪] শিরোধার্য পণ্ডিত উইনটারনিৎস আবার গণেশের লিপিকার্যের প্রসঙ্গটিকে নবম শতকের প্রক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী।[১০৫] কারণ, উক্ত প্রসঙ্গটি যে কেবল পাণ্ডুলিপি পাঠেই অনুপস্থিত তা নয়, ক্ষেমেন্দ্রের *ভারতমঞ্জরী* গ্রন্থেও গণেশের দ্বারা *মহাভারত* লিপিকরণের প্রসঙ্গটির সমর্থন পাওয়া যায় না। অন্যদিকে, ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত রাজশেখরের *বালভারত* গ্রন্থে (১। ২০) *ভারত সংহিতা*-র 'অনুলেখক' রূপে বিনায়কের নিযুক্তির কথা পাওয়া যায়। অতএব মূল *মহাভারত* সংকলনের কালে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে গণেশের লিপিকার্যের প্রসঙ্গটি *মহাভারত*-এর আদিপর্বে যুক্ত হয়নি। এটি নিশ্চিতভাবেই পরবর্তীকালের সংযোজন। ম্যাকডোনেলের মতে, এটি ন্যূনাধিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের সংযোজন। কারণ, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত মূল *মহাভারত*-এর সংকলনকাল ধরা হলেও পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে *মহাভারত*-এর বিভিন্ন অংশে বহুবিচিত্র সংযোজন ঘটেছিল। কাজেই, উল্লিখিত সময়পর্বে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ গণেশ কর্তৃক *মহাভারত* অনুলিখনের প্রসঙ্গটি আদিপর্বে প্রক্ষেপ হিসেবে সংযুক্ত হয়ে থাকতে পারে। তা ছাড়া এই ধরনের সংযোগের অন্য তাৎপর্যও থাকা সম্ভব। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকেই বিঘ্নহর্তা ও সিদ্ধিদাতা রূপে গণেশের মাহাত্ম্য পুরাণমণ্ডলে সুপ্রতিষ্ঠিত। তখন থেকেই যাবতীয় বিঘ্ন এড়াতে যে কোনও কাজের সূচনায় গণেশস্মরণ অবশ্যকৃত্য। না হলে বিঘ্নরাজের কোপে পড়তে হবে। স্বভাবতই *মহাভারত*-এর মতো এমন magnum opus কাজের সঙ্গে বিঘ্নহর্তা গণেশের নামটা জুড়তেই হত। যে অতিকায় বিপুলকলেবর গ্রন্থ রচিত হবে, তার রচনাকালে যাতে কোনও বিঘ্ন উদ্ভূত না হয়, সে'কারণে স্বয়ং বিঘ্নবিনাশক গণেশকে দিয়েই সেই গ্রন্থের লিপিকার্য করানো হয়েছে। ব্যাসের প্রার্থনায় ব্রহ্মার পরামর্শে স্বয়ং জ্ঞানবান ও গুণবান গণপতি যুক্ত হয়েছেন *মহাভারত*-এর অনুলিপিকার হিসেবে, নিজের উৎপাটিত দিব্যদন্তটিকে লেখনী করে তার সাহায্যে রচনা করলেন এই মহাগ্রন্থ। আমাদের মনে হয়, এই বৃত্তান্ত সম্ভবত বিঘ্নবিনায়ক গণেশের ভূমিকাটিকে স্মরণে রেখেই পঞ্চম থেকে নবম শতকের মধ্যে কোনও এক সময় মূল *মহাভারত*-এর আদিপর্বের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে সিদ্ধিদাতা ও বিঘ্নহর্তা হিসেবে

পৌরাণিক গণপতির ধারাবাহিক উত্থানের সঙ্গে *ভারতকথা*-র অনুলিপিকার গণেশের সংযোগের একটি সমান্তরাল সম্পর্ক রয়েছে।

১.৪

প্রাগার্য হস্তীদেবতার ঐতিহ্য এবং গণেশ :

প্রাচীন ভারতের হস্তী সংস্কৃতি এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হস্তীদেবতার ধারণা আর্য-পূর্ব ধর্ম-সামাজিক ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকেই পশুদেবতা রূপে স্বতন্ত্র হস্তীদেবতার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। পুরাণ সংকলনের পর্বে এই হস্তীদেবতাই মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট দেবতার রূপকল্পে গজানন গণেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মূলত ইন্দো-গ্রিক বা ইন্দো-ইরানীয় ঐতিহ্যের সূত্র ধরে আসা হস্তী সংস্কৃতি সমগ্র উত্তর ভারত বা উত্তর-পশ্চিম ভারত জুড়েই যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। গবেষক হরিদাস মিত্র-ও ভারতের উত্তরাঞ্চলে গণপতির প্রথম পূজা প্রচলনের কারণ রূপে ওই অঞ্চলে হস্তী সম্পদের ব্যাপকতর সমৃদ্ধি এবং হস্তীদেবতার প্রভূত জনাদরের উল্লেখ করেছেন।[১০৪] উত্তর-বৈদিক সাহিত্যে এই ধরনের হস্তীসদৃশ দেবতার অন্তর্ভুক্তি লক্ষ করা যায়। *মৈত্রায়ণী সংহিতা* এবং *তৈত্তিরীয় আরণ্যক*-এর মন্ত্রমধ্যস্থ কয়েকটি নামের মধ্যে আধা মানুষ ও আধা পশুদেহযুক্ত দেবতার চিহ্ন পাওয়া গেছে। এই theriomorphic deity-রা মুখ্যত হাতির মুখমণ্ডল বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে গণেশের সাধর্ম্যযুক্ত। যদিও পৌরাণিক গণেশের পূর্বমূর্তি হিসেবে এদের গ্রহণ করা যায় না। *মৈত্রায়ণী সংহিতা*-য় উল্লিখিত মন্ত্রের সূত্রে 'করট' (হস্তীকপোলযুক্ত জনৈক দেবতা), 'হস্তীমুখ' (গজমুখ জনৈক দেবতা) এবং 'দন্তী'-র (গজদন্তযুক্ত জনৈক দেবতা) নামোল্লেখ করা যায় – 'তৎকরটায় বিদ্মহে হস্তীমুখায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ'।[১০৫] এর পাশাপাশি *তৈত্তিরীয় আরণ্যক*-এর দশম প্রপাঠক যাজ্ঞিকী বা মহানারায়ণীয় উপনিষদের অন্তর্গত মন্ত্রের মধ্যে 'বক্রতুণ্ড' (বাঁকা ঠোঁট বা শুঁড় বিশিষ্ট জনৈক দেবতা) এবং 'দন্তী' শীর্ষক (গজদন্তযুক্ত জনৈক দেবতা) দেবতার উল্লেখ পাওয়া গেছে - 'তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ'।[১০৬] পরবর্তী বৈদিক যুগে কল্পসূত্রান্তর্গত *বৌধায়ন ধর্মসূত্র*-এ পারলৌকিক কর্ম হিসেবে শ্রাদ্ধতর্পণের সময় বিবিধ উপদেবতার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিঘ্নপ্রসাদ এবং বিঘ্নপ্রসাদী নামে চিহ্নিত এই বর্গের উপদেবতারা হলেন, বিঘ্ন, বীর, শূর, ভদ্র, হস্তীমুখ, বক্রতুণ্ড, একদন্ত, লম্বোদর ও গণেশ।[১০৭] *বোধায়ন গৃহ্যসূত্র*-এর 'বিনায়ককল্প' অংশে পূর্বোল্লিখিত চার বিনায়কের মধ্যে দেবায়জনের উল্লেখ আছে। এ ছাড়া অন্যান্য

দেবতাদের মধ্যে বিঘ্ন, বীর, শূর, উগ্র, ভীম, হস্তীমুখ, বরদ এবং বিঘ্নপ্রসাদ ও বিঘ্নপ্রসাদীগণ উপস্থিত।[১০৮] যদিও এই তালিকায় পূর্বোক্ত বক্রতুণ্ড, একদন্ত, লম্বোদর ও গণেশ অনুপস্থিত। বোঝা যায়, তালিকাভুক্ত উপদেবতাদের মধ্যে 'হস্তীমুখ' ও 'বক্রতুণ্ড' ব্যতিরেকে একদন্ত, লম্বোদর ও গণেশের নামোল্লেখ একান্তই পরবর্তীকালের সংযোজন। মান্য বিশেষজ্ঞ আর. সি. হাজরাও এর সপক্ষে মত দিয়েছেন।[১০৯] *মৈত্রায়ণী সংহিতা* ('করট', 'হস্তীমুখ', 'দন্তী') বা *তৈত্তিরীয় আরণ্যক*-এ ('বক্রতুণ্ড', 'দন্তী') উল্লিখিত হস্তীদেবতাদের নামের সূত্রেও এটা পরিষ্কার যে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের নানা স্থানে প্রায়শই এই ধরনের দেবকল্প আধা মানব-আধা পশুমূর্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। তবে এরা কেউই গজমুখ গণেশের প্রতিরূপ নয়। খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকেই এইসব আঞ্চলিক পশুদেবতারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র-নিরপেক্ষভাবে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে গুরুত্ব পেতে শুরু করেছিল। ফলত, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এরাই সম্ভবত 'লৌকিক দেবতা' নামে চিহ্নিত হয়েছে।[১১০] জৈন সাহিত্যে 'ব্যন্তর দেবতা' অথবা বৌদ্ধ সাহিত্যে 'দেব' পর্যায়ের প্রতিনিধি হিসেবে এদেরই প্রসিদ্ধি ছিল। পূর্বলিখিত নামগুলির মধ্যে 'হস্তীমুখ' এবং 'বক্রতুণ্ড' শীর্ষক উল্লেখ দুটি উৎসগত বিচারে অপেক্ষাকৃত পূর্বকালীন। 'দন্তী' শব্দেও গজদন্তের সূত্রে প্রাগার্য হস্তী সংস্কৃতির অনুষঙ্গটি স্পষ্ট। ঐতিহাসিকভাবে এরা পৌরাণিক গণেশের পূর্বসূরী হলেও একমাত্র মুখমণ্ডলের সাদৃশ্যটুকু ছাড়া গণেশের ভাবমূর্তির সঙ্গে এদের মেলানো শক্ত। পরবর্তীকালে অবশ্য এই অবয়বগত মিলের দিকটাকে গুরুত্ব দিয়েই 'হস্তীমুখ', 'বক্রতুণ্ড', 'দন্তী' শীর্ষক পৃথক পৃথক theriomorphic deity পৌরাণিক গণেশের গজমূর্তির মধ্যে আত্মলোপ করেছে। হস্তীমুখের সামঞ্জস্যেই এরা পুরাণ সংকলনের পর্বে সিদ্ধিদাতা গণপতি-গণেশের নামান্তর হিসেবে *তৈত্তিরীয় আরণ্যক*-এর বহুপ্রচলিত 'গণেশ-গায়ত্রী'-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তথাকথিত অ-বৈদিক পরিসরের মধ্যে থেকে আসা এই জাতীয় 'লৌকিক' স্তরের দেবতারা ক্রমাগত আর্য প্রভাবাধীন ধর্মব্যবস্থায় নিজত্ব খুইয়ে বৈদিক দেবতত্ত্বের আধারে এক নতুনতর পরিচয়ে উন্নীত হয়েছে।

১.৫

গণপতি, বিনায়ক ও হস্তী দেবতা থেকে গণেশ: একটি ক্রম-বিবর্তিত সমীকরণ

বিবিধ বিবর্তন-সূত্র থেকে গণেশের দেবত্বের উদ্ভব সংক্রান্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে পৌরাণিক হস্তীমুখ সিদ্ধিদাতা গণেশের আবির্ভাব নির্দিষ্ট একমাত্রিক ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি নয়। প্রাগার্য হস্তীপূজা

এবং হস্তীদেবতা বিষয়ক ধারণা থেকে কালক্রমে শ্রুতি-কল্পসূত্র-স্মৃতি-সংহিতার ঐতিহ্যবাহিত হয়ে গজমুখ গণেশ আনুমানিক চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে বর্তমান পরিচয়ে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। একবাক্যে এই সমীকরণ তৈরি করা যত সহজ, আদপে এই যোগবন্ধন ততখানি সরলরেখায় ঘটেনি। এর চলন স্বভাবতই বিচিত্র এবং বহুবিস্তারী।

প্রথমত, 'গণপতি'-র ধারণা নিঃসন্দেহে বেদ-নিঃসৃত। বেদোক্ত গণপতির ধারণার সঙ্গে জ্ঞান ও বৈদগ্ধ্যের যোগ যেমন, তেমনি সংগঠক-সুলভ নেতৃত্ব বা প্রভুত্বের দিকটিও সংশ্লিষ্ট। এমনকি শত্রুনাশের সূত্রে তিনি রক্ষক বা পরিত্রাতার গুণযুক্ত। আগেই বলা হয়েছে, বেদের ব্যাখ্যানে গণপতি শব্দ দেবতা বিশেষের নামপদবাচ্য নয়, একটি নির্বিশেষ গুণ বা অধিকারগত মর্যাদা। শুধু তাই নয়, বৈদিক সাহিত্যে গণপতির একটি বহু-নির্দেশক চরিত্র আছে। সেই পারম্পরিক প্রবাহ ধরেই শ্রুতির স্তর থেকে পুরাণের স্তরে গণপতি সত্তার বিবর্তন ঘটেছিল। প্রথম স্তরের ঋকসূক্তে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি গণপতি-নামা, পরে যজুর্বেদের স্তরে ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে রুদ্র বা মরুদ্‌গণের অধিপতি রূপে রুদ্র-শিব গণপতির পরিচয় লাভ করেছেন। এইসব তথাকথিত 'গণপতি' পরিচয়বাহী দেববৃন্দের বাইরেও ঋগ্‌বেদোক্ত আদিদেবতা অগ্নির বৈশিষ্ট্যাদি কীভাবে উত্তরকালীন পৌরাণিক গণেশের চরিত্র কল্পনায় অন্তঃশীল থেকেছে, তার প্রমাণ আগের অংশের আলোচনাতেই পাওয়া গেছে। অতএব সামগ্রিক পরিচয়ে পৌরাণিক গণেশ এমন এক মিশ্রসত্ত্ব দেবতা, যিনি বৈদিক গণপতি-তত্ত্বের পারম্পরিক উত্তরাধিকারের ফলস্বরূপ। প্রথম পূজ্যের মর্যাদায় তিনি শ্রুতির অগ্নির স্থানাধিকারী। অগ্নিরূপে একাধারে তিনি যজ্ঞপতি, অন্নপতি এবং ব্রতপতি। গাত্রবর্ণ, শত্রুনাশ, জীবগণের অধিপতি রূপে অগ্নির সমধর্মা। এমনকি খাদ্যাসক্তির কারণেও অগ্নিতুল্য। ঘৃতপ্রিয় অগ্নির সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট হয়েই গণেশ মোদকপ্রিয়। অগ্নিপত্নী স্বাহা ও স্বধার সামঞ্জস্যে পৌরাণিক গণেশও ঋদ্ধি ও সিদ্ধিপতি। আবার, জ্যেষ্ঠরাজ বৃহস্পতির সূত্রে তিনি কলাবিদ্যার শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ, জ্ঞানাধীশ, মন্ত্রপতি এবং কবিকুলশীর্ষ। তবে বৌদ্ধিক উৎকর্ষ বা মেধাগত গুণপনাতেই নয়, শত্রুনাশ এবং অমঙ্গল দূরকারী রূপেও পৌরাণিক গণেশের মধ্যে বৃহস্পতির গুণাবলীর সঞ্চরণ ঘটেছিল। গণাধিপতির পদমর্যাদায় তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। বল-বিক্রম ছাড়াও মেঘ-বৃষ্টি-বজ্রের দেবতা রূপে ইন্দ্রের ভূমিকা জলতত্ত্ব-প্রধান গণেশে সংশ্লেষিত হয়েছে। তা ছাড়া হস্তীমূর্তির সূত্রে rain charm-এর প্রসঙ্গটি পৌরাণিক গণপতি সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। মেঘ, বৃষ্টিপাত এবং পরিণামে শস্যপ্রাচুর্য---- এর সূত্র ধরেও ইন্দ্রের গুণাবলী শস্যদেবতা গণেশে(হস্তধৃত ইক্ষুদণ্ড বা মূলক জাতীয় আয়ুধের সাযুজ্যে গণেশ শস্যদেবতা রূপে কল্পিত) সংক্রমিত হয়েছে। তেজস্বিতায় গণেশ মরুদ্‌গণের অধিপতি রুদ্র-শিবের সমানধর্মা। প্রথমাবস্থায় ধ্বংসমূলক, পরে সৃষ্টি-সম্ভাবনাপূর্ণ---- গণপতির চরিত্রমূলে এই দুই

আপাত বিপরীতধর্মী অথচ গভীর সম্পর্কযুক্ত প্রবণতার অধিষ্ঠান। বিঘ্নকর্তা থেকে বিঘ্নহর্তায় উত্তরণের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যের প্রভাব স্পষ্ট। এ ছাড়া প্রাক-পৌরাণিক গণেশ বা গণপতি রূপে রুদ্র-শিবই পৌরাণিক গজমূর্তি গণেশে প্রবিষ্ট হয়েছে। পুরাণের গণেশ তো শিবপুত্র রূপে শৈবগণের-ই অধিপতি। কেবল অধিকারের ক্ষেত্র এক দেবতা থেকে আরেক দেবতায় স্থানান্তরিত হয়েছে মাত্র। প্রকারান্তরে গণেশ শিবেরই দ্বিতীয় মূর্তি। এইভাবে পৌরাণিক গণপতি-গণেশ বৈদিক গণপতিসমূহের সমষ্টিভূত এক সত্তা হিসেবে বেদোত্তর ধর্ম-সংস্কৃতির অন্দরে আসনলাভ করেছেন। গুণে ও স্বভাবে এতদূর মিশ্রিত হয়েও হস্তীরূপের বৈশিষ্ট্যগত নতুনত্বে তিনি স্বতন্ত্রস্থানীয়।

দ্বিতীয়ত, গণপতির বৈদিক ঐতিহ্যের সমান্তরালে আরেকটি পূর্বকালীন ধারা ছিল। এই প্রাগার্য বা অ-বৈদিক পরিসরের সঙ্গে কেউ কেউ 'বিনায়ক'-এর সম্বন্ধ কল্পনা করেছেন। যদিও উত্তর-বৈদিক কল্পসূত্রের অন্তর্গত গৃহ্যসূত্রের স্তরেই বিনায়ক-তত্ত্বের প্রাথমিক অবতারণা। কার্যত বিনায়ক-তত্ত্বের মধ্যে malevolence বনাম benevolence-এর প্রচ্ছন্ন দ্বৈরথের সূত্র ধরেই এমন মনে হওয়া সম্ভব। প্রাক-সভ্যতা পর্বে মানুষ যেমন প্রকৃতির অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারের হাত থেকে রেহাই পেতে একধরনের ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিষয়ের কু-প্রভাবগুলিকে নির্মঞ্ছিত করে ভারসাম্য তৈরির চেষ্টা করত, সেই জাতীয় ভাবনা বিনায়ক-তত্ত্বের গভীরেও রয়ে গেছে। এই দৃষ্টিতে বিনায়কের ধারণা প্রাক-বৈদিক ঐতিহ্যের অংশবিশেষ, যা রুদ্র-শিবের অস্তিত্ব-মূলের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

তৃতীয়ত, গণেশের পরিচয়-নির্মাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানক যে 'হস্তীমুণ্ড', তার সঙ্গে প্রাক-বৈদিক theriomorphic ঐতিহ্যের সংযোগ স্পষ্ট। তবে বিনায়কের 'বিঘ্নকারী' বনাম 'বিঘ্ননাশী' ভূমিকার মধ্যে নেতি থেকে ইতির অভিমুখে যাওয়ার যে অন্তর্গূঢ় প্রবণতা আছে, প্রাগার্য theriomorphic ঐতিহ্যের মধ্যে হয়তো তেমন কোনও ইঙ্গিত নেই। বরং এর ভিত্তিতে আছে সদর্থক ধারণা। পশুদেবতার এই ধারণা প্রাক-সভ্যতা পর্বের বিনায়কের ধারণার অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালীন মনে হয়। কারণ, ততদিনে মানুষ ষাঁড়, হাতি প্রভৃতি পশুদের গৃহপালিত পশু হিসেবে দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ রূপে গ্রহণ করেছে, পারিবারিক ও পেশাগত প্রয়োজনে তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, এমনকি টোটেম বা কুলপ্রতীক রূপে তারা বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যেও গৃহীত হয়েছে। প্রাক-বৈদিক পশুপতি রুদ্র-বিনায়কের ধারণার সঙ্গে পশুদেবতার এই ঐতিহ্য হয়তো কোনও এক বিন্দুতে সমন্বিত হয়েছিল।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বর্তমান গজানন গণেশের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিকাশের মূলে অন্তত তিনটি পরস্পর-পৃথক ঐতিহ্য কাজ করেছে। প্রথম স্তরে বৈদিক 'গণপতি' শীর্ষক ধারণা এবং সূত্র-সাহিত্যের অন্তর্গত 'বিনায়ক' বিষয়ক ধারণা দুটি পৃথক রেখায় বিকাশলাভ করেছিল। এই দুটি শাখার প্রথম মিলন ঘটল যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির স্তরে, খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে। এখান থেকেই কার্যত রুদ্র ও ব্রহ্মার দ্বারা বহু বিনায়কের এক গণাধিপতিতে রূপান্তর। বিঘ্নকর্তার বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিনায়কের গণাধিপতি রূপে বিঘ্নহর্তার অভিমুখে যাত্রা শুরু। এই পর্যন্ত গণপতি বা বিনায়কের সঙ্গে হস্তীদেহ বা গজাননের কোনও সংস্রব ঘটেনি। হস্তীমূর্তির সংযোগ হিসেবে তৃতীয় আরেকটি মাত্রা এর সঙ্গে যুক্ত হল। প্রাগার্য সংস্কৃতি চুঁইয়ে আসা হস্তীদেবতার ধারণা উত্তর-বৈদিক সাহিত্যে বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। এই হস্তীমুখ দেবতারা স্মৃতিধৃত গণপতি-বিনায়কের ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুখ্যত পুরাণ সংকলনের পর্বে গজানন গণপতি-বিনায়ক রূপে এক প্রথম পূজ্য দেবতার উদ্ভব ঘটায়। কাজেই, বর্তমান হস্তীমুখ গণেশকে আদ্যোপান্ত পৌরাণিক দেবতা মনে করাই সমীচীন। তাঁর উৎসমূলে প্রাক-বৈদিক এবং বৈদিক ঐতিহ্যের সমাপতন ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে তিনি গজমুখ, বক্রতুণ্ড, একদন্ত রূপে গণপতি-বিনায়কের পূর্ণাবয়বে প্রতিষ্ঠিত। তখন থেকেই পৌরাণিক হস্তীমুখ গণেশ বিশেষভাবে সিদ্ধিদাতা বিঘ্নহারী। গজবদন, বাঁকা শুঁড় ও একদন্তের সূত্রে গণেশ উদ্ভবমূলে প্রাগার্য ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত, যা উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রাচীন হস্তী উপাসনা এবং হস্তীদেবতার পূজন ঐতিহ্যের চিহ্ন বহন করছে। হস্তীর পবিত্রতা অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি পর্বতের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। পৌরাণিক আখ্যানে শিব-পার্বতীর সঙ্গে গজমুখ গণেশের সম্বন্ধ কল্পনার মূলে এর প্রভাব থাকতে পারে। অন্যদিকে, হস্তীমুখ দেবতার গণপতির পরিচয়লাভ বৈদিক ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি। গুণ, বৈশিষ্ট্য ও কার্যধারার সূত্রে বর্তমান গণেশ বেদোক্ত গণপতিদের উত্তরাধিকারী। তবে উৎসগত ভিন্নতা যাই থাকুক, গজানন গণপতি যে সর্বার্থেই পৌরাণিক দেবতা, অন্তত সেই পরিচয়েই যে তিনি সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে জনপ্রিয় হয়েছেন, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় গণপতি গণেশের বিবর্তন এবং দেবত্বের উদ্ভব সংক্রান্ত আলোচনাটিকে একটি রেখাচিত্রের আকারে প্রদর্শন করা হয়েছে।]

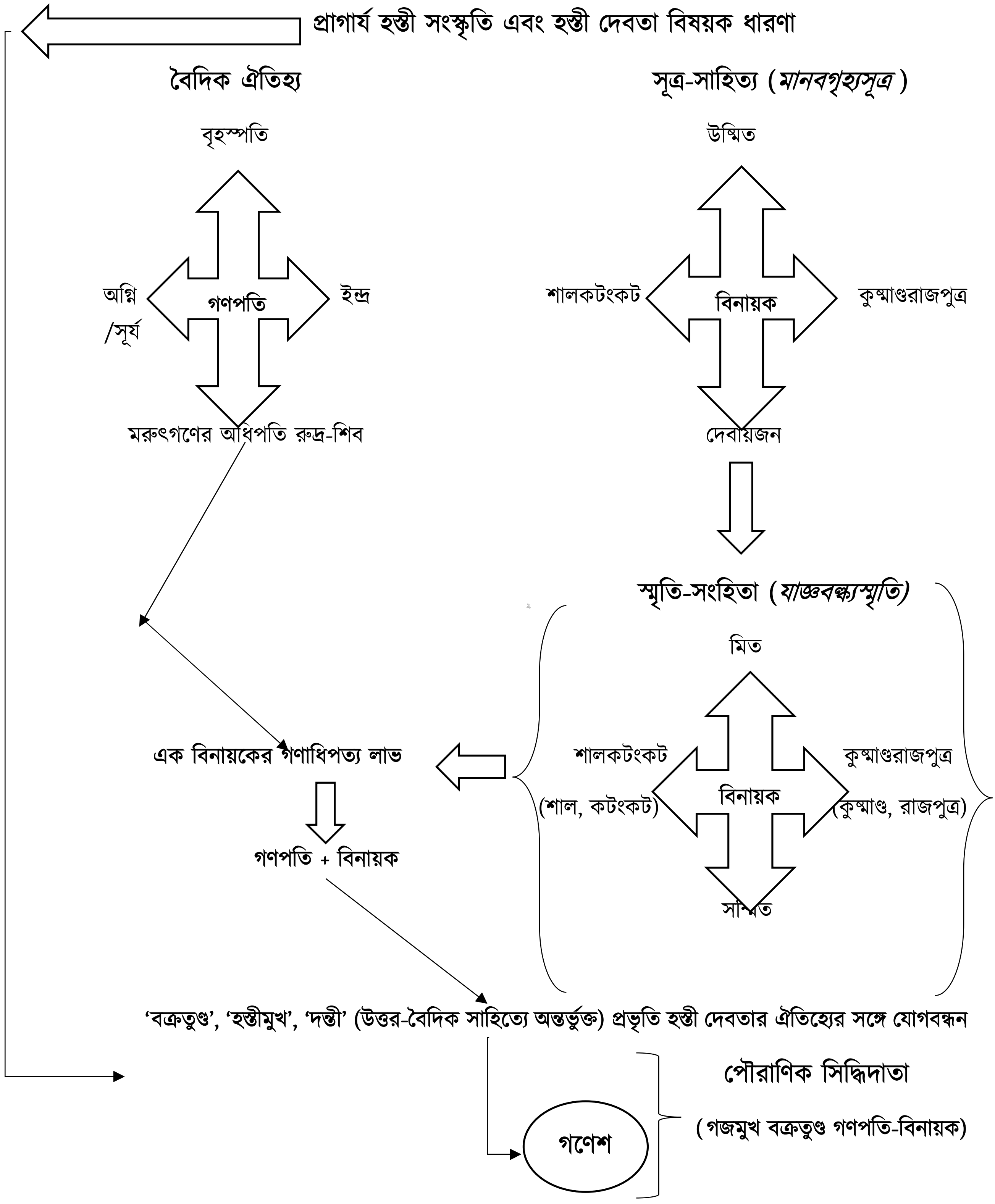

রেখাচিত্র # গণেশ: বিবর্তন এবং দেবত্বের উদ্ভব

উল্লেখসূচি :

১। *The Vajasaneyi-Samhita in the Madhyandina and the Kanva-Sakha with the Commentary of Mahidhara* (16. 25). Edited by Weber, Albrecht. The Chowkhamba Sanskrit Seris Office, 1972, p. 499; *যজুর্বেদ সংহিতা,* "শুক্লযজুর্বেদ-সংহিতা" (১৬। ২৫), "কৃষ্ণযজুর্বেদ-সংহিতা" (৪। ৫। ৪। ১), বিজনবিহারী গোস্বামী অনূদিত ও সম্পাদিত, হরফ, অক্টোবর ১৯৬০, পৃ. ১২০, ৫৭০

২। Krishan, Yuvraj. "Is Ganesa a Vedic God?". *Ganesa: Unravelling an Enigma.* MLBD, 1999, p. 11

৩। Ibid., p. 11

৪। প্রাগুক্ত, *যজুর্বেদ সংহিতা,* "শুক্লযজুর্বেদ-সংহিতা" (১৬। ২৫), পৃ. ১২০

৫। *ঋগ্বেদ সংহিতা* ('প্রথমোহষ্টক', ২। ২৩। ১), রমেশচন্দ্র দত্ত প্রকাশিত, কলকাতা: ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৯২ ব., পৃ. ১৬৫

৬। ওই, পৃ. ১৬৫

৭। যাস্ক, *নিরুক্ত,* চতুর্থ খণ্ড (১০। ১২। ৫), অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫, পৃ. ১১০০

৮। *ঋগ্বেদ সংহিতা* (১। ৪০। ২, ২। ১। ৩, ২। ২৪। ৯, ৪। ৫০। ৮), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭, ১৪৯, ১৬৮, ২৬৮

৯। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* (৪। ৪। ১), হরি নারায়ণ আপটে ও কাশীনাথ শাস্ত্রী আগাশে সম্পাদিত, আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৮৯৬, পৃ. ৮৭

১০। *কৌষীতকী-ব্রাহ্মণ* : ৮। ৫। ৭। ১-৩ ; *সাংখ্যায়ন-ব্রাহ্মণ* : ৮। ৫

১১। *স্কন্দপুরাণ* : কাশীখণ্ড ৫৭। ১০২

১২। প্রাগুক্ত, *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (৪। ৫০। ৫), পৃ. ২৬৮

১৩। *ঋগ্বেদ সংহিতা,* দ্বিতীয় খণ্ড (১০। ১৮২। ১), রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ অবলম্বনে, হরফ প্রকাশনী, ১৩৫৮ ব., পৃ. ৬৫৮

১৪। *কাঠক সংহিতা* : ১০। ১২। ৪৪

১৫। *তৈত্তিরীয়-সংহিতা* : ২। ৩। ১৪। ৩

১৬। প্রাগুক্ত, *ঋগ্বেদ সংহিতা,* দ্বিতীয় খণ্ড (১০। ১১২। ৯), পৃ. ৬০৬

১৭। *বৃহদ্দেবতা* : ১। ১২১, ১। ১২৭

১৮। প্রাগুক্ত, *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (১। ১০০। ৫), পৃ. ৭০

১৯। ওই, অনুবাদ - রমেশচন্দ্র দত্ত।

২০। *মাধ্যন্দিন-সংহিতা* : ২৩। ১৯; *কাণ্ব-সংহিতা* : ২৫। ২১-২২; *মৈত্রায়ণী সংহিতা* : ৩। ১২। ২০

২১। ওই, অনুবাদ - রমেশচন্দ্র দত্ত

২২। *শতপথ-ব্রাহ্মণ* : ১৩। ২, ৮। ৪

২৩। *বাজসনেয়ী-সংহিতা* (১১। ১৫); *তৈত্তিরীয়-সংহিতা* (৪। ১। ২। ২)

২৪। *ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ* : ১। ২১

২৫। *তৈত্তিরীয়-সংহিতা* : ৩। ৪। ৫। ১

২৬। *বৃহদ্দেবতা* : ৫। ৪৭

২৭। প্রাগুক্ত, *ঋগ্বেদ সংহিতা* (১। ৩৯। ৪-৭, ১। ৬৪। ২, ২। ৩৪। ১৩), পৃ. ২৬, ৪৫, ১৭৬

২৮। Banerjee, J. N. *Development on Hindu Iconography.* University of Calcutta, 1956, pp. 137-138

২৯। প্রাগুক্ত, *ঋগ্বেদ সংহিতা* (১। ৬৪। ১১), পৃ. ৪৬

৩০। ওই (১। ৬৪। ১১, ৫। ৫২। ৯), পৃ. ৪৬, ৩০৮

৩১। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, "রুদ্রগণ ও গণেশ", *হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* (দ্বিতীয় পর্ব), ফার্মা কেএলএম (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৯৬০, পৃ. ১৬১

৩২। প্রাগুক্ত, Krishan, Yuvraj. p. 15

৩৩। *কৌষীতকী-ব্রাহ্মণ* : ৩। ৬। ৫। ৫; *শতপথ-ব্রাহ্মণ* : ৭। ১। ২৪

৩৪। প্রাগুক্ত, *নিরুক্ত*, তৃতীয় খণ্ড (৭। ১৮। ২), পৃ. ৮৯৯

৩৫। *সাংখ্যায়ন-ব্রাহ্মণ* : নবম অধ্যায়

৩৬। *পুরাণকোষ* (প্রথম খণ্ড), "অগ্নি", নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ডিসেম্বর ২০১৭, পৃ. ৩৭

৩৭। প্রাগুক্ত, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, "অগ্নি", পৃ. ৮৬

৩৮। *বৃহদ্দেবতা* : ২। ২৪

৩৯। 'অগ্নির্দেবানাং জঠরম্', *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* (২। ৭। ১২। ৩), হরি নারায়ণ আপটে সম্পাদিত, পুণা আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৮৯৮, পৃ. ৭২৯

৪০। Macdonell, A. A. *A Vedic Reader for Students.* Motilal Banarasidass, 2001, p. 2

৪১। *পারস্কর গৃহ্যসূত্র* : ৫। ১০

৪২। প্রাগুক্ত, "কৃষ্ণযজুর্বেদ" (৩। ৩। ৪। ৫), পৃ.

৪৩। প্রাগুক্ত, *ঋগ্বেদ সংহিতা*, দ্বিতীয় খণ্ড (১০। ৮৭। ২), পৃ. ৫৬২

৪৪। *পুরোহিত দর্পণ* (প্রথম খণ্ড), সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, অবসর কার্যালয় (হরিদাস শেঠ কর্তৃক প্রকাশিত), ১৩৪০ ব., পৃ. ৫৩

৪৫। *নারসিংহপুরাণ*, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২৫ ব., পৃ. ৮২

৪৬। প্রাগুক্ত, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* (প্রথম পর্ব), পৃ. ৯০।

৪৭। *শারদাতিলকতন্ত্র* (১৪। ৮৯), পঞ্চানন শাস্ত্রী অনুদিত ও সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, আষাঢ় ১৪১৮ ব., পৃ. ৩৮৮

৪৮। হরিহরানন্দ ভারতী, *মহানির্বাণতন্ত্র* (৯। ২১), জগন্মোহন তর্কালঙ্কার অনুদিত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, কার্তিক ১৪০৯ ব., পৃ. ৪২০

৪৯। *তন্ত্ররাজতন্ত্র* : ৪৬। ৬।

৫০। *প্রপঞ্চসারতন্ত্র* : ১৬। ২৮।

৫১। প্রাগুক্ত, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* (প্রথম পর্ব), পৃ. ৯০

৫২। *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ* অনুসারে পার্বতী শিবের ঔরসে সন্তান ধারণের ইচ্ছাপ্রকাশ করলে শিব যুক্তিজাল বিস্তার করে পার্বতীর সংগম-বাসনা নিবৃত্ত করেছেন। পরে শিব পার্বতীর রক্তবর্ণ বস্ত্রকে ('মদীয়বসনঞ্চেদংরক্তবর্ণংমহেশ্বর') পুত্রজ্ঞানে চুম্বন করতে বললে সেই রক্তবস্ত্র থেকেই গণেশের আবির্ভাব ঘটে। *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ* (মধ্যখণ্ড, 'গণেশ জন্ম বিবরণ'), পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ. ২৮১-২৮২।

৫৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

৫৪। রাজানক জয়রথ, 'অষ্টাদশ প্রকাশ', *হরচরিতচিন্তামণি*, শিবদত্ত ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্ পরব, ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, ১৯৮৩, পৃ. ১৬৫-১৬৬

৫৫। প্রাগুক্ত, *ঋগ্বেদ সংহিতা* (১। ৭০। ২), পৃ. ৪৯

৫৬। *শুক্লযজুর্বেদ* : ১১। ৪৬

৫৭। *অথর্ববেদ* (১৯। ১। ৩। ২) বিজনবিহারী গোস্বামী, অনূদিত ও সম্পাদিত, হরফ, ১৩৫৮ ব., পৃ. ৫০৬

৫৮। তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২। ১। ১

৫৯। সচ্চিদানন্দ সরস্বতী, *পূজা-প্রদীপ*, সৌম্যানন্দ নাথ সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০ ব., পৃ. ১৫৪

৬০। মোঃ মোশারফ হোসেন, 'অগ্নি', *হিন্দু জৈন বৌদ্ধ মূর্তিতাত্ত্বিক বিবরণ (পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ)*, দিব্যপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১১৬

৬১। Desai, Devangana. "Sculptural Representation on the Lakshmana Temple of Khajuraho in the light of Prabodhachandrodaya". www.sahapedia.org, November 29, 2018, p. 105, accessed on 21. 8. 2020

৬২। প্রাগুক্ত, *পুরাণকোষ*, পৃ. ৩৭

৬৩। ওই, পৃ. ৩৮

৬৪। ওই, পৃ. ৩৮

৬৫। নির্মলানন্দ, "অগ্নি" (সপ্তম অধ্যায়), *দেবদেবী ও তাঁদের বাহন*, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ১৪২৪ ব., পৃ. ১১১

৬৬। ওই, পৃ. ১১১

৬৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৬৮। প্রাগুক্ত, নির্মলানন্দ, পৃ. ১১১

৬৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৭০। "A figure like Agni enables us to understand the many-sided, inconsistent presentment of Shiva and Vishnu in later times. ... Even a deity like Ganesa who seems at first sight modern and definite illustrates these ancient characteristics."

Eliot, Charles. *Hinduism and Buddhism : An Historical Sketch* (Vol. I). Routledge & Kegan Paul Ltd., 1962, p. 58

৭১। Monier-Williams, *Dictionary*, p. 971

৭২। ঐ, 971-72. এই দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে একজন আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা বা গুরু হিসেবে বুদ্ধ-ও বিনায়ক পদবাচ্য হতে পারেন।

৭৩। Monier-Williams, *Dictionary*, p. 971

৭৪। *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*-র বিশ্বরূপাচার্যের 'বালক্রীড়া' শীর্ষক ভাষ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : *The Yajnavalkyasmriti with the commentary of Visvarupacharya.* Edited by Sastri, T. Ganapati. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1982, p. 174

৭৫। মনিয়্যের উইলিয়ামের অভিধানে এই ধরনের শব্দার্থ-নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু উপসর্গের ওপর ভিত্তি করে অর্থের এইরূপ পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়।

৭৬। বিনায়কগণ উৎসগতভাবে নঞর্থক শক্তিসম্পন্ন হলেও এবং এদের সঙ্গে পুরাণ পর্বের গজানন গণেশের প্রকৃতিগত দূরত্ব থাকলেও বিঘ্নকারী বিনায়করাই যে বিবর্তনের ধারা বাহিত হয়ে পৌরাণিক বিঘ্নহর্তা গণেশে পূর্ণ পরিণতিলাভ করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহে নেই। কাজেই, পৌরাণিক গণেশের মধ্যে সূত্র-সাহিত্যের বিনায়কদের একটা মুখবন্ধ রয়ে গেছে।

৭৭। Krishan, Y. “Vinayaka as Vighnakarta (Causer of Obstacles) in the Manavagrhyasutra and Yajnavalkyasmriti: A Comparative Study”. op. cit., p. 25

৭৮। Thapan, Anita Raina. *Understanding Ganapati: Insights into the Dyanamics of A Cult.* Manohar Publishers & Distributers, 1997, pp. 86-91

উদ্দিষ্ট গ্রন্থে গবেষক চারজন বিনায়কের সঙ্গে সম্পর্কিত উপজাতি গোষ্ঠী এবং এদের সঙ্গে হস্তী সত্তার সম্পর্কজনিত ধারাগুলি বিশ্লেষণ করেছেন।

৭৯। বিশিষ্ট গবেষক Jan Gonda তাঁর গ্রন্থের 'The Grhyasutras' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, 'The main representatives of this school have been the Modha(ka) brahmins who, residing in the regions between Gujrat and Benaras, were active ritualists far into the 16^{th} century.' Jan Gonda (ed.). *A History of Indian Literature: The Ritual Sutras* (Vol. I). Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1977, p. 600

৮০। *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*, 'আচারাধ্যায়', ১। ১১। ২৭০। মূল সহ বঙ্গানুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য: পঞ্চানন তর্করত্ন (সংকলিত ও অনূদিত), 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা', *ঊনবিংশতি সংহিতা*, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা: সদেশ,

২০১৮, পৃ. ১৬২। প্রচলিত পাঠে ব্রহ্মা এবং রুদ্রের দ্বারা বিনায়কের গণাধিপত্য স্বীকৃত হলেও 'মিতাক্ষরা'-র ভাষ্যে রুদ্র ও ব্রহ্মার সঙ্গে বিষ্ণুর নামও সমভাবে উল্লিখিত। প্রসঙ্গত, *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*-র 'আচারাধ্যায়'-এর অন্তর্গত 'গণপতিকল্পপ্রকরণ' শীর্ষক একাদশ অধ্যায়ের ২৭০ নং শ্লোকের ভাষ্য লক্ষণীয়: "বিনায়কো বিঘ্নেশ্বরঃ পুরুষার্থসাধনানাং কর্মণাং বিঘ্নসিদ্ধয়র্থং স্বরূপফলসাধনত্ববিধাতসিদ্ধয়ে বিনিয়োজিতঃ নিযুক্তঃ রুদ্রেণ ব্রহ্মণাং--চকারাদ্বিষ্ণুনা চ..."। S. S. Setlur (ed.). *The Mitakshara with Visvarupa and commentaries of Subodhini and Balambhatti.* Madras: Brahmavadin Press, Georgetown, 1912, p. 180.

৮১। *বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ* : ২। ১০৫। ১৫

৮২। *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*, 'আচারাধ্যায়', ১। ১১। ২৭৪-২৭৫

৮৩। *মানবগৃহ্যসূত্র* : ২। ১৪। ১৯

৮৪। *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*-র 'আচারাধ্যায়'-এর অন্তর্গত 'গণপতিকল্পপ্রকরণ'-এর ২৮৯ নং শ্লোকের 'মিতাক্ষরা' ভাষ্যে *তৈত্তিরীয় আরণ্যক*-এ প্রাপ্ত "তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াত্।" শীর্ষক মন্ত্রের সমর্থনে বিনায়ক এবং গজানন গণেশের সমত্ববিধান করা হয়েছে। বিজ্ঞানেশ্বর প্রাক-দ্বাদশ শতকীয় ব্যাখ্যাকার হওয়ায় তাঁর ভাষ্যে এই ধরনের একত্ব প্রতিষ্ঠা স্বাভাবিক। কারণ, ততদিনে পৌরাণিক হস্তীমুখ গণেশের সঙ্গে স্মৃতি-সংহিতার বিনায়কের অভিন্নত্ব স্বীকৃত হয়ে গেছে। গজমুখ গণেশ ও বিনায়ক এই পর্যায়ে একই সত্তায় উপস্থিত। S. S. Setlur (ed.), প্রাগুক্ত, p. 185

৮৫। R. G. Bhandarkar. *Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems.* Varanasi: Indological Book House, 1965, p. 148. ভাণ্ডারকরের এই সিদ্ধান্তের দ্বারা পরবর্তী সময়ে অন্যান্য গবেষকরাও চালিত হয়েছেন। যেমন, Alice Getty (প্রাগুক্ত, p. 3), J. N. Banerjea (প্রাগুক্ত, 1956, p. 355 এবং *Pauranic and Tantric Religion.* Calcutta: University of Calcutta, 1966, p. 152) প্রমুখ।

৮৬। *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*-র টীকাকার বিশ্বরূপাচার্যের ভাষ্যের সমর্থনে গবেষক A. k. Narain এই সিদ্ধান্ত করেছেন, 'In fact, the commentary of Visvarupacharya equates Ambika with either Buddhi (i.e., wife of Vinayaka-Ganesa) or Rudrapatni, but not as mother of Vinayaka.' A. K. Narain. 'Ganesa: A Protohistory of the Idea and the Icon'. *Ganesa: Studies of an Asian God.* Delhi:

Sri Satguru Publications, 1997, p. 23. *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি* : ১। ১১। ২৮৫। টীকাকার বিশ্বরূপাচার্য বিনায়ক-জননী রূপে অম্বিকাকে স্বীকৃতি দেননি, বরং তিনি অম্বিকাকে গণেশ পত্নী বুদ্ধি অথবা রুদ্রপত্নীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেছেন। T. Ganapati Sastri (ed.), প্রাগুক্ত, p. 178

৮৭। *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*, 'আচারাধ্যায়' (১। ১১। ২৯৩); পঞ্চানন তর্করত্ন (সংকলিত ও অনূদিত), 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা', *ঊনবিংশতি সংহিতা*, অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৮৮। ঐ, ১। ১১। ২৯০। 'মিতাক্ষরা'-র ভাষ্যে বলা হয়েছে - 'বিনায়কোপস্থানে ভগবন্নিত্যূহঃ' [S. S. Setlur(ed.), প্রাগুক্ত, p. 185.] অর্থাৎ, 'গণেশের নিকট প্রার্থনাকালে "ভগবতী"র পরিবর্তে "ভগবন" বলিতে হইবে।' অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), ওই, পৃ. ১৬৪

৮৯। Y. Krishan, প্রাগুক্ত, p. 27

৯০। প্রাগুক্ত, A. K. Narain, p. 23

৯১। *রামায়ণ*, উত্তরকাণ্ড, ২৭। ৩৮

৯২। ওই, ২৭। ৪২

৯৩। *মহাভারত* (খণ্ড ১৬)। ১২, পরিশিষ্ট ১, নং ২৮, শ্লোকসমূহ ১৫০-৪৩৫

৯৪। ওই, বনপর্ব, ৩৯। ৭৯

৯৫। Y. Krishan, প্রাগুক্ত, p. 30

৯৬। *মহাভারত* (খণ্ড ১৭), দ্বিতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট ১। ১৮, শ্লোকসমূহ ৫৩-৫৪

৯৭। Monier-Williams, *Dictionary*, p. 343

৯৮। মহাভারত (খণ্ড ১৬), পরিশিষ্ট ১, নং ২৮, শ্লোক ৪২০

৯৯। "The... references in Vanaparva 65.23 and Anusasana 150.25 bear affinity to the description of Vinayaka in the Manavagrihya." Kane, P. V. *History of Dharmasastra* (Vol. II, Pt. I). Poona: BORI, 1974, p. 218

১০০। *মহাভারত*, অরণ্যপর্ব, খণ্ড ৩, দ্বিতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট ১। ১১। ৫৪

১০১। ঐ, বিরাটপর্ব, খণ্ড ৫, পৃ. ৩, পাদটীকা ১। ঐ, উদ্যোগপর্ব, খণ্ড ৬, পৃ. ৩, পাদটীকা ১

১০২। *মহাভারত*, খণ্ড ১, আদিপর্ব, পরিশিষ্ট ১। ১, শ্লোকসংখ্যা ৫-১৫, পৃ. ৮৮৪

১০৩। Y. Krishan. 'Vinayaka and Ganesa in the Mahabharata'. প্রাগুক্ত, p. 29

১০৪। Bailey, Greg. *The Mythology of Brahma*. OUP, 1983, p. 117, fn. 44

১০৫। Winternitz, M. 'Ganesa in the Mahabharata'. *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*. Cambridge University Press, 1898, p. 382

১০৬। Haridas Mitra, *Ganapati*, Shantiniketan: Vishvabharati, 1959, p. 5-10, 19

১০৭। *মৈত্রায়ণী সংহিতা* : ২। ৯। ১

১০৮। *তৈত্তিরীয় আরণ্যক* (২। ১০। ১। ২৫), বিনায়ক গণেশ আপটে সম্পাদিত, আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯২৭, পৃ. ৬৯৯

১০৯। *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* : ২। ৯। ৭। যদিও পি. ভি. কানে (*History of Dharmasastra*, Vol. II, Pt. 7, p. 214) এই উল্লেখটিকে পরবর্তীকালীন প্রক্ষেপ বলে গণ্য করেছেন।

১১০। *বোধায়ন গৃহ্যপরিশেষসূত্র* : ৩। ১০

১১১। *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* ('দেব-তর্পণ', ২। ৫। ৮৩-৯০) এবং *বোধায়ন গৃহ্যসূত্র* (৩। ১০)-এর তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে আর. সি. হাজরা মন্তব্য করেছেন, 'These portions of the two works are of doubtful authenticity.' R. C. Hazra. 'Ganapati-Worship, and the Upapuranas dealing with it'. *Journal of the Ganganath Jha Reasearch Institute*. Allahabad: Ganganath Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Vol. V, Pt. 4, August 1948, p. 271

১১২। পাণিনি সূত্রের (৬। ৩। ২৬) দ্বিতীয় বার্ত্তিকের ভাষ্য রচনার সময় পতঞ্জলি *মহাভাষ্য*-এ বৈদিক এবং লৌকিক দেবতাদের দুটি পৃথক শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। দ্রষ্টব্য: Banerjee, J. N. op. cit., 1956, p. 337

দ্বিতীয় অধ্যায়

সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে গণপতি-গণেশের ক্রমবিকাশ

২.১

ভারতীয় পুরাণকথায় গণপতি প্রসঙ্গ :

ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে প্রচলিত হস্তীমুখ গণেশের ভাবনাবীজ বা আবির্ভাবের আদিসূত্র বেদের অনেকান্ত 'গণপতি', কল্পসূত্রান্তর্গত বহু 'বিনায়ক'-এর ধারণা এবং প্রাক-বৈদিক উপজাতীয় ধর্মভাবনা বা হস্তী সংস্কৃতির ঐতিহ্য বেয়ে এলেও সাহিত্যিক প্রমাণের নিরিখে আজকের গজমুখ গণেশের সাকার রূপায়ণ ঘটে মূলত পুরাণ সংকলনের পর্বে। আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে ধারাবাহিকভাবে পৌরাণিক আখ্যানে গজানন গণেশ পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ে প্রকটিত হন। একই সময়ে বা এর কিছুটা আগে থেকেই মূর্তিশিল্প বা স্থাপত্য-ভাস্কর্যে গজমুখ গণেশের সাবয়বতা স্পষ্ট হতে থাকে। প্রাক-পৌরাণিক উৎসগুলির মধ্যে গণপতি গণেশের তত্ত্বভাবনা বীজাকারে ছিল ঠিকই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্য থেকে আসা সূত্রগুলিকে সংশ্লেষিত করে একটি নির্দিষ্ট আকারে বিশেষ এক দেবতার রূপকল্পনা এই পর্বের পৌরাণিক সাহিত্যেই প্রথম উদ্‌ভাসিত হয়। চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে আরও বহু শতাব্দীর পুরাণকথার আশ্রয়ে ভারতীয় ধর্মমানসে গণপতি গণেশের পরিচয় ও চরিত্র দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে। আগের অধ্যায়েই দেখানো হয়েছে, পুরাণ সংকলনের অব্যবহিত পূর্বে *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*-র স্তরে কীভাবে কর্মবিঘ্নসিদ্ধির জন্য নিয়োজিত 'বহু' বিনায়কের মধ্যে থেকে 'এক' গণাধিপতির নির্মাণ ঘটেছে। এর পাশাপাশি শুদ্ধিস্নানের মাধ্যমে তখন থেকেই বিনায়কদের অপশক্তির ধারণা ক্রমশ পালটে গিয়ে benevolent পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে স্মৃতি-সংহিতায় গ্রহণে-বর্জনে এইভাবে দানা বাঁধতে থাকে এক সদর্থক শক্তিসম্পন্ন 'গণপতি-বিনায়ক'-এর ধারণা। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ভাষ্যে মতান্তরে ইনি অম্বিকাপুত্র-ও বটে। কার্যত এই স্মৃতি-ধৃত সূত্রেরই পূর্ণস্ফূর্তি ঘটে পুরাণ-পরম্পরায়। স্মৃতির গণপতি-বিনায়ক কীভাবে গজমুখ হল---প্রধানত এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্রে রেখেই তৈরি হল যাবতীয় পৌরাণিক আখ্যান, যেখানে পূর্ববর্তী সূত্রগুলি সম্প্রসারিত হয়ে প্রথমপূজ্য এবং বিঘ্নহর্তা হিসেবে এক স্বতন্ত্র দেবতার আবির্ভাব সম্পূর্ণ হল। মূলত শিব বা শক্তির সঙ্গে সমন্বিত হয়ে পৌরাণিক স্তরে গণেশ এক পরিবারিক চালচিত্রের অন্তর্গত হয়। শিব-পার্বতীর পুত্ররূপে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ভারতব্যাপী ক্রমশ স্বীকৃত হতে থাকে। পুরাণ-পূর্ব কালে শিব এবং গণেশ অখণ্ড সত্তায় বিদিত। মহাভারতাদি গ্রন্থে শিবগণের 'প্রধান' রূপে গণেশ শিবেরই বিকল্পনাম। এই গণেশ-শিবের ধারণা ক্রমশ ভেঙে গিয়ে পুরাণমণ্ডলে এক-একটি আখ্যানের সূত্রে গজমুখ গণেশ নতুন একটি দেবপরিচয়ে এবং ভূমিকায় ব্যাখ্যাত হতে থাকে। আখ্যানে ক্রমশ তাঁর সঙ্গে শিব, পার্বতী, বিষ্ণু, গঙ্গা প্রমুখের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই পর্বেই 'সিদ্ধিদাতা'

এবং ‘বিঘ্নবিনাশক’ রূপে তাঁর জয়যাত্রার সূচনা। বৈদিক সাহিত্যে অথবা মহাভারত-এর অংশবিশেষে গণপতি, গণেশ বা বিনায়কের উল্লেখমাত্র ঘটলেও তাঁর জন্মকথা বা জীবনকথা একেবারেই চর্চিত হয়নি। খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকেই ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে এক-একটি সংস্কৃত পুরাণের আখ্যানসূত্রে গণেশের জন্ম, বাল্যলীলা, বিবাহ এবং কর্মকৃতিত্বের নানা দিক বর্ণিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে গণেশ কীভাবে একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হয়ে উঠলেন, সেই বিষয়ে সমীক্ষা করতে গিয়ে পুরাণ-বিশেষজ্ঞ Ludo Rocher লিখেছেন, ‘Above all, one cannot help being struck by the fact that the numerous stories surrounding Ganesa concentrate on an unexpectedly limited number of incidents. These incidents are mainly three: his birth and parenthood, his elephant head, and his single tusk.’[১] বিশেষত গণেশের জন্ম সংক্রান্ত আখ্যানে তাঁর জন্মঘটনাকে কেন্দ্র করে নানাবিধ জটিলতা, বিভিন্ন দেব-দেবীর সঙ্গে তাঁর জন্মসম্পর্ক স্থাপন, কখনও পুরুষ-নিরপেক্ষভাবে নারীর অংশজাত রূপে, আবার কখনও একান্তভাবেই পুরুষাংশে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। তা ছাড়া সংখ্যায় ন্যূন হলেও দু’-একটি পৌরাণিক উল্লেখে পুরুষ-নারীর মিলিত অংশগ্রহণেও গণেশের জন্মঘটনা পরিবেশিত হয়েছে। বৈচিত্র্যের দিক থেকে এইসব আখ্যান আস্বাদ্য তো বটেই, পাশাপাশি ধর্ম-দর্শনের দিক থেকেও গণপতির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জরুরি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্গীয় পুরাণাদির আলোচনাকে এই পর্যায়ের বাইরে রাখা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে নির্দিষ্টভাবে বঙ্গদেশীয় ধর্মচর্যায় গণপতির অবস্থানকে চিহ্নিত করতে ওই পৌরাণিক উপাদানগুলি ব্যবহৃত হবে। এই অধ্যায়ে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে পুরাণের গণেশ জন্মকথা এবং অন্যান্য মহিমাবাচক আখ্যানের গুরুত্ব বুঝতে চাওয়া হয়েছে। আলোচনাটিকে চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, ক. বহুবিচিত্র গণেশ জন্মকথা খ. গণেশের বাল্যলীলা গ. গণেশের বিবাহ ঘ. গণেশের মাহাত্ম্য এবং কর্মকৃতিত্ব।

ক. বহুবিচিত্র গণেশ জন্মকথা:

জন্মকেন্দ্রিক আখ্যানগুলি পুরাণভেদে পরস্পর-পৃথক। আবার, একই পুরাণের বিভিন্ন খণ্ডে অথবা একই খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে জন্মকাহিনির পাঠান্তর পাওয়া যায়। গণেশজন্ম বিষয়ক আখ্যানগুলিকে birth type-এর ভিত্তিতে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথমত, গণেশ জন্মের ক্ষেত্রে মাতার একক ভূমিকা লক্ষ করা যায় যথাক্রমে *মৎস্যপুরাণ*, *বামনপুরাণ*, *স্কন্দপুরাণ*-এর ‘মাহেশ্বরখণ্ড’-এর অন্তর্গত ‘কেদারখণ্ড’, ‘ব্রহ্মখণ্ড’-এর অন্তর্গত ‘ধর্ম্মারণ্যখণ্ড’, ‘নাগরখণ্ড’, ‘প্রভাসখণ্ড’-এর অন্তর্গত ‘অর্ব্বুদখণ্ড’, *পদ্মপুরাণ*-এর ‘সৃষ্টিখণ্ড’ এবং *শিবপুরাণ*-এর

‘জ্ঞানসংহিতা’-য়। দ্বিতীয়ত, পিতার একক ভূমিকা দেখা যায় *লিঙ্গপুরাণ* এবং *বরাহপুরাণ*-এর আখ্যানে। তৃতীয়ত, মাতা-পিতার যৌথ ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায় *পদ্মপুরাণ*-এর সৃষ্টিখণ্ড-এর ‘গণপতি স্তোত্র কীর্ত্তন’ এবং *গণেশপুরাণ*-এর ‘ক্রীড়াখণ্ড’-এ।

গণেশ এবং গণেশ-জননী :

১। *মৎস্যপুরাণ*-এর প্রাচীনতম মৌলিক অংশ আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের রচনা বলে মনে করা হয়। এখানে দেহনির্মাণের দিক থেকে গণেশ পার্বতীর অঙ্গমলজাত। *মৎস্যপুরাণ*-এর ১৫৪ নং অধ্যায়ের ৫০১ - ৫০৫ নং শ্লোকে গণেশজন্মের বর্ণনা পাওয়া যায়।[২] সুগন্ধী তেল, গায়ের নানা অনুলেপন এবং স্বেদজ গাত্রমল একত্র করে পার্বতী খেলার ছলে যে পুতুল নির্মাণ করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন, জলস্পর্শে সেই পুতুলের দেহেই প্রাণসঞ্চার হয়ে এক বালকের আকার ধারণ করে। এই ছেলের দেহ যেমন এককভাবে পার্বতীর চেষ্টানির্মিত, তেমনই জন্মমুহূর্তে গঙ্গার ক্রোড়-ই হয়েছে তাঁর প্রধান আশ্রয়। ফলে পার্বতী পরম স্নেহে ‘পুত্র’ বলে সম্বোধন করলেও কিংবা শিব তাঁকে পুত্র বলে মেনে নিলেও জাহ্নবী-গঙ্গার perspective থেকে গণেশ তাঁরই নিজপুত্র, ‘গাঙ্গেয়’। গঙ্গাবক্ষেই তাঁর প্রাণসত্তার প্রথম উদ্‌ভাসন। শিব-পার্বতীর সন্তান হয়েও প্রাণধারণের সূত্রে তিনি গঙ্গাত্মজ। *মৎস্যপুরাণ*-এর এই প্রমাণে গণেশ ‘দ্বৈমাতুর’-ও বটে, একইসঙ্গে দুই মাতার সন্তান। পুরাণে গঙ্গার সঙ্গে গণেশের এই মাতা-পুত্র সম্পর্ক একেবারেই অনালোচিত। এর মধ্যে জলতত্ত্বকেন্দ্রিক ভাবনার একটি আদিবীজ সুপ্ত রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গণেশের ধারণার বিবর্তন প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে গণপতির রূপকল্পনার মূল নিহিত আছে শ্রুতির অগ্নির মধ্যে, অগ্নি থেকে ব্রহ্মা হয়ে গণেশ পর্যন্ত এগিয়েছে। ফলে archetypal deviation-এর দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায়, যে দেবতার মূল অগ্নিতত্ত্বে, জলতত্ত্বে তাঁরই সার্থক পরিণতি। কাজেই, জ্ঞানাধীশ গণেশ জলতত্ত্বসার। এখানে দেবতত্ত্বের বিবর্তনে যে সূত্র কাজ করেছে, পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যেও তার সমর্থন পাওয়া গেছে। সাধকসমাজে যে গণপতি জলতত্ত্ব-প্রধান ব্যক্তির মুখ্য উপাস্যরূপে স্বীকৃত, জ্যোতিষবিদ্যায় যিনি মকররাশির উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাধিপতি, জলাধারে তাঁর জন্মকল্পনা স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত, ত্রয়োদশ শতকে কাশ্মীরের কবি জয়রথের (মতান্তরে জয়দ্রথ) বত্রিশ সর্গবিশিষ্ট *হরচরিতচিন্তামণি*-র অষ্টাদশ পটলধৃত গণেশজন্মকথা পাঠস্মৃতি হিসেবে মনে পড়বে।[৩] উল্লিখিত আখ্যানে জলজন্মের সূত্রে গণেশ ও গঙ্গা পরস্পর-অন্বিত। সেখানে রতিশ্রান্ত পার্বতী পুষ্করিণীতে শিববীর্যমিশ্রিত উদ্বর্তন বা অঙ্গমল বিসর্জন দেন। সেই দেহ-নিঃসৃত মল পুষ্করিণী থেকে তুলে নিয়ে দাসীরা প্রথমে আকাশপথে পূর্ণ সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, পরে সমুদ্রবাহিত হয়ে যা

গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে পৌঁছোয়। সেখানে গৌরীর শাপে গজমুখ ধারণকারী মালিনী উপস্থিত ছিল। তিনি ওই বীর্যমিশ্রিত উদ্বর্তন পান করে বৈশাখের শুক্লাচতুর্দশী তিথিতে এক চতুর্ভুজ পঞ্চবক্ত্র হস্তীমুখ পুত্র প্রসব করেন এবং গৌরীর পূর্বপ্রদত্ত অভিশাপ থেকে মুক্ত হন। এরপর মালিনী সেই গজানন পুত্রকে নিয়ে কৈলাসে উপস্থিত হয়ে গৌরীর কাছে সমস্ত পূর্বকথা নিবেদন করেন। সেই সময় সেখানে উপস্থিত সুরনদী গঙ্গা ওই অগ্নিতেজযুক্ত তীক্ষ্ণ কুঠারধারী পঞ্চমুখ গজাননকে দেখে তাঁকে নিজপুত্র বলে সম্বোধন করেন। এমনকী পুত্রমুখ দর্শনে স্নেহবর্ধিত হয়ে জাহ্নবী দুগ্ধবতী হন, পুত্রকে কোলে নিয়ে তাঁকে দুধ খাইয়ে লালন-পালন করতে থাকেন। সমুদ্র শত শত মণিমালা ও মুক্তাহার দিয়ে সেই পুত্রকে আভূষিত করেন। পূর্ববৃত্তান্ত অনুসারে যেহেতু পার্বতীর দেহ-নিষ্কাশিত মল পুষ্করিণী থেকে সমুদ্র হয়ে গঙ্গায় পৌঁছেছিল এবং গঙ্গা-সাগরের সংগমস্থলেই গণেশের জন্ম হয়, ফলে সমুদ্র এবং গঙ্গা পিতা-মাতা হিসেবে পঞ্চমুখ গজাননের ওপর নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করেন। পরে অবশ্য শিব-পার্বতীর নির্বন্ধে গজানন গণেশ গঙ্গার অধিকারমুক্ত হয়ে হর-গৌরী পরিবারে পুত্ররূপে গৃহীত হন। গঙ্গার সঙ্গে গণেশের মাতা-পুত্র সম্পর্কের কল্পনা যে শুধু পৌরাণিক আখ্যানেই নয়, অন্যান্য শাস্ত্রাদিতেও বিকশিত হয়েছিল, *হরচরিতচিন্তামণি*-র এই আখ্যানই তার প্রমাণ।

লক্ষ করার বিষয় হল, শিব-শক্তি পরিবারে কেবলমাত্র পার্বতীর মানসজাত বা অঙ্গজ সন্তান হিসেবেই গণেশের জন্ম হয়নি। বেশিরভাগ পুরাণের আখ্যানেই পার্বতীনির্মিত পুতুলে কখনও দেবী স্বয়ং, কখনও বা শিব প্রাণসংযোগের মাধ্যমে গণেশের জীবনদান করেছেন। এই ডিসকোর্স সমগ্র ভারতব্যাপী বেশ জনপ্রিয় হলেও অন্তত দুটি পুরাণকথায় (*মৎস্যপুরাণ* এবং *পদ্মপুরাণ*) গঙ্গার সঙ্গে গণেশের জন্মসম্পর্ক স্পষ্ট দেখানো হয়েছে। মনে হয় হর-গৌরী পরিবারের সঙ্গে গঙ্গার জটিল-গভীর সম্পর্কের রূপরেখা এর পৃষ্ঠভূমি। গঙ্গাধর শিবকে কেন্দ্র করে দুই দক্ষকন্যার এক অম্লমধুর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিন্যাস পুরাণ-পরিসরে সুবিদিত। *মৎস্যপুরাণ*-এর মতো *পদ্মপুরাণ*-এর 'সৃষ্টিখণ্ড'-এর ৪৩ নং অধ্যায়েও গণেশজন্মের ক্ষেত্রে গঙ্গার ভূমিকা পার্বতীর সঙ্গে সমভাবে স্বীকার্য। সেখানেও গঙ্গার জলস্পর্শেই পার্বতী নির্মিত ওই নিশ্চেতন পুতুল সপ্রাণ হয়েছে। দেহধারণ করে সজীব অস্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কার্তিক বা ষড়াননের জন্মের খানিকটা আদলও এই ধরনের গণেশজন্মকথায় মিশে আছে। এ ছাড়া *বামনপুরাণ*-এর গণেশজন্মের আখ্যান খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে, পার্বতীনির্মিত চতুর্ভুজ গজানন প্রথম অবস্থায় প্রাণহীন পুতুলমাত্র ছিলেন। প্রথমে পার্বতী ও পরে শিবের স্নানের শেষে তাঁদের দেহজলের সংস্পর্শেই ওই হস্তীমুখ পুতুলের প্রাণসঞ্চার ঘটে। এখানে গঙ্গা বা জাহ্নবীর নাম সরাসরি না এলেও গণেশজন্মের

ক্ষেত্রে জলস্পর্শযোগ নিঃসন্দেহে একটা জরুরি factor হয়ে উঠেছে। শিব-পার্বতীর গা-ধোয়া জলের স্পর্শে গণেশের প্রাণলাভ গজানন এবং জলের সম্পর্কের অন্তঃস্রোতকে পরোক্ষে চিনিয়ে দেয়। ভুললে চলবে না, গজের সঙ্গেও rain charm-এর একটা সম্বন্ধ আছে। স্বভাবতই হস্তীমূর্তি গণপতিও জলজাত। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে গণেশকে 'ঘটপ্রকৃতি' বলা হয়েছে। গণেশের দেহাকৃতি কার্যত ঘটসদৃশ। এক্ষেত্রেও ঘটের সূত্রে জলের সঙ্গে তাঁর সংযোগ দৃঢ় হয়। তবে *বামনপুরাণ* ও *হরচরিতচিন্তামণি* ছাড়া অন্য দুটি পৌরাণিক আখ্যানে 'গাঙ্গেয়' গণেশ প্রথমাবস্থায় মানবদেহধারী, গজমুখযুক্ত নন।

২। *বামনপুরাণ*-এর বিনায়ক জন্মকথায় দেখা যায়, হাজার বছর ধরে মন্দরপর্বতে শিব-পার্বতীর মহামোহ বা সুরতব্যাপার চলতে থাকায় দেবতারা আশঙ্কিত হন।[৪] তাঁদের মনে হয় শিবের ঔরসে পার্বতীর গর্ভসঞ্চার হলে এমন এক পুত্রের জন্ম হবে যাঁর দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের ক্ষমতাও খর্ব হতে পারে। কাজেই, উদ্বিগ্ন দেবতারা মন্দরপর্বতে পৌঁছে শিবের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে দ্বাররক্ষক নন্দী তাঁদের বাধা দেন। অন্য উপায় না দেখে অগ্নি হাঁসের ছদ্মবেশে মিলনকক্ষে প্রবেশ করে শিবের মাথায় উড়ে এসে বসেন। অগ্নি বলেন, তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে দেবতারা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। এ'কথা শোনামাত্রেই শিব সংগম অসম্পূর্ণ রেখে দেবতাদের সঙ্গে দেখা করতে চলে যান। দেবতারা শিবকে মৈথুনক্রিয়া পরিত্যাগ করার প্রার্থনা জানালে শিব তা মঞ্জুর করেন ঠিকই, কিন্তু সংগমকালে তাঁর যতটুকু তেজ উদ্রিক্ত হয়েছে, কোনও একজন দেবতাকে সেই বীর্যধারণের আদেশ দেন। ইন্দ্র, চন্দ্র ও সূর্য নিরস্ত হলে শেষে অগ্নি ওই পরিত্যক্ত শিবশুক্র পান করেন। দেবতারা বিদায় নেওয়ার পর শিব ফিরে এসে পার্বতীকে সমস্ত ঘটনা জানালে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে দেবতাদের অপুত্রক হওয়ার অভিশাপ দেন। এরপর সখী মালিনীকে ডেকে তিনি স্নানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মালিনী সুগন্ধিলেপনে দু'হাতে দেবীর অঙ্গমার্জনা করে ঠিকই, কিন্তু তার গাত্রমার্জনায় পার্বতীর পরিতৃপ্তি হয় না। এরপর মালিনী তাঁকে স্নানাসনে বসিয়ে ভেতরঘরে চলে গেলে পার্বতী নিজেই গাত্রমর্দন শুরু করেন ও নিজ দেহমল থেকে 'পীনবক্ষ সুলক্ষণ চতুর্ভুজ গজাননকে' সৃষ্টি করেন। এই নবনির্মিত গজাননকে মাটিতে রেখে তিনি পুনরায় স্নানের আসনে বসেন। মালিনী ফিরে এসে দেবীর মাথায় জল ঢেলে স্নান করানোর সময় মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। দেবী এই হাসির কারণ জানতে চাইলে মালিনী বলে, শিব নাকি নন্দীকে বলেছিলেন যে পার্বতীর একটি পুত্র জন্মাবে, অথচ দেবতাদের অনুরোধে সেই শিব-ই আবার পুত্রকামনা থেকে বিরত হয়েছেন। দেবী সখীর সব কথা শুনেও নিরুত্তর রইলেন। স্নানশেষে পার্বতী শিবের অর্চনা করে গৃহমধ্যে চলে গেলেন। এরপর শিব এসে একই স্নানের আসনে বসে স্নান সম্পন্ন

করেন। শিবের স্নানের শেষে পার্বতীর গাত্রমলজাত গজাননও সেই একই আসনে বসলেন। কিছুক্ষণ আগে একই জায়গায় স্নান সম্পন্ন করায় হর-গৌরীর স্বেদজল একত্র হয়ে ওই জলভূমিতে মিলিত হয়েছিল। ফলে শিব-পার্বতীর স্বেদজলের সংস্পর্শে আসামাত্রেই ক্ষুৎকারধ্বনির সঙ্গে সেই গজমুখের প্রশস্ত হাত উত্থিত হল। শিব তখন নন্দীকে দেখিয়ে ওই নবজাতককে পুত্ররূপে সানন্দে গ্রহণ করলেন। স্নানান্তে শিব দেবতা, অগ্নি ও পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে অর্চনা করে সহস্র নাম জপের পর পার্বতীর কাছে গেলেন। শিব ওই নবজাত গজাননকে দেবীকে দেখিয়ে বলেন যে, এই দিব্য গজমুখ পুরুষ তাঁরই অঙ্গমলসৃষ্ট। একথা শোনার পর দেবী আনন্দে তাঁকে পুত্ররূপে আলিঙ্গন করে মস্তক চুম্বন করেন। এরপর শিব এই গজমুখের 'বিনায়ক' নামকরণ করেন এবং তাঁকে দেবতা ও মানুষের বিঘ্নহর্তা ও পরম পূজনীয় রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। শিব ওই পুত্রকে পার্বতীর হাতে সমর্পণ করে ঘটোদর নামে এক গণশ্রেষ্ঠকে তাঁর সহায়রূপে এবং দেবীর আনন্দের জন্য মাতৃগণ, ভয়ঙ্কর ভূতগণ ও অন্যান্য বিঘ্নকারীদের বিনায়কের সাহায্যে নিযুক্ত করেন।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায়, এই আখ্যানে যতটা সরলরৈখিকভাবে বিনায়ক জন্মের ঘটনাটিকে পার্বতীর unisexual reproduction হিসেবে দেখানো হয়, ঘটনাটি আদৌ তেমন নয়। শিব-পার্বতীর অসম্পূর্ণ সংগমের পর স্নানের প্রাক্কালে পার্বতী যে গজাননমূর্তি গড়েছিলেন, স্নানের শেষে তাঁদের দেহজ স্বেদজলের সংস্পর্শেই সেই মূর্তি প্রাণবান হয়েছে। কাজেই, গণেশের এই জন্ম-প্রক্রিয়ায় শিব-পার্বতী দু'জনেরই অঙ্গস্পর্শ মিশে আছে। অথচ শিব ওই নবজাতককে সন্তানরূপে গ্রহণ করেও পার্বতীর সামনে তাঁকে একান্তভাবেই 'পার্বতীপুত্র', অন্যার্থে 'বিনায়ক' বলে ঘোষণা করেছেন। বোধহয় নিজের অংশগ্রহণের দিকটিকে তিনি আড়ালেই রাখতে চেয়েছেন। কারণ, দেবতাদের কাছে তিনি সংগমে বিরত থাকার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিছুক্ষণ আগেই দেবলোকের স্বার্থরক্ষার্থে তাঁকে সুরতক্রীড়া অসমাপ্ত রেখে উঠে আসতে হয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে পার্বতীর সঙ্গে যে কোনও সম্মিলনের চিহ্নকেই হয়তো তিনি গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে sexual union না হোক, পরোক্ষে একটা অঙ্গস্পর্শমূলক একত্ব তৈরি হয়েছিলই, সেই যৌথতার ফলেই নিষ্প্রাণ মূর্তিতে প্রাণসঞ্চার হয়েছে। শিবের perspective থেকে দেখলে মনে হয়, *বামনপুরাণ*-এর গণেশ জন্মকথায় শিব-পার্বতীর যৌথতার নিহিত স্তরে থেকে গেলেও আপাতভাবে 'বিনায়ক'-এর উৎপত্তির গল্পে পার্বতীর একক ভূমিকাকেই বড়ো করে দেখানো হয়েছে।

বামনপুরাণ প্রমাণে গণেশ 'বিনায়ক'-নামা। গবেষকদের মতে, এই পুরাণের মূল অংশ ৪৫০-৯০০ খ্রিস্টাব্দের

মধ্যে রচিত হলেও আনুমানিক নবম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে এ'টি সংযোজন সহ পুনর্বিন্যস্ত হয়। বামনপুরাণোক্ত বিনায়ক-গণেশ গৃহ্যসূত্রের বিনায়কদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। গণেশের উদ্ভব সংক্রান্ত আলোচনাতেই দেখা গেছে, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিনায়কের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন তো বটেই, প্রাগার্য সংস্কৃতির শিকড়সম্ভূত। হয়তো রুদ্র-শিবের কল্পনার মধ্যেও বিনায়ক জাতীয় ভাবনার পূর্বসূত্র থেকে গেছে। এই বিনায়ক-তত্ত্ব আলাদাভাবে বহুবচনান্ত ধারণা হিসেবে সাহিত্যে প্রথম উল্লিখিত হয়েছে বৈদিক কল্পসূত্রে, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে। ওই নেতিবাচক শক্তিমূলক বিনায়করাই পরবর্তী সময়ে ইতিপ্রদ শক্তিরূপে এক গণাধিপতির অভিধায় সংহত হয়েছে। এখানে বলা ভালো, বিনায়কের ধারণার গভীরে যে নঞর্থক শক্তির ইশারা প্রথম পর্বে অর্থাৎ গৃহ্যসূত্রের পর্যায়ে ছিল, সেটাই পরবর্তী সময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিনায়ক-গণেশের রূপকল্পনার মূলে কাজ করেছে। প্রচলিত মতে, বিনায়ক বৌদ্ধতন্ত্রে অপশক্তিমূলক অস্তিত্ব, 'পর্ণশবরী'-র দ্বারা লাঞ্ছিত, এমনকী 'বিঘ্নান্তক' দেবের হাতে নিগৃহীত। সাধনমার্গে এর ব্যাখ্যা অবশ্য ভিন্নতর। বৌদ্ধতন্ত্রে বিঘ্নেশ ও বিঘ্নান্তক গণেশেরই দুই রূপ। পর্ণশবরীর দ্বারা নির্জিত বলতে বৌদ্ধতন্ত্রে শাক্তধারার বিপরীতরতি অর্থেই বলা হয়েছে।[৫] সনাতন ধর্মে 'বিনায়ক' ভাবনার বিবর্তন ঘটেছে বিপরীতক্রমে। গৃহ্যসূত্রের অপকারী বিনায়কেরা স্মৃতি-সংহিতার স্তরে কর্মবিঘ্নসৃষ্টিকারী এক গণাধিপতি-বিনায়ক হিসেবে এবং স্নানাদি শোধনকর্মের মাধ্যমে কল্যাণকর শক্তিরূপে পুরাণকালীন হস্তীমুখ গণেশের পূর্বমুখ হয়ে উঠেছে। এই পৌরাণিক বিনায়ক গণেশের মধ্যে বিশিষ্ট নায়ক অর্থে গণপ্রধান হয়ে ওঠার অর্থটা যেমন রয়ে গেছে, তেমনি 'বিনায়ক' শব্দ নতুন এক অর্থদ্যোতনা (এককভাবে পার্বতীর সন্তান) লাভ করেছে। ব্রাহ্মণ্য পুরাণের মধ্যে *বামনপুরাণ*-এর 'বিনায়কোৎপত্তি' অধ্যায়েই পার্বতীপুত্র রূপে 'বিনায়ক'-এর অর্থব্যাখ্যা প্রথম সংবদ্ধ হয়েছে। এই ব্যাখ্যার সমান্তরালে 'বিনায়ক' অর্থে নেতৃত্বদানকারী বিশিষ্ট নায়কের ভূমিকাটি-ও পুরাণ-পরম্পরায় জায়মান ছিল। যেমন, *পদ্মপুরাণ*-এর 'সৃষ্টিখণ্ড'-এর ৬৩ নং অধ্যায়ের ৪ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, বিঘ্নহ্রাসের জন্য মর্ত্যমানব গণেশপূজা করে। ফলস্বরূপ তারা পরে 'বিনায়কত্ব' প্রাপ্ত হয় এবং গৌরীপুত্রের অনুরূপ ('গণেশং পূজয়েদগ্রে ত্ববিঘ্নার্থং পরে ত্বিহ।/ বিনায়কত্বমাপ্নোতি যথা গৌরীসুতো হি সঃ।।'[৬]) হয়ে থাকে। এই শ্লোকে 'বিনায়কত্ব' বলতে গণশ্রেষ্ঠের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৩। *স্কন্দপুরাণ*-এর রচনাকাল আনুমানিক সপ্তম শতক বিবেচনা করা হয়। তবে দশম শতকের মধ্যেই মূল রচনার সঙ্গে বিবিধ সংহিতা ও মাহাত্ম্যমূলক রচনা যুক্ত হয়ে এই মহাগ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পায়। সাতটি খণ্ডে বিভক্ত এই বিশালাকার পুরাণের 'মাহেশ্বরখণ্ড' (১), 'ব্রাহ্মখণ্ড' (৩), 'নাগরখণ্ড' (৬) এবং 'প্রভাসখণ্ড' (৭)-এর অন্তর্গত বিভিন্ন

উপাখ্যানে গণেশের জন্মমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। যদিও এক-একটি উপাখ্যানে গণেশের জন্মবৃত্তান্ত এক-একভাবে পরিবেশিত হয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপ:

'মাহেশ্বর খণ্ড'-এর অন্তর্গত 'কেদারখণ্ড' শীর্ষক অংশের নবম ও দশম অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্বের নিহিতার্থ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে গণপতি গণেশের মাহাত্ম্য এবং তাঁর জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে।[৭] গণেশ এখানে প্রকৃতির অংশজাত এবং ঘটনা-পরম্পরায় শিবপুত্ররূপে গৃহীত। এক্ষেত্রে গণেশজন্মের প্রসঙ্গ শিব-শক্তির অদ্বয়ত্ব প্রতিষ্ঠার সূত্রে এসেছে। পাশাপাশি শিব-শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে গণপতি-তত্ত্বও দার্শনিকভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'কেদারখণ্ড'-এর নবম অধ্যায়ের কাহিনি-সূত্র অনুসরণ করলে দেখা যায়, সমুদ্রমন্থনের ফলে উদ্‌গত বাড়বাগ্নি ও হলাহলের প্রভাব থেকে ত্রিজগতকে রক্ষার জন্য নারদ দেবাসুরকে মন্থনে সাময়িকভাবে বিরত থেকে সেই দক্ষযজ্ঞ-নাশকারী 'পরাৎপর, পরমানন্দময়, যোগীজন-ধ্যেয়, প্রপঞ্চাতীত, নিরাকার' শিবকে স্মরণের পরামর্শ দিলেও অহঙ্কারী, নষ্টবুদ্ধি, স্বার্থান্ধ দেবতা ও অসুরেরা শিবের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ছিলেন। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ রুদ্রকোপে ভয়ঙ্কর বিষক্রিয়ায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড চিরতরে ভস্মীভূত হওয়ার উপক্রম ঘটল। তখন ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ সহ বিষদগ্ধ সমস্ত লোক-ই জলমগ্ন হয়েছিল। ফলে না ভূমি, না জল, না অগ্নি, না আকাশ, না অহঙ্কার, না মহান, না মূল-অবিদ্যা কিছুই অবশিষ্ট রইল না। চরাচর ব্রহ্মাণ্ড 'নিখিল কালকূটাগ্নির প্রভাবে' এক অস্তিত্বহীন বৈনাশিক শূন্যস্থানে পরিণত হয়েছিল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু সহ ইন্দ্রাদি লোকপালগণও সেই সামূহিক ধ্বংসপ্রাপ্তির কালে বিষাগ্নির দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়েছিলেন। যদিও এমন বিনষ্টিকালেও অস্তিত্ববান ছিলেন দুই পরম সত্তা--- লিঙ্গরূপী মহাদেব শম্ভু এবং 'মহাত্মা হেরম্ব' অর্থাৎ গণেশ। লোমশ মুনির বাচনিকে দশম অধ্যায়ে তাঁদের কথোপকথনের মধ্য দিয়েই গণেশের জন্মঘটনা, তাঁর অবস্থানের গুরুত্ব এবং তত্ত্বসার ব্যাখ্যাত হয়েছে। গণেশকে দিয়েই আলোচ্য কথোপকথনের আরম্ভ। লিঙ্গরূপী রুদ্র-শিবের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, লীলাক্রমে তিনিই দেবাসুরের এই 'সুদুর্জ্জয়' বিঘ্ন উৎপাদন করেছেন। কারণ, ভয়ে বা মতিচ্ছন্নতায় যারা শিব অথবা গণেশের অর্চনা করে না, তারা যে কোনও কাজেই অসফল হয়। এই বক্তব্যের উত্তরে নিরাকার, নিরঞ্জন লিঙ্গরূপী শিব গণেশকে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত করেছেন: এই দৃশ্যমান চরাচর জগৎ অহঙ্কারাত্মক এবং এই অহঙ্কারই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। তত্ত্বগতভাবে সৃষ্টির আদিতে শিব 'বিজ্ঞপ্তিমাত্র' ছিলেন। এই স্তরে তিনি মায়ামুক্ত, শান্ত, সর্বদা আনন্দস্বরূপ এবং দ্বৈতাদ্বৈত-বর্জিত। এই প্রসঙ্গে গণেশের প্রশ্ন, শিব যদি পরমানন্দময় কেবল আত্মা-ই হন, তাহলে তাঁর চেয়ে অপর বা পৃথক তো কিছুই হওয়ার নয়। সেক্ষেত্রে এই ভেদমূলক নিত্যানিত্য সংসারচক্র কীভাবে উৎপন্ন হল? এই সংসারচক্রে তো প্রত্যেকেই

পরস্পরবিরোধী। কেউ জ্ঞানবাদে আচ্ছন্ন, কেউ নিজ নিজ গুণানুসারে কর্মবাদী, আবার কেউ জ্ঞাননিষ্ঠ। অথচ এরা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন, এর কারণই বা কী? এই সূত্রে গণেশ নিজের উৎস সম্বন্ধেও কৌতূহলী হয়েছেন— স্বয়ং তিনিই বা কোথা থেকে এসেছেন? এই বৃষভই বা কোথা থেকে? এমনকী সংসারচক্র-মধ্যস্থ ওইসব ব্যক্তিই বা কোথা থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, তারা আছেনই বা কোথায়? গণেশের মনে হয়েছে, ওই মহাভাগগণ সকলেই সাত্ত্বিক ও রাজস প্রকৃতিরূপে উৎপাদিত। এর প্রত্যুত্তরে শম্ভু হাস্যমুখে বলেছেন, কালপ্রভাবে সুরাসুর-নরপরিবৃত সমগ্র জগৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত রয়েছে। পরমার্থ জ্ঞানে জগতের নশ্বরত্ব নেই, একমাত্র মায়াযুক্ত হয়েই জগৎ নশ্বর। এই কথোপকথনের পর্বে লিঙ্গরূপী বিশ্বরূপ সদাশিবের থেকে এক পরমা শক্তির আবির্ভাব ঘটে। ইনি 'শিবরূপা, জগদ্‌যোনি, নিখিল কার্য ও কারণরূপিণী', এই শক্তির আবির্ভাব মাত্রেই লিঙ্গরূপী শিব তাঁর মধ্যে নিমগ্ন হলেন। এই অবস্থায় লিঙ্গশিব-ও শক্তির অধীন হলে ব্রহ্মবিদ্যাত্মরূপিণী একমাত্র পরমা শক্তিই গণেশের সম্মুখে অবস্থান করেন। বিস্ময়াবিষ্ট গণেশ একদৃষ্টে তাঁর দিকেই চেয়ে রইলেন। স্বয়ং লিঙ্গরূপী সদাশিবও যেখানে বিশ্বময়ী আদ্যা মূলাপ্রকৃতির অন্তর্গত হয়েই অদ্বৈতাবস্থায় রয়েছেন, সেখানে গণেশের এই পৃথকত্ব কীরূপে সম্ভব? স্কন্দপুরাণ বলছেন, এই জগৎ চরাচর কার্যত প্রকৃতির অন্তর্গত হলেও গণেশ যেহেতু স্বয়ং প্রকৃতি থেকেই আবির্ভূত এবং সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, ফলত তাঁর পৃথক অবস্থান থাকবেই। এই পর্যায়ে গণেশের জন্মঘটনা এবং তাঁর গজানন হওয়ার বৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে। গণেশ্বর গণেশ বহুদিন প্রাকৃতজনের মতো আত্মস্বরূপ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। একসময় শিবের সঙ্গে তাঁর প্রবল সংগ্রাম সংঘটিত হয়। গজাসীন গণেশের অজেয়ত্ব লক্ষ করে শম্ভু ত্রিশূল দ্বারা ওই হস্তীর সঙ্গে গণেশকেও হত্যা করেন। পুত্রের মৃত্যুদর্শনে শোকসন্তপ্ত পার্বতী শিবের স্তব করলে মহাদেব পার্বতীকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। দেবী তখন শিবের উদ্দেশে বলেন, যে গণেশ শিবের হাতে নিহত হয়েছে সে তাঁরই পুত্র, প্রকৃতিরই অংশজাত। আত্মবিস্মৃতির ফলে মূঢ়তাবশত সে শিবকে জানতে পারেনি। এইভাবে দেবী তাঁর সন্তোষের জন্য শিবের কাছে পুত্রের পুনর্জীবনপ্রাপ্তির অনুনয় জানালে শিব ওই মায়া-পুত্রের জীবনদান করেন এবং তাঁর মুখে গজমুখ সংযোজন করেন। তখন থেকেই ওই মায়া-নন্দন শঙ্করের প্রসাদে গজানন রূপে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। এরপর গজানন-গণেশের সারতত্ত্ব এবং মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি প্রকৃতির অংশজাত অর্থাৎ মায়ার পুত্র হলেও স্বরূপত মায়ামুক্ত এবং জ্ঞানবান। গজানন আত্মজ্ঞানরূপ অমৃতপানে নিত্য তৃপ্ত ও নিরাময়। তিনি সমাধিলীন রুদ্রাংশে কালেরও কালান্তক রূপে অবস্থান করেন। গণেশ যোগদণ্ডের জন্য নিজের দাঁত উৎপাটিত করে, এমনকি তা নিজের হাতে ধারণ করে শব্দব্রহ্মেরও

অতীত হয়েছেন। তিনি ঋদ্ধি ও সিদ্ধির সঙ্গে একত্বপ্রাপ্ত। পৃথিবীতে যত ধরনের বিঘ্ন ও গণ আছে, এমনকি তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, শম্ভুর নিয়োগে তিনি সেই সকল গণেরই অধিপতি রূপে নিযুক্ত হলেন। এই গণপতিত্বের গুণেই জ্ঞানমূর্তি গণেশ পৃথকভাবে অবস্থিত হয়েও বিশ্বরূপিণী প্রকৃতি বা প্রকৃতিলীন শিবলিঙ্গকে দেখেছেন। এরপর গণেশ শিবগণসহ নিজেকে এবং এই ত্রিজগতকে লিঙ্গে লীন দেখে সাময়িকভাবে মোহগ্রস্ত হলেও কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে শিব-পার্বতীকে প্রণাম জানান। তিনি প্রকৃতিস্থ শিবলিঙ্গের মধ্যেই ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু ও সদাশিবকে দর্শন করেন। এমনকী লিঙ্গ ও শিবশক্তিময় প্রেতপ্রায় ব্রহ্মাণ্ডগোলক সকল যে কোটি কোটি পরমাণুর মতো লিঙ্গরূপী শিবের মধ্যেই লীন ও বিলীন হচ্ছে, তাও তিনি চাক্ষুষ করেন। ওই শিবলিঙ্গ যে শক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন অর্থাৎ প্রকৃতিরই অন্তর্গত এবং প্রকৃতিরূপী শক্তিও যে লিঙ্গ দ্বারাই আবৃত, শিব-শক্তির এই অবিনাবদ্ধ মিলনদর্শনে একমাত্র গণেশেরই অধিকার। শিব-শক্তির অদ্বয়যোগেই যে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট, সেই পূর্ণতত্ত্বসার উপলব্ধি করে গণেশ তাঁর গণসমেত শক্তিযুক্ত শিবের স্তব শুরু করেন এবং ব্রহ্মাসহ দেবতাদের ওই লোকসংহারী বিষের হাত থেকে রক্ষা করার অনুনয় জানান। গণেশের আবেদনেই শিব তখন তীব্র বিষের প্রভাব সংহরণ করে ত্রিলোক পুনর্জীবিত করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবতা এবং অসুরদের প্রাণসঞ্জীবনের পর দেবতাদের পক্ষ থেকে বিষ্ণু সেই পরিত্রাণকারী শিবলিঙ্গের স্তব করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে শিব স্বয়ং আবির্ভূত হন। এ প্রসঙ্গে শিব বলেন যে তাঁকে উপেক্ষা করে অমৃতলাভের জন্য সমুদ্রমন্থনের মতো দুষ্কর্মের অপরাধে দেবতারা মৃত্যমুখে পতিত হবে। তিনি কার্যসিদ্ধির জন্য গণেশের নির্মাণ করেছেন। যে বা যারা গণেশ ও দুর্গাকে নমস্কার করে না, তারা অবশ্যই দুঃখভোগ করবে। দেবতারা অহংসর্বস্ব হয়ে কার্যসিদ্ধিপ্রদাতা গণেশকেই ভুলেছেন। যিনি তাঁদের কালকূটের মহাভয় থেকে রক্ষা করে চরাচর বিশ্বকে বিষাগ্নির প্রভাবমুক্ত করেছেন, সেই পরমত্রাতা গণেশের অর্চনা করা কর্তব্য। কাজের শুরুতে যারা গণাধিপ বিঘ্নেশ্বর গণেশের পূজা করে না, দেবাসুরের মতো তারাও কখনও সফল হবে না। শিবমুখে গণেশ মাহাত্ম্যের এই ঘোষণা শুনে দেবাসুর সকলেই গণেশের পূজাবিধি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। পরবর্তী মাহাত্ম্য বর্ণনা অংশে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

স্কন্দপুরাণ-এর 'মাহেশ্বর' খণ্ডান্তর্গত 'কুমারিকাখণ্ড'-এর ২৭ নং অধ্যায়ে নারদের জবানিতে গণেশ জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে।[৮] তারকাসুর-পীড়িত দেবতারা যখন শিবের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বিবিধ স্তুতিবাক্যে তাঁর স্তব করছিলেন, পার্বতী সেই সময় গাত্রমার্জনায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি নিজ গাত্রমর্দন করে সেই অঙ্গমল দ্বারা একটি গজমুখ মনুষ্যমূর্তি নির্মাণ করেন। পরে দেবতাদের পুণ্যস্তুতি শুনে করুণাঘন চিত্তে সেই সদ্যনির্মিত মূর্তিটিকেই 'পুত্র' বলে

আদর করতে থাকেন। এরই মধ্যে শিব সেখানে উপস্থিত হয়ে ওই পার্বতীপুত্রকে বহুগুণবান হওয়ার আশীষ প্রদান করলে পার্বতীর সম্মতিক্রমেই সেই মূর্তি বিশালাকার ধারণ করে তেজপ্রভাবে চারদিক উদ্ভাসিত করতে থাকে। এরপর শিব সেই বিঘ্নবিনাশন পার্বতীপুত্রকে যতদিন না তারকাসুর-হন্তারকের জন্ম হয়, ততদিন পর্যন্ত দেবতাদের রক্ষাকর্তারূপে নিযুক্ত করেন। এই আখ্যান অনুসারে গণেশ তারকারি কার্তিকের অগ্রজরূপে গণ্য হন।

স্কন্দপুরাণ-এর 'ব্রহ্মখণ্ড'-এর অন্তর্গত 'ধর্ম্মারণ্যখণ্ড'-এর 'গণেশপ্রস্থাপনাবর্ণন' (১২) শীর্ষক উপাধ্যায়ে আছে, পার্বতী নিজের গাত্রমল থেকে একটি সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ পুতুল নির্মাণ করে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন।[৯] নবোদ্ভূত পুত্র জন্মলাভের পর মাতা পার্বতীর আজ্ঞা প্রার্থনা করলে দেবী তাঁকে স্নানকক্ষের দ্বারদেশে অবস্থান করতে বলেন। তিনি আরও বলেন, পরশু সহ অন্যান্য আয়ুধ রয়েছে, প্রয়োজনে বালকপুত্র তা ব্যবহারও করতে পারে। কিন্তু তাঁর দায়িত্ব হল দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে কেউ যেন ভেতরে প্রবেশ করে 'বিঘ্নাচরণ' না করে, সেদিকে লক্ষ রাখা। পার্বতীর কথামতো গণেশ তেমনটাই করছিলেন। ইতোমধ্যে শিব এসে অভ্যন্তরকক্ষে প্রবেশ করতে চাইলে শিবের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ চলাকালে গণেশ শিবের প্রশস্ত কপালে পরশু ছুঁড়ে আঘাত করলে শিবও শূলাঘাতে গণেশের মস্তক ছিন্ন করেন। পুত্রকে ধরাশায়ী দেখে শোকসন্তপ্ত পার্বতীর ক্রন্দনে শিবও বিচলিত হন। তাঁর মনে হয় এমন অনর্থ ঘটানো আদৌ ঠিক হয়নি। এই সময় গজাসুরকে দেখতে পেয়ে শিব সেই মহাদৈত্যের মস্তক ছিন্ন করে ওই কর্তিত মুণ্ড মৃত পুত্রের মস্তকে প্রতিস্থাপন করে তাঁর জীবনদান করেন। এরপর শিব-ই পুনর্জাত পার্বতীপুত্রের 'গজানন' নাম রাখলেন এবং দেবতা ও মুনিগণ একত্রে মিলিত হয়ে আনন্দের সঙ্গে বিবিধ স্তুতিবাক্যে এই 'কুটুম্বকুশলকর' গণেশের স্তব করলেন।

স্কন্দপুরাণ-এর 'নাগরখণ্ড'-এর 'গণপতিত্রয়ের মাহাত্ম্য বর্ণন' (১৪২) শীর্ষক অংশে দেখা যায়, গণেশ শিবপ্রভাবে সৃষ্ট এবং পার্বতীর অঙ্গমলজাত।[১০] তপস্যার প্রভাবে সিদ্ধ মানবগণ দেবতাদের গৃহাদি ও মহিমা আচ্ছন্ন করলে তাঁদের মুখপাত্র হয়ে বিষ্ণু ('সহস্রাক্ষ') শিব-পার্বতী যেখানে একমনে উপবিষ্ট আছেন, সেই স্থানে উপস্থিত হন। বিষ্ণু শিবকে এমন এক উপায় বাতলাতে অনুরোধ করেন, যার ফলে তাঁরা সুখে গৃহে বাস করতে পারেন। এই দেববাক্য শুনে শিব পার্শ্বস্থিত পার্বতীর চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করেন। তখন পার্বতী বারবার গাত্রমর্দন করে ও সমস্ত অঙ্গমল একত্র করে 'নাগমুখ' নামের চতুর্বাহু, মহাকায়, লম্বোদর ও দেবতাদের আনন্দদায়ী এক পুরুষের সৃষ্টি করেন। এই উপাখ্যানে গণেশের নাম নাগমুখ। নাগ হস্তীর সমার্থক শব্দ। কাজেই নাগমুখ বা গজাননরূপেই গণেশ এখানে আবির্ভূত হয়েছেন।

‘নাগরখণ্ড’-এর ‘গণপতির পূজাবিধি ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন’ (২১৪) শীর্ষক অধ্যায়ের অন্য আরেকটি উপাখ্যানেও গণেশ পার্বতীর একক ভূমিকাজাত এবং তাঁর অঙ্গমলসৃষ্ট।[১১] তিনি খেলার জন্য এঁকে মনুষ্যদেহধারী অথচ গজমুখ করে গড়েছিলেন। ইনি চর্তুভুজ, কুঠারধারী, মোদকপ্রিয় ও ভক্তদের ‘সিদ্ধিপ্রদ’। প্রসঙ্গত তাঁর একটি পূর্বেতিহাসের কথাও বলা হয়েছে। এই বিষয়ে রোহিতাশ্ব মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছেন। বর্তমান বালমূর্তি ক্রীড়াসহায়ক গণপতি পূর্বে ছিলেন রণনিপুণ বীরযোদ্ধা। তারকাসুরের যুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করে দেবতাদের প্রভূত সাহায্য করেন। তাঁর মতো সাহায্য অন্য কোনও যোদ্ধা করেননি। তবে সংগ্রামে তিনিও ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হন। এই অবস্থায় তাঁকে দেখে শক্র বলে, যেহেতু গণেশ তাঁর নিধনের জন্যই যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন ও বহু দানবকে হত্যা করেছেন, ফলে তিনি মানুষ তো বটেই, দেবতাদেরও পূজ্যপদ লাভ করবেন। যারাই কাজের সূচনায় তাঁর পূজা করবে তাদেরই সিদ্ধিলাভ অনিবার্য। এ’কথা বলে শক্র তাঁকে বিসর্জন দেন। এই সময় তিনি তাঁকে সম্মাননাসহ শিব-গৌরীর কাছে প্রেরণ করেন। এরপর মার্কণ্ডেয়-কথিত ‘সর্ব্বপাপবিনাশন সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন সর্ব্বগুণোপেত ব্রত’-এর কথা প্রসঙ্গে জানা গেছে, গাধিপুত্র ক্ষত্রিয়রাজ বিশ্বামিত্র একসময় বশিষ্টের সঙ্গে বৈরিতায় জড়িয়ে ব্রাহ্মণ্যলাভের জন্য কৈলাসে শিব-পার্বতীর তপস্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। সে’সময় শিব তাঁকে কার্যসিদ্ধির জন্য সর্বাগ্রে গণপতি-বিনায়কের পূজার পরামর্শ দেন। বিশ্বামিত্র কীভাবে গণপতির পূজা করবেন, শিবের কাছে তা জানতে চাইলে শিব তাঁকে গণেশের জন্মকথা বলেছেন। পূর্বে দেবী গৌরী খেলার জন্য (‘ক্রীড়ার্থ’) নিজের অঙ্গমল দ্বারা একটি মূর্তি প্রস্তুত করে বালকরূপে তাঁকে চতুর্ভুজ ও মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট করেন। এই পার্বতীপুত্র গজবক্ত্র, মহাকায়, লম্বোদর ও লঘুরু। দেবী এই কৃত্রিম বালকপুত্র নির্মাণ করে তাতে প্রাণ-সঞ্জীবিত করতে শিবকে অনুরোধ করেন। শিব জীবসূক্ত ও সৃষ্টিসূক্ত দ্বারা ওই বালকপুতুলটিকে স্পর্শমাত্রেই তা সজীব হয়ে ওঠে। চতুর্থী তিথিতে জীবনপ্রাপ্ত এই বালক পার্বতীপুত্র এবং ‘গণাধ্যক্ষ’-রূপে সমস্ত লোকে পরিচিত হয়।

স্কন্দপুরাণ-এর ‘প্রভাসখণ্ড’-এর অন্তর্গত ‘অর্ব্বুদখণ্ড’-এর ‘বিনায়ক মাহাত্ম্য কথন’ (৩২) অধ্যায়ে আছে, পার্বতী গাত্রমল দিয়ে ‘বিনোদার্থ’ অর্থাৎ আনন্দের জন্য এক সুকুমার বালকের মূর্তি নির্মাণ করেন।[১২] পুতুলের দেহের অন্যান্য অঙ্গনির্মাণ সম্পন্ন হলেও লেপ বা কাদার অভাবে মুণ্ডটিই অগঠিত রয়ে যায়। দেবী তখন স্কন্দ বা কার্তিককে ওই মুণ্ডহীন পুতুলের মুণ্ড তৈরির জন্য একতাল কাদা আনতে বলেন। কারণ, মস্তক যোজনা হলেই ওই নবনির্মিত ‘পার্বতীপুত্র’ এবং ‘কার্তিকানুজ’ প্রতিপক্ষের অজেয় হয়ে উঠবে। স্কন্দ কাদা আনতে গেলেন

ঠিকই, কিন্তু কাদা না পেয়ে বদলে এক মত্ত গজরাজের মাথা কেটে এনে ওই পুতুল-বালকের মস্তকরূপে স্থাপন করতে উদ্যত হলেন। সেই সময় পার্বতী তাঁকে নিষেধ করতে যাবেন, কিন্তু তার আগেই দৈবনির্বন্ধে ওই হস্তীমুণ্ড পুতুলের স্কন্ধে যুক্ত হয়। তখন সেই বালকের গা থেকে নেতৃত্বদানের বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তাঁর মূর্তি কমনীয়, সর্বলক্ষণযুক্ত, ত্রিগম্ভীর, সপ্তরক্ত, ষড়ুন্নত, পঞ্চদীর্ঘ, পঞ্চসূক্ষ্ম, পরম সুন্দর এবং ত্রিবিস্তীর্ণ হল। এই অপূর্বরূপ দর্শন করে পার্বতী নিজ শক্তিপ্রয়োগে ওই বালকের জীবনদান করেন। দেবীর দ্বারা জীবনপ্রাপ্ত হয়ে সেই নবোদ্ভূত বালক পার্বতীর আদেশ প্রার্থনা করে। এরপর পার্বতী এই আশ্চর্যদর্শন বালকটিকে শিবের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর মহত্ত্বপ্রাপ্তির জন্য বর প্রার্থনা করলে শিব বলেন, শরীরের মধ্যে শির বা মস্তক-ই প্রধান অঙ্গ। পার্বতী যেহেতু স্কন্দের সাহায্যে এই পুত্রের গজমুখ ('মহাশির') যোজনা করেছে এবং এঁর শরীরে যেহেতু নেতৃত্বলক্ষণ বিদ্যমান, ফলে এই পুত্র 'মহাবিনায়ক' নামে পরিচিত হবে। এমনকি শিবেরই আদেশে মহাবিনায়ক শিবগণের অধিপতি হিসেবে নিযুক্ত হবেন। এই সূত্রে তাঁর নাম 'গণাধিপ' বা 'গণেশ' হয়েছে। মর্ত্যবাসীর যে কোনও কাজের শুরুতেই এই গণাধিপতিকে স্মরণ অবশ্য কর্তব্য, তা না হলে তাদের কার্যসিদ্ধি হবে না।

আবার, 'প্রভাসখণ্ড'-এর অন্তর্গত 'অর্ব্বুদখণ্ড'-এর 'ঈশানী শিখর মাহাত্ম্য খ্যাপন' (৫২) শীর্ষক উপাধ্যায়ে বিনায়ক-গণেশ শিবের বরানুগৃহীত এবং বিশেষভাবে পার্বতীর অঙ্গমলজাত।[১৩] কাহিনিতে আছে, শিব-পার্বতীর সুরতক্রীড়ায় বাধাদানের উদ্দেশ্যে দেবতারা কৈলাসে সমবেত হলে নন্দী তাঁদের অবসরকক্ষে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। এদিকে শিবের বীর্যে পার্বতীর গর্ভসঞ্চার হলে দেবতাদের সন্তানসন্ততির, এমনকি পৃথিবীরও পতন অনিবার্য। ফলে এই রতিক্রীড়া কখনওই সম্পূর্ণ হতে দেওয়া চলে না। এইরকম ভেবে দেবতারা বায়ুকে শিব-পার্বতীর মিলনকক্ষে গোপনে প্রেরণ করেন। বায়ু ওই অন্তরঙ্গমুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে উচ্চৈঃস্বরে শিবকে সন্তান-উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে বিরত হওয়ার আর্জি জানালে শিব লজ্জাভরে গৌরীকে পরিত্যাগ করে রমণভঙ্গ করেন। স্বভাবতই ক্ষুব্ধ গৌরী দেবতাদের অপুত্রক এবং বায়ুকে কায়াহীন হওয়ার অভিশাপ দিয়ে শিবের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে অর্বুদ পর্বতে সন্তানলাভের জন্য তপস্যা আরম্ভ করেন। এরপর হাজার বছর পার হয়ে গেলে শিবকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রাদি দেবতারা পার্বতীর তপঃস্থলে গিয়ে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। ইন্দ্র বলেন, শিব যখন লজ্জিত হয়েই তাঁর কাছে এসেছেন তখন দেবীর অপ্রসন্নতার কারণ কী? পার্বতী প্রত্যুত্তরে বলেন, যেহেতু ইন্দ্রের পরিকল্পনাতেই শিব তাঁকে পরিত্যাগ করেছে, কাজেই যতক্ষণ না তিনি সন্তানলাভ করবেন, ততক্ষণ তিনি স্বামীর কাছে ফিরে যাবেন না। একথা শুনে শিব সহাস্যে পার্বতীকে বলেন, দেবী যেন তাঁর প্রতি অন্তত দৃষ্টিপাত বা

সম্ভাষণের মাধ্যমে প্রসাদ বিতরণ করেন। দেবতাদের হিতার্থেই তিনি পূর্বে রতিক্রীড়ায় বিরত হয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু পার্বতীর সন্তান জন্মদানের সংকল্পেই ওই মিলনের সূচনা হয়েছিল, ফলে শিবের বরে আগামী চতুর্থীর দিন পার্বতী নিজ দেহজাত এক পুত্রের জন্ম দেবেন। সেই পুত্র বহুরূপধারী হয়ে দেব, দৈত্য ও সমগ্র মর্ত্যবাসীর সিদ্ধিপ্রদ হবে। এইভাবে শিববাক্যে সম্মত হয়ে দেবী চতুর্থীতে স্নানের পর নিজের দেহমল একত্র করে নিছক কৌতুকবশে চতুর্ভুজ বিনায়কের সৃষ্টি করেন। এরপর ওই বালকপুতুলে প্রাণ সঞ্জীবিত হলে শিবের নির্দেশানুসারে বিনায়ক পৃথিবীর সমস্ত মানুষের নায়কের পদে অধিষ্ঠিত হয়।

৪। *পদ্মপুরাণ*-এর মূল অংশ আনুমানিক ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের মধ্যেই রচিত হয়। এই পুরাণের 'সৃষ্টিখণ্ড'-এর 'গৌরীবিবাহ বর্ণন' (৪৩) শীর্ষক অধ্যায়ে পার্বতীর অঙ্গমলজাতরূপে গণেশজন্ম বর্ণিত হয়েছে।[১৪] এই অধ্যায়ের ৪৩২-৪৩৮ নং শ্লোকে বর্ণিত গণেশ জন্মকথা পূর্বোক্ত *মৎস্যপুরাণ*-এর বর্ণনার সমধর্মী। এখানেও পার্বতীর গাত্রমলনির্মিত প্রাণহীন পুতুল গঙ্গার জলস্পর্শে প্রাণবান হয়েছে। এই সূত্রে গঙ্গা ও গৌরী একইসঙ্গে 'দ্বৈমাতুর' গণেশের মাতৃত্বের ভাগীদার। তা ছাড়া *পদ্মপুরাণ*-এ গণেশের যে অষ্টনাম বিবৃত হয়েছে, সেখানেও তিনি 'দ্বৈমাতুর' রূপে আখ্যায়িত।

৫। বর্তমান *শিবপুরাণ*-এর মূল বা প্রাচীন অংশসমূহ আনুমানিক দশম-একাদশ শতকে সংকলিত হয়। এই পুরাণের অন্তর্গত 'জ্ঞানসংহিতা' অংশের ৩২ - ৩৪ নং অধ্যায়ে গণেশের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।[১৫] পার্বতী একদিন নন্দীকে দ্বারপাল নিযুক্ত করে স্নান করতে যান। এমন সময় শিব সেখানে উপস্থিত হয়ে নন্দীকে ভর্ৎসনা করে স্নানাগারে প্রবেশ করেন। এতে পার্বতী অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হন। তিনি উপলব্ধি করেন, নন্দী শিবের আজ্ঞাবহ অনুচর বলেই তাঁর আদেশ নির্দ্বিধায় উপেক্ষা করার সাহস দেখিয়েছে। শিবলোকে তাঁর নিজের এমন কোনও গণ বা অনুচর নেই, যে কেবলমাত্র তাঁরই আজ্ঞাবহ হবেন। এই পরিস্থিতিতে পার্বতী সিদ্ধান্ত নেন, তিনি একক ভূমিকায় সন্তানের জন্ম দেবেন। জয়া-বিজয়ার সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিনি জল থেকে পঙ্ক তুলে একটি সুন্দর পুত্রের মূর্তি নির্মাণ করেন এবং সেই মূর্তিতে প্রাণ সঞ্জীবন করেন। প্রাণবান হওয়ার পর দেবী তাঁকে নানা বস্ত্র-অলঙ্কারে সজ্জিত করে আশীর্বাদসহ গৃহদ্বারের রক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। পার্বতী বিশেষভাবে বলেন, "হে পুত্র! যে ব্যক্তি আমার গৃহমধ্যে আসিবে, তাহাকে নিবারণ করিবে। তুমি আমার পুত্র, একারণ আমারই; তুমি ভিন্ন আমার কেহ নাই।" সদ্যোজাত পুত্রও মায়ের আদেশ পালনের জন্য দ্বারদেশে লাঠি হাতে প্রহরারত ছিলেন। এমতাবস্থায় শিব অনুচরদের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হন এবং ওই পার্বতীপুত্রকে উপেক্ষা করে গৃহে প্রবেশ করতে উদ্যত

হন। প্রাথমিক পর্বে শিবের সঙ্গে গণেশের মৌখিক বাদানুবাদ চলে। শিব বিরক্ত হয়ে তাঁর অনুচরদের ওই বালককে সেই স্থান থেকে সরানোর দায়িত্ব দিয়ে অন্যত্র চলে যান। কিন্তু শিবানুচরেরা পার্বতীপুত্রের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করেও তাঁকে নিরস্ত করতে ব্যর্থ হয়, এমনকী নিজেরাই যুদ্ধে আহত হয়ে শিবের কাছে ফিরে আসেন। শিব তাঁদের এই অবস্থা দেখে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হন এবং শিবানুচরদের সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়বার ওই পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। অদূরে দাঁড়িয়ে এই পরিস্থিতি লক্ষ করছিলেন নারদ। তিনি সত্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র সহ অন্যান্য দেবদেবীদের সংবাদ দেন এবং সমস্ত দেবতারাই কৈলাসে এসে উপস্থিত হন। প্রজাপতি ব্রহ্মাও এই পর্বে ওই বালককে নানা উপায়ে দ্বারদেশ ছেড়ে দেওয়ার জন্য বোঝাতে থাকেন। কিন্তু, কোনওভাবেই তাঁকে সম্মত করা গেল না। উপরন্তু বালকটি দাড়ি-গোঁফ ছিঁড়ে এমনভাবে ব্রহ্মাকে নাস্তানাবুদ করেন যে, প্রাণভয়ে তিনি পলায়নে বাধ্য হন। এরপর প্রমথগণ এবং দেবতারা সম্মিলিতভাবে ওই বালকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে পরাভূত করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই অবস্থায় ওই দুর্দান্ত বালককে নির্জিত করতে শিব ও বিষ্ণু পরামর্শক্রমে একটি রণকৌশল অবলম্বন করেন। বিষ্ণু সামনে থেকে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং শিব পিছন থেকে ত্রিশূল দ্বারা ওই বালকের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। মুণ্ডহীন ধড় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। নারদের মাধ্যমে পুত্রের এই মৃত্যুসংবাদ অন্তঃপুরে পার্বতীর কাছে পৌঁছলে তিনি শোকাকুল হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। পুত্রের বিয়োগব্যথায় অধীর পার্বতী ক্রোধন্মত্ত হয়ে তাঁর শরীর থেকে বিভিন্ন শক্তিরূপিণী নারীদের সৃষ্টি করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টির বিনাশে ব্যাপৃত হন। স্তব-স্তুতির মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করার বহু চেষ্টা করা হলেও তিনি কোনও অবস্থাতেই শান্ত হন না। অবশেষে নারদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে তিনি জানান, তাঁর মৃত পুত্রকে পুনর্জীবন প্রদান করে যদি তাঁকে সমস্ত দেবতাদের পূজনীয় এবং শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করা হয়, তবেই তিনি ক্রোধ সংবরণ করবেন। দেবীর কথা অনুযায়ী, মৃত পুত্রের কর্তিত মুণ্ড খোঁজবার বহু চেষ্টা হয়, কিন্তু কোথাও ওই ছিন্ন মুণ্ড পাওয়া যায় না। শেষে শিবের আদেশে তাঁর অনুচরগণ বালকের ধড়টিকে স্নান করিয়ে তাঁর পূজা-অর্চনা আরম্ভ করেন এবং অনুচরদের একজন উত্তরদিকে যাত্রা করেন। যাত্রাকালে প্রথম যার দেখা পাওয়া যাবে, তার মস্তক এনে বালকের ধড়ে প্রতিস্থাপন করলেই সে পুনরায় জীবনপ্রাপ্ত হবে। শিবানুচরেরা প্রথমেই এক হাতিকে দেখতে পেয়ে তার মাথা কেটে এনে ওই মুণ্ডহীন ধড়ে স্থাপনমাত্রেই মৃত পুত্র পুনর্জীবিত হল। পুত্রকে জীবিত দেখে পার্বতী আনন্দিত হয়ে তাঁকে স্নেহচুম্বনে ভরিয়ে দিলেন। শিবও এই পুর্নজাত গজাননকে নিজের পুত্র বলে গ্রহণ করলেন এবং পার্বতীর ইচ্ছানুসারে তাঁকে দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অগ্রপূজ্যরূপে ঘোষণা করলেন।

উপরোক্ত আখ্যানে, বিশেষভাবে যেখানে মায়ের 'একক' ভূমিকায় গণেশের জন্ম হয়েছে, সেখানে গণেশজন্মের নেপথ্যে শিব-পার্বতীর সম্পর্কের মধ্যে একধরনের লিঙ্গরাজনীতি প্রচ্ছন্নভাবে রয়ে গেছে। পার্বতীপুত্রের জন্মলাভ, শিব কর্তৃক অস্বীকৃতি, সংঘর্ষ ও মৃত্যু, পার্বতীর রোষ উদগার, হস্তীমুণ্ড এনে মৃত সন্তানের ধড়ে প্রতিস্থাপন, পুনর্জন্ম বা 'second birth', 'গণপতি' বা 'গণেশ' নামে প্রথম পূজ্য হিসেবে স্বীকৃতি---এই পুরো journey-টার মধ্যে অনিবার্যভাবেই রয়ে গেছে পিতৃতন্ত্র বনাম মাতৃতন্ত্রের লিঙ্গ-মনস্তত্ত্বগত ঘাত-প্রতিঘাতের একটি অদৃশ্য প্রেক্ষিত। প্রসঙ্গত *শিবপুরাণ*-এর গণেশজন্মের কারণটিই বিবেচনা করা যেতে পারে। পার্বতীর অনুমতির তোয়াক্কা না করেই নন্দীকে হটিয়ে শিব ইচ্ছেমতো পার্বতীর 'ব্যক্তিগত' কক্ষে প্রবেশ করেছেন। এখানে 'স্নান' ব্যাপারটাই তো প্রতীকী। এর সঙ্গে নারীর inner world বা অন্তর্জগতের সম্বন্ধ। তা ছাড়া 'স্নান' একান্ত ব্যক্তিগত যৌন মুহূর্তের উদযাপন। অথচ কেবলমাত্র স্বামীত্বের অধিকারে নারীর সেই নিজস্ব জগতের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে কর্তৃত্বপরায়ণ পুরুষ। পার্বতীর নিষেধ সত্ত্বেও নন্দীকে অগ্রাহ্য করে শিবের স্নানাগারে প্রবেশ পার্বতীর অবস্থানকে subordinate করে দেয়। পার্বতী বুঝতে পারেন, তিনিও শিবের dominance-এর অধীন, তার উর্ধ্বে নন। গোটা কৈলাসে তাঁর একান্ত নিজস্ব কোনও 'গণ' বা আজ্ঞাবহ নেই, যে কেবলমাত্র তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার মর্যাদা রক্ষা করবে। ফলত, alternative voice বা বিকল্প স্বর নির্মাণের প্রয়োজন। ফলে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে নারীর নিজস্ব অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য পার্বতী নিজের অংশের কাউকে জন্ম দিতে চাইলেন। বোঝা যাচ্ছে, গণেশের জন্মটাই কার্যত contribution of mother cult, শুধু প্রথমবারের নয়, দ্বিতীয়বারের জন্মটাও। মা যখন একটা গোটা পুংশাসিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একা লড়াই করেন, বাধ্য করেন নিজের শক্তি ও ইচ্ছার কাছে ওই ব্যবস্থাকে নতজানু হতে এবং সর্বোপরি গোটা সমাজের সামনে প্রথম পূজ্য হিসেবে পুনর্জীবিত হস্তীমুখ সন্তানের identity প্রতিষ্ঠা করেন, তখন নিঃসন্দেহে তা সন্তানের গভীরতম মনে একটি স্থায়ী অভিঘাত তৈরি করে। ফলে মৃত্যু-ছোঁয়া এই নতুন জন্মের প্রেক্ষিতে গণেশের অবচেতনে mother archetype-এর প্রতি চিরস্থায়ী শ্রদ্ধা এবং কৃতার্থতার বোধ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। লিঙ্গ-মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে গণেশজন্মের এই আখ্যানকে একা মায়ের পথ চলার গল্প বলে মনে হয়। পার্বতীর গণেশকে জন্মদানের মধ্যে হয়তো 'single mother' ধারণার পূর্ববীজ থাকতে পারে। পার্বতী 'single mother' বলেই কি কেবল একা শিব নন, সম্মিলিত দেবকুল অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রের ষড়যন্ত্রেই নবজাতককে মরতে হল? ঠিক যে'ভাবে নারীপ্রাধান্যের যে কোনওরকম expression-কেই পুংশাসিত ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে। আসলে মাতৃত্বের সামাজিক সংজ্ঞার

ভেতরে যে পিতৃতন্ত্রের একটা অদৃশ্য থাবা থেকেই যায়, গণেশের প্রথম থেকে দ্বিতীয় জন্মের যাত্রাপথে সমাজ-ইতিহাসের সেই সূক্ষ্ম ও নির্মম চিহ্ন লুকিয়ে আছে।

গণেশ এবং গণেশ-জনক:

গণেশের জন্মবৃত্তান্তের দ্বিতীয় পর্যায় হল, পুরাণের এমন কয়েকটি আখ্যান, যেখানে পুরুষদেবতার অংশে গণেশের জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

১। *লিঙ্গপুরাণ* অনুসারে, তমো-রজোগুণাক্রান্ত দৈত্য, অসুর বা রাক্ষসদের কর্মপ্রচেষ্টায় বিঘ্নসৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইন্দ্র, বিষ্ণু, বৃহস্পতি প্রমুখ দেবগণ শিবের শরণাপন্ন হন এবং বিঘ্নরাজ গণপতিকে সৃষ্টির জন্য শিবের স্তব করতে থাকেন। শিব তাঁদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে স্বয়ং গণপতিরূপ ধারণ করলেন এবং পার্বতী সেই গজাননরূপী মহেশ্বরকে নিজগর্ভ থেকে প্রসব করলেন। এরপর শিবাংশে জাত গণেশ অসুরদের কাজে বিঘ্নসৃষ্টি করে দেবকুলের নিরাপত্তারক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন।[১৬]

লিঙ্গপুরাণ-এর গণেশজন্মের আখ্যানে জন্মসূত্রেই গণেশ শিবের সঙ্গে অভিন্ন-সম্পৃক্ত। দেবলোকের সুরক্ষার জন্য এমন একজন অধিনায়কের প্রয়োজন, যিনি নিজের বলবীর্যতায় দৈত্যদের শায়েস্তা করে শান্তিরক্ষা করবেন। সম্মিলিত দেবকুল এই উদ্দেশ্যে শিবের দ্বারস্থ হলে তিনি নিজের অংশেই এক তেজস্বী পুত্রের জন্মসম্ভাবনা তৈরি করেন, "বাচস্পতি সুরগুরু এইপ্রকার প্রার্থনা করিলে পর, দেবদেব শূলী উমা-গর্ভে সুরেশ্বর গণপতিরূপ ধারণ করিলেন।তখন শৈলাদি গণেশ্বরগণ ও ব্রহ্মাদি সুরেশ্বরগণ সমস্ত লোকনিদান ভবভয়-নিবারণ পরমেশ্বর গজানন-রূপী মহেশ্বরের স্তব করতে লাগিলেন।" লক্ষ করার বিষয় হল, এই আখ্যানে গণেশ মাতৃ-অংশে জাত নন; পিতার alternative soul হিসেবেই তাঁর জন্ম এবং প্রতিষ্ঠা। পার্বতীর 'গর্ভ' এখানে সন্তান জন্মের আধার বৈ আর কিছু নয়। নতুবা, শিবের বিভাসমন্বিত যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁর আবির্ভাবের প্রাক্কালে পার্বতীর গর্ভধারণের কোনও না কোনও সামঞ্জস্যপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যেত। অথবা এমন ভাবাও অসঙ্গত নয় যে, গণেশের জন্মঘটনার রূপায়ণে hetero normative sexual pattern অনুসারে স্বামীর ঔরসে স্ত্রীর গর্ভধারণের একটা সমাজ-অনুমোদিত প্রেক্ষাপট পুরাণকারের অবচেতনেও সক্রিয় ছিল। সে'কারণেই বোধহয় শিবের অংশোদ্ভূত হয়েও পার্বতীর গর্ভজাতরূপেই গণেশকে সর্বসমক্ষে আসতে হল। একা পুরুষ নারীর অংশগ্রহণ ছাড়াই সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন—এ'টা দৈবনির্ধারিত ব্যাপার হলেও সন্তান উৎপাদনের সামাজিক theory-র বিরুদ্ধে যায়। তাছাড়া, নবজাতক পুত্রের শারীরিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যে পিতার ব্যক্তিত্বের লক্ষণগুলিই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রতিফলিত

হবে--এ'টিও সমাজ-নির্ধারিত এক প্রত্যাশা। সামাজিক অর্থে 'বুদ্ধিপ্রধান' এবং 'শক্তিপ্রধান' পৌরুষের বৈশিষ্ট্যগুলি সঞ্চারিত হয় পিতা থেকে পুত্রের মধ্যে। কারণ, বুদ্ধিমত্তা এবং শক্তিপ্রদর্শনকেই সমাজ-নির্ণীত পৌরুষের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি মনে করা হয়, হৃদয়প্রাধান্যের দিকটি সেখানে প্রায়শই অবহেলিত থেকে যায়। মনে করা হয়, যে কোনও emotional attributes–ই কার্যত নারীর সূত্রে নবজাতকের ব্যক্তিত্বে প্রবিষ্ট হয়। দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সেবাধর্ম প্রভৃতি মানবিক সংবেদনা মাতার সূত্রেই জাতক লাভ করে। উলটোদিকে পিতার একক অংশে যেখানে তাঁর আবির্ভাব, সেখানে অনিবার্যভাবেই প্রধান হয়ে উঠেছে গণেশের শক্তিপ্রাধান্যের দিকটি। *লিঙ্গপুরাণ*-এ তাঁর জন্মবৃত্তান্তের মধ্যেই শক্রনিধনের উদ্দেশ্যটি নিহিত আছে। জন্মমুহূর্তেই শিব তাঁকে বরস্বরূপ বলেছেন, "হে আত্মজ! দৈত্যগণের বিনাশ, দেবগণের ও ব্রহ্মবাদী দ্বিজগণের উপকারের নিমিত্তই তোমার অবতার জানিবে।" এই আশীর্বচনের মধ্যেই তাঁর জন্ম এবং কর্মের উদ্দেশ্য ব্যখ্যাত হয়েছে। অতএব, যিনি স্বয়ং শিবের-ই alter-ego, তাঁর শক্তির অংশীদার, তাঁর অস্তিত্বের পরিকল্পনায় যে পিতৃপ্রধান ব্যবস্থার সমর্থনপুষ্ট masculinity–র প্রথানুগ সমীকরণ ব্যবহৃত হবে, এতে আর আশ্চর্য কী?

২। *বরাহপুরাণ* অনুসারে, দেবতা এবং ঋষিদের কার্যসম্পাদনে অসুরেরা নিরন্তর উপদ্রব সৃষ্টি করলে তারা মহাদেব শিবের কাছে বিঘ্ন অপসারণের জন্য একজন নতুন দেবতার প্রার্থনা জানান। তখন সহাস্যমুখ শিবের সম্মুখস্থ আকাশে তাঁরই হাস্যমুখ থেকে একজন সুদর্শন কুমারের জন্ম হয়। কুমারের রূপদর্শনে পার্বতীর অত্যধিক মুগ্ধতায় এবং প্রশস্তিতে ক্রুদ্ধ শিব অভিশাপ দেন যে, নবজাতক হস্তীমুখ, লম্বোদর এবং নাগপোবীতধারী হবেন। ক্রুদ্ধ হওয়ার সময় শিবের পদনিঃসৃত ঘাম থেকে অসংখ্য গজমুখ বিনায়কের জন্ম হয়। গণেশকে তাদের অধিপতিরূপে নিয়োগ করা হয়। গণেশ ও তাঁর গণেরা বিঘ্নকর ও গজাস্য বলে পরিচিত হন।[১৭]

বরাহপুরাণ বর্ণিত গণেশজন্মের আখ্যানেও গণপতির জন্ম একটি বিশেষ অভিপ্রায়কেন্দ্রিক। সেটি হল, ঋষিদের তপোশ্চর্যায় বিঘ্নসৃষ্টিকারী দৈত্যাদি অপশক্তিকে সংহার। এই উদ্দেশ্যে ঋষিগণ শিবের শরণাপন্ন হয়ে কৈলাসে সমবেত হলেন। কৈলাসে শিব তখন অন্য এক চিন্তায় ব্যাপৃত, অগ্নি বা পৃথিবীর মূর্তি থাকলেও আকাশের কোনও অবয়ব নেই কেন? এই ভাবনায় চিন্তান্বিত মহেশ্বর হাসতে হাসতে আকাশের দিকে তাকালে তাঁর হাসি থেকেই এক মূর্তিমান তেজস্বী হাস্যমুখ কুমার আবির্ভূত হলেন। সেই তেজোদৃপ্ত গুণবান কুমারের জন্মমাত্রেই দেবগণ তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করলেন। এই পর্যন্ত আখ্যানটি সরলরেখা ধরেই বেশ এগোচ্ছিল। এরপরই এল সেই চরম নাটকীয় মুহূর্ত, যখন শিবের স্ত্রী পার্বতীও সেই নবাবির্ভূত জ্যোতির্ময় কুমারের রূপে-গুণে যারপরনাই আকৃষ্ট

হলেন। আর তাতেই ঘটল বিষম বিপদ। সদ্যোসৃষ্ট কুমারের প্রতি স্ত্রীর মুগ্ধতা দেখে শিব বেজায় চটে গেলেন। এর ফল হল মারাত্মক। ঈর্ষাকাতর হয়ে শিব আত্মজকেই অভিশাপ দিয়ে বসলেন: এই মুহূর্ত থেকেই নবজাতকের হস্তীমুখ, স্ফীতোদর এবং নাগোপবীত হবে।

এখন প্রশ্ন হল, শিব যখন নিজের শক্তি দিয়েই গণেশকে রচনা করেছেন, তখন কী এমন কারণ ঘটল যাতে তিনি রুষ্ট হয়ে নিজের সৃষ্টিকেই বিকৃত করলেন? গভীরভাবে দেখলে গণেশের বিকটদর্শন হওয়ার এই অভিসম্পাতের মধ্যে এক অসংযত হঠকারী পিতৃহৃদয়কে চেনা যায়, স্বার্থে ঘা লাগলে যিনি নিজের পুত্রকেও রেহাই দেন না। বরং প্রয়োজন পড়লে পুত্রের নিজত্বটুকুও (originality) অবলীলায় ছিনিয়ে নিতে পারেন। এ তো এক অর্থে পুত্রের self বা আত্মকে নির্মম ধ্বংসের অপচেষ্টা। নিজের সন্তানকে জন্মমুহূর্তেই এমন নৃশংসভাবে শ্রীহীন করার উদাহরণ পুরাণকথায় খুব বেশি মিলবে না। আপাতভাবে সদ্যোসৃষ্ট কুমারের প্রতি শিবের রোষ উদগারের নেপথ্যে পার্বতীর রূপমুগ্ধতা নিশ্চয়ই একটা কারণ। তবে আমাদের মনে হয়, এই ঘটনার মূল শিবের মগ্নচেতনায় ক্রিয়াশীল এক জটিল মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে বিদ্যমান। লিঙ্গ-মনস্তত্ত্বের দিক থেকে একে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। গণেশের প্রতি পার্বতীর আকর্ষণসুলভ মুগ্ধতা সম্ভবত শিবের অবচেতনে একধরনের insecurity complex তৈরি করেছে। বিপরীতলিঙ্গক সমাজে পুরুষের প্রতি নারীর প্রেমজ আকর্ষণের কতকগুলি সাধারণ প্রবণতা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এদের মধ্যে একটি হল, সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীর কাছে (ব্যতিক্রম তো সবসময়ই থাকে) তথাকথিত 'wild'/'macho' বর্গের পুরুষরা তথাকথিত 'decorated' বর্গভুক্ত পুরুষদের চেয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত। আদুড় গা, সুদৃঢ় পেশি, কিংবা physical wildness-কেই পৌরুষের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অভিব্যক্তি মনে করা হয়। তুলনায় কিছুটা সুসজ্জিত, অলংকৃত, নমনীয় ব্যক্তিত্বের পুরুষরা পছন্দের প্রতিযোগিতায় একটু পিছিয়েই থাকেন। তথাকথিত 'রূপবান' পুরুষেরা সেই নিরিখে কিছুটা ব্রাত্যই বলা চলে। কেননা, বেশিরভাগ নারীর কাছেই বোধহয় পুরুষের রূপ বা সৌন্দর্য ততটা গুরুত্ব পায় না, যতটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তার শারীরিক দার্ঢ্য। সন্দেহ নেই, নারীর পুরুষের প্রতি আকর্ষণের এই বিচারধারা আদপেই পিতৃতন্ত্রের একদেশদর্শী নির্মাণ, যার ভেতর বলবত্তাকেই পৌরুষের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান ঠিক করা হয়েছে। যাবতীয় শোভনসুন্দর ভাব, বৈশিষ্ট্য, প্রসাধিত পুরুষদেহ অথবা তার নির্মল কোনও প্রকাশভঙ্গিকে নিতান্ত অপুরুষোচিত বলে 'পৌরুষ'-এর সামাজিক সংজ্ঞায়নের প্রকল্পে কিছুটা হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আলোচ্য আখ্যানে শিব স্বয়ং এই সমাজ-মানসিকতার অংশীদার, যিনি বিশ্বাস করেন অলংকৃত পুরুষের চেয়ে বলদৃপ্ত পুরুষই নারীর কাছে অধিক

আকর্ষণযোগ্য। অথচ এই পূর্বলালিত সংস্কারে প্রথম আঘাত লাগল তখন, যখন পার্বতী ওই সদ্যোজাত রূপবান পুরুষের সৌন্দর্যে মোহিত হলেন। এতদিন শিব জানতেন, পার্বতী শিবের সর্বত্যাগী, নিরাভরণ, অর্ধনগ্ন অথচ তেজোদৃপ্ত মূর্তিকেই পৌরুষের সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ ভাবেন। নবাগত কুমারের রূপদর্শনে পার্বতী যখন এতখানি মুগ্ধ হলেন, তখন শিবের স্বামীত্বের নিরঙ্কুশ অধিকারবোধে আঘাত লাগল। wild/macho male-এর পাশাপাশি decorated male-বর্গভুক্ত পুরুষেরাও যে পার্বতীর প্রীতিভাজন হতে পারেন; পার্বতীর মগ্নচেতনায় যে রূপবান পুরুষের প্রতিও আকর্ষণের কোনও চোরাগোপ্তা ভাঁজ থাকতে পারে, এটাই শিবের রোষ উদগারের প্রত্যক্ষ কারণ বলে মনে হয়। এরই পরোক্ষ প্রভাব এসে পড়েছে গণেশকে অভিশাপ দানের ঘটনায়। যদিও এ'টা স্পষ্ট করা ভালো যে, শিবের perspective থেকেই আমরা এই ধরনের মনোভঙ্গিকে বুঝতে চেয়েছি। পার্বতীর অন্তর্লোকে সম্ভবত সুন্দর দেহাবয়বের প্রতি একধরনের স্বাভাবিক মুগ্ধতা তৈরি হয়েছিল। একে যৌন আকর্ষণের সমতুল ভাবা বোধহয় সমীচীন নয়।

প্রসঙ্গত, *বরাহপুরাণ*-এর এই গণেশ জন্মকথার একটি ত্রুটিপূর্ণ উল্লেখের দিকে আলোকপাত করা যেতে পারে। বিশিষ্ট গণেশ-গবেষক Alice Getty ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ *Ganesa: A Monograph on the Elephant-faced God*-এর প্রথম অধ্যায়ে ('India: Origin of Ganesa. Ganesa in Indian Literature') *বরাহপুরাণ*-এর গণেশজন্ম অংশের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই অভিশাপদানের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উলটো তরফে ব্যাখ্যা করেছেন। মূল *বরাহপুরাণ*-এ যেখানে শিব কর্তৃক গণেশকে অভিশাপদানের কথা বলা হয়েছে, সেখানে তিনি লিখেছেন, 'When the goddess Uma(Parvati) saw the surpassingly beautiful youth whom Siva had created of his own will and without her participation, she uttered the following powerful curse: May thy head resemble that of an elephant and thy body be deformed by a huge belly.'[১৮] অর্থাৎ শিব নয়, গণেশকে গজমুখ এবং লম্বোদর হওয়ার অভিশাপ নাকি দিয়েছিলেন পার্বতী! এই পাঠান্তর যে তিনি *বরাহপুরাণ*-এর কোন সংস্করণে পেয়েছেন, বলা শক্ত। কারণ, *বরাহপুরাণ*-এর যে পাঠ তিনি দেখেছিলেন, পাদটীকীয় তথ্যসূত্র হিসেবে তার কোনও উল্লেখ নেই, আবার শেষে গ্রন্থপঞ্জিতেও (Sansktit Texts of Reference) তা অনুল্লিখিত। পাদটীকায় কেবল 'varaha-purana'— এইটুকু বলেই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের মনে হয়, এই পৃথক version-টির উৎস লুকিয়ে আছে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Vans Kennedy-এর *Researches into the Nature and Affinity of Ancient and*

Hindu Mythology গ্রন্থের 'Surya.— Ganesha' (xiv, pp. 353-354) শীর্ষক অধ্যায়ের গণেশ বিষয়ক আলোচনায়। এই অধ্যায়েই Kennedy *বরাহপুরাণ*-এর অভিশাপ দানের অংশটিকে শিবের বদলে পার্বতীর তরফে ব্যাখ্যা করেছিলেন। *বরাহপুরাণ*-এর কোন পাঠ দেখে তিনি এমন সিদ্ধান্ত করেছেন, তার কোনও উল্লেখ পাদটীকায় নেই। এরপর Kennedy-র এই ব্যাখ্যাটিই পাদটীকায় নাম ও পৃষ্ঠাসংখ্যা সহ অবিকল অনুসরণ করেছেন T. A. Gopinatha Rao, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *Elements of Hindu Iconography* গ্রন্থের 'Ganapati' শীর্ষক অধ্যায়ে (pp. 40-41)। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থে Getty সম্ভবত পূর্বসূরী Gopinath Rao-এর অনুসরণেই এই ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। এইভাবে Kennedy থেকে Gopinatha Rao হয়ে Getty পর্যন্ত *বরাহপুরাণ*-এর গণেশজন্ম প্রসঙ্গে একটা ভুলের ক্রম-পরম্পরা তৈরি হয়ে গেছে। গণেশ বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ-এর মর্যাদাপ্রাপ্ত Getty এই যে পূর্বজদের অনুসরণে মূল পুরাণের পাঠটিকে ভিন্নভাবে উপস্থিত করলেন, এতে সমস্যা হয়েছে দুটি। প্রথমত, যারা *বরাহপুরাণ*-এর মূল text না দেখে secondary source-এর ওপর ভর করবেন, বিশেষ করে Getty-র এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আলোচনা করবেন, তারা অনবধানতাবশতই ভুল করবেন। দ্বিতীয়ত, গণেশের জন্মকথার বিশ্লেষণে যারা মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির আশ্রয় নেবেন, তাদের প্রত্যেকেরই মূল পুরাণের পাঠটি না দেখার ফলে দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে ভিন্ন অর্থব্যাখ্যা তৈরি করে ফেলার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

গণেশ এবং গণেশজনক-জননী:

ভারতীয় সংস্কৃত পুরাকথায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণেশ 'parthenogenetic child' অর্থাৎ পুরুষ-নারীর যৌনসংসর্গ ব্যতীত জাত। নারী-নিরপেক্ষভাবে পুরুষাংশে অথবা এককভাবে নারীর অঙ্গজরূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। তবে দু'-একটি পৌরাণিক আখ্যান পাওয়া গেছে, যেখানে শিবের ঔরসে পার্বতীর গর্ভজাতরূপে গণেশের জন্ম হয়েছে। তবে সংখ্যায় অল্প হওয়ায় এই জাতীয় বৃত্তান্ত গণেশ জন্মের ক্ষেত্রে ততখানি হতে পারেনি। যেমন, ১। *পদ্মপুরাণ*-এর 'সৃষ্টিখণ্ড'-এর অন্তর্গত 'গণপতি স্তোত্র কীর্ত্তন' (৬৩) অধ্যায়ের ৫ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, "পার্ব্বত্যজনয়ৎ পূর্ব্বং সুতৌ মহেশ্বরাদিমৌ।/ সর্ব্বলোকধরৌ শূরৌ দেবৌ স্কন্দগণাধিপৌ।।"[১৯] অর্থাৎ পূর্বে পার্বতী মহেশ্বরের ঔরসে স্কন্দ ও গণাধিপ (গণেশ) নামে দুই সর্বলোকধর বীর পুত্র প্রসব করেন। *পদ্মপুরাণ*-এর 'সৃষ্টিখণ্ড'-এ এই একবারমাত্র শিবের ঔরসে পার্বতীর গর্ভজাত সন্তান হিসেবে গণেশজন্মের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২। *গণেশ পুরাণ*-এর ‘ক্রীড়াখণ্ড’-এর ১২৯ নং অধ্যায়ে সিন্দূর নামক দৈত্যের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য দেবতা এবং মুনি-ঋষিরা জগৎস্রষ্টা বিনায়কের শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, দ্বাপরে তিনি শিব-পার্বতীর ঘরে সর্বার্থসিদ্ধিকারক চতুর্ভুজ গজাননরূপে অবতারধারণ করে সিন্দূরাদি মহাদৈত্যের নিধন করবেন। সেইমতো শিবের অনুগ্রহে পার্বতীর গর্ভসঞ্চার হয় এবং সেই গর্ভ শুক্লপক্ষের চাঁদের মতো প্রতিদিন বাড়তে থাকে। একটিমাত্র শ্লোকে শিবের ঔরসে পার্বতীর গর্ভধারণের বর্ণনা পাওয়া যায়: “ততোহকস্মাদ্‌ধৈমবতী শিবানুগ্রহতো দধৌ। গর্ভং স ববৃধেহত্যন্তং দিনে দিনে যথা শশী।।”[২০] (১২৯ অধ্যায়, ৩১ নং শ্লোক)

তবে পুরাণ ছাড়াও আগমাদি শাস্ত্রে শিব-পার্বতীর মিলিত অংশগ্রহণে গণেশ জন্মের উল্লেখ পাওয়া গেছে। যেমন, শৈবাগম শাস্ত্র *সুপ্রভেদাগম*-এর ৪৩ নং অধ্যায়ে (‘অথ বিঘ্নেশস্থাপনাবিধিপটল’) আছে, হিমালয়ের পাদদেশে বিহাররত অবস্থায় এক হস্তী-হস্তিনীর মৈথুনমুহূর্ত দেখে শিব-পার্বতীর মধ্যে মিলনেচ্ছা জাগ্রত হয়। তাঁরাও হস্তী-হস্তিনীমূর্তি ধারণ করে সংগম যাপন করেন। ফলে শিব-পার্বতীর সুরতক্রীড়ায় যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তিনিও গজমুখযুক্ত হন।[২১]

প্রসঙ্গত, আরেকটি বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। প্রাচ্য বিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু *বিশ্বকোষ* (পঞ্চম ভাগ)-এর ‘গণেশকুণ্ড’ শীর্ষক টীকায় গণেশজন্মের একটি উপাখ্যান প্রসঙ্গে লিখছেন,

> স্কন্দপুরাণে গণেশখণ্ডে এই কুণ্ডটীর উৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে— একদিন পার্ব্বতী ও শিব পর্য্যঙ্কাসনে নিদ্রিত ছিলেন। সেই সময়ে সিন্দূর নামক একটা দুষ্ট দৈত্য আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। পার্ব্বতী ও শিবকে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া সিন্দূর পার্ব্বতীর উদরে প্রবেশ করিল এবং পার্ব্বতীর সন্তানের মুণ্ড কাটিয়া লইয়া বাহির হইল। ঐ গর্ভে গণেশের জন্ম হয়। সিন্দূর গণেশের মুণ্ডটী নর্ম্মদার তীরে যে স্থানে রাখিয়াছিল, সেই স্থানে একটী কুণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম গণেশকুণ্ড। এই কুণ্ডের নিকটবর্তী শিলাখণ্ড রক্তবর্ণ, কেহ কেহ সেই শিলাখণ্ডকে গণেশ শিলা বলিয়া থাকেন।[২২]

পূর্ববর্তী গবেষকদের অনেকেই নগেন্দ্রনাথের সমর্থনে *স্কন্দপুরাণ*-এর এই গণেশজন্মের বৃত্তান্তটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু *স্কন্দপুরাণ*-এর সাতটি খণ্ডের কোথাও নগেন্দ্রনাথ উল্লিখিত এই উপাখ্যানটি পাওয়া যায় না। নগেন্দ্রনাথ কোন সূত্র থেকে *স্কন্দপুরাণ*-এর ‘গণেশখণ্ড’-ধৃত এই ভাষ্যটি পেয়েছিলেন, বলা মুশকিল। বঙ্গদেশে রচিত ও সংকলিত *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর ‘গণেশখণ্ড’ একটি পরিচিত অংশ হলেও *স্কন্দপুরাণ*-এ আদৌ ‘গণেশখণ্ড’ নামে

পৃথক কোনও পর্ব বা অধ্যায় আছে বলে মনে হয় না। *স্কন্দপুরাণ*-এর প্রচলিত কোনও সংস্করণে (নবভারত বা চৌখাম্বা প্রকাশিত) এই ধরনের আখ্যান আমরা অন্তত খুঁজে পায়নি। বরং *গণেশপুরাণ*-এর 'ক্রীড়াখণ্ড' অংশে (১২৯ - ১৩৭ নং অধ্যায়) দ্বাপরে গজানন অবতারের দ্বারা সিন্দূর নামক দৈত্যনিধনের বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। ক্রীড়াখণ্ডের ১৩২ নং অধ্যায়ে শিশু গজাননের রক্তে নর্মদা তীরবর্তী শিলা রক্তবর্ণ হওয়ায় সেই সূত্রে 'নার্মদ গণেশ' প্রসঙ্গ এবং ১৩৭ নং অধ্যায়ে সিন্দূর দৈত্যের রক্ত গায়ে মেখে গজাননের 'সিন্দূরবদন' বা 'সিন্দূরপ্রিয়' নামধারণ, এর পুরোটাই *গণেশপুরাণ*-এর অন্তর্গত উপাখ্যান। আমাদের মনে হয়, লেখবার সময় লেখকের অসতর্কতাবশত এই দুই টেকস্‌টের মধ্যে কোনও অদলবদল ঘটে থাকতে পারে। আসলে পৌরাণিক আখ্যান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোন পুরাণের কোন বিশেষ পাঠটি বিবেচনা করছেন, লেখকের তরফে সেটি নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। তা না হলে আখ্যানের উৎসমূল খুঁজতে পরবর্তী সময়ের গবেষকদের সমস্যায় পড়তে হয়।

খ. গণেশের বাল্যলীলা:

গণেশের শৈশব-কৈশোরের উপস্থাপনা ভারতীয় পুরাণকথার এক বর্ণময় অধ্যায়। বিস্তৃতভাবে না হলেও বিভিন্ন এপিসোডের মধ্যে মধ্যে শিশু বা কিশোর গণেশের বাল্যলীলার উদ্‌ভাসন চোখে পড়ারই কথা। একটি নির্ভেজাল পারিবারিক চালচিত্রে সদ্যোজাত সন্তানের বাল্যযাপনের মুহূর্তগুলি যেমন প্রাকৃতিকভাবেই দৃষ্ট হয়, পুরাণকথাতেও তেমনই গণেশের বাল্যকালীন মূর্তিটি সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এই রূপায়ণ অনেকাংশেই মর্ত্যানুগ, প্রাকৃত জীবনের অনুরূপ। দেবতার জন্মবৃত্তান্তের পরের ধাপে এই শৈশব-কৈশোরের উপস্থাপনায় নবজাতকের চাপল্য, অস্থিরতা, পিতা-মাতার সঙ্গকামনা এবং শৈশবক্রীড়ার বহুবর্ণিল রূপ পুরাণকারের বর্ণনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মানবজীবনের স্বাভাবিক রূপায়ণ যেমন এই ধরনের উপস্থাপনার একটা দিক, তেমনই শিশুদেবতার বালকোচিত মুদ্রার ফাঁকে ফাঁকে মিশে যায় নিহিত মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তিও। দেবতার দিব্য আবির্ভাবের পর এই পর্যায়ে স্বভাবতই অলৌকিকের ঘেরাটোপেও লেগে থাকে লৌকিকের স্পর্শ। শিশু-কিশোরের নির্মল মমতামাখা অনাবিল মুহূর্তগুলির মধ্যে পরিবার জীবনের এক স্নিগ্ধমধুর রূপ ফুটে ওঠে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যাক।

১। *শিবপুরাণ*-এ গণেশজন্মের পর পার্বতী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মাতৃসুলভ স্নেহ ও ভালোবাসায় শিশুপুত্রকে আলিঙ্গন এবং চুম্বন করেছেন ("তদীয়ং রূপমালোক্য সুন্দরং হর্ষমাগতা।/ মুখমাচুম্ব্য সুপ্রীত্যালিঙ্গয়তং কৃপয়া

সুতম্।।", ৪। ১৩। ২৬-২৭)।[২৩] *বামনপুরাণ*-এও শিশুপুত্রের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরে পার্বতী বিনায়ককে আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ করেছেন।[২৪]

২। *ভবিষ্যপুরাণ*-এর বর্ণনায় স্তন্যপানরত গণেশের ছবি পাওয়া যায়। পার্বতীর স্তন্যপানকালে গণেশের ঈর্ষাভরা দু'চোখে মিশেছিল এই বিষয়ে ভাই কার্তিককে টেক্কা দেওয়ার আনন্দ। শিব অদূরে বসে গণেশের এই দুষ্টুমি লক্ষ করছিলেন এবং তিনি ঘোষণা করলেন বিঘ্নরাজ গণেশ 'লম্বোদর' (ঔদরিক বা উদরসর্বস্ব অর্থে) নামে পরিচিত হবেন।[২৫] এই প্রবণতা উলটো তরফেও সত্য। পারিবারিক পরিসরে গণেশ-কার্তিকের মধ্যে এই জাতীয় পক্ষপাতমূলক দ্বন্দ্ব শিশুকাল থেকেই লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া শিব-পার্বতীর সঙ্গসুখ কে বেশি পরিমাণে লাভ করবে অর্থাৎ কে কতখানি পিতা-মাতার কাছাকাছি আসবে--- এই নৈকট্যকামনা নিয়ে দুই ভাই গণেশ-কার্তিকের মধ্যে এক ঈর্ষাকাতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁদের শিশুবয়সেও দুর্লক্ষ্য নয়। *ব্রহ্মপুরাণ*-এর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, একদা পার্বতী যখন গণেশকে কোলে নিয়ে আদর করছেন, তখন সেই দৃশ্য দেখে কার্তিক ঈর্ষান্বিত হয়ে মায়ের কোলে উঠে পড়েছে। কারণ, কার্তিক মাতা পার্বতীর কাছে গণেশের থেকেও অতিরিক্ত প্রাধান্য ও মনোযোগ প্রত্যাশা করেন ("জিহ্বা রিপূন্দেবগণানপ্রপূজ্য গুরুং নমস্কর্তুমগাদ্ধিশাখঃ।/ চুকোপ দৃষ্টবা গণনাথমূঢ়মঙ্কে তমারোপ্য জহাস সোমঃ।।", ১১০। ১০৫)।[২৬] মায়ের সঙ্গসুখলাভের জন্য দুই ভাইয়ের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্ক শিশুদেবতার বাল্য-কৈশোরলীলার উজ্জ্বল চিত্রণ।

৩। শিশু গণেশ পিতা-মাতার অকৃত্রিম সান্নিধ্য ও স্নেহছায়ায় বেড়ে উঠছিলেন। বিশেষত গজমুখ হিসেবে পুনর্জন্মলাভের পর গণেশের বিষয়ে শিব-পার্বতী দুজনেরই মনোযোগ, যত্ন, আদর অনেক বেড়ে গিয়েছিল। গণেশকে কেন্দ্র করে তাঁদের বাৎসল্যের পূর্ণস্ফূর্তি তো ঘটেছিলই, এমনকী তাঁদের স্নেহাশীষ সর্বদাই শৈশবে গণেশকে ঘিরে ছিল। তাঁরা কার্তিক-গণেশ দু'জনেরই শিশুকালের দিব্যক্রীড়ার সাক্ষী ছিলেন। দু'জনের প্রতিই শিব-পার্বতীর অকুণ্ঠ স্নেহ ও ভালোবাসার প্রকাশ বাড়তে লাগল দিনে দিনে। দুই পুত্রকে পেয়ে মাতা-পিতারও আনন্দের সীমা রইল না। পুত্রেরাও আনন্দ ও ভালোবাসার সঙ্গে শৈশবক্রীড়ায় মেতে উঠলেন। সন্তানেরাও মাতা-পিতার প্রতি তাঁদের গভীর আনুগত্য প্রকাশ করলেন, যা চাঁদের উজ্জ্বল অংশের মতোই দিনে দিনে বাড়তে লাগল। *শিবপুরাণ*-এর 'জ্ঞানসংহিতা'-র (৩৫। ১১ - ১২) বলা হয়েছে, "ষণ্মুখশ্চ গণেশশ্চ পিত্রোরধিতরং তথা।।/ স্নেহশ্চৈব ব্যবর্দ্ধেতাং শুক্লপক্ষে যথা শশী।"[২৭]

৪। শিব-পার্বতীও সন্তানদের শিশুসুলভ আচরণে অত্যন্ত আহ্লাদিত হলেন। এ প্রসঙ্গে গণেশের শৈশবকালীন নৃত্য প্রদর্শনের বর্ণনাও পুরাণের বর্ণনায় পাওয়া যায়। *ভবিষ্যপুরাণ*-এ আছে, গণেশ একবার তাঁর মা পার্বতীর সামনে নৃত্য-গীত প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁকে আনন্দদান করেছেন ("যোমাতরং সরসৈনৃত্যগীতৈস্তথাহ ভিলাসৈরখিলৈ বিনোদৈঃ।/ সংতোষয়ামাস তথাতি তুষ্টং......।।", ১১৪। ১৬)।[২৮] ভারতীয় মানসে শিবের নৃত্যপারঙ্গমতার ভাবনা সুবিদিত, যিনি 'নটরাজ' নামে সাধারণ্যে পরিচিত। তাঁরই পুত্ররূপে গণেশের নৃত্যকুশলতায় হয়তো আশ্চর্যের কিছুই নেই। এ যেন এক দিব্য উত্তরাধিকার, পুত্রের মধ্যে পিতার গুণের আত্মীকরণ। গণেশের নৃত্যরূপায়ণের সাক্ষী যে তাঁর মা একাই, তা নয়, পিতা শিবের সামনেও গণেশ তাঁর শৈশবনৃত্যের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। *ভবিষ্যপুরাণ*-এর একজায়গায় আছে, শিব যখন অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে একত্রে বিরাজমান, তখন তিনি গণেশকে নৃত্য পরিবেশনের জন্য আর্জি জানান। গণেশও প্রসন্নচিত্তে পায়ে নূপুর বেঁধে নৃত্যে অবতীর্ণ হন। শিব তখন তাঁকে 'গণনায়ক' উপাধিতে ভূষিত করেন ("সর্বোষ্টিতোদেবগণৈর্মহেশঃ প্রর্বততাং নৃত্যমিতীত্যবাচ।/ সংতোষিতো নূপুরএবমাত্রাদগণেশ্বরত্বেহ ভিষিষেচ পুত্রম্।।", ১১৪। ১২)।[২৯]

৫। শিশুপুত্রের বালকোচিত চাপল্য শৈশবের স্বাভাবিক ধর্ম। পুরাণকথায় গণেশের শৈশবকালীন রূপের বর্ণনাতেও তেমনই চপল মাধুরী মিশে আছে। *ব্রহ্মপুরাণ*-এর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, পার্বতীর ক্রোড়স্থিত গণেশ শিশুসুলভ আবেগে বারবার মাতার নিষেধ সত্ত্বেও নিতান্ত খেলার ছলে শিবের মস্তকে জটার সঙ্গে শোভিত অর্ধচন্দ্রটিকে লুকিয়ে ফেলার বা গোপন করার চেষ্টা করছেন ("যোমাতুরুৎসংগগতোহথমাত্রা নির্বায়মাণোপি বলাচ্চচন্দ্রম্।/ সংগোপয়ামাস পিতু জটাসু গণাধিনাথস্থ বিনোদ এষঃ।।", ১১৪। ১০)।[৩০]

৬। *শিবপুরাণ*-এ পার্বতীর অঙ্গমলজাতরূপে গণেশের প্রথম জন্মের পর তিনি যখন মায়ের আদেশে স্নানাগারের দ্বারদেশে প্রহরারত ছিলেন, সেই সময় তাঁকে দেবলোকের যুযুধান সব পক্ষের প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়।[৩১] এই অধ্যায়ের একটি অংশে শিব যখন ওই অপরিচিত বালককে নিবারিত করার জন্য প্রথমে ভূতগণ ও পরে ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করেন, তখন শিশু গণেশের হাতে যে'ভাবে সৃষ্টিকর্তা নাস্তানাবুদ হন, অনেক পণ্ডিতের মতে অভিভাবকস্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠের এই মানহানির ঘটনায় গণেশের শৈশবোচিত আচরণ ও অপরিণত বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। বিশেষত ব্রহ্মা শিবাদেশে গণেশকে পুনর্বার বোঝানোর জন্য কৈলাসে উপস্থিত হলে তাঁকে গণেশের রোষের মুখে পড়তে হয়। ক্রুদ্ধ গণেশ একটি দণ্ড নিয়ে ব্রহ্মাকে উগ্রভাবে আক্রমণ তো করেনই, এমনকী যথেষ্ট জোরে তাঁর দাড়িসুদ্ধ ধরে টান মারেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা এতে কিছুটা অসহায় বোধ করলেও শেষ চেষ্টা হিসেবে তিনি

গণেশকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, কৈলাসে তাঁর আগমন সমঝোতা স্থাপনের জন্য, যুদ্ধের জন্য নয়। যদিও গণেশ তাঁর কোনও কথাতেই গুরুত্ব না দিলে তিনি ভয়ে চিৎকৃত অবস্থায় সেখান থেকে পালিয়ে যান। এর পরবর্তী ঘটনা সকলেরই জানা। এই রোষোদ্‌গারের ফলস্বরূপ তাঁকে মুণ্ডহীন হতে হয়। পরে অবশ্য হস্তীমুণ্ড প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে তিনি পুনর্জীবিত হন। অধ্যাপক Shanti Lal Nagar তাঁর *Cult of Vinayaka* গ্রন্থে পরমপূজ্য বিধাতাকে এইভাবে আক্রমণের মধ্যে গণেশের ‘immaturity’ ও ‘childish behaviour’ লক্ষ করেছেন। অন্যভাবে দেখলে মনে হয়, বালকত্বের উদ্‌যাপন এই জাতীয় বর্ণনায় কেবল অমলিন নির্মলতামাখা-ই নয়, ‘বালক’ এক্ষেত্রে যথাসম্ভব ‘বীর’-ও (‘বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়’) বটে। মায়ের আজ্ঞাবহরূপে দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও সে অকুতোভয়। বালকাবস্থার আখ্যানে বীরদর্পের এই উন্মেষ, শৌর্যবীর্যের এই অবতারণা নিখাদ শিশুত্বের বাইরেও চরিত্রায়ণে অন্য এক মাত্রা যুক্ত করে। হয়তো বালকত্বের গভীরে সামাজিক অর্থে ‘পৌরুষ’-এর সংজ্ঞা নির্মাণের একটা চেষ্টা চলেছিল। প্রথম জন্মের মধ্যে থেকে যাওয়া এই অসমসাহসী যোদ্ধামূর্তির সূত্রে গজানন-পূর্ব জীবনের এক বালকবীরের জন্মকথা মনে পড়ে।

৭। অন্য আরেকটি বর্ণনায় গণেশের শৈশবলীলার চিত্র পাওয়া যায়। বর্ণনাটি অত্যন্ত উপভোগ্য ও মনোরম, প্রায় চলচ্ছবির মতো। শিবের মাথার অর্ধচন্দ্রটি নেওয়ার জন্য শিশু গণেশ একটি পদ্মের বোঁটার সাহায্যে অর্ধচন্দ্রটি খোলার চেষ্টা করছেন সহজে নাগাল পাওয়ার জন্য গণেশ যখন শিবের কোলে চড়ে অর্ধচন্দ্রটি তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন, হঠাৎ অনুভব করলেন শিবের তৃতীয় নেত্র থেকে আগুন উদ্‌গীরণের উপক্রম হয়েছে। ইতোমধ্যে শিবের একটি সাপ, যে শিবের মস্তক-উদ্‌গত গঙ্গার জলপানে নিজের তেষ্টা নিবারণ করছিল, গণেশের আচরণে বিব্রত হয়ে তাঁর দিকে ছোঁ মেরে তেড়ে আসে। ফলে গণেশ কিছুটা বলশূন্য বা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় মাতা পার্বতী গণেশকে ধরে নেন এবং সোহাগভরে তাঁকে নিয়ে অন্যত্র চলে যান।[৩২]

৮। গণেশের বালমূর্তি *শ্রীতত্ত্বনিধি* গ্রন্থে গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে মুদগলপুরাণোক্ত দ্বাত্রিংশ গণপতি ধ্যানের প্রথম ধ্যানে ‘বাল গণপতি’-র শৈশবরূপের বর্ণনায় বলা হয়েছে, “করস্থকদলীচূতপনসেক্ষুকমোদকম্।/ বালসূর্যনিভং বন্দে দেবং বালগণাধিপম্।।” অর্থাৎ তিনি হাতে কলা, আম, কাঁঠাল, ইক্ষু ও মোদক ধারণ করেছেন। তাঁর অঙ্গদীপ্তি নবোদিত সূর্য বা বালার্কের সঙ্গে তুলনীয়।[৩৩]

৯। বাল্যলীলার শেষে গণেশ যৌবধর্মে পদার্পণ করেছেন। স্বভাবতই অঙ্গসৌষ্ঠবে পরিবর্তন এসেছে। সেই অনুসারে তাঁর দেহদীপ্তির বর্ণনাও হয়েছে ঊষাকালীন সূর্যের সাদৃশ্যে নয়, প্রভাতকালীন সূর্য বা তরুণারুণের সাদৃশ্যে।

বালকদশা ঘুচিয়ে তিনি নবতারুণ্যে উপনীত। *শ্রীতত্ত্বনিধি* গ্রন্থে বাল গণপতির ঠিক পরেই মুদগলপুরাণোক্ত 'তরুণ গণপতি'-র ধ্যানে তাঁর রূপের বর্ণনায় বলা হয়েছে, "পাশাঙ্কুশাপূপকপিত্থজম্বূস্বদন্তশালীক্ষুমপি স্বহস্তৈঃ।/ ধত্তে সদা যস্তরুণারুণাভঃ পায়াৎস যুষ্মাংস্তরুণো গণেশঃ।।"[৩৪] পূর্বোক্ত বাল গণেশের হস্তধৃত ফলসমূহের মধ্যে এখানে কেবল কদবেল ও জাম রয়ে গেছে। এ ছাড়া পাশ, অঙ্কুশ, পিঠা বা মিষ্টান্ন জাতীয় দ্রব্য, নিজ ভগ্নদন্ত, শালি ধান ও ইক্ষুদণ্ড দেখা যাচ্ছে।

গ. গণেশের বিবাহ:

গণেশ বিবাহিত না ব্রহ্মচারী, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিতণ্ডার শেষ নেই। দক্ষিণ ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি ব্রহ্মচারী রূপে বিদিত। যদিও উত্তরভারতে বহুলাংশেই গণেশকে বিবাহিত রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে বহুপ্রচলিত *শিবপুরাণ*-এর আখ্যানেই প্রধানত এই বিবাহের প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে।[৩৫] গবেষকদের মতে, মহারাষ্ট্রের সীমান্তে এসে গণেশের বিবাহ হয়েছিল, দক্ষিণে তিনি চিরকুমার ব্রহ্মচারীরূপেই প্রসিদ্ধ। দক্ষিণভারতের লোককথায়, আঞ্চলিক গাথায় বা শিল্পশাস্ত্রে গণেশ সর্বদা অবিবাহিতরূপেই চিত্রিত হয়েছেন। অন্যদিকে, উত্তরভারতীয় গণেশ বেশিরভাগক্ষেত্রেই ঋদ্ধি-সিদ্ধি নাম্নী দুই নারীযুগলের মধ্যমণি হয়ে অবস্থানরত।

শিবপুরাণ-এর ৩৫ ও ৩৬ নং অধ্যায়ে গণেশ ও কার্তিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সূত্রে গণেশের বিবাহের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।[৩৬] একদা শিব-পার্বতী তাঁদের দুই পুত্রের বিবাহের বিষয়ে চিন্তিত হন। কারণ, তাঁরা দু'জনেই 'আমি অগ্রে বিবাহ করিব' ('পরস্পরঞ্চ নিত্যং বৈ বাদে চ তৎপরাবুভৌ')—এই বলে পরস্পর নিত্য বিবাদ করে। এরই মধ্যে একদিন শিব-পার্বতী তাঁদের ডেকে বললেন, মা-বাবার চোখে দুই পুত্রই সমান। কাজেই দু'জনের মধ্যে যে আগে বিশ্বপরিক্রমা করে আসবে, তাঁর বিবাহই আগে হবে। কার্তিক তৎক্ষণাৎ ময়ূরে চড়ে বিশ্বপরিক্রমায় বের হলেন এই বিশ্বাসে যে, স্থূলদেহ গণেশ কিছুতেই তাঁর ছোট্ট ইঁদুর বাহনটির সাহায্যে সর্বাগ্রে পরিক্রমা শেষ করে ফিরতে পারবেন না। কিন্তু বিচক্ষণ গণেশ শিব-পার্বতীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে বললেন যে, শাস্ত্রমতে তিনি মা-বাবাকে প্রদক্ষিণ করেই শতবার বিশ্বপরিক্রমার ফল লাভ করেছেন। বিস্মিত শিব-পার্বতী গণেশের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করে কার্তিক ফেরার পূর্বেই বিশ্বরূপের (ওরফে প্রজাপতির) দুই কন্যা সিদ্ধি ও বুদ্ধির সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়ে দেন। গণেশ বিবাহের পর পত্নীদের সাহচর্যে অচিন্ত্যনীয় সুখ লাভ করেন। কিছুদিন পরে সিদ্ধির পুত্র হয় লক্ষ (মতান্তরে ক্ষেম) ও বুদ্ধির পুত্র হয় লাভ। যখন কার্তিক বিশ্বপরিক্রমা শেষ করে ফিরে আসেন, তখন তিনি

নারদের কাছ থেকে গণেশের বিবাহের সংবাদ পেলেন এবং মনের দুঃখে ক্রৌঞ্চ পর্বতে গিয়ে আজীবন কৌমার্য পালন করলেন। আবার, *মৎস্যপুরাণ*-এর 'অর্দ্ধনারীশ্বরাদি প্রতিমা স্বরূপ কথন' শীর্ষক অধ্যায়ের (২৬০) ৫৫ নং শ্লোকে ('যুক্তস্তু ঋদ্ধি-বুদ্ধিভ্যাম...') গণেশকে ঋদ্ধি ও বুদ্ধিযুক্ত বলা হয়েছে।[৩৭]

এই দুটি উল্লেখ থেকে এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মূল ধারার পুরাণে গণেশ বিবাহিত হিসেবেই বর্ণিত। তাঁর পত্নীযুগল হিসেবে 'সিদ্ধি ও বুদ্ধি' অথবা 'ঋদ্ধি ও বুদ্ধি'-র নাম পাওয়া যাচ্ছে, এমনকী সিদ্ধি-বুদ্ধির পুত্র হিসেবে লক্ষ ও লাভের নামও উল্লিখিত। তলিয়ে ভাবলে দেখা যায়, এক্ষেত্রে সিদ্ধি, বুদ্ধি বা ঋদ্ধি পৃথক চরিত্র বা নাম হিসেবে ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতখানি গণপতি-তত্ত্বের সঙ্গে তাঁদের আভ্যন্তরীণ সংযোগ। কাজেই, এই বিবাহ সর্বার্থেই 'iconic', কোনও 'real divine event' নয়। গণেশের পত্নীরূপে যে নারীযুগলের নাম পুরাণাদি সূত্রে সচরাচর পাওয়া যায়, তাঁরা নিছক স্ত্রী, শক্তি বা consort নন, নিহিতার্থে তাঁরাও গণপতি-তত্ত্বেরই অধীন। ব্যাপক অর্থে metaphoric identity, এক-একটি গুণ বা বিশিষ্টতা, গণেশকে উপাসনায় সন্তুষ্ট করে ভক্তরা প্রসাদরূপে যা লাভ করেন। গবেষক M. Arunachalam 'Vinayaka Chaturthi' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'This is only an allegorical way of saying that Ganesa is the giver of all success and of all knowledge to his devotees.'[৩৮] এখানে সিদ্ধি অর্থে 'attainment of desires', 'success' বা spritual power বোঝানো হয়। বুদ্ধি বলতে 'intellect' এবং ঋদ্ধি বলতে 'growth', 'fortune' অর্থাৎ সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য বোঝানো হয়। আবার, সিদ্ধিপুত্র লক্ষ বা ক্ষেম 'prosperity' এবং বুদ্ধিপুত্র লাভ 'acquisition' বা 'profit'-এর দ্যোতক। বোঝা যায়, গণেশপত্নী বা গণেশ-পুত্রদের এই পরিচয়গুলো নেহাতই আপাতস্তরের, প্রকৃত অর্থে গণেশের প্রকাশরূপের মধ্যেই এই বিশিষ্ট ভাবগুলি অন্তর্লীন হয়ে আছে। গণেশ নিজেই তো সিদ্ধিদাতা(পাঠান্তরে ঋদ্ধি) এবং বুদ্ধিদাতা। এই অর্থেও পত্নীদের সঙ্গে তিনি 'প্রভু' ('owner of Riddhi and Siddhi') সম্পর্কে যুক্ত। এ প্রসঙ্গে Cohen তাঁর 'The Wives of Ganesa' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'They are depersonalized figures, interchangeable, and given their frequent depiction fanning Ganesa are often referred to as *dasis*---servants.'[৩৯] উদ্ধৃতি থেকেই স্পষ্ট যে, 'দাসী'-সম্পর্কে অধীনতাসূত্রে এঁরা গণেশের সঙ্গেই যুক্ত। তাঁদের স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নেই। এই একত্বের ইঙ্গিত পুরাণ-প্রমাণেও লভ্য। *স্কন্দপুরাণ*-এর মাহেশ্বরখণ্ডান্তর্গত 'কেদারখণ্ড'-এর ১০ নং অধ্যায়ের ৩৭ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'ঋদ্ধিসিদ্ধিদ্বয়েনৈব একত্বেন বিরাজিত' অর্থাৎ তিনি ঋদ্ধি ও সিদ্ধির সঙ্গে একীভূত হয়ে বিরাজ করেন।[৪০]

আবার, শিবপুরাণোক্ত সিদ্ধি-বুদ্ধির সঙ্গে গণেশের বিবাহকে একটি কেন্দ্রীয় archetype হিসেবে গ্রহণ করলে তন্ত্রমার্গেও এই সিদ্ধির ধারণার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্রে বা যোগদর্শনে সিদ্ধির ধারণা প্রশস্ত। এর সঙ্গে 'মোক্ষ'-বিষয়ক ধারণারও যোগ রয়েছে। পাতঞ্জল দর্শনে আটটি সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে, যেমন: অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব এবং কামাবসায়িত্ব। বিশেষজ্ঞ Mircea Eliade *Yoga, Immortality, and Freedom* গ্রন্থে জানিয়েছেন, বহু তন্ত্রশাস্ত্রে সিদ্ধির ধারণাকে 'direct proof of man's gaining divinity' বলে চিহ্নিত করা হয়।[৪১] সিদ্ধি এখানে পারত্রিক অর্থবহ, নিজের মধ্যেই ঐশিত্বের উন্মেষ। সিদ্ধিদাতা গণেশের কৃপাধন্য হয়েই একজন সাধক এই অষ্টসিদ্ধির অধিকারী হন। গণেশের শাক্ত-উপাসনায় এই অষ্টসিদ্ধির ধারণাকে আটজন দেবীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে দেখা যায়। পুণের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরের দেওয়াল চিত্রে দেখা যায়, অসুর দেবান্তকের নিধনের জন্য গণেশ অষ্টসিদ্ধির এই দেবীরূপগুলিকেই ('personified Asta Siddhi') কাজে লাগিয়েছেন। যদিও Getty-র মতে, অষ্টশক্তিগণ এক কেন্দ্রীয় দেবীরই আটটি ভিন্ন প্রকাশরূপ হিসেবে স্বীকৃত এবং সেই মূল দেবীই গণেশের শক্তি হিসেবে গৃহীত। অষ্টসিদ্ধির ধারণাকে Getty সপ্তমাতৃকার বিবর্তন বলে মনে করেছেন, গণেশ যাঁদের সঙ্গে স্থাপত্যশিল্পে প্রায়শই উপস্থাপিত হন।[৪২] এ ছাড়া মহারাষ্ট্রে গণেশের পত্নী হিসেবে সারদা বা সরস্বতীর নাম পাওয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্রেও লক্ষ্মী ও সরস্বতী গণেশপত্নী রূপে স্বীকৃত। সিদ্ধি-বুদ্ধি যেমন গণপতি-তত্ত্বের অন্তর্গত হয়ে আছে, লক্ষ্মী এবং সরস্বতীও নিহিতার্থে তেমনই সিদ্ধি-বুদ্ধি-কেন্দ্রিক ধারণারই নবরূপায়ণ। কারণ, ঋদ্ধি বা সিদ্ধি যে সাফল্য, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি বোঝায়, শ্রী ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী সেই গুণবাচক। লক্ষ্মী প্রসঙ্গে গবেষক Cohen 'structuralist logic' অনুসারে দেখিয়েছেন, অনুভূমিক স্তরে যে গণেশ ঋদ্ধি-সিদ্ধির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন, তিনিই আবার উল্লম্ব স্তরে লক্ষ্মীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হন। অন্যদিকে, লক্ষ্মী যেমন গজের সঙ্গে অনুভূমিক স্তরে যুক্ত, উল্লম্ব স্তরে তেমনই তিনি গজানন গণেশের সঙ্গে সংযুক্ত হন। অন্যদিকে, বুদ্ধির সঙ্গে যে বিবেক, বিচার ও মনীষার সংযোগ, জ্ঞানতত্ত্ব সরস্বতী তার মূর্তিমতী প্রতিমা। তা ছাড়া বিদ্যাক্ষেত্র এবং সুরক্ষেত্রের সূত্রেও সরস্বতী এবং গণেশের ভূমিকার সাদৃশ্য রয়েছে।[৪৩] কাজেই, লক্ষ্মী ও সরস্বতীও 'metonymic wives' হিসেবে সিদ্ধি (ঋদ্ধি)-বুদ্ধির মতোই গণপতি-তত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে আছেন। ভারতের এক-একটি প্রদেশে গণেশের বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে পৃথক পৃথক আখ্যান কখনও পুরাণসূত্রে, কখনও আঞ্চলিক প্রভাবে নানা গাথা বা কল্পকাহিনির মাধ্যমে, এমনভাবে প্রচারিত হয়েছে যে

একমাত্রিকভাবে কোনও সিদ্ধান্ত করা শক্ত। তবে গণেশের বিবাহ সংক্রান্ত ধারণায় আপাতভাবে পার্থক্য যাই থাক, বহুনামা গণেশপত্নীরা সকলেই যে গণপতি-তত্ত্বের আধারে সংশ্লেষিত হয়েছেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

ঘ. গণেশের মাহাত্ম্য এবং কর্মকৃতিত্ব :

গজানন গণেশের গণাধিপত্যলাভ পৌরাণিক আখ্যানগুলিতে নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। কখনও শিব বা ব্রহ্মার দ্বারা এককভাবে, কখনও পার্বতীর দ্বারা, আবার কখনও বা ত্রিদেবের দ্বারা গজানন-বিনায়ক 'গণপতি'-র পদমর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন। গণেশের নেতৃত্বমূলক ক্ষমতা *মৎস্যপুরাণ*-এর বর্ণনা থেকেই সূচিত। এই পুরাণের ১৫৪ নং অধ্যায়ের ৫০৫ নং শ্লোকে লোকপিতামহ ব্রহ্মা গজাননকে বিনায়কদের অধিপতিপদে ('বিনায়কাধিপত্যঞ্চ দদাবস্য পিতামহঃ') অভিষিক্ত করেছেন।[৪৪] অতএব *মৎস্যপুরাণ* প্রমাণে মোটামুটি তৃতীয়-চতুর্থ শতকের মধ্যেই তিনি 'গণপতি' বা 'বিনায়কাধিপতি'-র পরিচয়ে স্বতন্ত্র এক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। *বামনপুরাণ*-এর ৫৪ নং অধ্যায়ের ৭৩ ও ৭৪ নং শ্লোকে শিবমুখে বিনায়কের মাহাত্ম্য উচ্চারিত হয়েছে। বিনায়কের বিঘ্ননাশকারী চরিত্রের পরিচয়ও সেখানে স্পষ্টই পাওয়া যায়। শিব বিনায়ক প্রসঙ্গে পার্বতীর উদ্দেশে বলেছেন, 'এষ বিঘ্নসহস্রাণি দেবাদীনাং হনিষ্যতি।।/ পূজয়িষ্যন্তি দেবাশ্চ দেবি লোকাশ্চরাচরাঃ।' অর্থাৎ, পার্বতীপুত্র বিনায়ক দেবতা ও মানুষের বিঘ্নসমূহ নাশ করবেন এবং সমস্ত চরাচরের লোকের পূজনীয় হবেন।[৪৫] পুরাণ নিরিখে গণেশের অগ্রপূজ্যতার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় *স্কন্দপুরাণ*-এর 'মাহেশ্বর খণ্ড'-এর অন্তর্গত 'কেদারখণ্ড'-এ (১০ নং অধ্যায়)। সেখানে শিবমুখে উচ্চারিত শ্লোকে কাজের সূচনায় বিঘ্নেশ্বর গণাধিপের অর্চনার ('তস্যার্চ্চনাবিধিঃ কার্য্যো গণেশস্য মহাত্মনঃ।।/ কর্মারম্ভে তু বিঘ্নেশং যে নার্চ্চন্তি গণাধিপম্।') প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৬] এই পুরাণের 'কেদারখণ্ড'-এর ১১ নং অধ্যায়ে শিব গণেশপূজার বিধান বর্ণনা করেছেন।[৪৭] শুক্ল ও কৃষ্ণ, দুই পক্ষের চতুর্থীতেই গণেশের পূজা হতে পারে। শুক্লপক্ষে পরিষ্কৃত সাদা তিল দ্বারা স্নান করে গণেশকে গন্ধ, মাল্য ও অক্ষতাদি দ্বারা সযত্নে পূজা করার নিয়ম। শিবের মতোই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণভেদে গণেশের ভিন্ন ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। গণভেদে তাঁর বহুনাম। যেমন, 'কেদারখণ্ড'-এ তাঁর অষ্টনাম হল – 'পঞ্চবক্ত্র', 'গণাধ্যক্ষ', 'দশবাহু', 'ত্রিলোচন', 'কমনীয়', 'স্ফটিকনিভ', 'নীলকণ্ঠ' ও 'গজানন'। এ ছাড়া শিবমুখে গণেশ পূজাবিধান বর্ণনার সময় তাঁর আলাদা আলাদা দশটি নাম কীর্তিত হয়েছে। যেমন, 'গণাধিপ', 'উমাপুত্র', 'অঘনাশন', 'বিনায়ক', 'ঈশপুত্র', 'সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক', 'একদন্ত', 'ইভবক্ত্র' ও 'মূষক-বাহন'। পাশাপাশি তাঁকে 'কুমার-গুরু' ও 'সর্বত্রপূজ্য'-ও ('কুমার গুরবে তুভ্যং পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ') বলা হয়েছে। সাত্ত্বিক ধ্যানে পঞ্চমুখী গণেশ 'হেরম্ব'-নামা, দশবাহু ও সিংহবাহন।

মধ্যম মুখ গৌরবর্ণ, চারটি দাঁতযুক্ত ও ত্রিনেত্রবিশিষ্ট। তিনি অপূর্বসুন্দর শুণ্ডধারী এবং শুণ্ডে পদ্ম ও মোদক সংযুক্ত। অন্য মুখগুলি যথাক্রমে হলুদ, নীল, ও সাদা রঙের হয়। দশটি হাতে পাশ, কুঠার, পদ্ম, অঙ্কুশ, দাঁত, অক্ষমালা, লাঙল, মুষল, মোদকপাত্র এবং বরাভয় মুদ্রা প্রদর্শিত। তিনি লম্বোদর, বিরূপাক্ষ, মেখলা পরিহিত, যোগাসনে উপবিষ্ট ও মাথায় চন্দ্র শোভিত। রাজস ধ্যানে তিনি 'বিশুদ্ধ সুবর্ণসন্নিভ' অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ, গজমুখ, অলৌকিক রূপবান, চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন, একদন্ত, মহোদর, পাশ ও অঙ্কুশধারী এবং দাঁতে মোদকের পাত্র উপস্থিত। তামস ধ্যানে তিনি নীলবর্ণ। গুণভেদে গণেশের ত্রিবিধ ধ্যানের পর তাঁর পূজা করণীয়। পূজাকালে তাঁর উদ্দেশে একুশটি দুর্বা ও একুশটি মোদক অর্পণ করা হয়। *স্কন্দপুরাণ*-এর 'মাহেশ্বরখণ্ড'-এর অন্তর্গত 'কুমারিকাখণ্ড'-এ ২৭ নং অধ্যায়ে শিবের বয়ানে গণেশ তাঁর মতোই গুণযুক্ত।[৪৮] বিক্রমে, বীর্যে ও দয়ায় তিনি শিবসদৃশ। পাপী, দুরাচারী এবং বেদ ও ধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনে গণেশ বিঘ্নসৃষ্টি করেন। যারা বিষ্ণু ও শিবের প্রতি ভক্তিহীন, তারাই বিঘ্নরাজ গণেশের বিঘ্নের বশবর্তী হয়ে তমোময় নরকে যাবে। অন্যদিকে, গণেশ বৈদিক ধর্ম ও জ্ঞাতিধর্ম পালনকারী, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী, প্রকৃত দয়াবান ও ক্রোধশূন্য ব্যক্তিদের বিঘ্নবিনাশ করবেন। গণেশের পূজা না করলে ধর্ম-কর্মে বিভিন্ন বিঘ্ন সূচিত হবে। অতএব সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রথমে তাঁর পূজা করণীয়। তলিয়ে ভাবলে দেখা যায়, পুরাণের বিভিন্ন version-এ গজাননের গণপতিত্বের স্বীকৃতির মধ্যে একধরনের উভবলিতা আছে। একদলের পক্ষে তিনি বিঘ্নপ্রদ, অপর ক্ষেত্রে বিঘ্নহারক। নেতি এবং ইতিযুক্ত বিমিশ্র ভাবমূর্তি তাঁর। দেবমণ্ডলে তাঁর উদ্ভব ও কর্মক্ষমতা লাভের মধ্যেও বিঘ্নসৃষ্টি ও ধ্বংসের একটা তাৎপর্য রয়ে গেছে। *স্কন্দপুরাণ*-এর 'নাগরখণ্ড'-এর 'গণপতিত্রয়ের মাহাত্ম্য বর্ণন' অধ্যায়ে (১৪২) নাগমুখ গণেশে পার্বতীর আশীর্বাদে ত্রৈলোক্যবিজয়ী এবং মর্ত্যের স্বর্গ-মোক্ষাকাঙ্ক্ষী মানুষের শুভকাজে বিঘ্ন-উৎপাদক হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন।[৪৯] দেবী তাঁকে অসংখ্য শিবগণের কর্তা নন্দী ও মহাকালের অধিনায়কত্বের পদ দিয়েছেন। এইভাবে পার্বতীর দ্বারা নাগমুখের 'গণপতি' পদে অধিষ্ঠান। তাঁর মঙ্গলাভিষেকের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেবতা নানা উপহার দিয়েছেন। যেমন, শিব আয়ুধশ্রেষ্ঠ কুঠার, পার্বতী ভোজনের জন্য মোদকপূর্ণ পাত্র, কার্তিক ভ্রাতৃভাবে ও বন্ধুস্নেহে বাহনরূপ ইঁদুর, ব্রহ্মা ত্রিকালজ্ঞের জ্ঞান, বিষ্ণু প্রজ্ঞা, সহস্রাক্ষ উত্তম সৌভাগ্য, কামদেব সৌভাগ্য, কুবের ঐশ্বর্যসম্পদ, সূর্য প্রতাপ, চন্দ্র কান্তি এবং অন্য দেবতারা তাঁদের ইষ্টবস্তু প্রদান করেছেন। শুক্লা মাঘী চতুর্থীতে যারা গণেশের পূজা করে তাদের সারা বছর কখনওই বিঘ্ন ঘটে না। আবার, 'নাগরখণ্ড'-এর 'গণপতির পূজাবিধি ও মাহাত্ম্যকীর্ত্তন' অধ্যায়েও (২১৪) বলা হয়েছে মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে গণেশের পূজাসম্পন্নকারী ব্যক্তিরা বিঘ্ন থেকে মুক্তি লাভ করেন।[৫০]

এই অধ্যায়ের শেষাংশে গণেশের মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্য শিববাক্যের সমর্থনে বলা হয়েছে, গণনায়ককে স্মরণ করে অপুত্র পুত্র ও নির্ধন মহৎঅ্যাঁধন লাভ করে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়লাভে সমর্থ হয়। স্বামীপরিত্যক্ত ভাগ্যবিড়ম্বিত নারী সৌভাগ্য ফিরে পায়। এমনকী গণেশের মাহাত্ম্যকথা পাঠ বা শ্রবণকারী ব্যক্তির অনুষ্ঠানেও কখনও বিঘ্ন ঘটে না। 'প্রভাসখণ্ড'-এর 'অর্ব্বুদ'-খণ্ডান্তর্গত 'ঈশানী শিখর মাহাত্ম্য খ্যাপন' অধ্যায়েও শিববাক্যের সমর্থনে পৃথিবীতে সর্বমানবের নায়কপদে গণেশের অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।[৫১] তিনি সর্বাগ্রে ও অন্যান্য দেবগণ পরে পূজিত হবেন। *পদ্মপুরাণ*-এর সৃষ্টিখণ্ড-এর ৬৩ নং অধ্যায়ে ব্যাসবচন হিসেবে বলা হয়েছে, মানুষ বিঘ্ন অপোনদনের জন্য গণেশপূজা করে।[৫২] এই পূজা করলে মানুষেরা পরে বিনায়কত্ব প্রাপ্ত হয় এবং গৌরীপুত্রের মতো হয়ে থাকে। এ ছাড়া গণেশের অগ্রপূজ্যতার কারণ হিসেবে এখানে কার্তিক-গণেশের দ্বন্দ্বলীলার অবতারণা করা হয়েছে কিছুটা ভিন্নভাবে।[৫৩] পার্বতী একসময় 'মহাবুদ্ধি' নামে এক সুধারসনির্মিত মোদক দেখিয়ে ও তার গুণ করে ব্যাখ্যা গণেশ ও কার্তিককে এক প্রতিযোগিতার মধ্যে ঠেলে দেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে অধিক ধার্মিক হয়ে যে শত সিদ্ধি লাভ করবে, মোদকের অধিকারী সেই হবে। শোনামাত্রেই কার্তিক ময়ূরে চেপে বিশ্বের সমস্ত তীর্থ ঘুরে ও তীর্থস্নান সেরে ফিরলেন। অন্যদিকে, গণেশ কোথাও না গিয়ে শুধু মাতা-পিতাকে প্রদক্ষিণ করেই তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ফলস্বরূপ, পার্বতীর বিচারে গণেশই জয়ী হলেন এবং মোদকের অধিকারও তিনিই পেলেন। কেননা, যদি কেউ পিতা-মাতার অর্চনা করে, তবে সর্বতীর্থ স্নান, সর্বদেব নমস্কার, সমস্ত যজ্ঞ, ব্রত, মন্ত্র, যোগ ও বিবিধ যম নিয়মও তার ষোড়শাংশের তুলনীয় হতে পারে না। কাজেই, হেরম্ব শত শত পুত্রের থেকেও অধিক গুণশালী হিসেবে স্বীকৃত হলেন। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখেই *পদ্মপুরাণ*-এ সমস্ত যজ্ঞ, বেদশাস্ত্র পাঠ, স্তবপাঠ ও নিত্য পূজায় সর্বাগ্রে গণেশপূজা বিহিত বলা হয়েছে। নক্তাহার ব্যক্তি চতুর্থীতে গণেশের পূজা করবেন। লিঙ্গে বা প্রতিমাচিত্রে তাঁর পূজা করা কর্তব্য। গণপতি-গণেশকে এখানে 'সর্ববিঘ্নশান্তিপ্রদ', 'গণাধিপ', 'উমানন্দপ্রদ', 'প্রাজ্ঞ', 'হরানন্দকর', 'ধ্যানজ্ঞানবিজ্ঞানপ্রদ' ও 'বিঘ্নরাজ' বলা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষাংশে আবার পৃথকভাবে বারোটি মহিমাব্যঞ্জক অভিধায় তিনি ভূষিত হয়েছে। যেমন, 'গণপতি', 'বিঘ্নরাজ', 'লম্বতুণ্ড', 'গজানন', 'দ্বৈমাতুর', 'হেরম্ব', 'একদন্ত', 'গণাধিপ', 'বিনায়ক', 'চারুকর্ণ', 'পশুপাল' ও 'ভবাত্মজ'। যে ব্যক্তি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে এই নামাষ্টক স্তোত্র পাঠ করে, বিশ্ব তাদের বশীভূত হয়, তারা বিভিন্ন মারাত্মক রোগ-ব্যাধির প্রকোপমুক্ত হয় এবং সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। *শিবপুরাণ*-এর 'জ্ঞানসংহিতা'-য় গণেশের অগ্রপূজ্যতালাভ ত্রিদেবের মাধ্যমেই ঘটেছে। সেখানে বলা হয়েছে, "অগ্রে ইঁহার পূজা করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগের

পূজা করিবে; যদি অগ্রে গণেশের পূজা না করিয়া আমাদিগের পূজা করে, সেই পূজায় অল্পফল হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।"[৫৪] এ ছাড়া শিব বরস্বরূপ গণেশের 'বিঘ্নহর্তা' নামটিকেই শ্রেষ্ঠ নাম হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন। সমস্ত শিবগণের অধিপতি বা 'গণাধ্যক্ষ' হিসেবেও তিনি পূজ্যপদ লাভ করেছেন। *শিবপুরাণ*-প্রমাণে যেহেতু পার্বতী কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথির প্রথম প্রহরে গণেশকে নির্মাণ করেছিলেন, ফলে কার্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্থী 'চতুর্থীব্রত' হিসেবে পালিত হবে। গণেশপূজার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের মানুষকেই অধিকার দেওয়া হয়েছে। বিবিধ সিদ্ধিলাভের জন্য স্ত্রীলোক ও উন্নতিকামী রাজাও এই ব্রত করতে পারে। প্রথম পর্যায়ের গণেশজন্ম অংশেই বলা হয়েছে, *লিঙ্গপুরাণ*-এর গণেশ শত্রুঘাতী পরান্তপ তো বটেই, উপরন্তু প্রকৃতিতে তিনি শিবেরই দ্বিতীয় মূর্তি। গণেশ এবং মহেশ্বর এখানে সমার্থব্যঞ্জক। জন্মের অব্যবহিত পরেই বালক গণেশ শিব-পার্বতীর বন্দনা করে নৃত্য শুরু করেছেন।[৫৫] গণেশের নর্তনশীল রূপের পৌরাণিক প্রমাণ হিসেবে উল্লেখটি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত বৃহৎবঙ্গ সহ ভারতের অন্যান্য প্রান্তে যে নৃত্যরত গণেশমূর্তি প্রায়ই দেখা যায়, বিভঙ্গের দিক থেকে শিবের নটরাজ মূর্তির সঙ্গেই তার ভাবগত সাদৃশ্য চোখে পড়ে। *লিঙ্গপুরাণ*-এ গণেশ ও শিব অভিন্ন বলেই, জন্মের পরে দেবসমক্ষে গণেশের নৃত্য কার্যত নৃত্যকুশলতার সূত্রেও শিব-গণেশের সংযোগকে আরও দৃঢ় করে। *লিঙ্গপুরাণ*-এ গণেশের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, দৈত্যদের বিনাশ এবং দেবতা ও ব্রহ্মজ্ঞ দ্বিজগণের উপকারের জন্যই শিবাংশে তাঁর দেহধারণ। পৃথিবীতে যারা দক্ষিণা ছাড়া যজ্ঞ করে, গণেশ স্বর্গপথে উপস্থিত থেকে তাদের ধর্মবিঘ্ন ঘটাবেন। অন্যায় পথ অবলম্বন করে যারা অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ব্যাখ্যান ও কর্মানুষ্ঠান করবে, গণেশ প্রতিনিয়ত তাদের প্রাণসংহারে রত থাকবেন। এমনকী নিজ বর্ণ ও ধর্মচ্যুত নরনারীদের প্রাণনাশ করে তাদের সমুচিত ফল প্রদান করাই গণেশের কাজ। অন্যদিকে, যেসব স্ত্রী-পুরুষ সর্বদা গণেশের অর্চনা করবে, তাদের গাণপত্যলাভ নিশ্চিত হবে। যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে ইহলোক বা পরলোক সর্বত্রই তারা অতি যত্নসহকারে পালিত হবে। যারা ত্রিদেবের পূজা বা তাঁদের উদ্দেশে অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ করবেন, তাদেরও বিঘ্ননিবারণের উদ্দেশ্যে শুরুতে গণেশের পূজা করতে হবে। তাঁর পূজা না করে কোনও কল্যাণকর শ্রৌত, স্মার্ত বা লৌকিক কার্য করা হলে, কল্যাণ শেষপর্যন্ত অকল্যাণে পরিণত হবে। *লিঙ্গপুরাণ* অবশ্য *শিবপুরাণ*-এর মতোই চতুর্বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই সিদ্ধিলাভের জন্য গণেশার্চনার বিধান দিয়েছেন। *মনুসংহিতা*-র মতো তিনি কেবল শূদ্রপূজ্য নন। ত্রিজগতে মানুষ কোন ছাড়, স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত প্রথমে গণেশপূজা না করে কার্যসিদ্ধি করতে পারবেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবসহ অন্যান্য দেবতাদের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি বিশেষে তিনি বিঘ্নপ্রদ হতে পারেন। শিব এখানে 'বৎস', 'তনয়'

প্রভৃতি পুত্রবাচক বিশেষণ ছাড়াও গণেশকে 'নরপুঙ্গব', 'বিনায়ক', 'গণেশ্বর', 'বিঘ্নগণেশ্বর', 'গজেন্দ্রবদন' ও 'স্কন্দাগ্রজ'-রূপে মহিমান্বিত করেছেন।[৫৫]

ভারতীয় পুরাণকথায় গণেশের কর্মকৃতিত্বের নিদর্শন-ও সুলভ। *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ*-এর দ্বিতীয় খণ্ড-এ গণেশের সঙ্গে ভার্গব পরশুরামের যুদ্ধবৃত্তান্তের বর্ণনায় গজাননের ওজস্বিতা এবং প্রবল পরাক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়।[৫৬] শিব-পার্বতী অভ্যন্তরকক্ষে একাসনযুক্ত হয়ে আছেন বলে প্রথম থেকেই প্রহরারত গণেশ পরশুরামকে ভেতরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। একাধিক দৃষ্টান্ত বা শাস্ত্রবচন দেখিয়ে গুরুভ্রাতা ভার্গবকে যারপরনাই বোঝানোরও চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু ক্রোধবিবশ পরশুরাম গণেশের শক্তি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সচেতন না হয়েই তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি গণেশের দিকে শিবদত্ত কুঠার ছুঁড়লে পিতৃপ্রদত্ত অস্ত্রের যাতে অসম্মান না হয়, সেই কারণে গজানন তাঁর হস্তীমুখের বামদন্তে ওই অস্ত্রের আঘাত সহ্য করেন। ফলস্বরূপ তাঁর বামদন্তটি উৎপাটিত হয় এবং তিনি একদন্ত নামে পরিচিত হন। *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ* বর্ণিত এই আখ্যান বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-এও পাওয়া যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে বঙ্গীয় পুরাণে গণেশ প্রসঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রে পর্বটিকে বিস্তারিত করা হয়েছে।

ব্রহ্মপুরাণ (৭৪ – ৭৭ অধ্যায়) এবং *শিবপুরাণ*-এর 'জ্ঞানসংহিতা'-য় (৫২ – ৫৪ অধ্যায়) মায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য গঙ্গার মর্ত্যাবতরণের ঘটনায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়।[৫৭] গণেশের জন্মপ্রসঙ্গে গঙ্গার সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্কের বিন্যাস পৌরাণিক আখ্যানে পাওয়া গেছে, ইতোপূর্বেই যা আলোচনা করা হয়েছে, এখানে তার কিছুটা বিপরীত ব্যঞ্জনা লক্ষ করা যায়। বিপরীত, কারণ গণেশ এখানে গাঙ্গেয় নন, পার্বতীপুত্র। পৌরাণিক কল্পনায় শিব-পরিবারে গঙ্গা ও গৌরী সপত্নী সম্পর্কে বিদ্যমান। শিবকে কেন্দ্র করে এঁদের মধ্যে প্রায়শই চলে নিরঙ্কুশ অধিকারবোধের লড়াই। একদা শিব গঙ্গার প্রতি অতিরিক্ত প্রেমপরায়ণ হলে পার্বতী রোষবশত পিত্রালয়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পুত্র গণেশ তখন মাকে আশ্বস্ত করেন যে, তিনি পরিকল্পনামাফিক গঙ্গাকে শিবের জটা থেকে মুক্ত করবেন। গণেশের কথায় দেবী পিতৃগৃহে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করেন। এদিকে মাকে দেওয়া কথা রাখবার জন্য গণেশও সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। সেই সময় প্রায় চোদ্দ বছর মর্ত্যে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। একমাত্র ব্রহ্মগিরি পর্বতে গৌতম মুনির আশ্রম ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণায় মানুষের কাতরতা বৃদ্ধি পায়। একসময় গৌতম ব্রহ্মার উদ্দেশে বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফলে ওই দুঃসময়েও একমাত্র তাঁর আশ্রম অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপমুক্ত ছিল। স্বভাবতই অন্যান্য ঋষিমুনিরা গৌতমের আশ্রমে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে বসবাস করতে থাকেন। গৌতমও তাঁদের যথাসাধ্য আপ্যায়ন করেন। গণেশ

এই সুযোগে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বেশ কিছুকাল অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে গৌতমের আশ্রমে বাস করেন। অনেকদিন পেরিয়ে গেলে তিনি ব্রাহ্মণদের এইভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, গৌতম হয়তো নিজ স্বার্থে অন্যান্য ঋষিদের তাঁদের নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করতে দিতে চাইছেন না। এইভাবে দিনের পর দিন অন্যের আশ্রয়ে থেকে পরান্নে প্রতিপালিত হয়ে তাঁরা স্বাধীনতা হারাচ্ছেন। গণেশের মন্ত্রণায় অন্য ঋষিরাও প্রভাবিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সহমত হন। এই পরিস্থিতিতে গণেশ পার্বতীর সখী জয়াকে গো-রূপে গৌতমের আশ্রমে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করার নির্দেশ দেন। গণেশের কথামতো জয়াও গোমূর্তি ধারণ করে আশ্রমে উপদ্রব শুরু করে। গৌতম গোরুটিকে নিরস্ত করতে যখনই একটি তৃণখণ্ড ছুঁড়ে মারেন, সেই মুহূর্তে গোরুটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন আশ্রমের সকলেই গোহত্যার অভিযোগে গৌতমকে দায়ী করে আশ্রম ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। নিরূপায় গৌতম এই সমস্যার সমাধান জানতে চাইলে ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধি হয়ে গণেশ তাঁকে বলেন যে, গৌতম যদি শিবজটাস্থিত গঙ্গাকে মুক্ত করে পৃথিবীতে আনতে পারেন, তাহলেই একমাত্র ওই পবিত্র জলস্পর্শে গোমাতা পুনর্জীবনলাভ করবেন এবং অন্য ব্রাহ্মণরাও স্বধর্মস্থিত হয়ে তাঁর আশ্রমে বাস করতে পারবেন। এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গৌতম শিবকে কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছে বরপ্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন তাঁর জটাস্থিত গঙ্গাকে মর্ত্যের কল্যাণে মুক্ত করেন। শিব গৌতমের এই প্রার্থনা পূরণ করে ব্রহ্মগিরি পর্বতের শীর্ষে গঙ্গাকে ত্যাগ করেন। জটামুক্ত গঙ্গা গৌতমকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি এখন দেবলোকে গমন করবেন নাকি ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে প্রবেশ করবেন? প্রত্যুত্তরে গৌতম বলেন, দেবী গঙ্গাকে মর্ত্যবাসীর কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করতে হবে। এরপর গঙ্গা নিজেকে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে ত্রিধারায় বিভক্ত করে এবং স্বর্গে চারটি, মর্ত্যে সাতটি ও পাতালে চারটি--- সর্বমোট এই পনেরোটি উপধারায় বিশ্লিষ্ট করে ব্রহ্মগিরি থেকে গৌতমাশ্রম হয়ে মর্ত্যে অবতরণ করেন। গণেশের নির্বন্ধে ঋষি গৌতমের দ্বারা আনীত এই গঙ্গা 'গৌতমীগঙ্গা', নামান্তরে বর্তমান ভারতের গোদাবরী নামে পরিচিত। এইভাবে মাতা পার্বতীর স্বার্থপূরণের জন্য গণেশের পরিকল্পনায় গৌতমমুনি গঙ্গাকে শিবজটামুক্ত করে মর্ত্যে আনতে বাধ্য হন। অতএব গণেশের পরোক্ষ হস্তক্ষেপে গঙ্গার এই মর্ত্যাবতরণ থেকেই প্রমাণিত, শুধু জলজন্মের সূত্রেই নয়, গঙ্গা-গণেশ কর্মসম্বন্ধেও যুক্ত।

বহুক্ষেত্রেই শৈবগণের মধ্যে গজাননের নায়কত্ব লাভ 'অধিপতি বা 'প্রধান' হিসেবে তাঁর গুরুত্ববৃদ্ধি করেছে। পৌরাণিক আখ্যানে কখনও তাঁর ভূমিকা শত্রু হন্তারকের, কখনও বিঘ্নঘটনকারীর, আবার কখনও মঙ্গলময় বরদাতার। দুষ্টের ধ্বংসকারী যেমন তিনি, তেমনই দেব-দানব-মানব নির্বিশেষে তাঁকে অমান্য করলে বা পূজার

অগ্রে স্থান না দিলে রোষের মুখে পড়তে হবে। পৌরাণিক বচনে গণেশের ক্ষমতা এমনভাবেই অপ্রতিহত করা হয়েছে যে ধর্মাচরণে তাঁকে অস্বীকারের উপায় নেই। যে কোনও কার্যের আরম্ভে তিনি এমনই অমোঘ যে ত্রিদেব পর্যন্ত তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন না, বরং তাঁরাও গজাননের অগ্রপূজ্যতায় প্রীত হন। প্রমাণ পদ্মপুরাণ, 'তত্র দেবাশ্চ সুপ্রীতা ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ'।[৫৮] তাঁর সন্তুষ্টি ভিন্ন যে কোনও কর্মে সাফল্য অসম্ভব। *পদ্মপুরাণ*-এর 'সৃষ্টিখণ্ড'-এর ৬৫ নং অধ্যায়ে আছে, ইন্দ্র মহাযজ্ঞকালে আদিদেব গণপতির পূজায় মোহবশে অবহেলা করায় যুদ্ধে হিরণ্যাক্ষের কাছে পরাস্ত হয়ে তাঁকে রাজ্যহারা হতে হয়।[৫৯] পরে শিবের আদেশে ইন্দ্র 'সর্বযুদ্ধে জয়প্রদ' ও 'সর্বকর্মে সিদ্ধিপ্রদ' গণপতির অর্চনা করলে গজানন সুপ্রসন্ন হয়ে দেবতাদের জয়যুক্ত হওয়ার আশীর্বাদ প্রদান করেন।

গণপতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই ধরনের আখ্যানচূর্ণ অনেকটা রূপক-বৃত্তান্তের মতো। এর মাধ্যমে গণেশের পূজা যে কোনও কাজের সূচনায় কতখানি অনিবার্য এবং প্রাসঙ্গিক, তার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও ক্ষেত্রেই তাঁকে অমান্য করার উপায় নেই। তাঁর সন্তোষ হলে সবক্ষেত্রেই সৌভাগ্যের উন্মেষ, নচেৎ ব্যর্থতা ঘটবেই। আসলে পুরাণ-মণ্ডলে তাঁর অভ্যুত্থানের মধ্যেই বিঘ্ন থেকে বিঘ্ন-নিরসনের একটা ইঙ্গিত রয়ে গেছে। গণেশের প্রথম জন্ম থেকে দ্বিতীয় জন্মের অন্তর্বর্তী পথটুকু মৃত্যুগন্ধী, বিপন্নতাময়। এক নবজাতক কখনও পিতার হাতে, কখনও বা গ্রহদোষে কিংবা গ্রহরাজ শনির দৃষ্টিপাতে (বিশেষভাবে বঙ্গীয় পুরাণকথায় দ্রষ্টব্য, *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*) মুণ্ডহীন হয়েছেন। বেশিরভাগ আখ্যানেই শিবের হস্তক্ষেপে গৌরীপুত্র গণেশের মৃত্যু গণেশের জন্মকালীন বিঘ্নের সূচক। পরে শিব, নন্দী বা বিষ্ণুর উদ্যোগে হস্তীমুণ্ডলাভ এবং পুনর্জীবনপ্রাপ্তির ঘটনায় তাঁর বিঘ্ননিরসন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আধা মানুষ-আধা পশুর দেহাবয়ব-বিশিষ্ট এই গজানন গণেশ দেবমণ্ডলে কীভাবে স্থায়ী পূজ্যপদ লাভ করবেন, তা নিয়ে একধরনের অনিশ্চয়তা থেকেই গেছে। সম্ভবত সে'কারণেই কখনও শিব, কখনও ব্রহ্মার দ্বারা গণাধিপত্যে নিযুক্ত হয়ে তিনি প্রথম পূজ্য দেবতায় পরিণত হয়েছেন। একধরনের বাধ্যতামূলক অনতিক্রম্যতার ধারণা দেবতারূপে তাঁর প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তেই লক্ষ করা যায়। আমাদের মনে হয়, পৌরাণিক আখ্যানে গণেশের জন্মঘটনার মধ্যে, বিশেষত ওই মৃত্যুছোঁয়া প্রথম এবং দ্বিতীয় জন্মের গভীরে, সর্বোপরি গজমুখ গণেশ বা গণপতি রূপে আত্মপ্রকাশের মধ্যে বিঘ্ন থেকে বিঘ্নমুক্তির, নেতি থেকে ইতিতে উত্তরণের দ্যোতনা যেহেতু আছে, ফলে গণেশের কার্যধারায় বিঘ্নকর্তা থেকে বিঘ্নহর্তা হয়ে ওঠার সঙ্গেও এর সংযোগ থাকা সম্ভব। আসলে গণেশের কার্যকারিতার pattern-এর মধ্যেই এমন একটা বিপরীত ফল প্রদানের প্রবণতা রয়েছে। একে ambivalence

বা দ্বৈধবৃত্তি বলা চলে। সর্বপ্রথম তাঁকে তুষ্ট করে পূজা করলে যে কোনও কাজেই উপাসকের সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত, না হলে গণেশ উলটোতে বেশি সময় লাগবে না। পুরাণের আখ্যানে তাঁর কর্মকৃতিত্ব প্রসঙ্গে বারবার এই দিকটায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যিনি সৌভাগ্যের সূচক, সিদ্ধিদাতা রূপে স্বীকৃত; কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হলে সেই তিনিই হতে পারেন দুর্ভাগ্যের কারণ। নবগ্রহমণ্ডলীতে একমাত্র গ্রহরাজ শনির সঙ্গে এইখানে তিনি সমানধর্মা। বঙ্গদেশে আধুনিক সাহিত্যে বিশেষত, গজানন গণেশের রূপাঙ্কনে এই চারিত্রিক ধরনের প্রতিফলন খুব বেশি দেখা গেছে। যথাস্থানে তা আলোচনা করা হয়েছে।

২.২

স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও মূর্তিকলায় গণপতি :

মূর্তিশাস্ত্রগুলিতে গণপতির রূপাঙ্কন বিভিন্নভাবে ঘটেছে। এক্ষেত্রে হস্তসংখ্যাগত এবং বিভঙ্গগত পার্থক্য দেখা যায়। বরাহমিহির প্রণীত *বৃহৎসংহিতা*-র ৫৭ নং অধ্যায়ে দ্বিভুজ গণেশের বর্ণনা রয়েছে।[৬০] মূর্তিপ্রমাণে গণেশের হস্তসংখ্যার বিবর্তনের প্রথম স্তর সম্ভবত এইটিই। যদিও *বৃহৎসংহিতা*-র উল্লেখটিকে অনেকেই পরবর্তীকালীন প্রক্ষেপ বলে মনে করেন, কিন্তু এই নিদর্শন থেকে সহজেই বোঝা যায় যে মূর্তিতে দ্বিভুজরূপেই গণেশের প্রাথমিক বিকাশ ঘটেছিল।[৬১] চতুর্ভুজ গণেশ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের, বলা ভালো পৌরাণিক যুগের নির্মাণ। *বৃহৎসংহিতা* ব্যতিরেকে অন্যান্য মূর্তিলক্ষণবর্ণনা সংক্রান্ত শাস্ত্রের মধ্যে শৈবাগম জাতীয় গ্রন্থ, যেমন কশ্যপের *অংশুমদ্ভেদাগম, সুপ্রভেদাগম* এবং *উত্তরকামিকাগম*-এর কথা উল্লেখ করা যায়। বৈষ্ণবীয় মূর্তিশাস্ত্রের মধ্যে *বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ* এবং *রূপমণ্ডন* উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া *মৎস্যপুরাণ* , *পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, শিবপুরাণ* প্রভৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রেও দেবমূর্তির বর্ণনা সম্পর্কিত নানা তথ্য পাওয়া যায়।

বিভিন্ন মূর্তিশাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে গণেশের হস্তসংখ্যায় যেমন পার্থক্য দেখা যায়, তেমনই হস্তধৃত ভিন্ন ভিন্ন আয়ুধ বা দ্রব্যাদি ধারণের ক্ষেত্রেও বর্ণনাগুলির মধ্যে তফাত ঘটে যায়। যেমন, *বৃহৎসংহিতা*-র প্রমাণে দ্বিবাহু গণেশের এক হাতে মূলক এবং অন্য হাতে কুঠার।[৬২] অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের মূর্তিশাস্ত্রগুলিতে, বিশেষত গণেশ যেখানে চতুর্বাহু, সেখানে তাঁর আয়ুধরূপে নিজের ভগ্ন দন্ত, মোদক, অঙ্কুশ, পাশ, সাপ, অক্ষমালা, পদ্ম প্রভৃতির ব্যবহার এক-একটি টেকস্টে এক-একরকমভাবে দেখা যায়।

আগেই বলেছি, *বৃহৎসংহিতা*-র মূর্তিপ্রমাণে প্রথম পর্বের গণেশ দ্বিবাহুবিশিষ্ট, এমনকী তাঁর বাহনরূপেও মূষিক অনুপস্থিত। বস্তুত, গণেশমূর্তিতে মূষিকের উপস্থিতি প্রথম পর্বেই ঘটেনি। শুরুর দিকে গজানন বাহনহীনভাবেই মূর্তি-ভাস্কর্যে রূপায়িত হয়েছেন। প্রাক-পৌরাণিক যুগে অর্থাৎ তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে নির্মিত এই বিনায়ক মূর্তিগুলিতে হস্তভূষণ হিসেবে মূলক এবং পরশু বা কুঠার দেখা যায়। এ ছাড়া দ্বিভুজ গণেশের প্রত্নদির্শনগুলিতে মোদকপূর্ণ পাত্রের উপস্থিতিও চোখে পড়ে। *গণেশপুরাণ*-এর বিবরণ অনুসারে কলিযুগে দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ রূপেই গণেশের আবির্ভাব। যেমন, *গণেশপুরাণ*-এ ধুম্রবর্ণ গণেশ 'দ্বিহস্তবান্' (২। ১। ২১) এবং ধুম্রকেতু 'দ্বিভুজ' (২। ৮৫। ১৫) হলেও গজানন গণেশ 'চতুর্বাহু' (২। ১৩০। ২)।[৬৩] মূর্তিতাত্ত্বিক H. Bussagli ও C. Sivaramamurti রচিত *5000 Years of the Art of India* গ্রন্থে এবং C. Sivaramamurti-র *The Art of India* গ্রন্থেও প্রত্নদির্শন হিসেবে যে প্রাচীনতম গণেশমূর্তির বিবরণ পাওয়া যায়, সেখানে বাহ্যত তিনি নিরাবরণ এবং গজমস্তক মুকুটহীন, একমাত্র সর্পভূষণ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও অলংকার নেই।[৬৪] গণেশ যে প্রাথমিকভাবে শৈবগোষ্ঠীর দেবতা হিসেবেই উদ্ভূত হয়েছিলেন, এই জাতীয় অঙ্গবিন্যাসই তার প্রমাণ। স্বতন্ত্র গণেশ মন্দিরের নিদর্শনও স্বল্পসংখ্যক এবং অবশ্যই পরবর্তী সময়ে নির্মিত।

স্থাপত্য-ভাস্কর্যে উপস্থাপনার দিক থেকে প্রথম পর্যায়ে গণপতি ব্রাহ্মণ্যধর্মে বেশ কিছুটা নিম্নস্তরীয়-ই ছিলেন। মন্দিরের প্রবেশদ্বার বা মহাদ্বারে তাঁকে দ্বারদেবতা হিসেবেই দেখা যেত। দ্বারপাল বা দ্বাররক্ষকের ভূমিকা ছিল তাঁর। প্রবেশদ্বারে এই জাতীয় অবস্থিতির ফলে মন্দিরে আগত যে কোনও দর্শনার্থী সর্বাগ্রে তাঁর উদ্দেশেই প্রণাম জানাতেন। পরবর্তী পর্যায়ে মন্দিরের মুখমণ্ডপের দেওয়ালগুলিতে গণেশের মূর্তিরূপায়ণ ঘটে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে গর্ভগৃহের একটু আগে অর্ধমণ্ডপের দেওয়ালেও তাঁর মূর্তিচিত্র অঙ্কিত হয়। শিব-শক্তি পরিবারের সদস্য হওয়ার সুবাদে শুরুর দিকে তিনি শিব-পার্বতীর অনুচর হিসেবে গৌণ ভূমিকাই পালন করতেন। এমনকী প্রথমাবস্থায় সপ্তমাতৃকা ও নবগ্রহমণ্ডলীর মধ্যেও বিনায়কের অবস্থান দেখা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে পঞ্চম থেকে দশম শতকের মধ্যে পরিবারদেবতা বা পার্শ্বদেবতা হিসেবে তাঁর অভ্যুত্থান ঘটে। এই সময়ে শক্তিসহ তান্ত্রিক গণেশেরও বহু মূর্তিনিদর্শন পাওয়া গেছে, গজমুখ গণেশের শক্তিরা যেখানে মানবমুখে উপস্থিত। তৃতীয় পর্যায়ে আনুমানিক দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি সময় থেকে গণেশের স্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণ শুরু হয়। প্রথমপূজ্য হিসেবে পঞ্চায়তন পূজায় সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তির সঙ্গে তাঁর আসনও সুনিশ্চিত হয়। এই পর্বেই গণেশের সঙ্গে বাহন হিসেবে ইঁদুরের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ গণেশ আদিপর্বে শিবের অধস্তন সহকারী হিসেবেই রূপায়িত হয়েছেন, পরে শৈব বলয়ের মধ্যে গৌণ বা পার্শ্বদেবতা হিসেবে তাঁর অভ্যুত্থান ঘটে। মূর্তিশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ T. A. Gopinath Rao তাঁর *Elements of Hindu Iconography* গ্রন্থে গণপতি-বিনায়কের বিস্তৃত মূর্তিবিবরণ দিয়েছেন।[৬৫] এখানে গণেশের আঠারোটি রূপভেদের মূর্তি সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে লক্ষ্মী গণপতি, উচ্ছিষ্ট গণপতি, মহাগণপতি, উর্ধ্ব গণপতি, পিঙ্গল গণপতি এবং শক্তি গণপতির ক্ষেত্রে গণেশ এবং শক্তি একই মূর্তিতে অবস্থানরত। এখানে লক্ষণীয় যে, মূর্তিতে গণেশের শক্তি হিসেবে উপস্থিত দেবীরা কেউই গজাননা নন। গণেশের নারী সংস্করণরূপে ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বে সুবিদিত বিনায়কী, বৈনায়কী বা গণেশানী গজবদন ঠিকই, কিন্তু তিনি গণপতি বা তাঁর কোনও একটি বিশেষ রূপের শক্তি নন। বৈনায়কী মাতৃকাপ্রকৃতির-ই একটি বিশেষ রূপভেদ হিসেবে স্বীকৃত। অন্য বারোটি মূর্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দেহবিভঙ্গে গণেশের রূপাঙ্কন দেখা যায়। যেমন, হেরম্ব, প্রসন্ন, দ্বিজ, উন্মত্ত-উচ্ছিষ্ট, বিঘ্নরাজ, ভুবনেশ, নৃত্য, হরিদ্রা, বাল ও তরুণ গণপতি এবং ভক্তি বিঘ্নেশ্বর ও বীর বিঘ্নেশ্বর। বাহুসংখ্যাও মূর্তিবিশেষে পরিবর্তনযোগ্য। কোথাও চার, ছয়, আট, দশ বা ষোলো। হস্তধৃত আয়ুধ বা অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেও মূর্তিবিশেষে সমত্ব চোখে পড়ে না। একই আঙ্গিকের মূর্তিতেও অনেকসময় হস্তায়ুধ আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সাধারণীকরণ প্রায় অসম্ভব। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণেশের হস্তে কতকগুলি পরিচিত আয়ুধ বা দ্রব্য দেখা যায়। যেমন, ভগ্নদন্ত, পাশ, অঙ্কুশ, কুঠার, মোদক প্রভৃতি। সাধারণত এই আয়ুধাদি বা হস্তভূষণের গুরুত্ব দ্বিবিধ। প্রথমত, এক দেবতা থেকে অন্য দেবতার মূর্তিগত পৃথকত্ব বা স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের সহায়ক। বিশেষ কতকগুলি আয়ুধ বা হস্তধৃত দ্রব্যের মাধ্যমে দেবতাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা যায়। দ্বিতীয়ত, আয়ুধ বা হস্তভূষণের সাহায্যে দেবতার কোনও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। আবার কখনও পুরাণের বিশেষ কোনও এপিসোডের সঙ্গেও ওই হস্তসজ্জার সংযোগ দেখা যায়। যদিও গণেশের ক্ষেত্রে হস্তীমুখ, বক্রতুণ্ এবং লম্বোদরের বৈশিষ্ট্যে দেহরূপটি এতই বিশেষীকৃত যে, আলাদা করে হস্তভূষণের সাহায্যে চিহ্নিত করার বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না। তা ছাড়া গণেশের হস্তধৃত মোদক বা মিষ্টান্ন জাতীয় আহার্যের ব্যবহারটি সবক্ষেত্রেই এত অপরিহার্য যে মূর্তিরূপে গণেশকে চেনাটা বেশ সহজ।

এযাবৎ গণপতি-গণেশের নানা প্রত্ন-নিদর্শন ভারত সহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে পাওয়া গেছে। গণেশের মূর্তিরূপের বিবর্তন বোঝার ক্ষেত্রে এই উল্লেখগুলি গুরুত্বপূর্ণ। যথা -

১। বর্তমান ইরানের লুরিস্তান নামক অঞ্চলে তিন হাজার বছর পূর্বের ব্রোঞ্জের অসাধারণ ভাস্কর্য এবং নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মধ্যে হস্তীমুখ মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

২। ভারতে দু'হাজার বছরেরও পূর্ববর্তী সময়ে শুঙ্গ রাজবংশের শাসনকালে ভিতরগাঁও, সম্ভার, অহিচ্ছত্র, বারাণসীর রাজঘাট, মহারাষ্ট্রের টার, অন্ধ্রের বীরপুরম, এমনকী পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড় থেকেও কতকগুলি পোড়ামাটির গণেশমূর্তি পাওয়া গেছে। যদিও গবেষকদের একাংশের মতে, এগুলি দেবতার মূর্তি নয়, খেলবার পুতুলবিশেষ।

৩। প্রথম খ্রিস্টপূর্ব থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে নির্মিত শ্রীলঙ্কার মিহিনটাল বা মিহিনতালে একটি বৌদ্ধ কনচেতিয় স্তূপের শিলাফলকে প্রাপ্ত গজমুণ্ড ও দন্তবিশিষ্ট আসন (বসা অর্থে) মূর্তিটিকে গণেশের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হয়। এই মূর্তির আনুমানিক বয়স প্রায় দু'হাজার বছরের কাছাকাছি।

৪। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত আমলে মধ্যপ্রদেশের বিদিশার নিকটবর্তী উদয়গিরিতে একটি পাহাড়গাত্রে প্রাপ্ত গণেশের আসন মূর্তিটি এ পর্যন্ত ভারতে আবিষ্কৃত গণপতির সর্বপ্রাচীন মূর্তি নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। এই মূর্তিটি উর্ধ্বলিঙ্গ বলে মনে করা হয়। আজ থেকে প্রায় ১৬০০-১৭০০ বছর আগেকার এই গণেশ মূর্তিতেই প্রকৃষ্টরূপে গজাননের অবয়ব ফুটে ওঠে। অতএব পুরাণের সাহিত্যিক প্রমাণের পাশাপাশি মূর্তিতেও এই চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকেই গজমুখ গণেশের উপস্থিতি চোখে পড়েছে।

৫। প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ চতুর্থ শতকেই উত্তরপ্রদেশের ফর্‌রুখবাদ বা ফতেহ্‌গড় জেলা থেকে একটি দ্বিভুজ গণেশমূর্তি পাওয়া গেছে। গণেশের বামহাতে মোদকপাত্র এবং তিনি শুঁড় দিয়ে মোদক ভক্ষণ করছেন। দেহবিভঙ্গে তিনি দণ্ডায়মান। ভারতে গণেশের দাঁড়ানো মূর্তিগুলির মধ্যে এ'টিকেই এখনও পর্যন্ত সর্বপ্রাচীন বলে গণ্য করা হয়।

৬। চতুর্থ শতকে গুপ্তযুগের প্রথমার্ধে উত্তরপ্রদেশের মথুরাতেও বেলেমাটির তৈরি একটি দ্বিভুজ গণেশমূর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে। দেহ-সংস্থানে এ'টিও দণ্ডায়মান। লক্ষণীয়, এই মূর্তির ক্ষেত্রে ইঁদুরবাহন অনুপস্থিত।

৭। গুপ্তযুগের প্রথমার্ধে ভিতরগাঁও-এর ইষ্টকনির্মিত মন্দিরে প্রাপ্ত গণেশের পোড়ামাটির মূর্তিটি বিশেষভাবে তাৎপর্যবহ। এক্ষেত্রে তিনি দেবতা আকারে রূপায়িত হননি, তাঁর উড্ডীন দেহভঙ্গিমা লক্ষ করা যায়।

৮। পূর্বোক্ত উদয়গিরির গুহাগাত্র ছাড়াও পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে নির্মিত মধ্যপ্রদেশের ভূমারা এবং উত্তরপ্রদেশের ভিতরগাঁও মন্দিরে পোড়ামাটির ফলকে মোদকভক্ষণরত গণেশমূর্তি দেখা যায়। ভূমারার শিবমন্দিরে প্রাপ্ত গণেশ মূর্তিটিকে গণেশের বিবর্তনের অন্তিম স্তর বলে চিহ্নিত করা যায়। মূর্তিগুলি সাধারণত তিন ধরনের হয় - উপবিষ্ট, নৃত্যরত এবং দণ্ডায়মান। উপবেশনরত গণেশমূর্তির সংখ্যাই সর্বাধিক। নৃত্যরত মূর্তিতে গণেশকে বাহনের ওপর নৃত্য প্রদর্শন করতে দেখা যায়। দেহসৌষ্ঠবে এই মূর্তিগুলি খর্বাকার, গজাননযুক্ত, ত্রিনয়ন এবং লম্বোদর। হস্তসংখ্যা কখনও চার, ছয়, আট কিংবা দশ। সাধারণত দ্বিভুজ মূর্তির সংখ্যায় অপ্রতুল।

প্রথম পর্বের মূর্তিগুলি সাধারণত নগ্ন ও দণ্ডায়মান। এগুলিকে সচরাচর দেবতাপ্রতিম মনে হয় না। গুপ্তযুগের প্রথমভাগে ভিলসা উদয়গিরির চন্দ্রগুপ্ত গুহায় গণেশের উৎকীর্ণ চিত্র অনুসারে তিনি পর্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট, বামহাতে মোদকভাণ্ড, অথচ ইঁদুর অনুপস্থিত। গণেশের উপবেশনরত মূর্তি প্রথম ও শেষ গুপ্তযুগে ভারতব্যাপী বিস্তৃত হয়। মূর্তিরূপায়ণে নৃত্য গণপতির সর্বাধিক স্ফুরণ দেখা যায় পূর্বদেশে, আজকের ওড়িশায়। এই মূর্তি মূলত অষ্টভুজ, সামনের ডানহাত গজহস্ত এবং নৃত্যের আবর্ত সমগ্র দেহে সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। পূর্বভারতে মূলত নটরাজ শিব এবং নটবর কৃষ্ণের মূর্তির আদলেই নৃত্যগণেশের মূর্তি রূপায়ণ ঘটেছে। বৃহৎবঙ্গে অষ্টম-দ্বাদশ শতকের মধ্যে বহু ষড়ভুজ বা অষ্টভুজ নৃত্য গণেশের মূর্তি পাওয়া গেছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বঙ্গদেশে প্রাপ্ত গণেশ মূর্তির আলোচনা প্রসঙ্গে এই দিকটি বিস্তারিত করা হয়েছে।

শৈবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ বা শাক্তের একান্ন পীঠের মতোই মহারাষ্ট্রের আটটি প্রসিদ্ধ গণপতি পীঠ গাণপত্য সম্প্রদায়ের মহাতীর্থ হিসেবে স্বীকৃত। এই অষ্টবিনায়ক মন্দিরের প্রত্যেক বিনায়ক অষ্টসিদ্ধির নির্দেশক। গাণপত্যগণ জীবনে অন্তত একবার অষ্টবিনায়ক দর্শনের বাসনা পূরণ করেন। এই আটজন বিনায়ক বা গণপতি হলেন, পুনার মোরগাঁও-এর ময়ূরেশ্বর, থেউড়ের চিন্তামণি বিনায়ক, আহমেদনগরের সিদ্ধটেক গ্রামের দক্ষিণামূর্তি গজমুখ সিদ্ধিবিনায়ক, পুনার লেনাদ্রি গ্রামের গিরিজাত্মজ, রায়গড় জেলার পালির বল্লালেশ্বর, ওঝর জেলার জুনর অঞ্চলের বিঘ্নেশ্বর বা বিঘ্নহর, মহাড়ের বরদ বিনায়ক এবং রঞ্জনগাঁও-এর মহাগণপতি।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার গণপতি মূর্তি ভারতেই অবস্থিত। মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরের চিন্ময় সান্দীপনী আশ্রমে একটি চব্বিশ ফুট উঁচু উপাসনা মন্দিরের উপরিভাগে 'চিন্ময় গণাধীশ'-এর একটি ছেষট্টি ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, মাটি থেকে যাঁর উচ্চতা প্রায় নব্বই ফুট। প্রথম যুগের গণেশ মূর্তিগুলিতে বাহন হিসেবে ইঁদুর উপস্থিত ছিল না। পরিবর্তে সিংহের উপস্থিতি চোখে পড়ে। আনুমানিক দশম শতাব্দী থেকে গণেশের বাহন

হিসেবে মূর্তি-ভাস্কর্যে ইঁদুরকে দেখা যায়। গণেশমূর্তির বিবর্তনের সর্বশেষ স্তরে এই ইঁদুর বাহনের বৈশিষ্ট্যটি যুক্ত হয়। প্রাথমিক স্তরের প্রমাণ হিসেবে আনুমানিক দশম শতকে নির্মিত উড়িষ্যার মুক্তেশ্বর মন্দিরের গণেশমূর্তিতে ইঁদুরের উপস্থিতির কথা বলা যায়। দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পকলায় অবশ্য দ্বাদশ শতকের আগে ইঁদুরের দেখা পাওয়া ভার। বহির্ভারতে গণেশের বাহন হিসেবে ইঁদুর যে সর্বত্র দেখা যায়, এমন নয়। কচ্ছপ, ঘোড়া, পাতিহাঁস, সিংহ ও হাতিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা গেছে। জাভা, ইন্দোচীন ও জাপানে প্রাপ্ত গণেশের প্রত্নুনিদর্শনগুলিতে আবার কোনও বাহন-ই নেই। একমাত্র শ্যামদেশ বা থাইল্যাণ্ডে গণেশের বাহন হিসেবে ইঁদুরকে দেখা গেছে। গণেশের প্রতিমালক্ষণের যে বর্ণনা *মৎস্যপুরাণ*-এ (২৬০। ৫৫) পাওয়া যায়, সেখানে মূষিকের সঙ্গে তাঁর দেহের নিম্নাংশ যুক্ত থাকার কথা বলা হয়েছে।[৬৬] যদিও এই অংশের প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ আছে। গবেষকদের মতে, এই বর্ণনাটি *বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ*-এ প্রাপ্ত গণেশের মূর্তিতাত্ত্বিক বিবরণের থেকে (৩ । ৭১ । ১৩ - ১৬) অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়। *বিষ্ণুধর্মোত্তর*-এ গণেশের মূর্তিলক্ষণের বর্ণনায় বাহন অনুল্লিখিত। উপহারস্বরূপ *স্কন্দপুরাণ* ও *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এ কার্তিক ও ধরিত্রী গণেশকে ইঁদুর বাহনটি প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য, পৃথিবীর সঙ্গে ইঁদুরের সম্পর্কের সূত্রে মনে হয়, এর মধ্যে কোথাও বিঘ্ননাশের আকাঙ্ক্ষা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কারণ, যে ইঁদুর কৃষিকর্মের ক্ষতি করে বা ফলন নষ্ট করে পৃথিবীর সামূহিক বিঘ্ন ঘটায়, পৃথিবী তাকেই উপহার হিসেবে প্রদান করেছেন। বিঘ্নকর ইঁদুরকে গণেশ বাহন হিসেবে তাঁর অধীন করলে ইঁদুরের বিঘ্ন তথা উপদ্রব সৃষ্টির ক্ষমতা হ্রাস পাবে বলে মনে হয়। তা ছাড়া সংস্কৃতে মূষক অর্থ তস্কর বা চোর। ইঁদুর ফসল নষ্ট করে কৃষিক্ষেত্রে তস্করের ভূমিকা পালন করে বলে মনে করা হয়। সেই ইঁদুরকে গণেশের নিয়ন্ত্রণাধীন করার মধ্যে নেতি থেকে ইতিতে উত্তরণের ইঙ্গিতও রয়ে গেছে। গণেশের ভাবরূপের সঙ্গে যাঁরা fertility-র সংযোগসূত্রে তাঁকে Harvest God বা কৃষিদেবতা পর্যায়ভুক্ত করেন, তাঁদের ভাবনার সঙ্গেও এর মিল পাওয়া যাবে। ইঁদুরের হাত থেকে চাষের জমি বা ফসলের রক্ষক হিসেবেও তিনি কৃষিদেবতা। *পদ্মপুরাণ*-এর 'সৃষ্টিখণ্ড'-এ ত্রিপুরাসুরের পুত্র ত্রৈপুরির সঙ্গে গণেশের মহাসংগ্রামের একটি পর্যায়ে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য-প্রযুক্ত এক বিশেষ শক্তিসম্পন্ন গজের সঙ্গে গণেশবাহন মূষিকের ভীষণ যুদ্ধ হয়।[৬৭] যুদ্ধের শেষে মূষিক সেই মহাবল গজরাজকে সংহার করে এবং মূষিকের পিঠে চড়ে গণেশ কুঠার দ্বারা ত্রৈপুরিকে হত্যা করেন। এখানে হাতির চেয়েও গণেশবাহন ইঁদুরকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন করে দেখানো হয়েছে। গণেশের সঙ্গে বাহন হিসেবে ইঁদুরের সংযোগের পৌরাণিক আখ্যানচূর্ণগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের। *গণেশপুরাণ*-এর ভাষ্য অনুযায়ী ঋষি পরাশরের আশ্রমে ব্যাপক ধ্বংসসাধনকারী ইঁদুরটিকে গণেশ ধরে

ফেলেন ও নিজের বাহনে পরিণত করেন। দক্ষিণভারতে অবশ্য এই বিষয়ে অন্য একটি উপাখ্যান প্রচলিত। কোনও সময়ে গজাসুরের সঙ্গে গণপতির একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ চলাকালীন গণেশ গজাসুরের শুণ্ডটি টেনে ছিঁড়ে দেন এবং ওই শুঁড়ের মাধ্যমে তাকে বেঁধে ফেলেন। এরপর গণেশ গজাসুরকে ইঁদুরে রূপান্তরিত করে তাকে বাহন হিসেবে গ্রহণ করেন। আবার, গণেশের মন্ত্রগুপ্তি, কূটত্ব ইঁদুরের মধ্যে পাওয়া যায় বলে সাধকসমাজ বিশ্বাস করেন।

২.৩

গণেশ-কেন্দ্রিক শাস্ত্রগ্রন্থ

সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে গণেশকেন্দ্রিক শাস্ত্রগ্রন্থরূপে *মুদগলপুরাণ, গণেশপুরাণ* এবং *গণপত্যথর্বশীর্ষ* বা *গণপতি উপনিষদ* --- এই গ্রন্থত্রয় সমাদৃত। গাণপত্য সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হিসেবে এই গ্রন্থগুলির গুরুত্ব অসামান্য। কারণ, সমগ্র ভারতব্যাপী গাণপত্য ধর্ম-দর্শনের ব্যাপকতা ও প্রসারতা মূলত এই গ্রন্থগুলির সূত্র ধরেই ঘটেছে। পরব্রহ্মরূপে গণেশের স্বরূপ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে গ্রন্থগুলি গণেশ-উপাসনা এবং গাণপত্য দর্শনের মূল সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করেছে। কালিক বিচারে এগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের রচনা হলেও (আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর পরবর্তী) এককভাবে গণপতির প্রাধান্যমূলক শাস্ত্র হিসেবে এই তিনটি গ্রন্থকেই চিহ্নিত করা হয়। আগের অধ্যায়ে আলোচিত ভারতীয় মহাপুরাণ বা উপপুরাণগুলিতে গণেশের প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্নভাবে এলেও সেই সেই পুরাণের মূল বা কেন্দ্রীয় দেবতারাই গ্রন্থের সিংহভাগে মহিমান্বিত হয়েছেন, গণেশের গুরুত্ব সেখানে কিছুটা পার্শ্বিক হতে বাধ্য। গণেশের জন্ম বা তাঁকে ঘিরে বহুবর্ণিল সব উপাখ্যান কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর পূজাপদ্ধতি অন্যান্য পুরাণকথায় কমবেশি জায়গা পেলেও ধর্ম-দার্শনিকভাবে গণপতি-পূজক একটি সম্প্রদায়ের কাছে তাঁদের কুলদেবতাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেওয়ার প্রণোদনা থেকেই এই ধরনের শাস্ত্রগ্রন্থের পরিকল্পনা। পুরাণের বর্গীকরণের নিরিখে প্রথমোক্ত পুরাণ দু'টি অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকা বহির্ভূত অর্থাৎ 'উপপুরাণ' রূপে চিহ্নিত। যদিও *মুদগল* এবং *গণেশপুরাণ* 'উপপুরাণ' পদবাচ্য হলেও এতে গ্রন্থদুটির প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয় না। এই প্রসঙ্গে *মুদগলপুরাণ*-এ যুক্তিসহ বলা হয়েছে, দেবলোকের অধিপতি দেবরাজ 'ইন্দ্র' দেবপ্রধান বা শ্রেষ্ঠরূপে সর্বত্রমান্য, অথচ তাঁরই ভ্রাতারূপে বিষ্ণু (দ্বাদশ আদিত্যের অন্তর্গত বিষ্ণু ও বামন অবতার) এবং বিনায়ক (মহোৎকট ও দৈত্যবিনায়ক অবতার) 'উপেন্দ্র' নামে আখ্যাত হন। এতে যেমন ইন্দ্রের তুলনায় বিষ্ণু ও বিনায়কের গৌরব ম্লান

হয়ে যায় না, তেমনই 'উপ'-চিহ্নিত হলেই মহাপুরাণের তুলনায় উপপুরাণগুলির গুরুত্ব কমে না বা সেগুলি অপ্রধান হয়ে যায় না, বরং এগুলি ব্রহ্মসাযুজ্য দান করে থাকে।[৬৮] শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে প্রথমে মহাপুরাণ শ্রবণ করে শুদ্ধচিত্ত ও সাধনপরায়ণ হয়ে তবেই উপপুরাণ শ্রবণ করা সম্ভব। মহাপুরাণ পাঠের দ্বারা সাধক-মন অর্জন না করলে উপপুরাণ পাঠের অধিকারলাভ করা যায় না। তা ছাড়া উপপুরাণগুলি কাহিনি অংশ বা ঘটনাপ্রাধান্যের থেকে সাধনমাহাত্ম্য বা লীলাপ্রকাশের দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে 'উপ'-স্থানীয় হলেও মহাপুরাণের থেকে এদের গৌরব যে বিন্দুমাত্র কমেনি, বেড়েছেই বরং, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তৃতীয় গ্রন্থটিকে অথর্ববেদের শেষাংশের সঙ্গে যুক্ত মনে করা হয়, গ্রন্থনামেও সেই লক্ষণ স্পষ্ট। উপনিষদের ঐতিহ্যাগত ধারায় ধর্ম-দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের ক্ষেত্রে গণেশ-কেন্দ্রিক এই গ্রন্থটি অন্যতম। এটি *গণপত্যথর্বশীর্ষ* ছাড়াও *গণপত্যুপনিষদ* (*গণপতি উপনিষদ*) নামেও গাণপত্য সম্প্রদায়ে জনপ্রিয়।

গণেশপুরাণ :

গণেশপুরাণ গাণপত্য সম্প্রদায়ের প্রধান উপাস্য গণপতির মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক শাস্ত্রগ্রন্থ। গণেশ-কেন্দ্রিক যে উপাখ্যানগুলি এই পুরাণে পাওয়া যায়, তা এই সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট অংশ। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে গণপতি-কেন্দ্রিক তত্ত্বভাবনা ও উপাসনা বিধি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চোপাসনার প্রধান উপাস্যরূপে তো বটেই, এমনকী জগৎস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মের পরমতায় গণেশের অধিষ্ঠান কার্যত এই জাতীয় গ্রন্থের সূত্র ধরেই ঘটেছে। গণেশ-কেন্দ্রিক এই শাস্ত্রগ্রন্থে গণেশের বিভিন্ন উপাখ্যান বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই জায়গা পায়নি কেবল, একটি সুনির্দিষ্ট তত্ত্বদর্শনের আলোকে গাণপত্য সম্প্রদায়ের মূল দেবতা তাঁর কাঙ্ক্ষিত উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। *গণেশপুরাণ*-এ প্রাচীন পুরাণকথা ও বৈদান্তিক ধ্যানধারণাকে গণেশভক্তির এলাকার মধ্যে নিবদ্ধ করা হয়েছে।[৬৯] বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণকথায় এবং ধর্মতত্ত্বে গণেশের উপস্থিতির ফলে এই দুই ধর্মের ইতিহাসের প্রেক্ষিতেও গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।[৭০] গণেশকে কেন্দ্র করে সৃষ্টিতত্ত্ব, বিভিন্ন রাজবংশের বংশলতিকা, রূপক কাহিনি, যোগদর্শন সহ সাধারণ দর্শনতত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থমধ্যে আলোচিত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, *গণেশপুরাণ* প্রকৃতিতে উপপুরাণ হলেও সম্প্রদায়বিশেষে এর মান্যতা লক্ষণীয়। উত্তরভারতে প্রসিদ্ধ ও একদা জনপ্রিয় গাণপত্য সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্ব ও অনুষ্ঠানাদির বর্ণনা এর মধ্যে পাওয়া যায়।[৭১]

গণেশপুরাণ-এর রচনাকালগত বিতর্কও কম নয়। গবেষকদের একাংশ একে দশম-একাদশ শতাব্দীর পরবর্তী

কালের রচনা নিদর্শন মনে করেন। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে গ্রন্থটি রচিত বলে তাঁদের অনুমান।[৭২] আবার, স্টিটেনক্রন খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিঘাতে এই গ্রন্থরচনা ত্বরান্বিত হয়েছিল বলে মনে করেন।[৭৩] তাঁর মতে এখনকার মহারাষ্ট্রে হিন্দু মারাঠা শক্তির সঙ্গে ইসলামী শাসকদের সামরিক সংঘর্ষের ফলশ্রুতিরূপে গণেশপুরাণ রচিত হয়। বিশিষ্ট গণেশ-গবেষক অনিতা রাইনা থাপানের মতে এই পুরাণের মূল রূপ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা, যদিও পরবর্তীকালে কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত অংশ এতে সংযোজিত হয়ে পুরাণের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমান রূপ লাভ করেছে। অন্যান্য পুরাণের মতো *গণেশপুরাণ*-ও ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিমার্জিত হতে হতে একটি বহুস্তরবিশিষ্ট গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।[৭৪] পণ্ডিত ফারকুহার এর রচনাকাল কিছুটা এগিয়ে ৯৫০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দের অন্তবর্তীকালীন ভেবেছেন।[৭৫] অন্যদিকে স্টিভেনসন গ্রন্থটিকে সপ্তদশ শতকের পরবর্তীকালীন মনে করেন।[৭৬] তবে পণ্ডিত লরেন্স. ডব্ল্যু. প্রেস্টন আনুমানিক ১১০০ থেকে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনও সময়ে *গণেশপুরাণ*-এর রচনাকাল বিবেচনা করেছন।[৭৭] সময়নির্ণয়ের এই সূত্রটিই তাঁর মতে সবচেয়ে যৌক্তিক। কারণ, এই পুরাণে সমকালীন নাগপুর ও বারাণসীর তীর্থস্থানগুলির বর্ণনা পাওয়া গেছে।[৭৮] মান্য পুরাণবিদ আর. সি. হাজরাও *গণেশপুরাণ*-এর রচনাকাল হিসেবে এই কালসীমাটিকেই (১১০০-১৪০০ খ্রিঃ) নির্দিষ্ট করেছেন।[৭৯] অধ্যাপক মহেশচন্দ্র যোশী অবশ্য তাঁর সম্পাদিত *গণেশপুরাণ*-এর ভূমিকায় গ্রন্থের সম্ভাব্য রচনাকাল চিহ্নিত করতে গিয়ে *ভার্গবপুরাণ* নামে এর একটি সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীকালীন আদিরূপের উল্লেখ করেছেন।[৮০] অধ্যাপক যোশী এই বিষয়ে পূর্বপক্ষ হিসেবে রামশরণ শর্মার মতামত উদ্ধৃত করে *ভার্গবপুরাণ* রূপে বর্তমান প্রচলিত *গণেশপুরাণ* রচনার কালসীমা অষ্টম শতকের পূর্ব পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছেন।[৮১] এ ছাড়া অন্যবিধ নানা প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন, বিদ্যার্ণবতন্ত্রে 'সুমুখশ্চৈকদন্তশ্চ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা মূলত *গণেশপুরাণ*-এর 'উপাসনাখণ্ড' থেকে গৃহীত বলে তিনি মনে করেন।[৮২] পণ্ডিত এম. এস. কৌল বিদ্যার্ণবের লেখক বিদ্যারণ্যের কালনির্ণয় করতে গিয়ে একাদশ শতকের প্রথমার্ধকেই নির্দিষ্ট করেছেন।[৮৩] এই সূত্র ধরে অধ্যাপক যোশী *গণেশপুরাণ*-এর রচনাকাল দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তী মনে করেছেন।[৮৪]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ এবং *মুদগলপুরাণ*-এর মতো *গণেশপুরাণ*-ও বিশ্বকোষতুল্য মহাগ্রন্থ। *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ* ও *ব্রহ্মপুরাণ* এবং *গণেশপুরাণ* ও *মুদগলপুরাণ*--- দুটি মহাপুরাণ ও দুটি উপপুরাণে গণপতি তত্ত্বত পৃথক পৃথকভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছেন। গণেশের স্বরূপ বিষয়ে এদের প্রতিপাদ্য আলাদা। *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ*-এ গণেশ সাবয়বতায় প্রতিষ্ঠিত

সগুণতত্ত্ব অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক ও সাকার, *ব্রহ্মপুরাণ*-এ তিনিই আবার নির্গুণতত্ত্ব অর্থাৎ তাঁর মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণরাহিত্য ঘটেছে। স্বরূপত তিনি নিরাকার ও বিমূর্ত। অন্যদিকে, *গণেশপুরাণ*-এর গণেশ সগুণ এবং নির্গুণের মিশ্রতত্ত্ব, এই সমন্বয়ের ধারণায় সগুণ গণেশ কার্যত নির্গুণ গণেশের মুখবন্ধ বা আদিরূপ।[৮৫] *মুদগলপুরাণ*-এ গণেশ আবার 'সম্যোগ'-রূপে (abstract synthesis with absolute reality and soul) ব্যাখ্যাত, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে পরম সত্য ও আত্মার বিমূর্ত সংশ্লেষণ ঘটেছে।

গণেশপুরাণ বিষয়গতভাবে 'উপাসনাখণ্ড' (প্রথম ভাগ) এবং 'ক্রীড়াখণ্ড' (দ্বিতীয় ভাগ)--- এই দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। বিরানব্বইটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত 'উপাসনাখণ্ড'-এর আলোচ্য বিষয় ধর্মতত্ত্ব এবং ভক্তিযোগ। একশো পঞ্চান্নটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত 'ক্রীড়াখণ্ড'-এর আলোচ্য বিষয়বস্ত হল বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ এবং গণেশ-সংক্রান্ত পৌরাণিক উপাখ্যান। *গণেশপুরাণ*-এর বহু পাঠান্তর পাওয়া গেছে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রবল প্রতিপত্তির কালে এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষের যুগে এই পুরাণ রচিত ও পরিমার্জিত হয়েছিল।[৮৬] বেইলির মতে, অন্যান্য পুরাণের মতো *গণেশপুরাণ*-এর মধ্যেও সমসাময়িক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে।[৮৭] পরিশিষ্টাংশে 'ক্রীড়াখণ্ড'-কে 'উত্তরখণ্ড' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। উপাসনাখণ্ডের ৪৬ নং অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত 'গণেশসহস্রনামস্তোত্র'-টি (গণেশের একহাজার নাম ও গুণাবলীর প্রশস্তিসূচক অংশ) *গণেশপুরাণ*-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় অংশ। নৈমিষারণ্যের ঋষিসমাবেশে ব্যাসের কথকতার আদলে এই পুরাণ রচিত। এর রচনাভঙ্গি শিক্ষামূলক ও পৌরাণিক। এই পুরাণের উপাখ্যান অংশের রূপকল্প ও কাঠামো অন্যান্য পুরাণগুলির মতোই। যদিও বেইলির মতে, *গণেশপুরাণ*-এ ভিন্নধর্মী চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। প্রথমত, এই গ্রন্থে পুরাণের তথাকথিত 'পঞ্চলক্ষণ' অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, এতে উপদেশমূলক ভঙ্গিতে ধর্মশাস্ত্রের উপাদান অত্যন্ত কম পরিমাণে ব্যবহৃত। তৃতীয়ত, পৌরাণিক আখ্যানের কাঠামো এমনভাবে সজ্জিত হয়েছে, যার দ্বারা মনে হয় গণেশ যেন সমস্ত উপাখ্যানেই হস্তক্ষেপ করেছেন। পৌরাণিক আখ্যানগুলিতে গণেশকে সর্বদাই অন্যান্য দেবতাদের জীবনস্বরূপ ও আদর্শস্থানীয় রূপে উপস্থাপনা করা হয়েছে। চতুর্থত, পুরাণের আখ্যানগুলিতে প্লটের কাঠামো অপরিবর্তনীয়।[৮৮]

গণেশপুরাণ-এর 'ক্রীড়াখণ্ড'-এ চার যুগে আবির্ভূত গণেশের চারটি মুখ্য রূপভেদ বা অবতার এবং তদ্বিষয়ক আখ্যানের বর্ণনা করা হয়েছে। 'ক্রীড়াখণ্ড'-এর অধ্যায়গুলিকে পর্যায়ক্রমে চারটি যুগের বিভাজনরেখায় বিন্যস্ত করা হয়েছে। ১-৭২ নং অধ্যায়ে কৃতযুগ (নামান্তরে সত্যযুগ), ৭৩-১২৬ নং অধ্যায়ে ত্রেতা যুগ, ১২৭-১৩৭ নং অধ্যায়ে

দ্বাপর যুগ এবং ১৩৮-১৪৮ নং অধ্যায়ে দ্বাপরলীলারই অংশরূপে 'গণেশগীতা' উপস্থাপিত হয়েছে। ১৪৯ নং অধ্যায়ে বর্তমান কলিযুগের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ১৪৯-১৫৫ নং অধ্যায় আলোচনামূলক, একটি প্রামাণ্য পুরাণ গ্রন্থের যে সকল সাহিত্যগুণ থাকা প্রয়োজন, এই অংশেই তা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

কৃত যুগের গণেশ মহোৎকট বিনায়ক নামে পরিচিত। ইনি রক্তবর্ণ, দশভুজ, বিরাটদর্শন। এঁর বাহন সিংহ। কশ্যপ ও অদিতির সন্তান হয়ে কাশ্যপ্যেয় নামে ইনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। এই অবতারে তিনি নরান্তক ও দেবান্তক নামে দুই অসুরভ্রাতা এবং ধূম্রাক্ষ নামে এক দৈত্যকে বধ করেছেন। ত্রেতা যুগের গণেশাবতার ময়ূরেশ্বর ষড়ভুজ, শ্বেতবর্ণ এবং ময়ূরবাহন। ইনি শিব-পার্বতীর পুত্ররূপে আবির্ভূত। এই অবতারে তিনি সিন্ধু নামক এক দৈত্যকে বধ করেছেন। অবতারলীলা সমাপ্ত হলে তিনি তাঁর ময়ূরটি ভ্রাতা কার্তিককে প্রদান করেন।দ্বাপর যুগের আদিতে শিব-পার্বতীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন গজানন। ইনি রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ইঁদুরবাহন। সিন্দুর নামক দৈত্যকে তিনি এই অবতারলীলায় বধ করেছেন। গজানন অবতারেই তিনি রাজা বরেণ্যর সামনে যোগমার্গদর্শক 'গণেশগীতা' প্রকাশ করেন। কলিযুগের সম্ভাব্য গণেশাবতার ধূম্রকেতু। ইনি দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ, নীলবর্ণ ও অশ্ববাহন রূপে কল্পিত। ইনি কলিযুগের অন্তিমলগ্নে আবির্ভূত হয়ে প্রভূত দৈত্য নিধন করবেন। ধূম্রকেতুর রূপকল্পে বিষ্ণুর দশম অবতার কল্কির ছায়া লক্ষ করা যায়।

মুদগল পুরাণ :

এই শাস্ত্রগ্রন্থে গণেশকে কেন্দ্র করে নানাবিধ পৌরাণিক উপাখ্যান এবং মাহাত্ম্যমূলক ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থাপিত হয়েছে। *গণেশপুরাণ*-এর মতোই *মুদগলপুরাণ*-ও গাণপত্য সম্প্রদায়ের কাছে অন্যতম প্রধান গ্রন্থ। গণেশকে কেন্দ্রে রেখে বহুবিধ আখ্যান-উপাখ্যানের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাবয়ব গ্রন্থের (দর্শনপ্রকাশক ও লীলাপ্রকাশক) পরিকল্পনা, একমাত্র *গণেশপুরাণ* এবং *মুদগলপুরাণ*-এর ক্ষেত্রেই লভ্য। গণেশ-কেন্দ্রিক পুরাণশাস্ত্রের নিদর্শন হিসেবে গাণপত্য সমাজে এই দুটি গ্রন্থের মান্যতা সর্বাধিক।

মুদগলপুরাণ ঘিরেও কালবিতর্ক প্রচুর। এক্ষেত্রে গবেষকদের মতৈক্য প্রায় নেই বললেই চলে। ফিলিপ গ্র্যানোফ এই পুরাণের আভ্যন্তরীণ প্রমাণগুলি পরীক্ষা করে গ্রন্থটিকে গণেশ বিষয়ক সর্বশেষ দর্শনশাস্ত্র বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।[৮৯] আর. সি. হাজরার মতে, গণেশপুরাণের সম্ভাব্য সময়সীমার পূর্বেই *মুদগলপুরাণ* রচিত হয় অর্থাৎ আনুমানিক ১১০০-১৪০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কে *গণেশপুরাণ*-এর রচনাকাল ধরলে *মুদগলপুরাণ* এর পূর্ববর্তী

সময়ের রচনা হতে পারে।[৯০] যদিও গ্র্যানোফ এই আপেক্ষিক সময়নির্ণয়ের সমস্যার দিকটিও তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, *মুদগলপুরাণ*-এ যথাক্রমে *ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, গণেশপুরাণ*-এর নামোল্লেখ থাকায় একে *গণেশপুরাণ*-এর পূর্বকালীন ভাবা শক্ত। গবেষক কোর্টরাইট আবার এই গ্রন্থকে ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতকের অন্তর্বর্তীকালীন মনে করেছেন। যদিও তাঁর মন্তব্যের সপক্ষে তেমন কোনও জোরালো যুক্তি চোখে পড়ে না।[৯১] গণেশ-গবেষক থাপান *গণেশ* ও *মুদগলপুরাণ* সংক্রান্ত কালবিতর্কের ঝোঁকগুলি পর্যালোচনা করে একে একটি বহুকালস্তরবিশিষ্ট গ্রন্থ বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, এই পুরাণের আদি রূপটি অবশ্যই প্রাচীন। তবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ভারতের কোনও কোনও অংশে গণেশপূজা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করলে এই পুরাণের মধ্যে অনেকগুলি অংশ প্রক্ষেপরূপে সংযোজিত হয়।[৯২]

গণেশপুরাণ-এর মতো *মুদগলপুরাণ*-এও গণেশপারম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। জগৎস্বরূপ পরমাত্মা এবং সর্বোচ্চ সত্যরূপে তাঁর বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চোপাস্যের চার দেবতার মতো তিনি ব্রহ্মের প্রকাশরূপমাত্র নন, তিনি সাক্ষাৎরূপে পূর্ণব্রহ্মই। এই অভিন্নতাসূত্রে গাণপত্য কুলদেবতার মর্যাদা এখানে তুঙ্গবিন্দু স্পর্শ করেছে। নির্গুণ পরম সত্যের সগুণ অস্তিত্বকল্পনা অবতারধারণের মধ্য দিয়ে প্রকাশমাধ্যম খুঁজেছে। এক একটি অধ্যায়ে প্রত্যেক অবতারের বিস্তৃত বিবরণের পাশাপাশি তাঁদের লীলামাহাত্ম্যও প্রকাশিত হয়েছে। গণেশপুরাণের মতো এখানে চতুর্বিধ অবতার নয়, গণেশের অগণন রূপভেদ স্বীকার করেও মুখ্যত অষ্ট অবতারের (১।১৭।২৪-২৮) ধারণা গুরুত্বলাভ করেছে। এই অষ্টাবতার গণেশপুরাণোক্ত অবতারদের থেকে স্বভাবত স্বতন্ত্র। প্রত্যেক অবতারের প্রতিপক্ষ হিসেবে যারা আছেন, সেই অসুরেরা বৃহদার্থে মানববৃত্তিরই (মাৎসর্য, মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ, কাম, আমিত্ব, অভিমান) এক-একটি বহিঃপ্রকাশ। গণপতি বিভিন্ন সময়ে নানা রূপে লীলাপ্রকটনের মধ্য দিয়ে চিত্তের অভ্যন্তরস্থ কুবৃত্তিগুলির শাসন ও দমন করেন। এইভাবে প্রবৃত্তিরূপী এক-একটি অসুর ধ্বংসের মাধ্যমে তিনি জীবের অষ্টপাশমুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। কাজেই, *মুদগলপুরাণ*-এর অষ্ট অবতারের এই ধারণা একান্তভাবেই একটি দার্শনিক প্রকল্পনা। লক্ষ করলে দেখা যাবে, আটটি অবতারের শেষ চারটিতে অর্থাৎ লম্বোদর, বিঘ্নরাজ, বিকট এবং ধূম্রবর্ণের মধ্যে তত্ত্বত শক্তি, সূর্য, বিষ্ণু এবং শিবের প্রতিরূপায়ণ ঘটেছে। গাণপত্য কুলদেবতা তাঁর সগুণাত্মক অবতারকল্পনার মধ্যে সূক্ষ্মভাবে চারিয়ে দিয়েছেন পঞ্চায়তন পূজার অন্য চার উপাস্যকে। গাণপত্য সম্প্রদায়ের perspective থেকে একে 'politics of incorporation' বা অধীনতামূলক অন্তর্ভুক্তির তাত্ত্বিক রূপায়ণ বলে মনে হয়। গণেশ এখানে সর্বব্যাপী পূর্ণব্রহ্মই নন কেবল, সগুণাত্মক অবস্থায় শক্তি, সূর্য, বিষ্ণু বা শিবেরও নামান্তর হয়ে উঠেছেন।

নিজ সম্প্রদায়ের দেবতাকে তত্ত্বত সর্বোচ্চ অবস্থানে রেখে অন্যান্য উপাসকগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় দেবতাদেরও তাঁর আধারে আত্মসাৎ করে নেওয়া গাণপত্যদের ধর্ম-সম্প্রদায়গত অগ্রগামিতার অভিপ্রায় প্রসূত।

মুদগলপুরাণ-এর বর্ণনা অনুসারে গণেশ বিভিন্ন যুগে নানা পরিচয়ে, নানা নামধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই পুরাণে জগৎসৃষ্টি সংক্রান্ত বিবিধ জটিল দার্শনিক তত্ত্ব অবতারবর্ণনার আধারে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেক অবতার সর্বোচ্চ সত্যের এক-একটি স্তর। এই স্তরগুলি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। গ্র্যানোফ মুদগলবর্ণিত প্রত্যেক অবতারের দার্শনিক অর্থের একটি ব্যাখ্যাসার উপস্থিত করেছেন।[৯৩] তবে দার্শনিক তত্ত্বায়নের পাশাপাশি দেব-দানবের যুদ্ধপ্রকৃতির বর্ণনার মতো সাধারণ পৌরাণিক বৈশিষ্ট্যগুলিও এই গ্রন্থে লক্ষণীয়। একমাত্র বিঘ্নরাজকে বাদ দিলে এক-একটি অবতারে গণপতির দেহের এক-একটি অঙ্গ বা কখনও বর্ণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই বিশেষ অঙ্গ বা বর্ণচিহ্নই ওই অবতারের নামরূপে প্রতিফলিত।

গণেশের প্রথম অবতার বক্রতুণ্ড। বাহন সিংহ। বাঁকা শুঁড় এই গণেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঙ্গ। সকল দেহের সমষ্টি রূপে সর্বোচ্চ সত্যের রূপ এটি। এটি ব্রহ্মের একটি সাকার রূপ। এই অবতার ধারণের উদ্দেশ্য হল মাৎসর্যবৃত্তির দমন অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতার নাশ। এই ঈর্ষাবৃত্তিরই রূপকায়ন ঘটেছে অসুরচরিত্রে। ঈর্ষাসুর ধ্বংসের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধির শিক্ষা দিয়েছেন বক্রতুণ্ড গণপতি। দ্বিতীয় অবতার একদন্ত। বাহন ইঁদুর। এক্ষেত্রে একদন্ত অর্থাৎ গজমুখের একটি দাঁত প্রত্যেক আত্মার সমষ্টি। এটি ব্রহ্মের মূল প্রকৃতির স্বরূপ। এই অবতার ধারণের উদ্দেশ্য মদাসুর অর্থাৎ দম্ভ বা অহমিকাবৃত্তির বিনাশ। একদন্ত গণেশ নিরহংকার চিত্তের দ্যোতক। তৃতীয় অবতার মহোদর, বক্রতুণ্ড ও একদন্তের সম্মিলিত রূপ। বাহন মূষিক। এই বিশাল উদর ব্রহ্মের প্রজ্ঞার প্রতীক। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় প্রবেশরত সর্বোচ্চ সত্যের স্তর এটি। এই অবতার ধারণের উদ্দেশ্য মোহাসুরকে ধ্বংস করা অর্থাৎ সংশয়, মোহ বা ভ্রমাত্মক প্রবৃত্তির নাশ। চতুর্থ অবতার গজবক্ত্র বা গজানন। বাহন মূষিক। ইনি মহোদরের রূপান্তর। এই অবতারের উদ্দেশ্য হল লোভাসুরকে ধ্বংস করা অর্থাৎ লালসাবৃত্তির উপশম ঘটিয়ে চিত্তকে নির্লোভ করা। পঞ্চম অবতার লম্বোদর। বাহন মূষিক। যে স্তরে পৌরাণিক দেবদেবীদের সৃষ্টি হয়েছে, সেই স্তরের চার অবতারের মধ্যে ইনিই প্রথম। লম্বোদরের সঙ্গে ব্রহ্মের শুদ্ধ রজোময়ী শক্তি বিরাজমান। এই অবতারের উদ্দেশ্য ক্রোধাসুরকে ধ্বংস করা। আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব বা ক্রোধানল থেকে মুক্ত করে লম্বোদর গণপতি শান্তচিত্ত হওয়ার শিক্ষা দেন। ষষ্ঠ অবতার বিকট। বাহন ময়ূর। বিকট অর্থে অপ্রাকৃত বা বীভৎস রূপ। ইনি সূর্যের প্রতিরূপ। ব্রহ্মের প্রজ্জ্বলন্ত সত্তা বা জাজ্জ্বল্যমানতার প্রতীক। এই অবতারের উদ্দেশ্য কামাসুরকে ধ্বংস করা অর্থাৎ কামনাবৃত্তির অবসান

ঘটিয়ে চিত্তকে নিষ্কাম করা। বিঘ্নরাজ সপ্তম অবতার। বাহন শেষনাগ। বিঘ্নের প্রভু বা ঈশ্বররূপে গণেশ এখানে বিষ্ণুর প্রতিরূপ। তিনি ব্রহ্মের পালক সত্তার প্রতীক। এই অবতারের উদ্দেশ্য মমাসুরকে ধ্বংস করা অর্থাৎ অধিকারবোধ বা আমিত্বের বিনাশ। বিঘ্নরাজ রূপে গণেশ এখানে দর্পহারী নারায়ণের সগোত্র। আত্মভারময় প্রবৃত্তিকে শাসন করে তিনি অহংনাশের শিক্ষা দেন। ধূম্রবর্ণ অষ্টম অবতার। গাত্রবর্ণ ধূসর। ইনি অশ্ববাহন। তিনি শিবের প্রতিরূপ। ইনি ব্রহ্মের ধ্বংসাত্মক সত্তার প্রতীক। এই অবতার ধারণের উদ্দেশ্য অভিমানাসুর অর্থাৎ অহংকার, আসক্তি প্রভৃতি কুবৃত্তির নাশ করে চিত্তকে নিরাসক্ত করা।

গণপত্যথর্বশীর্ষ বা *গণপত্যুপনিষদ* :

গণপত্যথর্বশীর্ষ বা *গণপত্যুপনিষদ* গাণপত্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাদৃত এবং অবশ্যপাঠ্য গণপতি-তত্ত্বপ্রকাশক গ্রন্থ। গ্রন্থটিকে অথর্ববেদের শেষাংশ বা এর উপসংহার পর্বের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হয়। সময়কালের বিচারে এই গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের রচনা বলে অনুমিত হয়। অপরাপর সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থের মতো *গণপত্যুপনিষদ্*-ও একটি শান্তিবচনের মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে। এই গ্রন্থের মূল অংশের দ্বিতীয় স্তোত্রে গণেশকে পরম সত্তা এবং পরব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যে'ভাবে শৈব উপনিষদগুলিতে শিবকে, বৈষ্ণব উপনিষদগুলিতে বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে, শাক্ত উপনিষদগুলিতে মহাশক্তিকে ওঙ্কার, ব্রহ্ম, পরমাত্মা বলে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লিখিত বৈদিক 'তত্ত্বমসি' ('তুমিই সেই') ধারণার মূর্ত প্রতীকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, *গণপত্যথর্বশীর্ষ*-এ তেমনই গণেশকেও অনুরূপ বিশেষণে সম্বোধিত করা হয়েছে। শান্তিপাঠের পর জগপতি গণেশের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে *গণপত্যুপনিষদ*-এর প্রথম মন্ত্র শুরু হয়েছে এইভাবে, 'ওঁ নমস্তে গণপতয়ে'(১)।[৯৪] এরপর দ্বিতীয় মন্ত্র থেকেই গণেশ এবং ব্রহ্মতত্ত্বের অভিন্নত্বের ধারণাটি বিস্তারিত করা হয়েছে। বেদপ্রতিপাদ্য পরমব্রহ্মরূপ গণপতি ওঁকার, পরমাত্মা এবং সচ্চিদানন্দরূপে আলোচ্য গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হয়েছেন। দ্বিতীয় স্তোত্রে তাঁর ব্রহ্মস্বারূপ্যের স্পষ্টোল্লেখ দেখা যায়, "ত্বমেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি। ত্বমেব কেবলং কর্তাহসি। ত্বমেব কেবলং ধর্তাহসি। ত্বমেব কেবলং হর্তাহসি। ত্বমেব সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মাসি। ত্বং সাক্ষাদাত্মাহসি নিত্যম্"(২)।[৯৫] শাস্ত্রজ্ঞ স্বামী তত্ত্ববিদানন্দ সরস্বতীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, গাণপত্য কুলদেবতাই একমাত্র 'তত্ত্বমসি' শব্দের সারতত্ত্বের প্রত্যক্ষ রূপ। একমাত্র তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। জগতে একমাত্র তিনিই এই সর্বস্ব--- 'ইদং সর্বম্', কারণ তিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বব্যাপী সত্য। তাঁকে সাক্ষাৎরূপে নিত্যাত্মা বা চিরন্তন আত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ স্তোত্রের একটি অংশে বলা হয়েছে, "ত্বং ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং রুদ্রস্ত্বমিন্দ্রস্ত্বমগ্নিস্ত্বং বায়ুস্ত্বং

সূর্যস্ত্বং চন্দ্রমাস্ত্বং ব্রহ্ম ভূর্ভুবস্সুবরোম্”(৬)।[৯৬] এই উল্লেখে ব্রহ্মরূপে গণপতিকে সমস্ত দেবতার সারবিগ্রহ বলা হয়েছে। তাঁর মধ্যেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র-ইন্দ্র-অগ্নি-বায়ু-সূর্য-চন্দ্রাদি সকল দেবতা সারবদ্ধ বা সম্মিলিত হয়েছে। সর্বস্বরূপে তিনিই ভূলোক, অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোক অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের প্রকাশই তাঁর মূর্তি। সত্যরূপে এবং শাশ্বতরূপে তিনিই একমাত্র পূর্ণ এবং নিত্য। এক গণেশের মধ্যেই সমস্ত দেবতার সংহতিকরণের ধারণায় সম্প্রদায়গত উদ্দেশ্যটিও বেশ স্পষ্ট। গাণপত্য সম্প্রদায়ের মুখ্য উপাস্যরূপে গণেশের প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির লক্ষ্যেই কার্যত অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মূল উপাস্যদের সঙ্গে গণেশের একাত্মকরণ ঘটিয়ে তাঁকে পূর্ণ এককরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একাদশ স্তোত্রের একটি শ্লোকে তাঁকে ‘জগৎকারণমচ্যুতম্’ অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির উৎস বা আদিকারণ বলা হয়েছে। স্বামী তত্ত্ববিদানন্দ টীকাভাষ্যে এই ‘অচ্যুত’ শব্দের সাধনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

> Since the universe is only an appearance, and the Lord is its apparitional cause, there is no real doership or enjoyership for the Lord with reference to this universe. If the Lord were to be the doer in the absolute sense, that would be a downfall from the exalted position of Existence Absolute, which is timeless. But, though the universe emanating from the Lord is time-bound, the Lord who is the cause of the universe remains timeless. This is the meaning of the word *acyuta*, one who has no downfall.[৯৭]

সময়বন্ধনাবদ্ধ সংসারের সৃষ্টিকর্তা তিনি স্বয়ং, অথচ নিজেই তিনি অনন্ত, অপার, সময়াতীত। তাঁর উপাসনার মধ্য দিয়েই সংসারবদ্ধ জীব জন্ম-মৃত্যুচক্রের বন্ধন উত্তীর্ণ হয়। একতমরূপে গণপতির এই অধিষ্ঠান গাণপত্য ধর্ম-সমাজের সাফল্যের অন্যতম সূত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, *গণপত্যথর্বশীর্ষ* কেবল নিরাকার নিরূপাধিক ব্রহ্মস্বরূপেই গণপতিকে ব্যাখ্যা করেনি, তাঁর একটি সাবয়ব মূর্তিও নির্মাণ করেছে। একাদশ স্তোত্রে গণেশের গাত্রবর্ণ, হস্তসংখ্যা, অঙ্গসৌষ্ঠব, বাহন এবং আয়ুধাদির পরিচয় পাওয়া যায়।[৯৮] মূষিকবাহন গণেশ রক্তবর্ণ, তাঁর অঙ্গ রক্তগন্ধচর্চিত, পরিধেয় রক্তবস্ত্র। তিনি চতুর্ভুজ, একদন্ত, লম্বোদর ও শূর্পকর্ণরূপে (কুলোর মতো কানবিশিষ্ট) বর্ণিত। তিনটি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ ও দন্ত ধারণ করেন, চতুর্থ হস্ত বরাভয় মুদ্রায় শোভিত। রক্তবর্ণ পুষ্পের দ্বারা তিনি পূজিত হন। এই গ্রন্থের দ্বাদশ সংখ্যক মন্ত্রে গণেশকে নানা মহত্ত্বপূর্ণ অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে, যেমন- ‘ব্রতপতি’, ‘গণপতি’, ‘প্রমথপতি’, ‘লম্বোদর’, ‘একদন্ত’, ‘বিঘ্ননাশী’, ‘শিবসুত’ এবং ‘বরদমূর্তি’।[৯৯] উদ্দিষ্ট মন্ত্রটি মালা মন্ত্র

নামে পরিচিত, কারণ এতে গণেশের আটটি মহিমাব্যঞ্জক নাম কীর্তিত হয়েছে। এক্ষেত্রে 'আট' সংখ্যাটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা 'গণপতি' শীর্ষক মহামন্ত্রেও এই আটটি বর্ণের সমাহার (গ্+অ+ণ্+অ+প্+অ+ত্+ই) লক্ষণীয়। নামাষ্টক মন্ত্রের প্রথম নামে তিনি জনৈক ব্যক্তির ব্রতাধীশ অর্থাৎ ব্রতের অধীশ্বর বা উদ্দিষ্ট। অথচ দ্বিতীয় নামে তিনি 'গণপতি', বহুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই দুই নামের সূত্রে ঋগ্বেদোক্ত অগ্নির সঙ্গেও তিনি সমানধর্মা। সূক্ষ্মভাবে দেখলে 'ব্রতপতি' এবং 'গণপতি' বিপরীত অর্থযুক্ত মনে হয়। আসলে ব্রতের ধারণার সঙ্গে যোগ এককের, 'গণ' সেখানে বহুর দ্যোতক। যদিও এককের ব্রতপতি যিনি, গণপতি রূপে তিনিই প্রকারান্তরে ওই একককে আত্মস্থ করেছেন অর্থাৎ এক এখানে বহু তথা সমষ্টির আধারেই সংহত হয়েছে। স্বামী তত্ত্ববিদানন্দ সরস্বতী টীকাভাষ্যে জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ক বিন্যাসের সূত্রে একে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে :

> *Vrata* means an individual, while *gana* is a group. It seems that the devotee says to the Lord: "O Lord, I am the *jiva* and you are the Lord of the *jivas.* I belong to a family or a group, and you are the Lord of all such groups. The entire universe including me and my group exists, as it were, in your belly. You may remove all the obstacles in our path and grant us boons.[১০০]

প্রমথপতি ও শিবসুত পরিচয়ে শিব এবং গণেশ একাত্মক। গণেশ প্রমথপতিরূপে প্রমথ বা শিবগণের নেতৃস্থানীয় দেবতা। শিবসুতরূপে তিনি শিবের সঙ্গে পুত্রসম্বন্ধে যুক্ত। তত্ত্ববিদানন্দ সরস্বতী 'প্রমথপতি'-র ব্যাখ্যায় লিখেছেন, প্রকৃত প্রমথ আসলে সেই ভক্ত, যিনি ভক্তির শক্তি সম্বল করে সর্বদা উপাস্যের প্রতি আত্মসমর্পণের ভাব পোষণ করেন। ঈশ্বরের প্রসাদে তাঁর যাবতীয় সাধনবিঘ্নের নিরসন হয়ে তিনি শিবের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করেন। টীকাকার লিখছেন, "Lord Ganapati is the son of Siva. But then, the father and the son are One and same. Siva is the *Nirguna Brahman*, while Ganapati is the *Saguna Brahman.* Worship of the latter leads the devotee to gain identity with the former."[১০১] যেহেতু শিব এবং গণেশ স্বরূপত অভিন্নতত্ত্ব, ফলে সাধকের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নির্গুণাত্মক শিব সগুণাত্মক গণেশের সঙ্গে সমতত্ত্বরূপে প্রতিভাত হন। লম্বোদর ও একদন্ত পরিচয় দুটি আপাতভাবে গণেশের দেহবৈশিষ্ট্যের সূচক। যদিও সাধকসমাজে এর অন্যার্থ প্রচলিত। লম্বোদর অর্থে সমগ্র বিশ্বকেই তিনি নিজের উদরে ধারণ করেছেন। বৃহৎ উদরময় গণপতি বিশ্বাত্মারূপেই লম্বোদর। এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড গজানন গণেশের-ই প্রতিবিম্ব। ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় লিখছেন, "The

Lord has a large belly. This is highly symbolic. It is naïve to assume that the Lord is a glutton. The Lord is not only the origin of this universe, but He also sustains and protects it, just as a mother protects the child in her womb."[১০২] একদন্ত-রূপেও গণেশ শিবলিঙ্গের সমানধর্মা। গণেশের বরপ্রদমূর্তিতে সিদ্ধিদাতার ভাবব্যঞ্জনা পাওয়া যায়।

গণপতি উপনিষদ-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হল, এই গ্রন্থে গণপতি-তত্ত্ব ব্যাখ্যার মধ্যে তান্ত্রিক ধারণাগুলির সমন্বয় লক্ষ করা যায়। অনেকের মতে এই তান্ত্রিকী উল্লেখগুলি দেখে গ্রন্থটি যে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে রচিত, তা অনুমান করা যায়। ষষ্ঠ স্তোত্রের একটি অংশে গণেশকে দেহস্থ ষট্‌চক্রান্তর্গত মূলাধার চক্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, 'ত্বং মূলাধারস্থিতোহসি নিত্যম্' অর্থাৎ তুমি নিরন্তর মূলাধার চক্রে অবস্থান করো।[১০৩] এ ছাড়া এই গ্রন্থের সপ্তম মন্ত্রে গণেশের বীজমন্ত্র 'গং'-এর সবিস্তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[১০৪] 'গণ' শব্দের প্রথম বর্ণ 'গ' উচ্চারণপূর্বক যখন আনুনাসিক 'ণ' বর্ণটি উচ্চারণ করা হয়, তখন তা অর্ধচন্দ্রের মতো সুন্দর রূপে প্রতিভাত হয়। এইটিই তত্ত্বত গণেশের রূপ। 'গ' এখানে প্রথম বর্ণ, 'অ' মধ্যবর্ণ এবং 'ণ' শেষবর্ণ। এই শব্দ উচ্চারণমাত্রেই সকল শব্দ একযোগে উচ্চারিত হয়। *গণপত্যথর্বশীর্ষ*-এর দশম মন্ত্রে গণক ঋষির দ্বারা উক্ত নৃচদ্‌গায়ত্রীছন্দে রচিত *তৈত্তিরীয় আরণ্যক*-এর দশম প্রপাঠক বা মহানারায়ণ উপনিষদোক্ত গণেশগায়ত্রী ("একদন্তায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াত্।।") বর্ণিত হয়েছে।[১০৫] এই মন্ত্রটিকে গণেশের ধ্যান ও জ্ঞানের প্রেরণাদায়ক মনে করা হয়। জন গ্রিমসের মতে মন্ত্রটি গণেশভক্তের পরম আধ্যাত্মিক প্রেরণার উদ্বোধক, মন্ত্রোক্ত 'দন্ত' ও 'তুণ্ড' শব্দ দুটি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতীক। এই প্রতীকতত্ত্বের মাধ্যমে পার্থিব, বৌদ্ধিক ও অতীন্দ্রিয় আত্মোপলব্ধির সংযোগ সাধিত হয়।[১০৬]

২.৪

গণপতির রূপভেদ এবং গাণপত্য সম্প্রদায় :

গুপ্তরাজত্বের শেষদিকে গণপতির নির্দিষ্ট মূর্তি দ্বারা তাঁর পূজার্চনার সূচনা হলেও এর বেশ কিছুকাল পর থেকেই সাধারণ্যে তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বলে মনে করা হয়।[১০৭] গণপতির এই উত্তরোত্তর লোকপ্রিয়তা বৃদ্ধির নেপথ্যে গাণপত্যদের বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা ছিল। তাঁরা ধর্মদার্শনিকভাবে গণপতিকে ত্রিমূর্তিতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের উর্ধ্বে পরব্রহ্মের স্থানাভিষিক্ত করেছিলেন।[১০৮] নিজেদের সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় উপাস্যকে তত্ত্বগতভাবে

সর্বোচ্চ মর্যাদা না দিলে কোনও সম্প্রদায়ের-ই ধর্মীয় মতবাদ দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে না। এক্ষেত্রে গাণপত্যরাও তাঁদের কুলদেবতার পূজার্চনাকে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির কাঠামোয় একটি সুস্পষ্ট রূপদানের চেষ্টা করেন। *পদ্মপুরাণ*-এর রচনায় গাণপত্যগণের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। এই পুরাণের ‘সৃষ্টিখণ্ড’-এ গণপতি মাহাত্ম্য বর্ণনের অধ্যায়গুলিতে গণেশকেই গৌরবান্বিত করা হয়েছে।[১০৯] আনন্দগিরির (নামান্তরে অনন্তানন্দগিরি) *শঙ্করবিজয়* বা *শঙ্করদিগ্বিজয়* গ্রন্থ থেকে মধ্যযুগের ভারতে গণপতির পূজক বা একভক্ত-সম্প্রদায় হিসেবে ছয়টি শাখার কথা জানা যায়।[১১০] গ্রন্থটি কার্যত ধর্মীয় বিতর্ক ও প্রচারমূলক। এর বিষয়বস্তু আচার্য শঙ্করের মতো প্রবল প্রতিপক্ষের কাছে গণপতির বিভিন্ন উপাসক গোষ্ঠীর নতিস্বীকার এবং তাঁদের বৈদান্তিক শঙ্করের মতাদর্শের অনুকূলে আনয়ন। এই পৃথক গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রত্যেক সদস্যই নির্বিশেষভাবে গাণপত্য অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সকলেই গণপতির পূজক। যদিও একই উপাস্যের বিশেষ বিশেষ রূপভেদের ভিত্তিতে গাণপত্যগণ ছয়টি শাখায় বিশ্লিষ্ট। যেমন, মহাগণপতি, হেরম্ব গণপতি, উচ্ছিষ্ট গণপতি, হরিদ্রা গণপতি, নবনীত গণপতি এবং সন্তান গণপতি। সম্প্রদায়গুলির কেন্দ্রীয় উপাস্য গণপতি হলেও তাঁর পৃথক ছয়টি রূপভেদ অনুযায়ী এক-একটি গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র তত্ত্বদর্শন ও সাধনমার্গ গড়ে উঠেছে, এমনকী গণেশের ছয়টি রূপের নাম অনুসারেই সেই সেই গোষ্ঠীর গাণপত্যগণ চিহ্নিত হয়েছেন। প্রত্যেক গোষ্ঠীর অনুগামীরা ভাব-শাস্ত্র-তত্ত্বে তো পৃথক বটেই, পাশাপাশি উপাস্যের নাম, রূপ এবং মন্ত্রেও বিশিষ্ট। তাঁরা দার্শনিকভাবে অখণ্ড-মূল হলেও চেহারায় বহুত্ব বিদ্যমান। প্রত্যেক শাখার সদস্যরা নিজেদের কপালে ও বাহুতে সেই সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ কুলচিহ্ন ধারণ করেন। এতে পরস্পরের পরিচয়ের পৃথকত্ব-ও তৈরি হয়। উদ্দিষ্ট গ্রন্থের বিবরণ থেকে জানা যায়, আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টম বা নবম শতক নাগাদ অদ্বৈত বেদান্তের প্রবক্তা শৈব দার্শনিক শঙ্করাচার্য গাণপত্য সম্প্রদায়ের এই ছয়টি শাখা বা উপবিভাগের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ধর্মীয় বাকযুদ্ধে তাঁদের যথাসম্ভব নির্জিত করে নিজের মতের সপক্ষে আনেন। পণ্ডিতদের মতে আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতক নাগাদ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গাণপত্য সম্প্রদায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

গাণপত্যগণ দেবতাদের শ্রেণিনির্ণয়ের বিরোধী হলেও মূর্তিভেদ অনুসারে গাণপত্য সমাজে যে পঞ্চ বিনায়কের অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রথমে তাঁদের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।[১১১]

১। স্বানন্দনাথ বা একাক্ষর গণপতি, নিবাস স্বানন্দলোক, শক্তি: স্বানন্দ-সিদ্ধি ও বুদ্ধি

২। বক্রতুণ্ড গণপতি, নিবাস চিন্তামণিদ্বীপ, শক্তি: সগুণ সিদ্ধি ও বুদ্ধি

৩। শারদেশ বা শ্বেত গণপতি, নিবাস ব্রহ্মলোক, শক্তি: সারদা বা বুদ্ধি-সরস্বতী

৪। মহা গণপতি, নিবাস শক্তিলোক(মতান্তরে মণিদ্বীপ), শক্তি: সিদ্ধি-লক্ষ্মী

৫। উচ্ছিষ্ট গণপতি, নিবাস উচ্ছিষ্ট পুরম, শক্তি: বিনায়কী বা নীলসরস্বতী(নামভেদে ময়ূরী, বিঘ্নেশ্বরী)

মূর্তিভেদে শক্তি ও ভবন সহ পঞ্চ বিনায়কের শ্রেণিবিন্যাস

১। স্বানন্দেশ গণপতি হলেন অনেকান্ত-রূপ গণেশের (‘বহুধাত্মমূর্তি’) উৎসতত্ত্ব বা আদিমূল। *গণেশপুরাণ, মুদগলপুরাণ, বিনায়ক তন্ত্র, মেরু তন্ত্র, বিনায়ক রহস্য* প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁর পরিচয় প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত। ইনি স্বরূপত একাক্ষর (মূল-ভূত বিনায়ক), পরব্রহ্মরূপ এবং ‘তত্ত্বমসি’-তুল্য। গাণপত্য মতে, এই স্বানন্দনাথ নির্গুণ স্বরূপ। তিনি অনন্তরূপী গণপতির আদিতম একক উৎস। ব্রহ্মণস্পতি হিসেবে ব্রহ্মের যাবতীয় প্রকাশেরও অধিপতি তিনি। নির্দিষ্ট একজন দেবতারূপেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ঘটে না, বরং তিনিই সর্ববিধ অস্তিত্বের আদি এবং একতম সত্তা। গণেশের বহুরূপের উৎসে তাঁরই সর্বশ্রেষ্ঠতা বিদিত। এই আদিতত্ত্ব স্বানন্দেশ আপনার আনন্দে আপনিই বিভোর বা পূর্ণ, পরম অদ্বৈত এবং অনপেক্ষ। ঈশ্বররূপে জীব ও জগতের মিলিততনু হয়েও তিনি এ’সবের উর্ধ্বে, নিরাকার এবং পরমতত্ত্ব। গাণপত্য ধর্মভাবনা অনুসারে, তাঁর ভবন স্বানন্দলোক, যেখানে স্বানন্দেশ তাঁর ২১৬-টি রূপভেদ সহ বিদ্যমান এবং প্রত্যেক রূপ তাঁর সঙ্গে বিহাররত। প্রকৃতি-রূপ সিদ্ধি এবং পুরুষ রূপ বুদ্ধি তাঁর পত্নী বা শক্তিরূপে স্বীকৃত। এই দুই শক্তি অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতির অধীশ্বর বা স্বামী হওয়া সত্ত্বেও স্বানন্দনাথ পূর্ণরূপে অভেদাত্মক অর্থাৎ যাবতীয় দ্বৈতজ্ঞানের অতীত।

২। একাক্ষর স্বানন্দনাথের পরবর্তী স্তরে বক্রতুণ্ডের অধিষ্ঠান। স্বানন্দেশ যেমন জীব ও জগতের যুগ্ম অবয়ব হিসেবে ঈশ্বর হয়েও পরম নির্গুণ এবং আদিসত্তা, বক্রতুণ্ড সেখানে কেবলই ঈশ্বর। এই রূপভেদে নিরাবয়ব স্বানন্দনাথের সাকারত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। ফলে বক্রতুণ্ডকে একাক্ষর গণেশের সগুণ এবং সাকারতত্ত্ব বলা যায়। তিনি ত্রিগুণধর, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অধিপতি। নির্গুণাত্মক পরমসত্তার কায়াকল্পনার মাধ্যমে সগুণাত্মক বক্রতুণ্ডের ধারণা তৈরি হয়েছে। এইরূপে বক্রতুণ্ড গণেশ তাঁর ত্রিশক্তি অর্থাৎ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াকে বিশ্বসৃষ্টির জন্য প্রয়োগ করেন। গাণপত্যদের বিশ্বাসে চিন্তামণি-দ্বীপে তাঁর বাসস্থান। এখানে নিজের ২১৬-টি রূপ সহ তিনি বিরাজমান। সিদ্ধি ও বুদ্ধি বক্রতুণ্ডের পত্নীরূপে গৃহীত। তাঁরা পূর্বোক্ত স্বানন্দেশের শক্তিদ্বয় স্বানন্দ-সিদ্ধি ও স্বানন্দ-বুদ্ধির সগুণ রূপভেদ।

৩। শারদেশ বা শ্বেত গণপতি বক্রতুণ্ডের সৃজনাত্মক রূপভেদ এবং স্বরূপত জ্ঞানতত্ত্বপ্রধান। পূর্ববর্ণিত বক্রতুণ্ডের ত্রিশক্তির মধ্যে জ্ঞানশক্তি বা সৃজনশক্তির ধারণা এই রূপভেদের মাধ্যমে দৃষ্ট হয়। সৃষ্টির ধারণা প্রকাশ করেন বলে ইনি সরস্বতীনাথ অর্থাৎ বাগীশ্বরী সারদা-সরস্বতী-ই তাঁর পত্নীরূপে স্বীকৃত। ইনি ঋষি অঙ্গিরার কন্যা এবং সিদ্ধি-বুদ্ধির অবতার হিসেবে পরিচিত। গাণপত্য মতে, বিশ্বসৃজন সংক্রান্ত যাবতীয় বিদ্যার অধীশ্বররূপে এই শ্বেত গণপতিকে মান্য করা হয়। শারদেশের বাসভবন ব্রহ্মলোক, তাঁর প্রাসাদ চিন্তামণি-ভবন নামে কথিত। এখানে ২১৬-টি রূপ সহ শ্বেত গণপতি পূর্ণপ্রতিষ্ঠ।

৪। মহাগণপতি বক্রতুণ্ডের ক্রিয়াত্মক রূপভেদ। এই প্রকাশরূপের মাধ্যমে গণেশ সৃষ্টিকার্যে অংশগ্রহণ করেন। ইনি স্বরূপত লক্ষ্মীপ্রধান। ক্রিয়াশক্তিরূপে স্বীকৃত সিদ্ধি-লক্ষ্মী বা বল্লভা মহাগণপতির শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ইনি চিন্তা-সিদ্ধির অবতার এবং ঋষি মরীচির কন্যা। মহাগণপতির নিবাস শক্তিলোক, আবার *বিনায়ক রহস্য* অনুযায়ী মণিদ্বীপ। রাজ্যটি মণিদ্বীপ হলেও তাঁর প্রাসাদ স্বানন্দভবন নামে পরিচিত। এখানে নিজের ২১৬-টি রূপভেদ সমেত মহাগণপতি অধিষ্ঠিত।

৫। উচ্ছিষ্ট গণপতি গণেশের সমস্ত রূপের সারবিগ্রহ। একাক্ষর স্বানন্দেশ যেমন পঞ্চ বিনায়কের উৎসমূল, উচ্ছিষ্ট গণেশ তেমনই সারতত্ত্ব। *মুদগলপুরাণ* ও *বিনায়ক তন্ত্র* অনুযায়ী, সগুণতত্ত্ব বক্রতুণ্ড সৃষ্ট্যারম্ভে ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনকার্যে পঞ্চদেবতা অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য ও শক্তিকে নিয়োগ করার পর, ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে কে সবচেয়ে এগিয়ে এ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তাঁদের স্বভাবান্তর্গত অহংকার সৃষ্টিরচনায় বিঘ্ন সম্পাদন করে। এই ভিত্তিহীন অহংসর্বস্বতা থেকে তাঁদের মুক্ত করার জন্য স্বানন্দনাথের সগুণপ্রকাশ বক্রতুণ্ড পঞ্চদেবতার সামনে

এক শিশুমূর্তি ধারণ করে উপস্থিত হন। বক্রতুণ্ডের এই শিশুবেশী মানসমূর্তি উৎকৃষ্টের অবশিষ্ট অর্থে উচ্ছিষ্ট নামে পরিচিত হয়। গণপতির এই বিশেষরূপটি বক্রতুণ্ডের ইচ্ছাশক্তি অর্থাৎ বিনায়কী মহামায়ার অধিপতি, গাণপত্য সমাজে যিনি মূর্তিভেদে বিঘ্নেশ্বরী, ময়ূরী বা নীলস্বরস্বতী নামেও খ্যাত। বক্রতুণ্ডের চিন্তামণিদ্বীপের উচ্ছিষ্ট পুরমে তাঁর অধিষ্ঠান। এখানে ২১৬-টি রূপভেদ সহ তিনি নীলসরস্বতীর সঙ্গে বিদ্যমান। স্থূল ধামগুলির মধ্যে প্রলয়ের পরেও একমাত্র এটিই অবশিষ্ট থাকে। গাণপত্য ধর্মতত্ত্ব অনুসারে, প্রলয়মুহূর্তে গণেশের নিত্য ধামগুলিকে স্বানন্দেশ যখন নিজের অন্তর্গত করে নেন, এমনকী স্বানন্দলোক পর্যন্ত নির্গুণতত্ত্ব স্বানন্দনাথের মহানিদ্রায় লীন হয়ে যায়, তখনও একমাত্র উচ্ছিষ্ট গণেশ-ই স্বানন্দেশের সমস্ত লীলার অতন্দ্র সাক্ষী হিসেবে অস্তিত্ববান থাকেন। কারণ, তাঁকেই স্বানন্দনাথের হৃদয়ে সৃষ্টির পুনঃপ্রকাশের জন্য ইচ্ছাশক্তির জাগরণ ঘটাতে হয়। কাজেই, প্রলয়ের পরে পুনরারম্ভের মুখবন্ধ হিসেবে উচ্ছিষ্ট গণনাথ নিত্য প্রকাশিত। এই কারণে, গাণপত্য গোষ্ঠীতে তিনি কালেরও কাল বা মহাকাল নামে বিখ্যাত।

গাণপত্য ধর্ম-দর্শন অনুসারে উপরোক্ত পঞ্চ বিনায়ক এবং তাঁদের প্রত্যেকের ২১৬-টি মূর্তি ধরলে সম্মিলিতভাবে গণপতির ১০৮৫-টি রূপভেদ পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে এই রূপভেদগুলি গাণপত্য ধর্ম-সমাজের মন্ত্রক্রম গঠন করেছে। এর পাশাপাশি আনন্দগিরির *শঙ্করবিজয়*-এর বর্ণনার অনুসরণে গণপতির ছয়টি প্রধান রূপভেদ ও সেই অনুযায়ী পৃথক পৃথক গাণপত্য সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচনা করা যাক।

মহাগণপতি:

শঙ্করদিগ্বিজয়-এ উল্লিখিত গণপতির ছয়টি প্রধান রূপভেদ ও তদনুযায়ী শাখা-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মহাগণপতি ও তাঁর পূজক সম্প্রদায় অন্যতম। পণ্ডিত Gopinath Rao পঞ্চ শক্তি-গণেশের মধ্যে মহাগণপতিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তন্ত্র ও আগমাদি শাস্ত্রে, *শঙ্করদিগ্বিজয়* গ্রন্থে মহাগণপতি ও তাঁর উপাসকদের সম্পর্কে জানা যায়। তবে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মচিন্তায় মহাগণপতির রূপাবয়ব নিয়ে সামান্য পার্থক্য আছে। মহাগণপতির বিবরণ তিব্বতীয় বৌদ্ধদের চর্চার অন্তর্গত প্রাচীনতম *মহাগণপতি তন্ত্র*-এ লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেখানে মহাগণপতিকে ‘world-benefitting god of gods whose worship brings accomplishment’- হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১১২] বৌদ্ধ ধর্মচিন্তায় তিনি চতুর্ভুজ এবং শ্বেতবর্ণ[১১৩] হলেও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রাদি যেমন *ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি*,[১১৪] *প্রপঞ্চসার তন্ত্র*[১১৫] এবং *শঙ্করদিগ্বিজয়*[১১৬]-এ রক্তবর্ণ এবং দশ বা মতান্তরে দ্বাদশভুজ

হিসেবে বর্ণিত। গণপতির প্রচলিত মূর্তির মতো বিশেষ এই রূপেও তিনি গজমুখ। তাঁর রক্তবর্ণ গাত্র সিঁদুর[১১৭] বা নবারুণের সঙ্গে তুলনীয়।[১১৮] বেশিরভাগ মূর্তিলক্ষণশাস্ত্রে তাঁকে ত্রিনয়ন, দশভুজ ও মস্তকে অর্ধচন্দ্রধর[১১৯] হিসেবে রূপদান করা হয়েছে। তিনি দশটি হাতে যথাক্রমে পদ্ম, দাড়িম্ব বা ডালিম, গদা, চক্র, নিজের ভগ্নদন্ত, পাশ, জলপূর্ণ রত্নময় কলস, নীলপদ্ম, ধান্যশীর্ষ ও ধনুকাকৃতি বিশিষ্ট ইক্ষুদণ্ড ধারণ করেছেন।[১২০] মূর্তিভেদে তাঁর হাতে ডালিমের পরিবর্তে আম, গদার পরিবর্তে শঙ্খ এবং জলকলসের পরিবর্তে রত্নখচিত অমৃতকলস দেখা যায়।[১২১] মহাগণপতির হস্তধৃত দশটি বস্তু বিভিন্ন দেবতার উপহার। উপহারগুলি দেবমণ্ডলীর ওপর গণেশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চিহ্নবাহী। অন্যান্য সকল দেবতার কর্মসম্পাদনের ক্ষমতাও যে তাঁর রয়েছে, দশভুজে দশটি উপহার তারও প্রতীক।[১২২] মূর্তিভেদে মহাগণপতির হাতে বহুবীজসমন্বিত একটি জামির দেখা যায়, যা সৃষ্টিশক্তির প্রতীক তথা শিবের একটি রূপক। তাঁর হস্তধৃত ইক্ষুদণ্ড প্রেমের দেবতা মদন বা কামদেবের রূপক। তীররূপী ধান্যশীর্ষ ধরিত্রীর উপহার। এই ধান্যশীর্ষ এবং ধনুকাকার ইক্ষুদণ্ড প্রজনন ও উর্বরতাশক্তির প্রতীক। চক্র বিষ্ণুর প্রধান আয়ুধ এবং গদা বিষ্ণুর অবতার বরাহের রূপক। কখনও কোনও মূর্তিতে রত্নকলসটি হাতের বদলে শুঁড়ে দেখা যায়, এটি ধনসঞ্চয়ের দেবতা কুবেরের রূপক। পাশাপাশি একে গণপতির আশীর্বাদ ও সৌভাগ্যলাভের প্রতীক হিসেবেও দেখা যায়।[১২৩]

ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধমত--- উভয়ক্ষেত্রেই তাঁকে সশক্তিক উপস্থাপনা করা হয়েছে। যদিও বৌদ্ধগ্রন্থে শক্তির বর্ণনা না থাকলেও মহাগণপতির মণ্ডলমধ্যে তিনি অবশ্যম্ভাবীরূপে উপস্থিত।[১২৪] এই দেবীও শ্বেতবর্ণা, বামক্রোড়াসীনা। তাঁর ডান হাতে থাকে পবিত্রতার প্রতীক পদ্ম এবং বাম হাতে তিনি গণেশকে আলিঙ্গন করেন।[১২৫] মহাগণপতি যে বাঁ-হাতে নীলপদ্ম ধারণ করেছেন, সেই হাতেই তিনি শক্তিকে আলিঙ্গন করেন। এ ছাড়া অন্যান্য দেবদেবী ও অসুরেরা মহাগণপতিকে ঘিরে থাকেন।[১২৬] মথুরার দসবোদ্ধি মন্দিরে মহাগণপতির এই শক্তি সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী মহালক্ষ্মীরূপে পূজিত হয়। নামান্তরে তিনিই পুষ্টি।

অষ্টবিনায়ক মন্দিরগুলির অন্যতম রঞ্জনগাঁও গণপতি মন্দিরে মহাগণপতির পূজা হয়। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে মহাগণপতি তাঁর পিতা শিবকে ত্রিপুরাসুর বধে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পূর্বমুহূর্তে শিব নিজপুত্রের স্তুতি করতে ভুলে যাওয়ায় ক্রোধবশত মহাগণপতি শিবের রথটি নিষ্ক্রিয় করে দেন। শিবও নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং মহাগণপতির স্তুতি করেন। এরপরই শিব ত্রিপুরাসর নিধনে সফল হন।[১২৭]

শঙ্করদিগ্বিজয়-এর বর্ণনা অনুযায়ী গাণপত্য সম্প্রদায়ের যে শাখাটি মহাগণপতির পূজক, ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের সংস্পর্শে তাঁরা একভাবে বিবর্তিত হয়েছিল। শ্রুতিমান্যতা এই গোষ্ঠীর মধ্যেও দেখা যায়, এমনকী মহাগণপতি তাঁদের কাছে স্বরূপত ত্রিমূর্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সমষ্টিভূত রূপ। মহাগাণপত্যগণ তাঁদের কুলদেবতাকে রক্ষাকর্তা এবং সৃষ্টিকর্তার সর্বোচ্চ সম্মান দেয়। মহাগণপতির অনুগামীদের বিশ্বাস, তাঁদের উপাস্য দেবতা নিত্য এবং শাশ্বত। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বেও তিনি অস্তিত্ববান ছিলেন, এমনকী মহাপ্রলয়ের পরেও তাঁর অস্তিত্ব থাকবে। ব্রহ্মাণ্ড ও জীব সৃষ্টির কাজে সহায়তার জন্য তিনিই প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের মতে, মহাগণপতির ভক্ত একাগ্র চিত্তে ধ্যান করলে সচ্চিদানন্দের অনুভূতি লাভ করতে পারেন।[১২৮] তান্ত্রিক ধারণা অনুসারে মহাগণপতি উপাসনার সঙ্গে মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন ও বশীকরণ--- এই ছ'টি অভিচারমূলক ক্রিয়ার সম্বন্ধ রয়েছে।[১২৯]

মহাগাণপত্যগণ দ্বৈতবাদী দর্শনের ধারানুসারী হলেও তাঁরা 'ব্রহ্ম'-এর সঙ্গে 'মুক্তি'-র (জন্ম-মৃত্যুচক্র থেকে মুক্তি) ধারণাকে সমন্বিত করে না এবং আরাধ্যের সঙ্গে চিরকাল একই লোকে অবস্থানের ধারণায় তত্ত্বগতভাবে বিশ্বাস করে।[১৩০] এই সালোক্যচিন্তা তাঁদের ধর্ম-দার্শনিক অবস্থানকে বুঝতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে তাঁরা পাশুপত শৈব বা শৈবাগমপন্থীদের মতো দ্বৈতবাদী দর্শনের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ভিন্নতর। মহাগাণপত্যগণ গজানন ও একদন্তকেই মহাগণপতি বলে জানেন, যিনি শক্তিলোকে (মতান্তরে মণিদ্বীপ) বল্লভা বা সিদ্ধি-লক্ষ্মীর সঙ্গে চিরবিহাররত। মহাগণপতির মূর্তি গণেশের বহুপূজিত মূর্তিগুলির অন্যতমও বটে। গাণপত্যরা এই মূর্তিকে আনন্দ, সম্পদ ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক বলে মনে করে।[১৩১]

হরিদ্রা গণপতি:

শঙ্করদিগ্বিজয়-এ বর্ণিত গণপতির ছয়টি প্রকাশরূপের মধ্যে একমাত্র হরিদ্রা গণপতি-ই শক্তিযুক্ত নন। আক্ষরিক অর্থে 'হরিদ্রা' বলতে হলুদকে বোঝানো হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে গণেশের নামটি বর্ণচিহ্ন প্রকাশক। তাঁর গাত্র পীতবর্ণ বা হরিদ্রাভ বলেই সম্ভবত এমন নাম। এই গণেশ 'রাত্রি গণপতি' নামেও পরিচিত।[১৩২] তিনি পীতাম্বর (হলুদবর্ণ যজ্ঞোপবীতধারীও বটে), ত্রিনেত্রযুক্ত এবং চতুর্বাহু। *নিত্যোৎসব* এবং *মন্ত্রমহার্ণব* শীর্ষক মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থে হরিদ্রা গণেশের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি পীতাম্বর, ত্রিনেত্রযুক্ত এবং চতুর্বাহু। চার হাতে যথাক্রমে পাশ, অঙ্কুশ (হস্তী চালনার জন্য প্রয়োজনীয় দণ্ড), মোদক এবং নিজের ভগ্নদন্ত ধারণ করেছেন।[১৩৩] সাধকসমাজ বিশ্বাস

করেন, হস্তধৃত পাশের দ্বারা তিনি নিজের ভক্তদের কাছে টেনে আনেন এবং অঙ্কুশ দ্বারা তাঁদের মার্গদর্শন করান।[১৩৪] দক্ষিণাম্নায় গ্রন্থের বিবরণে হস্তসংখ্যার পার্থক্য লক্ষণীয়। গাত্রবর্ণ ও পরিচ্ছেদ হলুদ হলেও সেখানে গণেশ সেখানে ষড়ভুজ এবং রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁর ডান দিকের তিনটি হাতে থাকে অঙ্কুশ, ক্রোধপ্রকাশক মুদ্রা এবং বরাভয় মুদ্রা। বাঁ-দিকের তিনটি হাত পাশ, পরশু বা কুঠার এবং বরদ মুদ্রায় শোভিত।[১৩৫] ভাণ্ডারকরের বর্ণনা থেকে জানা যায়, হরিদ্রা গণপতির মুখ হলুদলিপ্ত অর্থাৎ তাঁর মুখে হলুদ মাখানো থাকে। হলুদবর্ণ ও হলুদ পরিধানের পাশাপাশি তাঁর গায়ে একটি হলুদরঙা যজ্ঞোপবীত বা পৈতাও থাকে। হস্তধৃত আয়ুধের মধ্যে থাকে পাশ, অঙ্কুশ ও একটি লাঠি।[১৩৬]

এই সম্প্রদায়ের যিনি সর্বোচ্চ প্রতিনিধি, তিনি *কৃষ্ণযজুর্বেদ* থেকে একটি মন্ত্র উচ্চারণ বা আবৃত্তি করেন।[১৩৭] মহাগণপতির পূজকদের মতো এই গাণপত্যগোষ্ঠীও নিজেদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্গত বলেই মনে করে। সম্ভবত খ্রিস্টীয় দশম শতক নাগাদ এঁদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। সম্পদ ও কল্যাণ কামনায় হরিদ্রা গণেশের পূজা করা হয়। সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে, বিবাহাদি মঙ্গলকার্যে 'গাত্রহরিদ্রা'-র অনুষ্ঠানে হরিদ্রা গণপতি বিশেষভাবে স্মর্তব্য। তাঁকে স্মরণ করে বা তাঁর উদ্দেশে হলুদ নিবেদন করে সেই হলুদ পাত্র-পাত্রীর গায়ে লাগানো হলে শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। বিবাহোপযোগী যাবতীয় মঙ্গলকর্মে হলুদ একটি অত্যাবশ্যক উপাদান হওয়ায় সেই সূত্রে হরিদ্রা গণেশও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েন।

এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত গাণপত্যগণ হরিদ্রা গণেশকে সর্বোচ্চ দেবতা রূপে অর্চনা করেন, তিনিই ভক্তদের রক্ষাকর্তা। তাঁকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র প্রমুখ সকল দেবগণের নেতা, ঋষি ভৃগু ও দেবগুরু বৃহস্পতির গুরু এবং শেষনাগের অধিপতি মনে করা হয়। তিনি সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানপ্রদাতা এবং বিশ্বসৃজনকারী সকল দেবতারই পূজনীয়। হরিদ্রা গাণপত্যদের বিশ্বাস অনুসারে তাঁদের কুলদেবতার পূজা করলে মোক্ষলাভ করা যায়। এই গোষ্ঠীর গাণপত্যরা একসময় উত্তপ্ত লোহা দিয়ে নিজেদের মাথায় গণেশের মস্তক ও হাতের তালুতে গণেশের দন্তের ছাপ অঙ্কন করত।[১৩৮]

অজিতাগম শীর্ষক শাস্ত্রগ্রন্থে হরিদ্রা গণপতি হলুদ বর্ণ হস্তীরূপে পার্শ্বস্থিত দু'জন স্ত্রীর ('দারাযুগলম্) সঙ্গে বর্ণিত হয়েছেন।[১৩৯] এই স্ত্রীগণ কিন্তু গণেশের শক্তির থেকে স্বতন্ত্র। এই বিশেষ রূপকল্পটির সঙ্গে বরং *গণেশ* ও *মুদগলপুরাণ*-এর গণপতির সদাপার্শ্বস্থিত দুই স্ত্রী, সিদ্ধি ও বুদ্ধির নৈকট্য আছে।[১৪০] যদিও পুরাণদুটিতে গণেশের অন্তর্নিহিত অংশরূপে তাঁদের অবতারণা[১৪১] এবং শক্তি উপাসনার সঙ্গে সংযুক্ত বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানও এক্ষেত্রে

নিষ্প্রয়োজন। *অজিতাগম*-এ হরিদ্রা গণপতির এই জাতীয় মূর্তি রাজধানী শহরগুলির পক্ষে উপযুক্ত বলে প্রস্তাব করা হয়েছে।[১৪২] সম্ভবত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহরের একটি অংশে এঁর লোকপ্রিয়তা বেড়েছে এবং ধীরে ধীরে একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁর প্রতি আনুগত্য তৈরি হয়েছে। হলুদ বা পীতবর্ণ ঐতিহ্যাগতভাবে বৈশ্যবর্ণ রূপে স্বীকৃত। মনে হয় হরিদ্রা গণেশকে বিশেষভাবে রাজধানী শহরগুলিতে স্থাপনযোগ্য মনে করার কারণ, ওইসব অঞ্চলে সম্পদশালী মানুষের ক্রমবর্ধমান বিকাশের সঙ্গে গণপতির এই বিশেষ রূপের জনপ্রিয়তার একটা সম্বন্ধ আছে। এর থেকেই ক্রমে এক স্বতন্ত্র দেবতা হিসেবে হরিদ্রা গণপতির উত্থান ত্বরান্বিত হয়েছে।

তন্ত্রমার্গেও হরিদ্রা গণেশের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। তাঁর পূজায় বিশেষ মন্ত্র ও যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃত জীবনের চাহিদাপূরণের জন্য, বিশেষত যৌনজীবন সংক্রান্ত বরলাভের জন্য তাঁর পূজা প্রশস্ত। ছয়টি অভিচারমূলক ক্রিয়ার সঙ্গেও এই গণপতির সংযোগ রয়েছে। এই জাতীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে দক্ষ মন্ত্রোচ্চারক শত্রুকে সম্মোহন, আকর্ষণ, বশীকরণ, ঈর্ষান্বিত অথবা হত্যা করতেও পারেন বলে বিশ্বাস করা হয়।[১৪৩]

হেরম্ব গণপতি:

হেরম্ব গণেশ পঞ্চ হস্তীমুখবিশিষ্ট। নেপালে এই মূর্তি বিশেষভাবে জনপ্রিয়।[১৪৪] গণেশের তান্ত্রিকী উপাসনায়, বিশেষত বামাচারী মার্গে এই মূর্তির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। *মুদগলপুরাণ*-এ বর্ণিত হেরম্ব গণপতি গণেশের বত্রিশটি রূপের অন্যতম। *স্কন্দপুরাণ*-এ হেরম্ব বিনায়ককে বারাণসীর নিকটস্থ ছাপান্ন জন বিনায়কের অন্যতম বলা হয়েছে। *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ* (আটটি নাম), *পদ্মপুরাণ* (বারোটি নাম), *চিন্ত্যাগম* (ষোলটি নাম) প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে গণেশের যে নামের তালিকা পাওয়া যায়, 'হেরম্ব' অভিধাটি তার মধ্যে অন্যতম।[১৪৫] *গণেশপুরাণ*-এও গণেশের নামান্তর হেরম্ব।[১৪৬] 'হেরম্ব' নামটি অর্থব্যাখ্যায় বহুপ্রসূ। *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর বিষ্ণুকৃত ব্যাখ্যায় 'হেরম্ব' অর্থে দীনপালক বা অসহায়ের রক্ষককে বোঝায়, 'হে' অর্থে অসহায় বা দীন এবং 'রম্ব' অর্থে পালক বা রক্ষাকর্তা।[১৪৭] অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *পঞ্চোপাসনা*-য় লিখেছেন, হে অর্থাৎ শিব তাঁর সমীপে সর্বদা থাকেন বলেই তিনি হেরম্ব।[১৪৮] এই ব্যাখ্যায় হেরম্ব গণেশ শৈব কাল্টের প্রভাবযুক্ত। এ ছাড়া 'হেরম্ব' শব্দে মহিষকেও বোঝানো হয়।[১৪৯] পঞ্চমুখের সূত্রে পঞ্চানন শিব অথবা সিংহবাহনের সূত্রে সিংহবাহিনী দুর্গা বা শক্তির সঙ্গেও হেরম্ব একাত্মক। কাজেই, তাঁকে শিব ও দুর্গার মিলিত তত্ত্ব বলা যায়। আবার, হেরম্ব-এর ধারণা বুদ্ধের সঙ্গেও যুক্ত। *শব্দকল্পদ্রুম* অনুসারে হেরম্ব তান্ত্রিক বুদ্ধের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে সমার্থব্যঞ্জক, যেমন হেরুক, চক্রসম্ভার, বজ্রকপালি,

বজ্রটীকা, দেব, নিশুম্ভি এবং শশীশেখর।[১৫০] হেরুক শব্দে অবশ্য শিবের একজন অনুচর বা ভৃত্যকে বোঝানো হয়।[১৫১] অন্যদিকে, হেরম্ব 'বুদ্ধ ও শিবকপাল'-এর সমন্বিত মূর্তির সঙ্গে সমার্থক।

শঙ্করদিগ্বিজয়-এ হেরম্ব গণেশকে তাঁর বাম উরুতে আসীন শক্তির সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়।[১৫২] যদিও কাশ্মীরি শাস্ত্র *দেবীরহস্য*-এ বর্ণিত হেরম্ব গণপতি তরুণ বালক, তাঁকে 'কুমার' সম্বোধন করা হয়েছে।[১৫৩] এমনকী *অজিতাগম* এবং *তন্ত্রসার*-এও তিনি শক্তির উপস্থিতি ছাড়াই ব্যাখ্যাত হয়েছেন। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, *শঙ্করদিগ্বিজয়*-এ বর্ণিত হেরম্ব গাণপত্যগণ যে ঐতিহ্যের অনুসারী, তা কাশ্মীরি এবং দক্ষিণ ভারতীয় তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রাদির থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা পৃথক। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক Anita Raina Thapan প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে কী বৌদ্ধ প্রভাবেই হেরম্ব গণেশের মূর্তিতে শক্তির ধারণা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, ঠিক যেমন পূর্বালোচিত কয়েকটি তান্ত্রিক বৌদ্ধ রূপের অনুষঙ্গ হেরম্ব গণেশের epithet বা নামসূচক অভিধায় প্রতিফলিত?[১৫৪]

আগম শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হেরম্ব গণেশের মূর্তিতত্ত্বে বৌদ্ধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গণেশের পাঁচটি মুখ মহাযান বৌদ্ধধর্মের পঞ্চস্কন্ধাত্মক পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের প্রতিভূ। গণেশবাহন সিংহের সঙ্গেও বুদ্ধের সিংহচিহ্নিত আসনের সমান্তরাল সম্পর্ক দেখা যায়, যিনি পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের রূপভেদে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। *অজিতাগম* অনুসারে, হেরম্ব গণপতির গাত্রবর্ণ সাদা (হস্তী যেমন বুদ্ধের ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে অথবা যেমন বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর)।[১৫৫] পাঁচ সংখ্যাটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সংখ্যাটির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের যোগ আছে এবং শিব স্বয়ং এই পাঁচ সংখ্যাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (নামান্তরে পঞ্চানন)। যদিও একথা সত্য যে, গণপতির এই রূপভেদ আগমাদিতে কিঞ্চিৎ নিন্দিত হয়, ফলে এর সঙ্গে এমন কিছু বিষয় যুক্ত হয়ে পড়ে যা শিবতত্ত্বের বিপরীত ধারণা। এই প্রসঙ্গে গণেশ বিশেষজ্ঞ Anita Raina Thapan লিখেছেন:

It was recommended as being appropriate in a *kheta.* The *Diptagama* defines a kheta as a village inhabited by *sudras.* Possibly some worshippers of Heramba Ganapati were Buddhists or Buddhists and Saivas at the same time and were, therefore, looked down upon. It is significant that this form of Ganapati appears in places (Kashmir and Tamil region) were a flourishing Buddhism was eventually replaced by a resurgent Sivaism. Consequently, there are positive indications of borrowing between the two faiths.[১৫৬]

হেরম্ব গণপতির একভক্ত সম্প্রদায় সম্ভবত কাশ্মীর ও তামিল প্রদেশে দেখা যায়। ঠিক কোন সময়ে গণপতির এই হেরম্বমূর্তি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল, স্পষ্ট করে বলা মুশকিল । এই হেরম্বনামা পঞ্চমুখ সিংহবাহন গণেশের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় কাশ্মীরীগ্রন্থ *শারদাতিলকতন্ত্র*-এ।[১৫৭] যেহেতু দশম-একাদশ শতাব্দীর মধ্যেই হেরম্ব গণেশ গাঠনিক অবয়বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং আগমাদিতেও ব্যাখ্যাত হয়েছেন, ফলে মনে হয় নবম শতকের শেষ থেকেই এই বিশেষ প্রকার গণপতির অনুসরণকারী গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দ্বাদশ শতকের এক অভিলেখ থেকে মধ্যপ্রদেশে হেরম্ব গণপতির উদ্দেশে এক মন্দির স্থাপনের কথা জানা গেছে।[১৫৮] সম্ভবত হেরম্ব গণেশের অনুগামী সম্প্রদায় বা হেরম্ব গাণপত্যগণই এই নির্মাণকার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

গণেশের হেরম্ব মূর্তিতে পাঁচটি হস্তীমুণ্ড দেখা যায়। এর মধ্যে চারটি মুণ্ড প্রধান চার দিকের নির্দেশক এবং পঞ্চম মস্তকটি উর্ধ্বমুখ অবস্থায় থাকে।[১৫৯] হেরম্ব গণেশের পাঁচটি মস্তকের বর্ণ তাঁর পিতা শিবের পাঁচটি রূপভেদের অনুরূপ। এই পাঁচ মুণ্ড শক্তির প্রতীক।[১৬০] গাত্রবর্ণ স্বর্ণাভ হলুদ,[১৬১] মতান্তরে শ্বেতবর্ণ।[১৬২] ইনি সাধারণত সিংহবাহন,[১৬৩] তবে মূর্তিভেদে সিংহের সঙ্গে ইঁদুরকেও কখনও দেখা যায়। যেমন, একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে ওড়িশায় নির্মিত একটি মূর্তিতে গণেশের আসনের পাশে ইঁদুর দেখা যায়। নেপালের ভক্তপুরে নির্মিত একটি মূর্তিতেও হেরম্ব গণেশ দুটি ইঁদুরের ওপর দণ্ডায়মান। নেপালে হেরম্ব গণেশকে সাধারণত যুগপৎ সিংহ ও ইঁদুরের সঙ্গে দেখা যায়। বাহন সিংহ হেরম্ব গণেশের রাজকীয় সত্তা ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির প্রতীক।[১৬৪] এই বাহন গণেশমাতা পার্বতী প্রদত্ত।[১৬৫] ফলে বিশেষ এই রূপে গণেশ শক্তিময় ও বীরদর্পী, মাতৃভাবের ধারক।

মূর্তিতত্ত্ব সংক্রান্ত শাস্ত্রগুলিতে হেরম্ব গণেশ দশভুজ। তিনি পাশ, নিজ ভগ্নদন্ত, অক্ষমালা, পরশু, তিন মাথাযুক্ত মুগুর ও একটি মোদক ধরে আছেন। দুটি হাত বরমুদ্রা ও অভয়মুদায় সজ্জিত।[১৬৬] অন্যান্য বর্ণনা অনুসারে তাঁর হাতে কখনও একটি মালা ও ফল থাকে।[১৬৭] মূর্তিভেদে কখনও অঙ্কুশ।[১৬৮]

হেরম্ব গণেশ দুর্বল বা নিঃসহায়ের রক্ষাকর্তা হওয়ায় তিনি নির্ভীকতা ও শত্রুকে নির্জিত করার শক্তি প্রদান করেন।[১৬৯] তন্ত্রমার্গে এই গণেশ পূর্ণপ্রতিষ্ঠ। হৈরম্ব বা হেরুম্ব নামক এক তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে সশক্তিক এই গণেশ পূজিত হন। এই শক্তি গণেশের স্ত্রী হলেও সাধারণভাবে তাঁকে মাতা পার্বতীই মনে করা হয়।[১৭০] হেরম্ব গণেশ ছয়টি অভিচার বা অশুভ উদ্দেশ্যে মন্ত্রের প্রয়োগমূলক ক্রিয়ার সঙ্গেও যুক্ত।[১৭১]

উচ্ছিষ্ট গণপতি:

গণপতির এক বিশেষ ধরনের তান্ত্রিক রূপ উচ্ছিষ্ট গণপতি। গাণপত্য সম্প্রদায়ের ছ'টি প্রধান শাখার মধ্যে উচ্ছিষ্ট গাণপত্য সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় উপাস্যরূপে এই গণেশ পূজিত। গাণপত্য ধর্ম-সম্প্রদায়ে বিশেষত বামাচারী তন্ত্রমার্গে উচ্ছিষ্ট গণেশের উপাসনা প্রচলিত। গণেশের এই বিশেষ প্রকাশরূপটি মৈথুনমত্ত, আদিরসাত্মক। মূর্তিতত্ত্ব অনুসরণ করলে এই গণেশের বামক্রোড়ে উপবিষ্ট এক নগ্ন দেবীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। হেরম্বসূত উচ্ছিষ্ট গাণপত্য শাখার অন্যতম প্রবক্তা। আক্ষরিকভাবে 'উচ্ছিষ্ট' বলতে খাদ্যগ্রহণের পর পরিত্যক্ত অবশিষ্ট তথা বর্জিত অংশকে বোঝানো হয়। মুখে থেকে যাওয়া খাবারই হল উচ্ছিষ্ট, এই খাবারে মুখের লালারস লেগে থাকে বলে আপাতদৃষ্টিতে একে অশুদ্ধ জ্ঞান করা হয়।[১৭২] যদিও উচ্ছিষ্ট গণপতির 'উচ্ছিষ্ট' শব্দটি উৎকৃষ্টের অবশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। গণেশের অন্যান্য রূপের মতো উচ্ছিষ্ট গণপতিও গজানন। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁর গাত্রবর্ণের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, *মহামন্ত্রার্ণব* অনুসারে রক্তবর্ণ, *উত্তরকামিকাগম*-এ কৃষ্ণবর্ণ[১৭৩], আবার অন্য আরেকটি বর্ণনায় ইনি নীলবর্ণ।[১৭৪] হস্তসংখ্যাও মূর্তিভেদে পৃথক, কোথাও চতুর্ভুজ বা ষড়ভুজ। মূর্তিবিভঙ্গের দিক থেকে এই গণেশ উপবেশনরত। কোথাও কোথাও তাঁকে পদ্মাসনে উপবিষ্ট দেখা যায়। *উত্তরকামিকাগম*-এর বর্ণনায় তাঁর মস্তকে রক্তমুকুট শোভিত এবং তিনি ত্রিনয়নযুক্ত।[১৭৫] *ক্রিয়াক্রমদ্যোতি*-র বর্ণনায় তাঁর ছয়টি হাতে থাকে পদ্ম (কোনও বর্ণনায় নীলপদ্ম)[১৭৬], একটি দাড়িম্ব বা ডালিম ফল, একটি বীণা, একটি অক্ষমালা ও একটি ধান্যশীর্ষ।[১৭৭] *মহামন্ত্রার্ণব*-এর চতুর্বাহু মূর্তিতে থাকে তীর, ধনুক, পাশ ও অঙ্কুশ।[১৭৮] *উত্তরকামিকাগম* অনুযায়ী চতুর্ভুজ গণেশের তিনটি হাতে থাকে পাশ, অঙ্কুশ ও ইক্ষুদণ্ড।[১৭৯] চতুর্থ হস্ত দ্বারা তিনি সুরতক্রীড়া সম্পন্ন করেন। কোহেনের মতে, মূর্তিভেদে অনেকসময় উচ্ছিষ্ট গণেশের বামক্রোড়গত এই শক্তি একটি মোদকপূর্ণ পাত্র কোলে ধরে থাকে এবং গণেশের শুঁড় মোদক ভক্ষণের জন্য সেই থালা স্পর্শ করে থাকে। এক্ষেত্রে শুঁড়টি দেবী ও গণেশের মধ্যে আদিরসাত্মক বন্ধনের প্রতীক। আবার কখনও মোদকপাত্রের পরিবর্তে গণেশের শুঁড় দেবীর যোনিদেশ স্পর্শ করে থাকে। এই ধরনের আদিরসাত্মক মূর্তিতত্ত্ব তান্ত্রিক গাণপত্য শাখাগুলির প্রভাবকে প্রতিফলিত করে। ডালিম ফলটিও প্রজননশক্তি ও উর্বরতার প্রতীক। গাণপত্য সম্প্রদায়ের নানা মূর্তিতে এটি দেখা যায়।[১৮০] *শঙ্করদিগ্বিজয়*-এর বর্ণনায় চতুর্বাহু, ত্রিনয়ন, ধ্যানরত উচ্ছিষ্ট গণেশের হাতে পাশ, অঙ্কুশ ও গদা ধারণ করতে দেখা যায়। চতুর্থ হস্ত অভয় মুদ্রায় শোভিত। শুণ্ডশীর্ষের দ্বারা গণপতি ক্রোড়গত দেবীর যোনি স্পর্শ করে আছেন।[১৮১] *শঙ্করদিগ্বিজয়* অনুসারে, উচ্ছিষ্ট গণপতির পূজক সম্প্রদায় হৈরম্ব নামে পরিচিত। যদিও এই 'হৈরম্ব' শব্দের অনুষঙ্গে হেরম্ব

গণপতির পূজক সম্প্রদায়ের কথা মনে হয়। হেরম্ব এবং উচ্ছিষ্ট গণপতির এই সংযোগের আরেকটি কারণ হতে পারে, তাদের শ্রেণি-অবস্থানের সমত্ব। তারা সমাজের এমন এক অংশ, যাদের ব্রাহ্মণ্যপন্থীদের দ্বারা অনেকাংশেই নিন্দিত হয় এবং এদের উপাস্যদের গুপ্তমূর্তি বেশিরভাগক্ষেত্রেই মূলধারায় গ্রহণযোগ্য হয় না। ফলে দুই প্রান্তিক শাখা-সম্প্রদায়ের অবস্থানগত নৈকট্য সহজেই গড়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে কিছুটা পরিবর্তনের মাধ্যমে এই জাতীয় গুপ্তমূর্তিগুলি সমাজে স্বীকৃত হয়।[১৮২] *প্রাণতোষিণী তন্ত্র*-এ উচ্ছিষ্ট গণনাথ হেরম্বের বালকাবস্থার রূপ হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন,[১৮৩] যদিও *দেবীরহস্য*-এর পরিশিষ্ট-এ এর ঠিক বিপরীত তথ্য পাওয়া যায়[১৮৪], অর্থাৎ হেরম্ব-ই সেখানে উচ্ছিষ্ট গণেশের শৈশবরূপ। শৈবগ্রন্থ *ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি* শক্তিবিহীন উচ্ছিষ্ট গণেশের বিবরণ দিয়েছেন। পরবর্তীকালের কয়েকটি তান্ত্রিকী গ্রন্থে উচ্ছিষ্ট গণেশের শক্তি হিসেবে উচ্ছিষ্ট চণ্ডালী বা চণ্ডালিনীর নাম পাওয়া। যদিও *শঙ্করদিগ্বিজয়*-এ দেবীর কোনও নামোল্লেখ নেই।[১৮৫] *প্রাণতোষিণী তন্ত্র* অনুসারে, উচ্ছিষ্ট চণ্ডালী দশমহাবিদ্যান্তর্গত দেবী মাতঙ্গীর-ই এক রূপভেদ।[১৮৬] এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত V. N. Jha-এর বক্তব্যের সমর্থনে Thapan লিখেছেন, ‘Chandali and Matangi were goddesses of the *Chandals* and *Matangas* both originally aboriginal tribes who were eventually converted into a low caste. The practices of this sect were evidently tantric and later texts associated this form of the deity with the goddesses of the lower orders of society.’[১৮৭]

উচ্ছিষ্ট গণপতির ক্রোড়াসীন নগ্ন দেবীমূর্তিটি সাধকসমাজে তাঁর স্ত্রী বা শক্তিরূপে পূজিত। গণেশের বিরাটকায় মূর্তির সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার এই দেবীমূর্তির সুরতলীন অবয়ব মূর্তিগতগতভাবেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই নগ্নিকা ক্রোড়াসীন শক্তি দ্বিভুজা। তিনি সুন্দরী, যুবতী ও সালংকারা। *উত্তরকামিকাগম*-এ তাঁর নাম ‘বিঘ্নেশ্বরী’। উচ্ছিষ্ট গণেশের চতুর্থ হস্ত এই দেবীর গোপনাঙ্গ স্পর্শ করে আছে। *মহামন্ত্রার্ণব* অনুসারে, উচ্ছিষ্ট গণেশের যৌনসংগমরত মূর্তিনির্মাণই বিধেয়। সাধারণত উচ্ছিষ্ট গণেশের শাস্ত্রসম্মত রূপটি ভাস্কর্যগুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয়নি। তাঁর মূর্তিতে বাম ক্রোড়ে এক নগ্ন দেবীমূর্তির অধিষ্ঠান দেখা যায়। মূলত চতুর্ভুজ মূর্তিতেই এই আসঙ্গলীন অবস্থা দৃশ্যমান। তাঁর তিনটি হাতে থাকে পাশ, অঙ্কুশ ও লাড্ডু বা মোদক, চতুর্থ হাতে তিনি দেবীর নিতম্ব আলিঙ্গন করে থাকেন। বাঁ হাতে দেবী পদ্ম বা অন্য কোনও ফুল ধারণ করেন। মূর্তিভেদে হাতের বদলে শুঁড়ের অগ্রভাগটি শক্তির যোনি স্পর্শ করে থাকে। আবার, কোনও ক্ষেত্রে দেবীমূর্তিটিকে ডান হাতে উচ্ছিষ্ট গণেশের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ

করে থাকতে দেখা যায়। পুরুষ-প্রকৃতির এই জাতীয় মৈথুনমত্ত প্রকাশরূপ গাণপত্যের বামাচারী মার্গে অত্যন্ত প্রশস্ত।

ক্রিয়াক্রমদ্যোতি অনুসারে, শ্রেষ্ঠ বর লাভের জন্য উচ্ছিষ্ট গণেশের পূজা করা হয়। অনেকে কামনাপূরণের জন্য এই গণেশের পূজা করেন।[১৮৮] কথিত আছে, তাঁর ধ্যান করলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণলাভ করা যায়।[১৮৯] তিরুনেলভেলিতে উচ্ছিষ্ট গণেশের একটি মন্দির আছে। এখানে সন্তানলাভের কামনায় গণেশের অর্চনা করা হয়।

উচ্ছিষ্ট গাণপত্য শাখায় তান্ত্রিক বামচারী মার্গের সাধনবিধি প্রচলিত। এই শাখাটি সম্ভবত শাক্তধর্মের কৌল পূজার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।[১৯০] উচ্ছিষ্ট গণেশের মূর্তিকল্পটিও কৌলতান্ত্রিক প্রকৃতির।[১৯১] এই আদিরসাত্মক মূর্তিকল্পটি গণেশ ও মহাশক্তির একত্বের দ্যোতক রূপে প্রতিভাত হয়।[১৯২] মূলধারার হিন্দুধর্মের উপাসনাবিধিতে মদ্য নিষিদ্ধ হলেও উচ্ছিষ্ট গাণপত্যগণ মনে করেন তাঁদের উপাস্য মদ্যপানরত এবং তাঁর পূজাতেও মদ্য ব্যবহৃত হয়। এই শাখার অনুগামীরা তাদের কপালে লাল টীকা অঙ্কন করেন, জাতি ও বর্ণভেদ প্রথা মানেন না, মূলধারার হিন্দুধর্মের যৌনতা ও বিবাহ সংক্রান্ত ধারণাকে অস্বীকার করেন এবং মূলধারার হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানগুলির পালন অনুগামীদের নিজস্ব ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেন। বামাচারী মার্গে উচ্ছিষ্ট গণেশকে পূজার সময় পূজককে 'উচ্ছিষ্ট' অবস্থায় (নগ্ন অবস্থায় বা মুখে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে) পূজা করতে হয়। উচ্ছিষ্ট গণেশ-ও তন্ত্রোক্ত ছয়টি অভিচারমূলক ক্রিয়া বা অশুভ উদ্দেশ্যে মন্ত্রের প্রয়োগ সংক্রান্ত ধারণার সঙ্গে যুক্ত।[১৯৩]

নবনীত, স্বর্ণ এবং সন্তানগণপতি:

নবনীত, স্বর্ণ ও সন্তান গণপতি *শঙ্করদিগ্বিজয়*-এ একই বর্গভুক্ত রূপে উপস্থাপিত হয়েছেন। এই তিন গণপতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এঁদের পূজক সম্প্রদায় বা অনুগামীরা শক্তির উপাসনা করেন না, হলুদবর্ণ বস্ত্র পরিধান করেন এবং বৈদিক কর্মকাণ্ডের ধারা অনুসরণ করেন। *অজিতাগম*-এ স্বর্ণ গণপতিকে শ্বেতবর্ণ বা স্বর্ণবর্ণ রূপে এবং শক্তি সংসর্গ ছাড়াই বর্ণনা করা হয়েছে।[১৯৪] যদিও *শঙ্করদিগ্বিজয়* অনুসারে গণেশের এই তিনটি প্রকাশরূপের বর্ণনা শৈবাগমগুলিতে পাওয়া যায়।[১৯৫] কিন্তু নবনীত ও সন্তান গণপতির ধারণা আগমশাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত হয়নি, এমনকী তন্ত্রশাস্ত্রে প্রাপ্ত গণেশের ঐতিহ্যানুগ ষোলো বা বত্রিশটি নামের তালিকায় অথবা কাশীস্থিত ছাপান্নজন বিনায়কের মধ্যেও এই দুই গণপতি অনুপস্থিত। যদিও পূর্বাম্নায় থেকে নবনীত গণেশের একটি মন্ত্র *শ্রীবিদ্যারত্নাকর*-এ পাওয়া যায়।[১৯৬] নবনীত গণপতির সূত্রে ননীচোরা কৃষ্ণের অনুষঙ্গ মনে পড়তে পারে। সন্তান

গণপতির ধারণার মধ্যেও কৃষ্ণের শৈশবকালীন রূপ অর্থাৎ বালগোপালের ছায়া মিশে আছে। গবেষক Anita Raina Thapan-এর মতে হয়তো বৈষ্ণবদের কারণেই গণেশের এই বিশেষ রূপ দুটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, কারণ বৈষ্ণবদের মধ্যেও গণপতিপূজা প্রচলিত ছিল। এই সম্ভাবনা আরও দৃঢ় হয় সমকালীন গণেশ পূজার কয়েকটি রকমফের মাথায় রাখলে। উদাহরণস্বরূপ তিনি কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলার কুম্ভাসি অঞ্চলের শ্রীবিনায়ক মন্দিরের প্রসঙ্গ এনেছেন। এই মন্দিরের ‘প্রমুখ পূজারী’ বা প্রধান পুরোহিত নিজেই বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ, মধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাঁর পৌরোহিত্যেই বিনায়ক পূজিত হন বিষ্ণুরই একটি রূপভেদ হিসেবে। গণপতির নির্দিষ্ট বৈশিষ্টপূর্ণ মূর্তিকে সাধারণভাবে স্বীকার করেও তিনি ও ভক্তমণ্ডলী উদ্দিষ্ট মন্দিরে বিষ্ণুর একটি রূপভেদ হিসেবেই গণেশকে মান্যতা দিয়ে থাকেন। নবনীত বা সন্তান গণপতির ভাবধারাতেও বৈষ্ণব কাল্‌টের চিহ্ন তদনুরূপে থাকতে পারে।[১৯৭]

২.৫

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে গণপতি

জৈনদের আনুশাসনিক ধর্মশাস্ত্রে গণেশ পূজার কোনও উল্লেখ নেই। তবে পরশুধারী ও মূষিকবাহন এক দেবতা ‘লম্বোদর’, ‘গজানন’ প্রভৃতি নামে জৈন সাহিত্যে উল্লিখিত হন। দ্বাদশ শতকে হেমচন্দ্রের *অভিধান চিন্তামণি* গ্রন্থে গণেশের নামান্তর হিসেবে বিনায়ক, হেরম্ব, বিঘ্নেশ প্রভৃতি উল্লেখ (২। ১২১) পাওয়া গেছে।[১৯৮] এ ছাড়া জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে গণেশ প্রতিষ্ঠার বিধিও পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে পঞ্চদশ শতকে (১৪১২ খ্রিঃ) বর্ধমান সূরি রচিত *আচারদিনকর* গ্রন্থের বর্ণনার কথা বলা যায়।[১৯৯] সেখানে বলা হয়েছে, দেবতারাও কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য অর্জনের জন্য গণপতিকে প্রসন্ন রাখেন। তা ছাড়া যে কোনও শুভানুষ্ঠান বা নতুন কোনও কাজের সূচনায় তাঁর পূজা করা হয়। দিগম্বর সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থগুলিতে গণেশের জনপ্রিয়তা তুলনামূলকভাবে কম। দ্বিভুজ গণেশের প্রাচীনতম জৈন মূর্তিটি মথুরায় আবিষ্কৃত হয়েছিল।[২০০] এই মূর্তিতে গণেশের সঙ্গে জৈন যক্ষী অম্বিকাকে দেখা যায়। এ’টি খ্রিস্টীয় নবম শতকের মূর্তি। রাজস্থান ও গুজরাটের জৈন মন্দিরগুলিতে গণেশের বিগ্রহ দেখা যায়। এ ছাড়া উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি গুহায় খোদিত মধ্যযুগের দুটি জৈন গণেশমূর্তি পাওয়া গেছে। আবু পাহাড়ের নেমিনাথ মন্দিরে একটি ত্রয়োদশ শতকের জৈন অভিলেখের প্রারম্ভে ‘শিবতনুজ’-রূপে গণেশের বন্দনা পাওয়া যায়।[২০১] গবেষকদের মতে, জৈন ধর্মে গণেশের প্রবেশ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে ঘটেছিল, আনুমানিক

নবম শতকে। শ্বেতাম্বর জৈন ঐতিহ্যে তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের সহচররূপে যে পার্শ্বযক্ষ পূজিত হন, তিনি গজমুখ হওয়ায় অনেকক্ষেত্রে গণেশের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায় দশম শতক থেকে পূর্ব ভারতের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বর্তমান বাঁকুড়া ও তৎসন্নিহিত এলাকায় মূলত জৈন ব্যবসায়ীদের সূত্রে মণিভদ্র বা পার্শ্বযক্ষরূপে গণেশের প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়। পাল-সেন পর্বে প্রাচীন বাংলায় জৈন তীর্থঙ্করদের সঙ্গে গণেশের একাসনভুক্তির বহু প্রত্ননিদর্শন আজকের বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় মিলেছে। অধিকাংশ জৈন ধর্মাবলম্বী গণেশের পূজা করেন। তাঁদের বিশ্বাস গণেশ কুবেরের কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করেন। জৈন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সংযোগ থাকায় তাঁদের কাছে গণেশ পূজার ধারণাটি বেশ গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলে মনে হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন বঙ্গদেশে গণেশ উপাসনার মূর্তি প্রমাণের ক্ষেত্রে গণেশের এই জৈন সংযোগের বিষয়টি বিস্তারিত করা হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মে গণপতি-গণেশের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত। উত্তর-গুপ্ত যুগে সারনাথের ভাস্কর্যে খোদিত গণেশ এবং তাঁর বাহন মূষিকের মাধ্যমে বুদ্ধের ‘মহাপরিনির্বাণ’-এর রূপায়ণ দেখা যায়। মাঘ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের *সমকালীন* পত্রিকায় দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী রচিত ‘দেব-দেবী বিবর্তনে গণপতি’ শীর্ষক প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্মে গণপতির পরিগ্রহণ সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায়।[২০২] প্রবন্ধকার জানিয়েছেন, তন্ত্রের প্রভাবে বৌদ্ধরা তাঁদের দেব-দেবীর সঙ্গে হিন্দু দেব-দেবীদেরও মূর্তি নির্মাণ আরম্ভ করেন। বুদ্ধের তিরোধানের তিনশো বছর পরে তাঁর মূর্তি প্রথম নির্মিত হয়। এরও বহুকাল পরে হিন্দু দেবতাদের মূর্তি নির্মাণের সূচনা। *ললিতবিস্তর*-এর মতে নাকি বুদ্ধের জন্মের পরই তাঁকে গণেশ, স্কন্দ, শিব প্রমুখের মূর্তি প্রদর্শন করা হয়েছিল।[২০৩] অন্য একটি লিখনমালায় দেখা যায়, বুদ্ধের নির্বাণলাভের সময় গণেশ মূষিকের ওপর, কার্তিক ময়ূরের ওপর এবং ইন্দ্র হস্তীর ওপর বসে প্রত্যক্ষ করছেন।[২০৪] ঢাকার জাতীয় জাদুঘর বা সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত বৌদ্ধদেবী ভ্রূকুটিতারার মূর্তির পদতলে গণেশ শায়িত।[২০৫] ঔরঙ্গাবাদের ৬ সংখ্যা-চিহ্নিত গুহায় গণেশ একজন প্রধান দেবতা হিসেবে উপস্থিত, যা গণেশের সঙ্গে শৈব ও বৌদ্ধ তন্ত্রের সংযোগকে দৃঢ় করে। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, *বজ্রধাতু মণ্ডল*-এর বহিরাবরণের প্রত্যেক পার্শ্বের কেন্দ্রীয় দেবতা হিসেবে গণেশ উপস্থিত। এখানকার আরও একটি মণ্ডলে গণেশ বা বিনায়ক কেন্দ্রীয় দেবতা হিসেবে স্বীকৃত।[২০৬] ভারত, নেপাল এবং তিব্বতের বৌদ্ধ চিত্রকলায় নৃত্য গণপতি এবং হেরম্ব গণপতি উপস্থাপনা চোখে পড়ে। নেপালের বৌদ্ধ মঠগুলিতে মহাকালের সঙ্গে গণেশকেও অন্যতম দ্বারপালরূপে দেখা যায়। গণপতি হস্তীমুখ দেবতা হিসেবে তিব্বতীয় ধর্মচর্যায় শ্বেত গণপতি, রক্ত গণপতি এবং পীত গণপতি রূপে অন্তর্ভুক্ত। বৌদ্ধ

সাহিত্যেও গণপতির সুদৃঢ় অবস্থান। একাদশ শতকে অভয়করগুপ্তের *নিষ্পন্নযোগাবলী*-র তিনটি মণ্ডলে গণেশের মূর্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে।[২০৭] *ধর্মধাতুভাগীশ্বর মণ্ডল*-এ বলা হয়েছে, গজমুখ বা হস্তীমুখ গণপতি পবিত্র সর্পোপবীত পরিধান করেন, তিনি চতুর্ভুজ, ডান দিকের দুটি হাতে ত্রিশূল ও লাড্ডু জাতীয় মিষ্টান্ন এবং বাম ডানদিকের হাত দুটিতে কুঠার ও মূলক ধারণ করেন এবং তাঁর বাহনরূপে মূষিককে দেখা যায়।[২০৮]

ভূতডামর মণ্ডল-এ গণেশের অবস্থান ও মূর্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে এইভাবে – উত্তরপূর্ব কোণ বা ঈশান কোণে মূষিক বাহনে অবস্থানরত গজানন গণেশ ত্রিনয়নযুক্ত, মস্তকে অর্ধচন্দ্র শোভিত এবং তিনি চতুর্বাহু। মূলক ও কুঠার ডান দিকের দুটি হাতে এবং ত্রিশূল ও নরকরোটি বাম দিকের হাত দুটিতে ধারণ করেছেন।[২০৯] *কালচক্র মণ্ডল*-এ গণেশ বর্ণিত হয়েছেন এইভাবে – উত্তর-পূর্ব বা ঈশান কোণে মূষিকের ওপর উপবেশনরত গণেশ কুমারী দ্বারা বিভূষিত। তিনি ডানদিকের হাত দুটিতে কুঠার ও বজ্র এবং বামদিকের দুটি হাতে পাশ ও রত্ন ধারণ করেছেন।[২১০] *সাধনমালা*-র *সাধনা* নং ৩০৭ *গণপতি সাধনা* নামে পরিচিত, যেখানে সিদ্ধি ও সাফল্য লাভের উপায় বা মাধ্যম হিসেবে গণেশের স্তুতি করা হয়।[২১১] এতে বক্রতুণ্ড ও একদন্তযুক্ত বিঘ্নেশের অর্চনা করা হয়। গণেশকে এখানে ‘ভগবন্ত’ নামে সম্বোধন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ধ্যানটিতে বলা হয়েছে, এই ‘ভগবন্ত’ গণপতি রক্তবর্ণ, জটামুকুটধারী, অলংকারাদি পরিহিত, দ্বাদশভুজ, লম্বোদর, একবদন, অর্ধপর্য্যঙ্কাসনে তাণ্ডবনৃত্যরত, ত্রিনয়নযুক্ত এবং একদন্ত। তাঁর বারোটি হাতের মধ্যে ডানদিকের হাতগুলিতে যথাক্রমে কুঠার, তীর, অঙ্কুশ, বজ্র, খড়্গ ও শূল এবং বামদিকের হাতে মূষল, চাপ, খট্টাঙ্গ, রক্তকপাল, শুষ্কমাংসকপাল ও ফটক ধৃত। তিনি রক্তপদ্মে মূষিকের ওপর নৃত্যভঙ্গিতে অবস্থিত। *গণপতি হৃদয় ধারণী* শীর্ষক নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত আছে, একদা বুদ্ধ যখন রাজগৃহে বিচরণ করছিলেন, সেই সময় তিনি আনন্দকে উপদেশ দেন, যে ব্যক্তি মনোযোগী, পাঠরত, বিদ্যাবান এবং প্রচার পরায়ণ, তাঁর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা বা উদ্যোগ সফল বা সিদ্ধ হবেই।[২১২] *ধর্মকোষসংগ্রহ* নামক একটি পরবর্তী যুগের নেপালী বৌদ্ধ টেক্সটে বৌদ্ধ দেবতা হিসেবে গণেশের মূর্তিপরিচয় দেওয়া হয়েছে। গণেশের মুখ একটিই, তা গজানন বা হাতিমুখ। তিনি একদন্ত, ত্রিনেত্রযুক্ত ও চতুর্ভুজ। তিনি ডানদিকের হাত দুটিতে জপমালা ও মূলক এবং বামদিকের হাত দুটিতে কুঠার ও মিষ্টান্ন ধারণ করেছেন।[২১৩] Wilson তাঁর *Bauddha Tracts from Nepal* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, নেপালী বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে গণেশের সসম্মান অধিষ্ঠান। এ প্রসঙ্গে লেখকের যথার্থ পর্যবেক্ষণ ধরা পড়েছে এই মন্তব্যে – ‘some of the most eminent Buddhist saints prepared Sanskrit originals and Tibetan translations of several works (nearly two dozens)

of the Ganapatya cult. These are to be found in the Encyclopaedic compilations, the Tanjur and the Kanjur.'[২১৪] নেপালের মন্দিরগুলি হিন্দু বা বৌদ্ধদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সেখানেও অন্যান্য দেবতাদের মন্দিরে গণেশ পূজিত হন। তবে গণেশের একক বা স্বতন্ত্র মন্দির বিরল। চীন-জাপান-মঙ্গোলিয়াতেও গণেশ পূজা প্রচলিত। যদিও স্বতন্ত্র মন্দিরের অস্তিত্ব নেই। বৌদ্ধ পুথিতে গণেশ বিনায়ক নামা বলে জাপানে তিনি বিনায়কেয় নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, জাপানের শিঙ্গন সম্প্রদায়ের মণ্ডলগুলির মধ্যে, বিশেষত *বজ্রধাতু* এবং *গর্ভধাতু মণ্ডল* দুটির মধ্যে বিনায়কের একটি বিশিষ্ট স্থান লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ ঐতিহাসিক লামা তারানাথ লিখেছেন যে, গণেশ এবং অন্যান্য উচ্চকোটির দেবতা মহাযানের সূত্র এবং তন্ত্রসমূহ প্রদান করেছিলেন। তবে মহাযান বৌদ্ধধর্মে এমন কতকগুলি সাহিত্যিক প্রমাণ ও মূর্তিবিভঙ্গের নিদর্শন আছে, যার নিরিখে কেউ কেউ গণপতি বিনায়কের বাহ্যত বিপরীত ভূমিকার কথা বলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, *সাধনমালা*-র ২০৪ নং সাধনায় দেবী অপরাজিতার দ্বারা গণপতি নির্জিত হয়েছেন, 'গণপতিসমাক্রান্ত'।[২১৫] নেপালী বৌদ্ধ পুরাকথায় গণপতি বিনায়কের বিপ্রতীপ ভূমিকা সম্পর্কিত দুটি ভাষ্য পাওয়া যায়। একটিতে গণেশ কীভাবে বৌদ্ধ দেবতাদের দ্বারা নির্জিত হয়েছেন, অন্যটিতে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মচর্যায় কীরূপে তাঁর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। নেপালী বৌদ্ধদের টেকস্ট *স্বয়ম্ভু পুরাণ*-এর আখ্যায়িকা অনুসারে, একসময় এক ওড়িয়ান বজ্রাচার্য অষ্টসিদ্ধি লাভের জন্য কাঠমাণ্ডুর নিকটস্থ বাঘমতী নদীতটে তান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছিলেন। গণেশ তাঁর কাজে বিঘ্নসৃষ্টির জন্য নিজের গণভুক্ত পুতনা, কাঠপুতনা প্রমুখ আসুরিক শক্তিসম্পন্ন নারীর সাহায্য গ্রহণ করেন। ওড়িয়ানাচার্যের ওপর এদের কুদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়। পরে আচার্য সদাক্ষরী নামা এক মহাবিদ্যার বন্দনা করেন, যিনি তাঁর দশক্রোধ নামক শক্তিকে জাগ্রত করে গণেশকে পরাজিত করেন। এই ভাষ্যেই সামান্য বদল লক্ষ করা যায় নেপালী বৌদ্ধদের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের রচনা *ধর্মকোষসংগ্রহ*-এ। সেখানে বিঘ্নান্তকের দ্বারা গণেশ-শাসনের একটি আখ্যায়িকা পাওয়া যায়।[২১৬] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'গণেশ' শীর্ষক প্রবন্ধে এর উল্লেখ করেছেন। ওড়িয়ান আচার্য যখন বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ এবং লোকপালদের উপাসনা করছিলেন, গণেশ তখন লক্ষ করেন তাঁর মূর্তি মন্দিরে অনুপস্থিত। স্বভাবতই তিনি ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর গণদের আচার্যকে ধ্বংস করার আজ্ঞা দেন। পরিশেষে আচার্য বিঘ্নান্তকের শরণ নিলে গণেশ বশীভূত হন। আপাতভাবে বৌদ্ধতন্ত্রে গণপতিকে বিঘ্নকারক মনে হলেও বিঘ্নেশ্বর ও বিঘ্নান্তক গণপতির-ই দুটি রূপ হিসেবে কল্পিত। সাধনমালার ধ্যানে দেবী পর্ণশবরীর দ্বারা গণেশের যে বিশেষ রূপটি নির্জিত হয়েছে বলে মনে করা হয়, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তার অর্থ ভিন্ন। বৌদ্ধতন্ত্রে শাক্তধারার বিপরীতরতি অর্থেই গণেশকে এখানে

নির্জিত দেখানো হয়েছে। বিশিষ্ট অধ্যাপক অর্জুনদেব সেনশর্মা অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের গ্রন্থের ভূমিকায় এই বিষয়টিকেই বিস্তারিত করে লিখেছেন, 'বৌদ্ধতন্ত্রে, পুরুষতত্ত্ব কায়াসাধনায় নিম্নগতি পেলে, কর্পূর যদি সমুদ্রে পতিত হয়, তা বিঘ্ন। কিন্তু সেই তত্ত্বই যদি ঊর্ধ্বগামী হয়, তবে তা বোধিসত্ত্বচিত্ত। বৌদ্ধতন্ত্রে পুরুষতত্ত্বের এই ব্যাখ্যা, শৈবসিদ্ধান্তে শিবের বীর্য্যপাত ও ঊর্ধ্বরেতা উভয়ের বৈপরীত্যে কল্পিত। দেবী যখন প্রবৃত্তি-পুরুষকে নিবৃত্তিমার্গে সামরস্যে আনয়ন করেন, তখন বিঘ্নপুরুষকে নিশ্চেতন করে বিঘ্নান্তকের সঙ্গে দেবী শূন্যতার (তাঁর নাম, বজ্রযোগিনী, পর্ণশবরী যাই হোক) বিপরীতরতাতুরা আবিষ্ট বিগ্রহ কল্পিত হয়।' ('ভূমিকা', *দেবতাদের খোঁজে*, পৃষ্ঠাসংখ্যা অনুল্লিখিত)

২.৬

সাধনমার্গীয় ব্যাখ্যায় গণপতি

ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে গাণপত্য কুলদেবতা গজানন গণেশের দেবত্বের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের স্তরগুলি আমরা পূর্বাধ্যায়গুলিতে আলোচনা করেছি। গাণপত্য দর্শন অনুযারী ব্রহ্মমূর্তি গজাননের তত্ত্বজ্ঞান সুজটিল এবং আয়াসসাধ্য। আগেই দেখেছি, আপাত পরিচয়ে গণেশ শিব-গৌরীর সন্তানরূপে প্রসিদ্ধ হলেও গাণপত্য ধর্মসাধনায় তিনি পূর্ণশক্তি এবং পরম ব্রহ্মের প্রকাশমূর্তি বিশেষ। শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণবের মতোই গজানন গণেশের উপাসক হিসেবে তাঁর অনুগামীরা সাধ্যতত্ত্বের অস্তিত্ব এবং ক্ষমতার চরমতায় বিশ্বাস করে। গণেশোপাসক বা গাণপত্যের কাছে গণপতিই যে ultimate বা supreme power এবং সৃষ্টির মূলীভূত শক্তি, *গণেশপুরাণ*-এর 'উপাসনা খণ্ড'-এর দ্বাদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মাকৃত গণেশস্তুতিতে তার প্রমাণ আছে– 'সদসদ্ব্যক্তমব্যক্তং সর্বং হি গণনায়কঃ' অর্থাৎ সৎ, অসৎ, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত সমস্ত রূপেই গণনায়ক গণেশ-ই বিদ্যমান।[২১৭] গাণপত্য দর্শনে এই 'গণপতি'-কে কেবল 'গণ' অর্থাৎ বহুমানুষের প্রধানরূপে দেখলে চলবে না। এখানে 'গণ' সমূহবাচক। *মুদ্গলপুরাণ*-এর 'একদন্তচরিত'-এর ২৫ নং অধ্যায়ে 'গণ'-এর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, 'সমূহবাচী শব্দশ্চ গণ ইত্যভিধীয়তে।/ বাহ্যান্তরাদিভেদানাং সংযোগে তু সমূহকঃ।।/ অন্নপ্রাণাদিকা শব্দা ব্রহ্মণো বাচকা মতাঃ।/ তে সর্বে গণরূপাশ্চ তেষাং স্বামী গণেশ্বরঃ।।'[২১৮] পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, ষটত্রিংশৎ তত্ত্ব সবই গণান্তর্গত এবং এই গণসমূহের একক স্বামী গণপতি সর্বস্বপ্রকাশ রূপে স্বীকৃত। বেদে ব্রহ্মতত্ত্বের বিবিধতা স্বীকার করা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু অন্নব্রহ্ম, প্রাণব্রহ্ম বা শব্দব্রহ্ম এর কোনওটিকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা হয়নি। বরং ব্রহ্মবাচক কোনও তত্ত্বই অন্যোন্য-নিরপেক্ষ

নয়, প্রতিটিই অন্যাপেক্ষ। একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বস্তুত, 'সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তম্ অবাঙ্মনসগোচরম্' যে ব্রহ্ম, তা ব্যাখ্যাতীত বলেই কেবল ব্যাখ্যার চেষ্টামাত্র সম্বল। পূর্বজ মহাত্মাগণ ব্রহ্মের সংজ্ঞা নিরূপণে কোনও না কোনও ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সম্যকরূপে ব্রহ্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ করা কখনওই সম্ভব হয়নি। চিরন্তন তথা শাশ্বত ব্রহ্ম চিন্মাত্র, পূর্ণাতিপূর্ণ এবং নির্গুণ ও নিরূপাধিক বলেই তাঁর সামগ্রিক পরিচয় সাধারণের জ্ঞানের অগোচরে। অগম অপার সেই তত্ত্বমাত্রসার ব্রহ্ম বিষয়ে জানা সম্ভব নয় বলেই সেই পূর্ণতত্ত্বের আভাসমাত্র পেতে গাণপত্যরা পরমব্রহ্মকে গজবদন কল্পনা করেছে। এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুসারে সূর্য, বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রমুখ দেবতাগণের মধ্য দিয়ে নির্গুণ ব্রহ্মের এক-একটি রূপ প্রকাশিত হলেও, একমাত্র গণপতির মধ্যেই ব্রহ্মতত্ত্বের মূল রূপের পূর্ণস্ফূর্তি ঘটেছে। গাণপত্য মতে, গজমুখেই তিনি ব্রহ্মের সারভূত। এক্ষেত্রে 'গজ' শব্দটি তাৎপর্যবোধক। শব্দটিকে উলটে ব্যবহার করলেই দাঁড়ায় 'জগ' অর্থাৎ পৃথিবী, যা তত্ত্বত ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব। অতএব গজমস্তকে গণেশ সাক্ষাৎরূপে ব্রহ্ম-ই। ব্রহ্মের প্রতিচ্ছবি যেমন জগৎ, তেমনই গজাননের 'গজ'-কে উলটে দিলেই 'জগ' অর্থাৎ বস্তুলোক সামনে এসে পড়ে। গাণপত্যগণ ব্রহ্মকে সত্য জ্ঞান করেও জগৎ-প্রপঞ্চকে মিথ্যা ভাবেননি, ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া ভেবেছেন। প্রতিবিম্ব বা ছায়া কখনওই মিথ্যা বা ভ্রান্ত হতে পারে না, তা মূল বস্তু বা তত্ত্বেরই উলটোনো চেহারা বা রূপ। এই কারণেই ব্রহ্মানন গণেশের গজমস্তকে ব্রহ্মের প্রতীকতা লক্ষ করা যায়, যে 'গজ'-কে (ব্রহ্মতত্ত্ব) উলটে ভাবলেই জগতের প্রতিবিম্ব এসে পড়ে। প্রসঙ্গত, *মুদ্গলপুরাণ*-এর 'ধূম্রবর্ণচরিত'-এর ৪২ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "বিশ্বং কণ্ঠাদধস্তস্য শিরো ব্রহ্ম গজাত্মকম্।/ তয়োর্যোগে গণেশো নো দেহধারী বভূব চ।।"[২১৯] অর্থাৎ, এই জগৎ গণেশের কণ্ঠ থেকে নিম্নে অবস্থিত এবং তাঁর শির বা মস্তকই ব্রহ্ম। এই দু'য়ের যোগে গণেশের অবয়ব সুগঠিত। অতএব দেখা গেল, এই গজমস্তকরূপ ব্রহ্ম এবং নরদেহরূপ জগৎ গণপতি-তত্ত্বে একাধারে সংশ্লেষিত। গাণপত্য দর্শনে *ছান্দোগ্য উপনিষদ*-এর মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি'[২২০]-এর ('তুমিই সেই/ব্রহ্ম') 'তৎ-ত্বম্-অসি'-এর মধ্যে 'তৎ' যদি হয় গজাননের হস্তীমুণ্ড ('ব্রহ্ম') এবং 'ত্বম্' যদি হয় তাঁর নরবপু ('জগৎ'); তাহলে 'অসি' অর্থে ওই গজমুখ ও নরদেহের unification বা সম্মিলন বোঝায়। ঠিক যেন ব্রহ্মতত্ত্ব এবং জীবজগৎ গজানন গণপতির হস্তীমুণ্ড ও নরদেহের মধ্যে একত্বলাভ করেছে।

প্রাবন্ধিক Leona Anderson গণেশ-গবেষক Paul B. Courtright-এর গ্রন্থপ্রদত্ত একটি সূত্র অবলম্বনে গণেশের স্বরূপের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'In the philosophical branches of the Indian tradition, Ganesa is identified with the Advaita Vedantic vision of Nirguna brahman.

Ganesa is the *sat-cit-ananda*, the being-consciousness-bliss.' লক্ষণীয়, *গণেশপুরাণ*-এর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকৃত গণেশস্তুতির মধ্যে গজানন গণপতির এই ব্রহ্মসারূপ্যের প্রসঙ্গটি বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। ত্রিদেব সেখানে 'অজন্মা, নির্বিকল্প, নিরাকার, একমাত্র, নিরালম্ব, অদ্বৈত, আনন্দপূর্ণ, পর, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরীহ এবং পরব্রহ্ম'-রূপে গণেশের আরাধনা করেছেন। উল্লিখিত স্তোত্রের ১২ নং শ্লোকে গণেশকে 'বিশ্বরূপ' বলা হয়েছে। গণেশের চরণযুগল যে বেদান্তবেদ্য, *চম্পূ রামায়ণ*-এর প্রথম শ্লোকেই তার সমর্থন পাওয়া যায়, 'লক্ষ্মীং তনোতু নিতরামিতরানপেক্ষ-/ মঙ্ঘ্রিদ্বয়ং নিগমশাখিশিখাপ্রবালম্।/ হেরম্বমম্বুরুহডম্বরচৌর্যনিঘ্নং/ বিঘ্নাদ্রিভেদশতধারধুরংধরং নঃ।।'[২২১] অর্থাৎ, গণেশের সেই চরণদ্বয় অন্য কিছুর সহায়তা ছাড়াই আমাদের প্রভূত সম্পদ বিস্তার করুক, যা বেদবৃক্ষের শিরোরূপ অগ্রভাগের নবপল্লব, যা পদ্মের সৌভাগ্যাতিশয় অপহরণে নিপুণ, যা বিঘ্নরূপ পর্বতের বিদারণে বজ্রের মতো অগ্রণী। এখানে বেদবৃক্ষের অগ্রভাগ উপনিষদ অর্থাৎ বেদান্ত এবং তার থেকে উৎপন্ন নবপল্লবের অর্থ বেদান্তবেদ্য।

যদিও গাণপত্যের গণেশ 'সচ্চিদানন্দ' পূর্ণব্রহ্ম হিসেবে *গণেশপুরাণ, মুদ্গলপুরাণ* ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে ব্যাখ্যাত হলেও স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চায়তন পূজায় তিনি কিন্তু 'সদানন্দ'-স্বরূপ। উপাসকের কাছে নির্গুণ পরব্রহ্মের সগুণ রূপমূর্তি হিসেবে এক-এক দেবতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত। চিদানন্দ সেখানে তেজোময় সূর্য এবং সদানন্দ জ্ঞানময় গণপতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর *পূজা-প্রদীপ* ব্যাখ্যাত 'ষট্‌কোণবিশিষ্ট ব্রহ্মভাবচক্র'-এ গণপতি সদানন্দ অর্থাৎ সদ্‌ ও আনন্দ-তত্ত্বের (শিব + শক্তি) মধ্য তথা মিলনবিন্দুতে অবস্থিত জ্ঞানতত্ত্ব বিশেষ। বঙ্গদেশে স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাসনায় গণপতির অবস্থান ও ভূমিকা প্রসঙ্গে পরবর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে এই সূত্রটি বিস্তারিত করা হবে।

দেবদর্শন স্থূল ইন্দ্রিয়বেদ্য বিষয়দর্শনের মতো নয়, তা ধ্যানগম্য এবং স্বানুভববেদ্য। বিশেষ দেবতার ধ্যানের মধ্য দিয়ে সাধকের চিত্তলোকে উপাস্যের মূর্তি প্রতিভাসিত হয়। সাধনমার্গে একমাত্র ধ্যান ব্যতিরেকে দেবতার মূর্তিদর্শনের অন্য পথ নেই। শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী তাঁর *ক্রমবিকাশের পথে* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'গণেশ আদি ঈশ্বর আমাদের অন্তঃকরণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধহীন কোন অবাস্তব সত্তা নহেন। তাই পূজকগণ ধ্যান পুষ্পটি হস্তে রাখিয়া হৃদয়ের গভীর স্তরে ডুব দিয়া তাঁহার মিলনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেন, যখন সেই স্বরূপস্থিত হন, তখনই সেই পুষ্পটি নিজের মস্তকে রাখিয়া মানসপূজায় নিযুক্ত হন। পূজায় যিনি যত গভীরভাবে অন্তরের দিকে ডুবিতে পারেন, তিনি ঈশ্বরের ততই নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকেন।'[২২২] বোঝা গেল,

একমাত্র অন্তর্গত উপলব্ধিতেই তিনি ধরা দেন। ধ্যানমার্গে হৃদয়ানুভব ছাড়া সেই অনাদ্যন্ত সাধনধনকে পাওয়ার আর অন্য পথ নেই। সাধকের অন্তর্লোকের এক-একটি শক্তি-প্রকোষ্ঠে এক-এক দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করা হয়। এক্ষেত্রে উপাসকের অন্তর্লোকের বুদ্ধিশক্তির ঈশ্বরীয় ভাবকে 'গণেশ' বলা যেতে পারে। সদানন্দময় সিদ্ধিদাতা গণপতি-গণেশ বুদ্ধিশক্তির অধীশ্বর। জ্ঞানীগণ ও কর্মীগণ নির্বিশেষে গণেশ-উপাসকের চিত্তলোকে এই বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে কোন কোন বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়, কীভাবেই বা সাধকের অন্তর্নিহিত ভাবরূপের সঙ্গে উপাস্যের তত্ত্বসাদৃশ্য তৈরি হতে পারে, আলোচ্য অংশে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পুরোহিত দপর্ণোক্ত গণেশের 'খর্ব্বং স্থূলতনুং' শীর্ষক বহুচলিত পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্রের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ কার্যত সমান্তরাল অর্থে আবৃত। সাধনমার্গে মন্ত্রধৃত শব্দগুলির আপাত অর্থের পাশাপাশি গূঢ়ার্থও বিদিত। গণপতি-তত্ত্বের সঙ্গে সাধকের অন্তঃকরণস্থিত বিশেষ ভাবের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মন্ত্রান্তর্গত শব্দের অর্থভেদ জরুরি। এক্ষেত্রে ঐহিক স্তরে জ্ঞানতত্ত্ব গণেশের অঙ্গকান্তি এবং দেহসৌষ্ঠবের বৈচিত্র্য যেমন জ্ঞানীগণ উপলব্ধি করেন, তেমনই গণেশের কর্মকৃতিত্বের সঙ্গে বুদ্ধিমান কর্মীগণের ভাবসাদৃশ্য দেখা যায়। লক্ষণীয়, 'খর্ব্বং স্থূলদেহং গজেন্দ্রবদনং সুন্দরং প্রস্যন্দন্মদ গন্ধ-লুব্ধ-মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলং'— এই পর্যন্ত গণেশের স্বরূপের বর্ণনা, যা একমাত্র জ্ঞানমার্গীদের কাছেই প্রকাশগম্য। জ্ঞানীগণের চিত্তলোকেই গজানন গণেশের এই প্রকাশরূপ অনুভূত হয়। তাঁদের অনুভূতি ধ্যানমন্ত্রের এই প্রথমার্ধের ওপর বেশি ঝুঁকে পড়ে। পরবর্তী "দন্তাঘাত বিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু"— এই অংশটুকুতে গণেশের কর্মের বর্ণনা ধরা আছে। বুদ্ধিশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত মানুষদের মধ্যে একমাত্র কর্মী এবং অনুভূতিসম্পন্ন মানুষদের স্বভাবের সঙ্গে ধ্যানমন্ত্রের দ্বিতীয়ার্ধের যোগ। এ প্রসঙ্গে গণেশের ধ্যানমন্ত্র থেকে তাঁর দেহরূপ ও কর্মপ্রকৃতির সঙ্গে গণেশ-ভক্ত বা উপাসকের চরিত্রগত সংযোগের সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। মন্ত্রধৃত দ্ব্যর্থক শব্দগুলির বাচ্যার্থ এবং অন্তর্নিহিতার্থ নিম্নে উল্লিখিত হল:

প্রথমার্ধ	**বাচ্যার্থ**	**নিহিতার্থ**
খর্ব্বং	বেঁটে, ছোটোখাটো, অল্পায়তন(দেহাকৃতি নির্দেশক)	দম্ভশূন্য, অহংকারবিহীন, নিরভিমান।
স্থূলতনুং	স্ফীতকায়, দেহভারযুক্ত(শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সূচক)	অবিচলিত, স্থির, অচঞ্চল স্বভাব।

গজেন্দ্রবদনং	হস্তীরাজ বা হস্তীশ্রেষ্ঠের মুখ	ঋজুরেখ স্বভাব বা বুদ্ধিতে একরোখা। সততই নিজের বিচারধারা ঠিক এমন ভাব। গজমুণ্ড হওয়ায় পশুর মতোই একরোখা বিচারশক্তি।
লম্বোদরং	লম্বিত উদর বা ঝোলা পেটবিশিষ্ট	নিশ্চিন্ত ও শান্তস্বভাব। যাদের অভাবের জ্ঞান কম, তারাই এমন লম্বমান উদরের অধিকারী হন। এরা শান্ত ও নিরূপদ্রব জীবনে অভ্যস্ত হন।
সুন্দরং	তিনি রূপবান বা তাঁর অসাধারণ সৌন্দর্য প্রকাশক মূর্তি	এই সৌন্দর্য কেবল দৈহিক আকর্ষণ নয়। এর মধ্যে চিত্তাকর্ষক স্বভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
প্রস্যন্দন্মদ	কপোল বা গাল থেকে মদজল নির্গত হচ্ছে	অন্তরে শান্তির অমৃতধারা প্রবহমান।
গন্ধ-লুব্ধ-মধুপ	ভ্রমরেরা মদবারির সুগন্ধে প্রলুব্ধ	জ্ঞানীগণ(জ্ঞানমধু পান করেন) তাঁর প্রভাবে আকৃষ্ট বা সঙ্গলাভে ইচ্ছুক।
ব্যালোল গণ্ডস্থলং	গালের চারপাশে ভ্রমরেরা সঞ্চরণরত	জ্ঞানীগণ তাঁর সঙ্গলাভ করে ধন্য হয়েছেন।

গণেশ-ধ্যানের দ্বিতীয়াংশের ব্যাখ্যা:

দ্বিতীয়ার্ধ	বাচ্যার্থ	নিহিতার্থ
দন্তাঘাত বিদারিতারি	দাঁতের আঘাতে শত্রুকে বিদীর্ণ করেন	অন্যায়কারীর প্রতি ক্ষমাহীন আচরণ করেন। এক্ষেত্রে দাঁত দিয়ে আঘাত করার অর্থই হল, এই স্তরের কর্মীরা নির্দয় হয়ে নির্বিচারে শত্রু সংহার করেন। অনমনীয় স্বভাব।
রুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং	শত্রু-রক্তের সিঁদুরে শোভমান	অন্যায়কারীর রক্তপাতেই আনন্দ। চিরকাল এরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর, যেন বিদ্রোহী ভাবের লাল রং স্বভাবে ধারণ করেছেন।
শৈলসুতাসুতং	হিমালয়-পুত্রীর পুত্র	হিমালয় অর্থে পাষাণ। পাষাণের মেয়ের ছেলে অর্থাৎ পার্বতীপুত্র অত্যন্ত কঠোর হৃদয়। ফলে সহজে দয়াপরবশ হন না। অন্যায়কারীর প্রতি ক্ষমাহীন হন।
গণপতিং	গজানন গণেশ	গণশক্তি বা সংঘশক্তির নেতা
সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু	সমস্ত কর্মের পরিণাম ফল বা সিদ্ধি প্রদান করেন	সিদ্ধি এখানে ঐহিক কেবল নয়, পারত্রিক। আপাত কর্মসাফল্য-ই সিদ্ধি নয়, এর সঙ্গে মোক্ষ বা মুক্তি বিষয়ক ধারণা জড়িত।

ধ্যানমন্ত্রের উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকেই গণপতি-তত্ত্বের সঙ্গে সাধকের সংযোগের ভিত্তি স্পষ্ট হয়। উপাসকগণের মধ্যে যাঁরা অন্তর্লোকের বুদ্ধির কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা নিরভিমান, একাগ্র, আত্মপ্রত্যয়ী, নিশ্চিন্ত ও শান্ত স্বভাব, লোকপ্রিয়, অন্তর্গত শান্তির প্রভাবে নিমগ্ন, জ্ঞানীগণের প্রিয় এবং জ্ঞানীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হন। উপাসকদের

মধ্যে জ্ঞানসম্পন্ন যাঁরা, একমাত্র তাঁদের মধ্যেই এই দিকগুলির বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। পাশাপাশি বুদ্ধির কেন্দ্রে সংযুক্ত কর্মীগণের মধ্যে ধ্যানমন্ত্রের দ্বিতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি বিকশিত হয়। তাঁরা অন্যায়কারীকে সমূলে ধ্বংস করেন। দুর্বৃত্তদের সঙ্গে কোনওদিনও সন্ধি বা মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করেন না। সবসময়ই অন্যায়কারীর প্রতি নির্দয় আচরণ করেন। এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানুষেরাই জয়যুক্ত হন এবং জনসাধারণ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে বাধ্য হয়। সাধকসমাজের বিশ্বাস অনুসারে, নিজ নিজ অন্তঃকরণের বুদ্ধিকেন্দ্র পর্যন্ত যাঁরা স্থিতিলাভ করতে পারেন, তাঁদের স্বভাবে ও কর্মে উপরোক্ত লক্ষণগুলি নিশ্চিতরূপেই প্রতিভাত হয়।

উল্লেখসূচি :

১। Rocher, Ludo. 'Ganesa's Rise to prominence in Sanskrit Literature.' *Ganesh: Studies of an Asian God.* edited by Brown, Robert L., State University of Newyork Press, 1991, 73

২। *মৎস্যপুরাণ* (অধ্যায় ১৫৪), পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ পরিদৃষ্ট, নবভারত পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃ. ৫৬৯-৭০

৩। Jayaratha. *The Haracharitachintamani* (chap. 18). Edited by Sivadatta & Parab, Pandurang Kasinath. Bombay: Nirnaya Sagara Press, 1897, p. 165-66

জয়রথের (মতান্তরে জয়দ্রথ) *হরচরিতচিন্তামণি*-র 'গণপত্যবতার' (১৮) শীর্ষক অধ্যায়টি অর্থব্যাখ্যা সহ বুঝতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক দেবার্চনা সরকার সাহায্য করেছেন।

৪। *বামনপুরাণ* (অধ্যায় ৫৪), পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০ ব. পৃ. ২১৭-২০

৫। অর্জুনদেব সেনশর্মা, 'ভূমিকা', *দেবতাদের খোঁজে,* অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বইচই পাবলিকেশন, নভেম্বর ২০২২, পৃ. অনুল্লিখিত।

৬। *পদ্মপুরাণ* ('সৃষ্টিখণ্ড', অধ্যায় ৬৩), পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৪১২ ব. পৃ. ৭৪৩

৭। *স্কন্দপুরাণ,* প্রথমভাগ ('মাহেশ্বরখণ্ডে-কেদারখণ্ড'), পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৩৯৭ ব., পৃ. ৪৩-৫৪

৮। ওই, প্রথম ভাগ ('মাহেশ্বরখণ্ডে-কুমারিকাখণ্ড'), পৃ. ৩৫৩-৫৪

৯। ওই, তৃতীয় ভাগ ('ব্রহ্মখণ্ডে-ধর্ম্মারণ্যখণ্ড'), জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ ব., পৃ. ১৮০৬

১০। ওই, ষষ্ঠ ভাগ ('নাগরখণ্ড', 'গণপতিত্রয়ের মাহাত্ম্য বর্ণন'), ১৪২১ ব., পৃ. ৪১০১-০২

১১। ওই, ষষ্ঠ ভাগ ('নাগর খণ্ড', 'গণপতির পূজাবিধি ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন'), পৃ. ৪৩২৯-৩৩

১২। ওই, সপ্তম ভাগ ('প্রভাসখণ্ডে-অর্ব্বুদখণ্ড', 'বিনায়ক মাহাত্ম্য কথন'), ১৪২০ ব., পৃ. ৫২০৮-০৯

১৩। ওই, সপ্তম ভাগ, ('প্রভাসখণ্ডে-অর্ব্বুদখণ্ড', 'ঈশানীশিখরের মাহাত্ম্য খ্যাপন'), পৃ. ৫২৪৯-৫১

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৯

১৫। *শিবপুরাণ* ('জ্ঞান-সংহিতা', অধ্যায় ৩২-৩৪), পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ

১৪২২ ব., পৃ. ১২২-৩৭

১৬। *লিঙ্গপুরাণ* (‘পূর্ব্বভাগ’, অধ্যায় ১০৫), পঞ্চানন তর্করত্ন অনুদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৯৬ ব., পৃ. ১৮৬-৮৭

১৭। *বরাহপুরাণ* (অধ্যায় ২৩), পঞ্চানন তর্করত্ন অনুদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪০১ ব., পৃ. ১১৮-২২।

১৮। Getty, Alice. *Ganesa: A Monograph on the Elephant-faced God.* Pilgrims Publishing, 2006, p. 6

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৩

২০। *গণেশপুরাণ* (‘ক্রীড়াখণ্ড’, ১২৯। ৩১), মহেশচন্দ্র যোশী সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ২০১৪, পৃ. ১০৪৮

২১। http://vedicreserve.miu.edu/sthapatya_veda/suprabhedagama.pdf, accessed 19.7.2020

২২। *বিশ্বকোষ* (পঞ্চম খণ্ড), নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত, কলকাতা ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত, ১৩০১ ব., পৃ. ২০৫

২৩। Nagar, Shanti Lal. “The Birth, Childhood and Marriage”. *Cult of Vinayaka.* Intellectual Publishing House, 1992, p. 15

২৪। প্রাগুক্ত, ‘বিনায়কোৎপত্তি’ (অধ্যায় ৫৪, শ্লোক ৭১ - ৭২), পৃ. ২২০

২৫। Nagar, Shanti Lal. op. cit., p. 15

২৬। Ibid., p. 15

২৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

২৮। Nagar, Shanti Lal. op. cit., p. 16

২৯। Ibid., p. 16

৩০। Ibid., p. 16

৩১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-৩১

৩২। Nagar, Shanti Lal. op. cit., p. 17

৩৩। Wodeyar, Krishnaraja. *Sritattvanidhi* (vol. 3, *Sivanidhi*). Edited by Ramesh, K. V.

Mysore: Prachya vidya sangshodhanalaya, 2004, p. 56

৩৪। Ibid., p. 56

৩৫। প্রাগুক্ত, অধ্যায় ৩৬, পৃ. ১৪০-৪২

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০১

৩৮। Arunachalam, M. 'Vinayaka Chaturthi'. *Vivekananda Kendra Patrika* 6, no. 1, 1977, 63-68

৩৯। Cohen, Lawrence. 'The Wives of Ganesa'. *Ganesh: Studies of an Asian God.* op. cit., p. 130

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৪১। Eliade, Mircea. *Yoga, Immortality, and Freedom.* Princeton University Press, 2d ed., 1969, p. 153

৪২। Getty, Alice. op. cit., p. 12

৪৩। Cohen, Lawrence. op. cit., p. 134

৪৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০

৪৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

৪৮। প্রাগুক্ত, শ্লোক ৭ ও ৮, পৃ. ৩৫৩

৪৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০২-০৩

৫০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩২-৩৩

৫১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৫০

৫২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৩

৫৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৩-৪৪

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৫৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

৫৬। *The Brahmanda Mahapuran* ('Madhyama Bhaga', Chap. 41 – 43). Edited by Sharma, K. V. Varanasi: Krishnadas Academy, 2000, p. 170-73

৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-১৩

৫৮। প্রাগুক্ত, শ্লোক ২২, পৃ. ৭৪৭

৫৯। ওই, পৃ. ৭৪৭-৪৮

৬০। Krishan, Yuvraj. 'Development of the Iconography of Ganesa'. *Ganesa: Unravelling an Enigma.* Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, 1999, P. 89

৬১। Ibid., p. 89

৬২। Ibid., p. 89

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯, ৮৩৩, ১০৫০

৬৪। Bussagli, H. & Sivaramamurti, C. *5000 years of Indian Art.* New York, 1971, p. 103, 136; Sivaramamurti, C. *The Art of India.* New York, 1977, p. 82-3

৬৫। Rao, Gopinath T. A. *Elements of Hindu Iconography* (vo.I, pt. I). MLBD, 2017, p. 52-56

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০১

৬৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭২-৭৩

৬৮। Leaman, Oliver. *Encyclopedia of Asian Philosophy*, pp. 440-42.

৬৯। Stevenson, R. 'Analysis of the Ganesa Purana with Special Reference to the History of Buddhism'. *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, vol. 8, pp. 319-29; Tiwari, Maruti Nandan & Giri, Kamal. 'Images of Ganesa in Jainism'. *GANESH: Studies of an Asian God.* Brown, Robert L (edited), 101-107.

৭০। ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পুরাণ', *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ. ১২৩।

৭১। Thapan, Anita Raina. 'Introduction'. *Understanding Ganapati: Insights into the dynamics of a Cult*, pp. 30-33; Bailey, Greg (translated and annoted). 'Dating and Place of Composition of the Ganesa Purana'. *The Ganesa-Purana* (Part-I, Upasana Khanda), pp. 15-21.

৭২। Bailey, ibid, pp. 15-21.

৭৩। Thapan, Anita Raina. op. ct., pp. 30-33.

৭৪। Farquhar, J. N. *Outline of the Religious Literature of India*, p. 226, 270.

৭৫। Stevenson, R. op. cit., p. 319.

৭৬। Preston, Lawrence W. 'Subregional Religious Centers in the History of Maharashtra: The Sites Sacred to Ganesa'. *Images of Maharashtra: A Regional Profile of India*. Wagle, N. K.(ed.), p. 103.

৭৭। Bailey, Greg. op. cit., pp. 80-85.

৭৮। Hazra, R. C. 'The Ganesa Purana'. *Journal of the Ganganatha Jha Research Institute*, Vol. 9, p. 97.

৭৯। মহেশচন্দ্র যোশী, 'গণেশপুরাণ কা আরম্ভিক নাম: ভার্গবপুরাণ', *গণেশপুরাণ*, মহেশচন্দ্র যোশী(সম্পা.), পৃ. ২৮-২৯।

৮০। ওই, পৃ. ২৮-২৯।

৮১। ওই, 'গণেশপুরাণ কা সম্ভাব্য রচনাকাল', পৃ. ২৯।

৮২। ওই, পৃ. ৩০।

৮৩। ওই, পৃ. ৩০।

৮৪। Brown, Robert L (edited). op. cit., p. 95.

৮৫। Ibid, p. 95-97.

৮৬। Thapan, Anita Raina. op. cit., pp. 30-33; Ibid, p. 95-97.

৮৭। Bailey, Greg. op. cit., p. 4, 116.

৮৮। Ibid, p. 22 (xxii).

৮৯। Granoff, Phyllis. 'Ganesa as Metaphor'. op. cit. Brown, Robert L (ed.), pp. 94-95 (note 2).

৯০। Hazra, R. C. op. ct., pp. 79-99.

৯১। Courtright, Paul. B. *Ganesa: Lord of Obstacles, Lord of Beginnings*, p. 214.

৯২। Thapan, Anita Raina. op. cit., p. 304.

৯৩। Granoff, Phyllis. op. ct., pp. 94-95(note 2).

৯৪। Saraswati, Swami Tattvavidananda (commentator). 'The Text'. *Ganapati Upanisad*, p. 3.

৯৫। Ibid, p. 3.

৯৬। Ibid, p. 5.

৯৭। Ibid, 'Commentary', pp. 78-79.

৯৮। Ibid, 'The Text', p. 6.

৯৯। Ibid, p. 6.

১০০। Ibid, 'Commentary', p. 80.

১০১। Ibid, p. 80.

১০২। Ibid, p. 78.

১০৩। Ibid, 'The Text', p. 4.

১০৪। Ibid, 'The Text', p. 5.

১০৫। Ibid, 'The Text', p. 5.

১০৬। Grimes, John. *Ganapati: Song of the Self*, pp. 27-29.

১০৭। Banerjee, J. N. *Development of Hindu Iconography*. Calcutta University, 1956, pp. 151-52

১০৮। *পদ্মপুরাণ*-এর 'সৃষ্টিখণ্ড'-এ (৬৫। ২২) গণেশের অর্চনা করলে ত্রিদেব সন্তুষ্ট হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া 'ও নম গণপতয়ে' শীর্ষক মন্ত্রটি একাধিকবার উল্লেখের ('সৃষ্টিখণ্ড', ৬৩। ২৮, ৬৫। ১০) বিষয়টিও লক্ষণীয়।

১০৯। সমস্ত পূজার সূচনায় গণেশপূজা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গণেশের পূজায় পিতৃপুরুষ ও সকল দেবদেবীর নিত্য আরাধনা হয় বলে ব্রাহ্মণগণ সর্বদা সর্বযজ্ঞে সর্বপ্রথম গণেশের অর্চনা করে থাকেন (*পদ্মপুরাণ*, 'সৃষ্টিখণ্ড', ৬৩। ১৮-২০)।

১১০। Karmakar, A. P. *The Religions of India: The Vratyas or Dravidian Systems* (vol. 1). Mira Publishing House, Lonavala, 1950, p. 139

১১১। ইদানীংকালে বাংলার অন্যতম গাণপত্য ধর্মপ্রচারক সুরজ কুমার দাসের আলোচনা ও বিশ্লেষণের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১১২। Wilkinson, Christopher. 'The Tantric Ganesa: Texts preserved in the Tibetan Canon', op. cit., p. 243

১১৩। Ibid., p. 244

১১৪। *Isanasivagurudevapaddhati* of Isanasiva. II. 16. 1-16. Edited by Sastri, T. Ganapati. Trivandrum Sanskrit Series, vol. 72, 1923, 1-16

১১৫। Prapanchasara Tantra, xvii.2, 8-9, 14-18

১১৬। *Sankaravijaya of Anandagiri.* Edited by Vidyasagar, Jibananda. Calcutta, 1881, p. 82

১১৭। Rao, Saligrama Krishna Ramchandra. *Ganapati 32 Drawings from a 19th Cent. Scroll.* Karnataka Chitrakala Parishath, 1989, p. 18

১১৮। Subramuniyaswami, Satguru Sivaya. *Loving Ganesha.* Himalayan Academy, 2019, p. 71

১১৯। Ibid., p. 71

১২০। Ibid., p. 71; Rao, Ramchandra, op. cit., p. 55

১২১। Jagannathan, T. K. *Sri Ganesha.* Pustak Mahal, 2009, p. 108

১২২। Grewal, Royina. *Book of Ganesha.* Penguin Books Limited, 2009, pp. 120-21

১২৩। Ibid., pp. 1201

১২৪। Wilkinson, Christopher, op. cit., p. 247

১২৫। Rao, Ramchandra, op. cit., p. 55; Grewal, Royina, op. cit., pp. 120-21

১২৬। Grewal, Royina, Ibid., pp. 120-21

১২৭। Ibid., pp. 133-4

১২৮। Bhandarkar, Ramkrishna Gopal. *Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems.* Asian Educational Services, , p. 213

১২৯। Grewal, Royina, op. cit., pp. 122-23

১৩০। *Sankaravijaya*, op. cit., pp. 82-83

১৩১। Jagannathan, T. K., op. cit., p. 106

১৩২। Rao, T. A. Gopinatha. *Elements of Hindu Iconography* (part 1). Motilal Banarasidass Publisher, 1993, p. 59

১৩৩। Yadav, Nirmala. *Ganesa in Indian Art and Literature.* Publication Scheme, 1997, pp. 23-24

১৩৪। Subramuniyaswami, op. cit., p. 79

১৩৫। Rao, Saligrama Krishna Ramchandra. *Pratima Kosha: Descriptive Glossary of Indian Iconography.* IBH Prakashana, 1989, p. 153

১৩৬। Bhandarkar, op. cit., p. 213

১৩৭। *Sankaravijaya*, op. cit., pp. 85-87

১৩৮। Bhandarkar, op. cit., p. 213

১৩৯। Ajitagama, vol. iii, 55.18

১৪০। *মুদ্গল পুরাণ* (VI 9. 8), *গণেশ পুরাণ* (II. 125. 39), (II. 6. 24), (II. 31. 9)

১৪১। *মুদ্গল পুরাণ* (VIII. 43. 26-27), *গণেশ পুরাণ* (II. 130. 22)

১৪২। *Ajitagama*, Vol III, p. 6, fn. 73. Quoted from the Svayambhuvagama

১৪৩। Grewal, op. cit., pp. 122-23

১৪৪। Ibid., pp. 67-68

১৪৫। Grimes, John A, op. cit., p. 52-59

১৪৬। Bailey, Greg, op. cit., p. 656

১৪৭। প্রাগুক্ত, অধ্যায় ৪৪, শ্লোক ৮৯, পৃ. ৩০০

১৪৮। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পঞ্চোপাসনা*, কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০, পৃ. ২২

১৪৯। Thapan, Anita Raina, "The Ganapatyas", op. cit., p. 188

১৫০। *শব্দকল্পদ্রুম*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৫০

১৫১। Apte, V. S. *The Practical Sanskrit-English Dictionary*, p. 1031

১৫২। *Sankaravijaya*, chap. 15, op. cit., pp. 87-88

১৫৩। *Devi Rahasya*, See Parisistas V.iii.30, p. 545

১৫৪। Thapan, Anita Raina, op. cit., p. 189

১৫৫। *Ajitagama*, Vol. III, 55.12

১৫৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

১৫৭। *শারদাতিলকতন্ত্র*

১৫৮। Thapan, Anita Raina, op. cit., p. 190

১৫৯। Rao, T. A. Gopinatha. *Elements of Hindu Iconography*, part 1, op. cit., pp. 46-47

১৬০। Grewal, op. cit., pp. 67-68

১৬১। Rao, T. A. Gopinatha, op. cit., p. 57

১৬২। Subramuniyaswami, op. cit., p. 69

১৬৩। Rao, T. A. Gopinatha, op. cit., p. 65

১৬৪। Grewal, op. cit., pp. 67-68

১৬৫। Ibid., pp. 67-68

১৬৬। Rao, T. A. Gopinatha, op. cit., p. 65

১৬৭। Subramuniyaswami, op. cit., p. 69

১৬৮। Rao, T. A. Gopinatha, op. cit., p. 65

১৬৯। Jagannathan, op. cit., p. 104; Paul, Martin Dubost. *Ganesa: The Enchanter of the Three Worlds*, Mumbai: Project for Indian Cultural Studies, 1997, p. 158

১৭০। Dalal, Roshan. *Hinduism: An Alphabetical Guide.* Penguin Books Limited, 2014, p. 470

১৭১। Grewal, op. cit., pp. 67-68

১৭২। Sanford, James H. 'Literary Aspects of Japan's Dual-Ganesa Cult'. *Ganesh: Studies of an Asian God*, op. cit., pp. 313-15

১৭৩। Rao, op. cit., pp. 53-55

১৭৪। Subramuniyaswami, op. cit., p. 66

১৭৫। Rao, op. cit., pp. 53-55

১৭৬। Subramuniyaswami, op. cit., p. 66

১৭৭। Rao, op. cit., pp. 53-55

১৭৮। Ibid., pp. 53-55

১৭৯। Ibid., pp. 53-55

১৮০। Cohen, Lawrence, op. cit., p. 120-21

১৮১। *Sankaravijaya*, chap. 15, op. cit., p. 87

১৮২। Thapan, Anita Raina, op. cit., p. 190

১৮৩। *Pranatosini Tantra*, p. 611

১৮৪। *Devi Rahasya*, See Parisistas V.iii.30, p. 545

১৮৫। Pal, Pratapaditya. "introduction". *Hindu Religion and Inconography (According to Tantrasara).* Vichitra Press, Los Angeles, 1981, p. 7

১৮৬। *Pranatosini Tantra*, p. 489

১৮৭। Thapan, Anita Raina, op. cit., p. 190

১৮৮। Rao, op. cit., pp. 53-55

১৮৯। Jagannathan, op. cit., pp. 120-21

১৯০। Bhandarkar, op. cit., p. 213

১৯১। Nagar, Shanti Lal. *The Cult of Vinayaka*. Intellectual Pub, 1992, p. 59

১৯২। Cohen, Lawrence, op. cit., pp. 120-21

১৯৩। Grewal, op. cit., pp. 122-23

১৯৪। Suvarna Ganapati's description appears in *Ajitagama*, Vol. III, 55. 15

১৯৫। *Sankaravijaya*, p. 87

১৯৬। Thapan, Anita Raina, op. cit., p. 193

১৯৭। Ibid., pp. 193-94

১৯৮। Krishan, Yuvraj. 'Ganesa in Jainism', op. cit., p. 121

১৯৯। Ibid., p. 121

২০০। Ibid., p. 122

২০১। Ibid., p. 121

২০২। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, 'দেব-দেবী বিবর্তনে গণপতি', *বিশেষ গণেশ সংখ্যা*, টেরাকোটা, পুনর্মুদ্রিত, আগস্ট ২০২১, পৃ. ৩৯

২০৩। ওই, পৃ. ৩৯

২০৪। ওই, পৃ. ৩৯

২০৫। Bhattasali, *N. K. Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*. Dacca, 1929, pl. xix

২০৬। Krishan, Yuvraj. 'Ganesa in Buddhism', op. cit., p. 109

২০৭। Ibid., p. 109

২০৮। Ibid., p. 109

২০৯। Ibid., pp. 109-10

২১০। Ibid., pp. 109-10

২১১। Ibid., p. 110

২১২। Ibid., p. 110

২১৩। Ibid., p. 110

২১৪। Mitra, Haridas. *Ganapati.* Visva-Bharati, 1950, p. 43, Appendix III, pp. 45-48

২১৫। Krishan, Yuvraj. 'Ganesa in Buddhism', op. cit., p. 111

২১৬। Ibid., p. 111

২১৭। *গণেশপুরাণ* ('উপাসনাখণ্ড', ১। ১২। ৯), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

২১৮। *মুদ্গলপুরাণ,* 'একদন্তচরিত' (২। ২৫। ৩০-৩১), মুম্বাই: মুদ্গল পুরাণ প্রকাশন মণ্ডল, অক্টোবর ১৯৭৬, পৃ. ৫২-৫৩

২১৯। ওই, 'ধূম্রবর্ণচরিত' (৪২। ৪০), পৃ. ১০০

২২০। *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী,* দ্বিতীয় ভাগ, 'ছান্দগ্যোপনিষদ্' (৬। ৮। ৭), গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, জুলাই ২০২২, পৃ. ৩৩০

২২১। Voja & Lakshmana Suri. *The Champu-Ramayana.* Edited by Parab, Panurang Kashinath. Bombay: Nirnaya-sagar press, 1898, p. 2

২২২। সত্যানন্দ সরস্বতী, 'ঈশ্বরীয় শক্তি গণেশ', *ক্রমবিকাশের পথে,* http://www.shaktibad.net, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৬

দ্বিতীয় পর্যায় : বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গণপতি প্রসঙ্গ

তৃতীয় অধ্যায়

গণপতি উপাসনা এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশ

পূর্বাধ্যায়গুলিতে দেখানো হয়েছে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকেই সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে, বিশেষত পুরাণাদি শাস্ত্রে গণপতির পরিচয় পূর্ণতর ও স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল। কার্যত এই সময় থেকেই ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্য বা মূর্তিশিল্পে ব্যাপকভাবে গণপতির রূপায়ণ ঘটতে শুরু করে। বস্তুত, উত্তরভারত এবং দক্ষিণভারত জুড়ে গুপ্ত আমল থেকেই অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে সিদ্ধিদাতা এবং বিঘ্নবিনাশকরূপে আদিপূজ্য গণেশও সমাদৃত হতে থাকেন। যদিও এই পর্বের সংস্কৃত সাহিত্যে, দু'একটি বিচ্ছিন্ন নিদর্শন ছাড়া গণপতির প্রসঙ্গ প্রায় অনুপস্থিত। এমনকী অষ্টম-নবম শতকের আগে গাণপত্য সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্ব সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোনও তথ্যও পাওয়া যায় না। এর থেকে মনে হয়, ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে গজানন গণেশ স্বতন্ত্র দেবতা হিসেবে পুরাণমণ্ডলে আত্মপ্রকাশের পর তাঁকে কেন্দ্রে রেখে একটি একভক্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠতে কয়েক শতক সময় লেগেছিল। আনন্দগিরির *শঙ্করদিগ্বিজয়* গ্রন্থে বা ওই গ্রন্থের মাধব বিদ্যারণ্যকৃত 'ডিণ্ডিমাখ্য ভাষ্য' থেকে প্রথম গাণপত্য ধর্ম-সমাজের ছয়টি পৃথক উপশাখার কথা জানা যায়। অষ্টম-নবম শতকে বৈদান্তিক আদি শঙ্কর গাণপত্যের এই উপশাখাগুলিকে নির্জিত করে ধর্ম-দার্শনিকভাবে তাঁদের পঞ্চোপাসনার অনুকূলে নিয়ে আসেন। ফলে নবম শতক থেকেই স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাসনার ধারায় প্রথমপূজ্য হিসেবে গণপতির প্রবেশ সিদ্ধ হয়। যদিও ভারতের অন্যত্র চিত্রটা এইরকম হলেও বঙ্গদেশে স্মার্তব্রাহ্মণ্য ধর্মব্যবস্থায় পঞ্চদেবতার আদিদেবরূপে গণপতির প্রবেশাধিকার বেশ বিলম্বিত। তবে একথা ঠিক, পঞ্চোপাস্যের বর্গে তাঁর অন্তর্ভুক্তি কয়েক শতক পরে ঘটলেও (আনুমানিক পঞ্চদশ শতক) সপ্তম-অষ্টম শতক থেকেই গণপতি ক্রমশ বঙ্গদেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে গৃহীত হয়েছেন। পুরাণপ্রমাণ ছাড়াও প্রাচীন বঙ্গদেশের অভিলেখ, মূর্তিলেখ বা বিচ্ছিন্ন মূর্তিপ্রমাণের সূত্রেও এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হয়। বিশেষভাবে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে, স্থূলত পাল ও সেন রাজাদের সময়সীমায় বৃহৎবঙ্গের নানা প্রান্তে বিঘ্নবিনাশক এবং সিদ্ধিদাতারূপে অসংখ্য স্থানক (দণ্ডায়মান), আসন (উপবিষ্ট) এবং নৃত্যরত গণেশমূর্তির প্রত্নুনিদর্শন পাওয়া গেছে। পাশাপাশি মিলেছে সমকালের সংস্কৃত কোষকাব্যের সাহিত্যিক প্রমাণ-ও। এইসব সাক্ষ্যের নিরিখে প্রাচীন বঙ্গে গজানন গণেশের পূজন-ঐতিহ্যের আদিধারা তথা প্রথম পর্যায়টিকে চিহ্নিত করা যায়।

৩.১.

বঙ্গীয় লেখমালায় গণেশ

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে (আনুমানিক ৬০০-৬৫০ খ্রিস্টাব্দ) অখণ্ড বঙ্গের শ্রীহট্ট থেকে প্রাপ্ত কামরূপরাজ

ভাস্করবর্মার ‘নিধনপুর তাম্রশাসন’ বা ‘নিধনপুর লিপি’-তে গজানন গণেশের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। উদ্দিষ্ট তাম্রশাসনের প্রথম ফলকের ১১ নং শ্লোকে রানী গন্ধর্ববতীর ‘গণপতি’-নামা পুত্রের সূত্রে তুলনীয়ভাবে দেবতা গণপতির প্রসঙ্গ এসেছে। গন্ধর্ববতী-পুত্র গণপতি এখানে গুণাধিক্যে দেবতা গণপতিতুল্য। ধর্মশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ P. V. Kane তাঁর *Histoty of Dharmasastra* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগে প্রাচীন বাংলায় গণপতির প্রথম উল্লেখ হিসেবে এই তাম্রশাসনটির উল্লেখ করেছেন।[১] পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত *কামরূপশাসনাবলী* গ্রন্থে এই নিধনপুর তাম্রলিপির অনুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন। তাঁর অনুসরণেই প্রাসঙ্গিক অংশটির মূলসহ অনুবাদ এখানে উল্লেখ করা হল - “গন্ধর্ববতী তস্মাদ্ গণপতিমিব দানবর্ষণমজস্রং।/ গণপতিমগণিতগুণগণমসূত কলিহানয়ে তনয়ং।।”[২] অর্থাৎ “তাঁহা হইতে (অর্থাৎ কল্যাণ বর্ম্মার ঔরসে) গন্ধর্ব্ববতী গণপতির ন্যায় অজস্র দান বর্ষণকারী অসংখ্য গুণসমূহমণ্ডিত গণপতি (নামে) পুত্র কলি বিঘাতনিমিত্তে প্রসব করিয়াছিলেন।”[৩]

শাসনোল্লেখিত শ্লোকটিতে গন্ধর্ববতী-পুত্রের পরিচয় প্রদানের সূত্রে পরোক্ষে গণপতিদেবের চরিত্রমহিমার প্রসঙ্গ এসেছে। লক্ষণীয়, শ্লোকান্তর্গত ‘দান’ ও ‘কলি’ শব্দ দুটি দ্ব্যর্থক। গজাননের সাপেক্ষে দান বর্ষণের প্রসঙ্গটি মদস্রাব বা মদবারির দ্যোতক, কারণ গণেশের ‘খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং’ শীর্ষক পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্রে তাঁর গণ্ডস্থল বা কপোল থেকে মদজল নির্গত হওয়ার অনুষঙ্গ পাওয়া যায়। অন্যদিকে রাজা গণপতির ক্ষেত্রে দানবর্ষণ অর্থে ধনাদি প্রদান বোঝায়। তা ছাড়া ‘কলি’ শব্দ-ও দেবতা গণেশের ক্ষেত্রে যুগ এবং রাজা গণপতির ক্ষেত্রে কলহ নির্দেশক। অভিলেখের প্রসঙ্গটি সরাসরি ‘দেবতা’ গণপতি বিষয়ক নয় বটে, তবে তৎকালে পৌরাণিক দেবমণ্ডলে গণপতি যে গুরুত্বপূর্ণ এক দেবতা হিসেবে চরিত্রমাহাত্ম্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন, গণেশের নামে রাজমহিষী-পুত্রের নামকরণ থেকেই তা স্পষ্ট হয়।

২। পালবংশীয় রাজা দেবপালের পুত্র প্রথম শূরপালের (আনুমানিক ৮৬৩ খ্রি.) তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে নির্মিত ‘মির্জাপুর তাম্রশাসন’-এর ১৮ নং শ্লোকে ‘বিনায়ক’ শব্দের উল্লেখ দেখে অনেকেই এ’টিকে প্রাচীন বাংলায় অভিলেখ প্রমাণে গণপতির চিহ্নবাহী ভাবেন। এমন ধারণা বিভ্রান্তিজনক। মূল শ্লোকটি হল - “মায়ামূলগৃহং পুরাণপুরুষং ক্রোড়াননং বামনম্/ নিত্যোদীর্ণ্ণ গদং বিনায়কযুতং দিব্যাঙ্গনালোকিতম্।/ পশ্যন্ত্যা বহু সের্ষমেব হি হরিং ত্যক্তা বিরাগাদিব/ শ্রীমদ্‌যৌবনরূপসদ্‌গুণতৃষা দেব্যা শ্রিয়াশ্লেষিতঃ।।”[৪] অধ্যাপক অশোক চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী *পাল অভিলেখ সংগ্রহ*-এ লেখটির পাঠ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ‘বিনায়ক’ অর্থে গণপতি বুঝিয়েছেন। অথচ শ্লোকে সংশ্লিষ্ট রাজার উৎকর্ষ

বোঝাতে বা তাঁকে বিষ্ণুর থেকেও মহিমাবান করে তুলতে বিষ্ণু সম্পর্কিত যে উল্লেখগুলি করা হয়েছে, সেখানে গণপতি অর্থে 'বিনায়ক' শব্দের ব্যাখ্যা কিছুটা অসংলগ্ন মনে হয়। মনে রাখতে হবে, গোষ্ঠীপ্রধান, বুদ্ধ এবং আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার মতোই বিনায়ক শব্দের একটি অর্থ 'গরুড়'-ও বটে। এর আভিধানিক সমর্থন আছে। ফলে শ্লোকধৃত বিষ্ণুবাচক উল্লেখগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 'বিনায়ক' শব্দের অর্থ এক্ষেত্রে গরুড় হওয়াই যুক্তিযুক্ত।[৫]

৩। তাম্রশাসনের পাশাপাশি বঙ্গদেশে গণেশের মূর্তি এবং তৎসহ লেখপ্রমাণ পালরাজত্বেই প্রথম পাওয়া গেছে। এই প্রসঙ্গে প্রথম মহীপালদেবের চতুর্থবর্ষের নারায়ণপুর মূর্তিলেখটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপালের চতুর্থ রাজ্যবর্ষ অর্থাৎ খ্রি. ১০৭৮ সনে নির্মিত একটি গণেশমূর্তি কুমিল্লার নারায়ণপুরে আবিষ্কৃত হয়েছিল। মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ অভিলেখ সূত্রে বিশেষজ্ঞ দীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেন, "... মহারাজাধিরাজ মহীপাল দেবের রাজত্বের চতুর্থ সংবৎসরে সমতটের অন্তর্গত বিলিকন্ধকবাসী বণিক জম্ভলমিত্রের পুত্র বণিক বুদ্ধমিত্র বিনায়ক ভট্টারকের এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন।... বিলিকন্ধক নামক স্থানটি অবশ্যই সমতট দেশের অন্তর্গত ছিল।... এই গ্রামটি কতিপয় বর্ধিষ্ণু বণিক পরিবারের আবাসস্থল ছিল।... নাম দুটিতে বৌদ্ধপ্রভাব থাকলেও বর্তমান বিনায়ক মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা সম্ভবত হিন্দু ছিলেন; কারণ বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে বিনায়কের যে বর্ণনা দেখা যায়, তা অনেকাংশে ভিন্নরূপ।"[৬] ব্যাখ্যাসূত্রে বোঝা যায়, সমতটের এক ব্যবসায়ী পরিবারের সদস্য বুদ্ধ মিত্রের নির্বন্ধে স্থপতি পুণ্যেশ (বা 'পৃণ্যেশ') 'বিনায়ক ভট্টারক'-এর যে কৃষ্ণপ্রস্তর মূর্তি স্থাপন করেছেন, তা আদৌ বৌদ্ধ বিনায়কের অনুরূপ নয়, বরং হিন্দু বিনায়কের লক্ষণযুক্ত। একে বৌদ্ধ প্রভাবিতদের ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু রীতিতে মিশ্রিত হওয়ার ঐতিহাসিক ধারাটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। হিন্দু দেবতার প্রতিমালক্ষণ বর্ণনা-সংক্রান্ত শাস্ত্র, যেমন *বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ*-এর বর্ণনার সঙ্গে এই বিনায়ক মূর্তির সাদৃশ্য দেখা যায়।[৭] অঙ্গসৌষ্ঠবে মূর্তিটি পৌরাণিক চতুর্ভুজ একদন্ত গণেশের অনুরূপ। আনুমানিক দুই হাত উচ্চতাবিশিষ্ট এবং পদ্মের ওপর উপবেশনরত। এ'টি seating pose and posture-এর দিক থেকে ললিতাসন বা অর্ধপর্যঙ্কাসনের পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ আরামদায়ক উচ্চাসনে বসা অবস্থায় তিনি বাম পা-টি মুড়ে এবং ডান পা-টি ঝুলিয়ে রেখেছেন। ডান পায়ের একাংশ দ্বারা পদ্মবেদীর নিচে উপস্থিত বাহন মূষিককে স্পর্শ করে আছেন। গণেশ বলয়, হার ও মুকুট পরিহিত। তাঁর দুটি পায়ে নূপুর শোভিত। গলদেশে যজ্ঞোপবীত ও কটিতে সর্পবন্ধ। পদতলে বেদীগাত্রে পদ্মের মোটিফ দেখা যায়। মূর্তির উপরিভাগে প্রভাবলীতে দু'পাশে দু'জন সখী এবং ঠিক মাঝখানে তিনটি প্রস্ফুটিত পদ্ম রয়েছে। গণেশের হস্তধৃত আয়ুধগুলি হল, নিচের হাতে অক্ষমালা ও মোদকভাণ্ড এবং উপরের হাত দুটিতে মূলক

(মূলা জাতীয় সবজি) ও পরশু। গণেশের শুণ্ডটি বামদিকমুখী এবং তিনি শুণ্ডাগ্র দ্বারা মোদকপাত্র থেকে মোদক আস্বাদন করছেন। (চিত্র ১)

৪। প্রাচীনতার দিক থেকে সাগরদ্বীপের গণেশ উপাসনাও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বীরভূম জেলার সিয়ান গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত পালরাজ নয়পালের 'সিয়ান লেখমালা'-র একটি শ্লোকে বলা হয়েছে: "সাগর-সঙ্গমে রৌপ্যঃ সদাশিবো হৈমৌ চণ্ডিকা-বিঘ্ননায়কৌ/ কারিতৌ কারিতং যেন তয়োর্হৈর্মঞ্চ পীঠকং।"[৮] অর্থাৎ গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে রুপোর সদাশিব মূর্তি এবং সোনার চণ্ডী ও বিঘ্ননায়ক বা গণেশমূর্তি নির্মাণের সংবাদ পাওয়া যায়। পাশাপাশি শেষোক্ত দুই দেবদেবী অর্থাৎ চণ্ডী এবং গণেশের জন্য সোনার বেদী নির্মাণের কথাও শ্লোকে বলা হয়েছে।

৫। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন বা কমৌলি লিপি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বারাণসীর কমৌলি গ্রামে আবিষ্কৃত হলেও লিপিতত্ত্ববিদদের মতে গৌড়বঙ্গের সঙ্গেই এই অভিলেখটির সম্পর্ক অধিক।[৯] পরমমাহেশ্বর ও পরমবৈষ্ণব বৈদ্যদেবের কামরূপে রাজত্বের চতুর্থ বছরে (আনুমানিক ১১১৫ খ্রি.) বরেন্দ্র-নিবাসী সোমনাথ নামক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান উপলক্ষে উদ্দিষ্ট অভিলেখটি রচিত হয়। সংস্কৃত ভাষানিবদ্ধ পদ্যে ও গদ্যে তিনটি তাম্রফলকে এই শাসনলিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল। ফলক তিনটি চমসের মতো একটি পদার্থে সংবদ্ধ, তার ওপর গজানন গণেশের মূর্তি অঙ্কিত রয়েছে।[১০] মনে হয়, তাম্রশাসনে রাজমুদ্রা সংযুক্ত করার যে শাস্ত্র-শাসন তৎকালে প্রচলিত ছিল, তার অনুসরণেই গণেশের মূর্তিকে কমৌলি লিপিতে রাজমুদ্রারূপে গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত সময়পর্বে (দ্বাদশ শতক) যে বঙ্গদেশীয় রাজাদের তাম্রশাসনে গণপতি গণেশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন, বিষ্ণু এবং শিবের পরমভক্ত বৈদ্যদেবের লিপিতে গণপতির মূর্তি অঙ্কন থেকেই তা প্রমাণিত হয়। (চিত্র ২)

৬। সেনরাজ বিজয়সেনের দ্বাত্রিংশ রাজ্যাঙ্কে (আনুমানিক ১১৫৯ খ্রিস্টাব্দ) নির্মিত 'বারাকপুর তাম্রশাসন'-এর প্রথম শ্লোকে দুই শিশু কার্তিক ('ক্রৌঞ্চারি') এবং গণেশের ('দ্বিরদ') কৌতুকক্রীড়ার দৃশ্য ফুটে উঠেছে। দ্বাদশ শতকের বঙ্গদেশে বাল গণেশের অবতারণার ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট অভিলেখটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কারণ, বঙ্গীয় লেখপ্রমাণে শিবপুত্ররূপে সন্তান গণপতির আবির্ভাব এখানেই প্রথম ঘটেছে। যথা: "ক্রোঞ্চারিদ্বিরদাস্যয়োঃ শিশুতয়া তাতস্য মৌলৌ মিথো গঙ্গাবারিণি খেলতোঃ শশিকলামালোক্য মধ্বেজটম্।/ শে (শৈ)বালাবলিমধ্যবদ্ধশফরীবুদ্ধ্যা সমাকর্ষতো রাক্রন্দস্ফুট-কন্দলেন বিহসন্নব্যাজ্জগদ্ধূর্জ্জটিঃ।।"[১১] অর্থাৎ শিবপুত্র শিশু কার্তিক এবং গণেশ, দু'জনেই পিতা ধূর্জটির জটাজালে আবদ্ধ গঙ্গাজলে ক্রীড়ারত অবস্থায় শিবজটা-মধ্যস্থিত চন্দ্রকলাকে পুঁটিমাছ ভেবে, করবদ্ধ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ক্রন্দন শুরু করেছিলেন।

৩.২

পুরাণকথায় গণেশ প্রসঙ্গ

বঙ্গদেশে রচিত ও সংকলিত পুরাণগুলির মধ্যে *দেবীপুরাণ* (আনু. সপ্তম শতকের পূর্বে সংকলিত, ৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পরে নয়), *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ* (আনু. দশম থেকে ষোড়শ শতক), *মহাভাগবতপুরাণ* (আনু. দশম বা একাদশ শতক, দ্বাদশ শতকের পরে নয়) এবং *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এ (আনু. দ্বাদশ শতক বা ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) গণপতি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।[১২] গণেশের জন্মকাহিনি বা অন্যান্য মাহাত্ম্যবাচক উপাখ্যানের দিক থেকে এইসব পুরাণের বিশিষ্টতা যেমন আছে, তেমনই প্রাচীন বঙ্গদেশে সাহিত্যপ্রমাণের ভিত্তিতে গণেশের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার সূত্রগুলিকে বুঝে নিতে এই গ্রন্থগুলির সাহায্য ছাড়া উপায় নেই। *কালিকাপুরাণ* ও *দেবীভাগবতপুরাণ*-এ গণেশকেন্দ্রিক উপাখ্যান প্রায় না থাকায় এই পর্যায়ে ওই দুটি পুরাণকে আলোচনার বাইরেই রাখা হয়েছে। বঙ্গদেশীয় পুরাণাদিতে গণেশের জন্মঘটনা কেবল শিব বা শক্তিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়নি, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ-ও গণেশের জন্মকথায় একটা গুরুত্বপূর্ণ factor। ফলে বঙ্গদেশে গণেশের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের পৌরাণিক পারম্পর্যকে বুঝতে চাইলে এই প্রধান তিন দেবতার (শিব, শক্তি ও বিষ্ণু) সঙ্গে গণেশের সংযোগের তাৎপর্যগুলিকেও বোঝা জরুরি। বিশেষত উল্লেখ্য, গণেশের জন্মকাহিনির আলোচনায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যানের অবতারণা যতখানি সুলভ, এই পূর্বভারতীয় পুরাণগুলির বেলায় ততখানি মনোযোগ বা বিশ্লেষণ বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় না। পূর্বজ গবেষকদের প্রত্যেকেই প্রায় এই পুরাণগুলির বিশ্লেষণনির্ভর আলোচনায় একটু যেন শৈথিল্য দেখিয়েছেন। *ব্রহ্মবৈবর্ত্ত* বা *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এর গণেশজন্মের ব্যাখ্যা যদিও পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানেও আখ্যানের অন্তর্গত সম্ভাবনাগুলি প্রায়শই অস্পষ্ট থেকে গেছে। তা ছাড়া *দেবীপুরাণ* ও *মহাভাগতপুরাণ*-এর গণেশজন্মকথা অনেকাংশেই ব্রাত্য রয়ে গেছে। অথচ বঙ্গদেশে গণেশ কাল্ট-এর চরিত্র বুঝতে গেলে এই পুরাণ-প্রমাণগুলি অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশে পৌরাণিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গণপতির যে প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, তার গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলি এইসব পুরাণের অন্দরেই লুকিয়ে আছে।

বঙ্গীয় পুরাণাদি শাস্ত্রে গণপতির জন্ম এবং কর্মবৃত্তান্তের রূপরেখা অনুসরণ করলে দেখা যাবে, গণপতি জন্মসূত্রে কেবল মাতৃকাপ্রকৃতিরই সংস্রবধন্য নন, একইসঙ্গে গণেশের জন্মকথায় পুরুষদেবতাদেরও ভূমিকা লক্ষণীয়। বঙ্গদেশীয় পুরাণে পার্বতী বা গৌরীর সন্তান হিসেবে গণপতি যতটা জায়গা জুড়ে রয়েছেন অর্থাৎ বালগণপতির প্রতিষ্ঠাবিশ্ব এক্ষেত্রে যতখানি জোরদার, ততটাই তিনি প্রধান দুই দেবতা বিষ্ণু ও শিবের সঙ্গেও ওতপ্রোত।

এক্ষেত্রে স্মার্ত হিন্দুর পৌরাণিক ভাবচৈতন্যে গণেশ যতটা মা-ঘেঁষা অর্থাৎ মাতৃসঙ্গধন্য, ততটাই তাঁর শিব এবং বিষ্ণুর সঙ্গেও সংযোগ। কাজেই, মায়ের একক প্রভাববলয়ের সমান্তরালে আরেকটি পথরেখা ধরেও প্রাচীন বঙ্গদেশে তাঁর অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছিল। পুরাণের আখ্যানের সূত্রে গণেশের এই বিকল্প প্রতিষ্ঠাপথের তাৎপর্য খেয়াল করা যায়। পুরাণকথায় গণপতির এ এক ভিন্নধর্মী নির্মাণ। যে গণপতি বঙ্গদেশে স্মার্ত হিন্দুর প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মধারায় 'বালরূপে'-ই সম্মানিত অর্থাৎ হর-গৌরীর সন্তান হিসেবেই সাধারণ্যে যাঁর প্রতিষ্ঠা, যিনি মোদকলোভী, মঙ্গলমূর্তি, বিশেষভাবে 'মায়ের ব্যাটা'; তাঁর জন্মমূলে এবং প্রকাশরূপে যে অন্য কোনও পুরুষদেবতার চরিত্রবৈশিষ্ট্য মিশে থাকতে পারে, এমনকী এই বক্তব্যের সমর্থনসূচক পুরাণ-প্রমাণ যে এই বঙ্গদেশেই লভ্য, তা *দেবীপুরাণ*, *মহাভাগবতপুরাণ* বা *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর গণেশ জন্মের এপিসোড থেকেই বুঝে নেওয়া যায়। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধের মধ্যে বঙ্গীয় পুরাণবৃত্তে গণপতির প্রতিষ্ঠা কার্যত male line এবং female line --- দুই পথরেখা ধরেই এগিয়েছে। লক্ষণীয়, গণেশের উদ্ভব সংক্রান্ত আখ্যানে mother cult-এর নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা ভারতব্যাপী যথেষ্ট popular discourse হলেও বাংলায় গণপতির আবির্ভাবক্ষেত্র একমাত্রিকভাবে মাতৃকাপ্রকৃতির-ই কার্যাধীন নয়, প্রধান দুই পুরুষদেবতারও করকবলিত বটে। পৌরাণিক আখ্যানে এর জোরালো সমর্থন আছে। প্রথমেই পুরাণবিশেষে গণেশের সঙ্গে অন্য তিন দেব-দেবীর জন্মসম্পর্কের ছকটি দেখে নেওয়া যাক।

দেবীপুরাণ : বিষ্ণু (পার্বতীর ইচ্ছায় পূর্বরাত্রিতে মালব্য পর্বতে বিষ্ণু-লক্ষ্মীর সংগম--- পরবর্তী সময়ে বিষ্ণুর ঘর্মাক্ত করতল মন্থন করে শিবের ইচ্ছায় বিনায়কের মূর্তিধারণ)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ : শিব + বিষ্ণু = গণেশ (পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরায় গণেশ অবশ্য শিব-পার্বতীর পুত্ররূপে গৃহীত)

মহাভাগবত পুরাণ : বিষ্ণু (পার্বতী নির্মিত পুত্তলিকায় দেবীর স্তনপানেচ্ছুক বিষ্ণুর আত্মগোপন এবং গণেশ রূপে আবির্ভাব)

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ : পার্বতী (শিবের আশীষে পার্বতীর রক্তবর্ণ বস্ত্র থেকে গণেশের আবির্ভাব, প্রথম পর্যায়ে গ্রহদোষে নবজাতকের মুণ্ডচ্ছেদ, পরে শিব এবং নন্দীর উদ্যোগে হস্তীমুণ্ড প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে গজাননের পুনর্জীবনলাভ)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্গদেশে গণেশ মিশ্রতত্ত্ব দেবতা। জন্মসম্পর্কে যেমন তিনি শক্তির প্রভাববদ্ধ, তেমনই শিব অথবা বিষ্ণুর সঙ্গেও তাঁর জনক-জাতক সম্পর্ক, কখনও আবার নিজেই তিনি শিব ও বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্নতত্ত্ব।

স্বভাবতই, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে পুরাণাদি শাস্ত্রে গণেশের জন্ম বা তাঁর প্রতিষ্ঠার ধরনের সঙ্গে এই বঙ্গদেশীয় পৌরাণিক ঐতিহ্য মিলবে না। বঙ্গদেশে গণেশ শিবের ঔরসজাত বা পার্বতীর গর্ভজাত নয়। এক-একটি পুরাণে তাঁর জন্মপ্রক্রিয়া এক-একভাবে নির্মিত। এদের উদ্দেশ্যও ভিন্নতর। প্রাচীন বঙ্গদেশে শৈব, বৈষ্ণব বা শাক্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েই গজানন গণেশের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যানে গণেশজন্ম বিশ্লেষণের সূত্রে এই পৃথক পৃথক সম্পর্কবিন্যাস বুঝে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টির মুখপাত করা যাক।

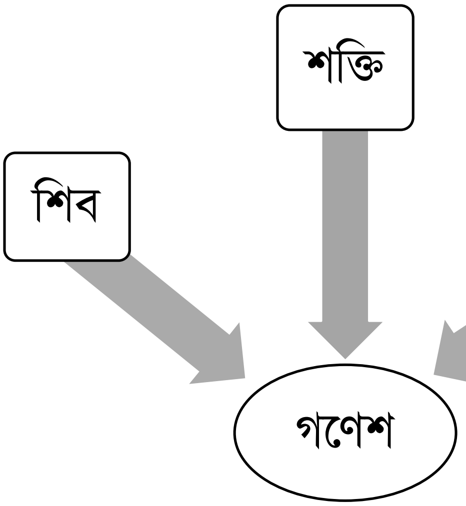

শিব-শক্তি-বিষ্ণু : বঙ্গদেশে প্রধান তিন দেবতার সঙ্গে গজানন-গণেশের আন্তঃসম্পর্ক

দেবীপুরাণ-এ গণেশ প্রসঙ্গ :

দেবীপুরাণ-এর ১১২ নং অধ্যায়ে গণেশোৎপত্তির বর্ণনা করা হলেও কেন বিঘ্নাসুরের নিধনের জন্য গণেশ মালব্য পর্বতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই কাহিনি বিশদে জানার জন্য পাঠককে আরও তিনটি অধ্যায় পিছিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ ১১৬ নং অধ্যায়ের প্রথমভাগে বশিষ্ঠ-মনুর কথোপকথনের মধ্যে সেই পূর্ববৃত্তান্ত উপস্থাপিত হয়েছে।[১৩] যুগারম্ভকালে সৃষ্টিকামনায় তপস্যারত ব্রহ্মা মহামোহগ্রস্ত হয়ে চেতনা হারিয়ে ফেলেন এবং সে সময় তিনি এমনই অহংতাড়িত হয়ে পড়েন যে বিষ্ণু এবং শিবকে অবজ্ঞা করে একমাত্র নিজেকেই জগতের কর্তা ও ভোক্তারূপে

চরম জ্ঞান করেন। এর ফলস্বরূপ তাঁর মুখের ডানদিক (দক্ষিণভাগ) থেকে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা উদ্‌গত হয় এবং তা থেকে বিঘ্নাসুর নামে প্রচণ্ড বিক্রম এক অসুরের জন্ম হয়। জন্মমাত্রেই সেই অসুর ক্রোধে নয়নযুগল ও ভ্রূমণ্ডল রক্তবর্ণ করে হাতে চক্র ও ত্রিশূল নিয়ে ব্রহ্মার প্রতি আক্রমণোদ্যত হয়। তার সঙ্গে ব্রহ্মার হাজার বছর ধরে যুদ্ধ চলে ঠিকই, কিন্তু বিঘ্নাসুরের পরাজয় সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় জগৎপালক বিষ্ণু কৈলাসে উপস্থিত হয়ে গান্ধর্ব শাস্ত্রানুসারে গানসহ স্তব-স্তুতির মাধ্যমে শিবকে সন্তুষ্ট করে বিঘ্নাসুর নিধনের উপায় জানতে চান। শিব বিষ্ণুকে জানান ওই অসুর তাঁরই ক্রোধজাত, অতএব অবিনাশী। অহংকারমত্ত ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ করার জন্যই এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। তবে বিঘ্নাসুর ও তার কুলের গতিবিধি পর্বতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং গোদুগ্ধ ও চন্দ্রকিরণ যুগে যুগে তাদের শান্ত রাখবে। ফলে তারা প্রজাপীড়ন প্রভৃতি অন্যায়কার্য থেকে বিরত থাকবে। এইভাবে আশ্বস্ত করে শিব লক্ষ্মীসহ বিষ্ণুকে মালব্য পর্বতে গমনের নির্দেশ দেন। কারণ, সেই দেবী সেখানে 'সৃষ্টির বিঘ্নভূত বিঘ্নাসুরের বিনাশার্থ বিঘ্নেশ' অর্থাৎ গণেশকে সৃষ্টি করবেন। শিবের বরলাভ করেও বিষ্ণু তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কতদিন পর্বতে বাস করবেন বা সেই দেবীরই বা কীভাবে সমাগম ঘটবে। প্রত্যুত্তরে শিব বলেন, বিষ্ণু সর্বমঙ্গলা শিবাদেবীকে মনে মনে স্মরণ করে লক্ষ্মীসহ মালব্য পর্বতে যাবেন। সেখানে একরাত্রি অতিবাহিত করলেই জগতের মূলকারণস্বরূপিণী দেবী বিষ্ণুর কাছে আসবেন এবং ভগবতীর ইচ্ছাতেই সেখানে বিষ্ণু-লক্ষ্মীর গাঢ় মিলন সম্ভব হবে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ সর্বদেবময়, সর্ববিঘ্নবিনাশক, নরদেহী, সর্বদেবতার নায়ক, স্বয়ম্ভূদেব গজমুখের আবির্ভাব ঘটবে। যদিও তিনি মাতৃকামণ্ডলের মধ্যবর্তী হয়েও বিষ্ণুর করতল মন্থন করে তাঁর 'পুত্র'-রূপেই প্রকট হবেন। ফলে এই ক্ষেত্রে গজানন তত্ত্বত শক্তি-সম্ভূত হলেও এককভাবে বিষ্ণুরই অঙ্গজ। তবে পুত্রসম্বন্ধে যুক্ত হলেও ঐশ্বর্যভাবযুক্ত গণেশ স্বয়ং বিষ্ণুরও পূজ্য এবং দয়াময়-স্বভাব হওয়ায় পিতা হয়েও বিষ্ণু তাঁকে নানারূপে স্তব করবেন এবং বিঘ্নবিনাশন আয়ুধ হিসেবে গদা প্রদান করবেন। সেই অস্ত্র দেখামাত্রেই বিঘ্নাসুরের শক্তি ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। গজানন মালব্য পর্বতে বিঘ্নাসুরের নিধনের পর একে একে জম্ভাসুর ও তার মায়াকল্পিত সুলোমাসুরকে বধ করবেন। এইভাবে বরপ্রাপ্তির পর শিববাক্যে সম্মত হয়ে বিষ্ণু গণেশের সৃষ্টির জন্য মালব্য পর্বতে গমন করেন। এর পরবর্তী অংশ যথাক্রমে *দেবীপুরাণ*-এর 'গণেশোৎপত্তি' (১১২), 'গণেশ-স্তব' (১১৩), 'গণেশের অভিষেক' (১১৪) ও 'বিঘ্নাসুর বধ' (১১৫) শীর্ষক চারটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।[১৪]

পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে মেরুপর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত মালব্য পর্বতের সুরম্য পরিবেশে বিষ্ণু এবং লক্ষ্মী পৃথিবীর

স্থিতি রক্ষার্থে শরীরধারণ করে সুরতক্রীড়ায় রত ছিলেন। বিষ্ণুর ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে অন্যান্য দেবতারাও সেখানে উপস্থিত হয়ে তপস্যায় ব্যাপৃত হন। এমনকী বিদ্যাদেবীও বেদস্বরূপে প্রকাশিত হয়ে বিষ্ণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তপশ্চারণে ব্রতী হন। এই সময় 'ভগবানের নিত্য ইচ্ছার প্রকাশে' বিষ্ণুর মধ্যে রাজসিক ভাব দেখা দিলে তাঁর পাণিতল মন্থন করে সর্বদেবময় প্রভু গজানন-বিনায়কের জন্ম হয়। *দেবীপুরাণ*-এর ১১২ নং অধ্যায়ে বিনায়কের আবির্ভাব-মুহূর্তে যেভাবে তাঁর কায়াকল্পনা করা হয়েছে, তা থেকে মনে হয় ত্রৈলোক্যের সমস্ত শক্তি একত্রবদ্ধ হয়ে বিঘ্নাসুর হন্তারকের জন্ম হয়েছে। *শ্রীশ্রীচণ্ডী*-র বর্ণনা অনুযায়ী মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা সৃষ্টির মুহূর্তে যেমন 'অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্' অর্থাৎ সমস্ত দেবতার সেই অতুলনীয় তেজ একীভূত হয়ে তাঁদের শরীর-সমন্বয়ে প্রকট হয়েছিলেন, এখানেও তেমনই শক্তিতত্ত্বের আদলে গণেশোৎপত্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত দেবদেবী এক গণেশের মধ্য দিয়েই যেন প্রকাশিত হয়েছেন অর্থাৎ বহুর শক্তিকে একের মধ্যে সংহত করেই পরমপুরুষ রূপে বিনায়কের প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এই দিব্যপ্রকাশ যেমন জ্যোতির্ময়, তেমনি ভাবলোক এবং বস্তুলোকের সাপেক্ষে পরিকল্পিত। গণেশের দেহাবয়বের মধ্যে দেব, দানব, মানব, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, মুনি, ঋষিসহ সমগ্র প্রকৃতি অর্থাৎ চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ তাঁর আবির্ভাবকে পূর্ণতা দিয়েছে। জন্মকালে গণেশের বিরাটত্বের এমন রাজকীয় প্রকাশ *দেবীপুরাণ* ছাড়া আর কোনও বঙ্গদেশীয় পুরাণকথায় মিলবে না। এখানে শিব বা পার্বতীর সন্তান পরিচয়ে বালরূপে নয়, পূর্ণপুরুষ এবং শক্তিধর হিসেবেই তাঁর অবতারণা। এই প্রকাশমূর্তির মধ্যে বিষ্ণু-অংশজ গণেশ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত অস্তিত্ব একযোগে ধারণ করেছেন। যেমন, সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি তাঁর চোখ, ব্রহ্মা মস্তক, বৃক্ষশ্রেণি কেশরাশি, একাদশ রুদ্র গ্রীবাদেশ, গ্রহ-নক্ষত্রেরা দন্তপঙ্‌ক্তি, ধর্ম ও অধর্ম ওষ্ঠদ্বয়, সরস্বতী জিহ্বা, দশদিক কর্ণযুগল, দেবরাজ ইন্দ্র নাসিকা এবং শিব স্বয়ং তাঁর ভ্রূমধ্যে অবস্থান করেছেন। তাঁর প্রতি লোপকূপে ঋষিদের অবস্থান, সপ্তসিন্ধু জঠরে পরিণত, যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, গন্ধর্ব, কিন্নর ও পিশাচেরা উদরের মধ্যে এবং নদীরা বাহুদুটিতে আশ্রয় নিয়েছে। সাপেরা আঙুল, তারাগণ নখরাজি এবং মেরুশিখরচারিণী আদিদেবী হৃণ্মর্ম অধিকার করেছেন। ধর্ম ও যম নাভিতে, পৃথিবী কটিদেশে, সৃষ্টিদেবী লিঙ্গে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় জানুদেশে, পর্বতেরা উরুতে, পাতালবাসীরা অলকে, মর্ত্যমানবেরা পা দু'খানিতে এবং রুদ্র প্রলয়াগ্নি পায়ের আঙুলগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন। এমনকী তিনি সর্বদেবসমন্বিততনু হওয়ায় তাঁর মধ্যে যুগ, মনু, কল্প, দিন, কাষ্ঠা, কলা, লব প্রভৃতি সময়ের বিভিন্ন একক বা বিভাজিত কালখণ্ড-ও দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। এই সর্বস্বরূপ, সমগ্র-প্রকাশ গজমুখকে বিষ্ণু প্রণাম জানিয়ে ভক্তিভরে নানা স্তবের মধ্য দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন।

১১৩ নং অধ্যায়ের এই 'গণেশ-স্তব'-এর অংশে গণেশের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও তাঁর রূপধারণের গুরুত্ব যেমন ব্যাখ্যাত হয়েছে, তেমনই গাত্রবর্ণ, অনিন্দ্যসুন্দর দেহসৌষ্ঠব, আয়ুধ এবং অলঙ্কার-আভূষণাদির উল্লেখে তাঁর আবয়বিক উৎকর্ষও ধরা পড়েছে। গণেশের দেহকান্তি মনোহর তাম্রাভ। তাঁর কান রেণুরজ ও পদ্মের বর্ণযুক্ত। কর্ণকুহর পলাশপাতার মতো বিশাল ও শঙ্খের মতো আবর্তযুক্ত। রক্তবর্ণ কর্ণান্ত-বিস্তৃত দুটি সুন্দর চোখ তাঁকে সমুজ্জ্বল করেছে। পর্বততুল্য তাঁর দেহ এবং সাপেরা শিরোভূষণে পরিণত। মুখমণ্ডল বরাহের মতো দৃঢ়দন্তের কিরণে শোভমান। শুভ্র ও সুন্দর দাঁতগুলি কুন্দফুল, বরফ এবং চন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর গলদেশে বিচিত্র সুন্দর হার সুশোভিত। তিনি যেন নক্ষত্রের মতো সুশোভন মুক্তামালা দিয়ে গাঁথা বনমালা পরিধান করেছেন। তাঁর গণ্ডস্থল বা কপোল থেকে গঙ্গাজলের মতো মদধারা নির্গত হচ্ছে, যার আকর্ষণে ভ্রমরেরা গীতমুখর। বিনায়কের মুখনিঃসৃত শব্দ মেঘগর্জনের মতো গম্ভীর, হুঙ্কাররব ঘণ্টাধ্বনির মতো। পরবর্তী অংশে দেখা যাবে, মেঘগর্জনের মতো ধ্বনিগাম্ভীর্যের এই পৌরাণিক কল্পনাটি একাদশ শতকের কোষকাব্য *সুভাষিতরত্নকোষ*-এ একটি শ্লোকের মধ্যেও ঠাঁই পেয়েছে। যোগিনীগণ তাঁর নিত্য সেবাকার্যে নিযুক্ত। স্বর্ণমণ্ডিত মরকত-মণিযুক্ত সুচারু চামরের সাহায্যে তাঁর ব্যজন করা হয়। তিনি দণ্ড, অঙ্কুশ, পরশু, মেখলা ও সূত্রধারণ করে ভীষণ নূপুর নিনাদে পর্বতের সানুদেশ মুখরিত করে শোভাপ্রাপ্ত হয়েছেন। লক্ষ করার বিষয় হল, নূপুরনিক্কণ এখানে মধুবর্ষী নয় মোটেই, রণসাজে সাজবেন যিনি, তাঁর পায়ের নূপুর-নিনাদ 'ভীষণ' তো হবেই। যুদ্ধমোদী গণেশের রূপনির্মিতির ক্ষেত্রে এই ধরনের উল্লেখ খুবই যুক্তিযুক্ত। বিষ্ণুস্তবে তিনি এক হাতে লাড্ডু এবং অন্য হাতে সিদ্ধার্থ ও সুগন্ধি চন্দনাদি ধারণ করেছেন। পরের অধ্যায়েই অবশ্য দেবপ্রদত্ত যুদ্ধাস্ত্রে তিনি সজ্জিত হবেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বসু, শঙ্কর, এমনকী রাক্ষসকুলও তাঁর স্তবগান করেছেন। বিনায়ক ছাড়াও আলোচ্য স্তবে গজানন ('গজবক্ত্র'), দেবশত্রুহন্তা ('সুরারিহন্তম্'), দৈত্যদর্পনাশক ('দনুদর্পহন্তম্'), বিঘ্নেশ্বর ('বিঘ্নেশ্বরায়') এবং তিনটি জায়গায় বরদায়ক ('বরদায়কম্'), বরদ ও বরপ্রদ-রূপে ('বরদায় বরপ্রদায়') তাঁকে সম্ভাষণ করা হয়েছে। এখানে গণেশের বলবত্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে যে, তিনি নিজদেহে সূর্যের পথ রুদ্ধ করেছেন এবং দেহভারে সুমেরুকে ভূমধ্যে সমধিক নিহত করেছেন। তাঁর তর্জনে দানবেরা পর্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। সুচারুবেশধারী গণেশকে বিষ্ণু 'দেবতাদের প্রথম ভ্রাতা' এবং 'মহাদেবের দ্বিতীয় মূর্তি' বলেছেন। তিনি যুদ্ধনিপুণ এবং শত্রুবল-বিনাশক। তাঁর দাঁতের আগায় রিপুহস্তীরা সংলগ্ন আছে। দেবতাদের শত্রুনাশের জন্যই তাঁর আবির্ভাব, জগৎবাসীর মঙ্গলার্থেই রূপধারণ। গণেশ ভক্তের অভীষ্ট প্রদান করেন বলেই বিষ্ণু তাঁর পূজা করেছেন। স্তবে প্রসন্ন হয়ে গণেশ যেন

তাঁর কল্যাণ বিধান করেন এবং দেবতা ও সিদ্ধগণের শত্রু বিঘ্নাসুরকে সত্বর বধ করে ইন্দ্রকে শঙ্কামুক্ত করেন। এইভাবে গণেশের রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে স্তবস্তুতির মাধ্যমে তাঁকে উদ্বোধিত করা হলে তিনিও পরম সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণুকে আশ্বস্ত করেন এবং বিঘ্নাসুর বধের জন্য স্বীকৃত হন।

১১৪ নং অধ্যায়ে নবাবির্ভূত বিনায়ক বিষ্ণুস্তবে প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বরদান করলে ব্রহ্মা, শিব, সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ সেখানে উপস্থিত হন এবং একে একে তাঁরা গণেশকে ভক্তিসহকারে পূজা ও উপহার প্রদান করে সন্তুষ্ট করেন। যেমন, মহাদেব বিনায়ককে নিত্য উদিত অর্ধচন্দ্র, ব্রহ্মা শ্বেতমেখলা, সূর্য বিদ্রুম (প্রবাল বা পদ্মরাগমণি), বিষ্ণু শঙ্খ ও ধনুক, ইন্দ্র বজ্র, যম দণ্ড, বরুণ গদা, অঙ্কুশ ও পাশ, রাক্ষসরাজ গমনপরিপাটী, ত্রিকূটাচল ও কটিসূত্র, নক্ষত্রেরা গেণ্ডুমালা, উমাদেবী বিজ্ঞান, শিব যোগ-পরিপাটী এবং যোগীগণ তেজ, বল ও সিদ্ধি প্রদান করেছেন। এ ছাড়া ঋষি, পর্বত ও নদেরা নিজেদের প্রিয় দ্রব্য গণেশকে উপহারস্বরূপ দিয়েছেন। সমুদ্রেরা যথাবিধানে নিজ গাম্ভীর্য প্রদান করেছেন। এইভাবে শিবাদি দেবতারা তাঁদের মন্ত্রপূত দিব্যাস্ত্র ও ব্রত সমুদয় বিনায়ককে অর্পণ করে তাঁকে রণসাজে সাজিয়ে যুদ্ধযাত্রায় উৎসাহিত করেছেন। দেবতাদের দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার পর স্বয়ং দেবাদিদেব শিব তাঁকে বিনায়ক নামে বিখ্যাত হয়ে সমস্ত কাজের প্রারম্ভে প্রথম পূজ্যের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

এরপর ১১৫ নং অধ্যায়ে বিনায়কের সঙ্গে বিঘ্নাসুরের সংগ্রামের বিবরণ পাওয়া যায়। বিনায়কের অভিষেকের পর দেবতারা 'মহাবলিষ্ঠ' গজমুখকে অগ্রসর করে বিঘ্নবিনাশের জন্য উদয়াচলে গমন করেছেন। সেখানে অবস্থানরত দোর্দণ্ডপ্রতাপ, গগনচুম্বী, যোজনবিস্তৃত দানবরাজ ও তার নবসপ্ততি সেনার সঙ্গে বিনায়কের প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধের সময় বিঘ্নপক্ষের দানবদের কাছে গজসৈন্যের পরাজয় হচ্ছে দেখে দেবতারা প্রমাদ গুনলেন এই ভেবে যে, বিনায়ক বুঝি বিঘ্নবধে ব্যর্থ হবেন! এই আশঙ্কায় ভীত হয়ে তখন ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু ও ইন্দ্র নিজেদের দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেন। এই দৃশ্য দেখে বিনায়ক দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন হয়ে ভয়ঙ্কর ক্রোধে রুদ্রাস্ত্র দ্বারা বিঘ্নাসুরের কণ্ঠচ্ছেদ করে তার পাপময় দেহ থেকে বিঘ্ন অপসারণ করেন। পাশাপাশি অন্যান্য বিঘ্নপক্ষীয় সেনাদেরও বীরবিক্রমে বিনাশ করেন। এইভাবে মহাশক্তিধর বিনায়ক ব্রহ্মার 'তপোশ্ছিদ্রসম্ভূত' ইন্দ্রশত্রু বিঘ্নাসুরকে নিধন করে দেবতাদের সুরক্ষিত করেন এবং ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করেন।

বঙ্গদেশের ধর্ম-সংস্কৃতিতে 'বাল গণপতি' বনাম 'বীর গণপতি'-র উপস্থাপনা সংক্রান্ত বিতর্কের প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত বিনায়কোৎপত্তির আখ্যানটিকে যথেষ্ট ব্যতিক্রমী মনে হয়। এখানে জন্মকাল থেকেই গণেশের ভূমিকা

অরি-ধ্বংসকারীর। মালব্য পর্বতে এক কামোদ্দীপক পরিস্থিতিতে বিষ্ণুর পাণিতল মন্থন করে তাঁর জন্ম হয় ঠিকই, কিন্তু তিনি যে দেবাদিদেব মহেশ্বরের ইচ্ছাপূরণের জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন, সে'কথা আবির্ভাবের পর নিজমুখেই স্বীকার করেছেন। ১১৩ নং অধ্যায়ে বিষ্ণুকৃত স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে গণেশ বরদান করে বলেছেন, 'হে বিষ্ণো! তোমার সন্তোষার্থ ও দেবরাজের শত্রু সংহারের জন্য মহাদেব আমাকে এই পর্বতে পাঠাইয়াছেন। ... আমি নিমেষমধ্যে ত্রৈলোক্যের শত্রুকে পরাজয় করিয়া তোমায় প্রদান করিতেছি।'[১৫] বিনায়কের এই উক্তি থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে তাঁর শরীর-ধারণের উদ্দেশ্য। তিনি ইন্দ্রের বিঘ্নহর্তা এবং স্বর্গের রক্ষক। এক *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এর পরশুরাম বনাম গণেশের যুদ্ধবিবরণ (পরবর্তী অংশের আলোচনা দ্রষ্টব্য) ছাড়া বঙ্গদেশের আর কোনও গণেশ জন্মকথায় গণেশের তেজোদৃপ্ত পৌরুষের এমন জোরালো উপস্থাপনা পাওয়া যাবে না। এই গণপতি পূর্ণস্বরূপ, সর্বদেবময় এবং যুদ্ধাস্ত্রধারী। এই বিশ্বের প্রকাশ তাঁর মূর্তি। মহেশ্বরেচ্ছায় বিষ্ণু-অংশে আবির্ভূত হলেও ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি একীভূত হয়েছে তাঁর মধ্যে। *দেবীপুরাণ*-এর এই শত্রুহন্তা পরান্তপ গণপতি মাতৃকামণ্ডলের অন্তর্গত হয়েও পুরুষাংশে জাত। সম্ভবত পিতা বা পিতৃপ্রতিম অন্য দেবতার (শিব অথবা বিষ্ণু) পৌরুষের উত্তরাধিকার বর্তেছে তাঁর ভাব-মূর্তিতে। লক্ষ করলে বোঝা যায়, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে *লিঙ্গপুরাণ* এবং *বরাহপুরাণ*-এর মতোই *দেবীপুরাণ*-এর এই আখ্যানেও গণেশের জন্ম পুরুষনির্ভর সন্তানজন্মের pattern বা male line অনুসরণ করেছে। যদিও *লিঙ্গপুরাণ*-এর গণেশ জন্মের মুহূর্তে সামাজিক প্রত্যাশা অনুযায়ী শিবকে যেমন উমাগর্ভের আধার ব্যবহার করতে হয়েছে, *দেবীপুরাণ*-এও তেমনই শিবের আজ্ঞায় মালব্য পর্বতে বিষ্ণু-লক্ষ্মী 'শিবাদেবী' অর্থাৎ ভগবতীর ইচ্ছায় গণেশ জন্মের প্রাক্কালে সংগম সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে সন্তান জন্মের পূর্বসূত্র রূপে নারী-পুরুষের যৌথ অংশগ্রহণের সামাজিক pattern অনুসৃত হয়েছে। যদিও আবির্ভাব মুহূর্তে গণেশ এককভাবে বিষ্ণুর করতল থেকে পুত্ররূপেই প্রকাশলাভ করেছেন। *দেবীপুরাণ*-এর এই গণেশ বিষ্ণু-অংশজাত বীর গণপতি। তাঁর যোদ্ধৃসত্তার পূর্ণ উদ্‌যাপন এই পুরাণের আখ্যানে ধরা আছে। কাজেই, পুরাণের যেসব আখ্যানে গণেশ শিব বা বিষ্ণুর অংশজাত অর্থাৎ কোনও না কোনও পুরুষ দেবতার অংশে সৃষ্ট, সেখানে তাঁর চারিত্র নির্মাণে masculinity–র একটি সমাজমান্য মডেল ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব পাঠকৃতির গহনে যে social psyche বা সামাজিক মন প্রচ্ছন্ন রয়েছে, সেখানে সম্ভবত গণেশের child archetype–এর চেয়ে male archetype–এর উদ্বোধনই অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-এ গণেশ প্রসঙ্গ :

পদ্মপুরাণ-এর 'সৃষ্টিখণ্ড'-এর 'গণপতি স্তোত্র কীর্ত্তন' এবং *গণেশ পুরাণ*-এর 'ক্রীড়াখণ্ড'-এর ১২৯ নং অধ্যায় বাদ দিলে শিবের ঔরসে পার্বতীর গর্ভধারণের দৃষ্টান্ত প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর গণেশ জন্মকথায় দেখা যায় যে, শিবের ঔরসে গর্ভধারণের সাধ ছিল পার্বতীর।[১৬] যদিও সেই সাধে বাধ সাধবারও ছিল হাজারও আয়োজন। কখনও পরিবারের ভেতর থেকে, কখনও বাইরে থেকে। সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ-নারীর যৌথ শারীরিক অংশগ্রহণের সমাজনির্দিষ্ট paradigm এই প্রেক্ষিতে বার বার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। একটি 'জনক-জননী' সম্বন্ধের popular narrative-এর ভেতরেও যে কত সূক্ষ্ম জটিল অন্তর্ঘাত নিঃশব্দে রয়ে যায়, *ব্রহ্মবৈবর্ত্ত*-এর 'গণেশ-উৎপত্তি' কথাতেই এর প্রমাণ মিলবে। পুরুষ-নারীর প্রত্যাশিত যৌন সংগমের বাইরেও এই ধরনের আখ্যান যৌনতার কতকগুলো সমান্তরাল পরতকে চিনিয়ে দেয়।

প্রথমেই *ব্রহ্মবৈবর্ত্ত*-এর গণেশ জন্মোৎপত্তির অংশটি সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক।[১৭] শিব-পার্বতীর হাজারবছরব্যাপী সুরতক্রীড়া অব্যাহত। এই রতিক্রিয়ার ফল কী হবে এই ভেবে দেবতারা উদ্বিগ্ন। তাঁরা ব্রহ্মাকে মুখপাত্র করে নারায়ণের শরাণাপন্ন হলেন। সতর্কবাণী শোনালেন নারায়ণ : সংগমের সময় শিবের বীর্য যদি পার্বতীর যোনিপথে প্রবেশ করে এবং তার ফলে পার্বতী যদি সন্তানসম্ভবা হন, তবে দেবতাদের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। শিবের ঔরসে পার্বতী যে পুত্র প্রসব করবেন, তিনি হবেন সুরাসুর-বিনষ্টকারী।[১৮] প্রমাদ গুনলেন দেবতারা। তাঁদের মিলিত হস্তক্ষেপে শিবের বীর্য পার্বতীর যোনিপথে প্রবেশের পূর্বেই মাটিতে পড়ে গেল। ক্ষুব্ধ পার্বতী দেবতাদের নির্বীর্য এবং অপুত্রক হওয়ার অভিশাপ দিলেন।[১৯] এ'দিকে শিবের ঔরসে গর্ভধারণের একান্ত বাসনা পার্বতীর। দেবতাদের চক্রান্তে তাঁর কাঙ্খিত ফললাভ ঘটল না। বেদনাহত চিত্তে পুনরায় সন্তান ধারণের জন্য শিবের কাছে অনুনয় করলেন। পার্বতীর মর্মবেদনা থেকে তাঁর অবস্থানের ধরনটি টের পাওয়া যায়। তিনি শিবকে বলেছেন, 'সম্ভোগ না শেষ হ'তে রতিভঙ্গ হ'লে।/ অতি দুঃখ ভোগ করে রমণী সকলে।।/ সঙ্গমভঙ্গেতে নারী অতি দুঃখ পায়।/ কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রসম হয় ক্ষীণকায়।।'[২০] অথবা, 'রতিভঙ্গ দুঃখে আমি অতীব কাতর।/ না পড়িলে বীর্য্য মম গর্ভের ভিতর।।/ তুমি মোর প্রাণেশ্বর তুমি মোর পতি।/ তোমা দ্বারা পুত্র লাভ না হ'ল সম্প্রতি।।/ পুত্রহীন রমণীর নিষ্ফল জীবন।/ উচ্চবংশজাত পুত্র সুখের কারণ।।'[২১] এই ধরনের উক্তি থেকে নিশ্চয়ই স্পষ্ট *ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ*-এর 'গণেশ খণ্ড'-এ অন্তত গণেশকে সন্তানরূপে লাভ করার আগে পর্যন্ত পার্বতীর চিন্তা এবং আচরণ অনেকাংশেই পিতৃপ্রধান ব্যবস্থা সমর্থিত এবং স্বীকৃত social code-গুলির অনুবর্তী। ফলত

heteronormative sexual pattern অনুসারে 'দাম্পত্য'-এর সাফল্যের জন্য পুরুষ-নারীর সংগমে সন্তান উৎপাদনের সামাজিক theory-তে তিনি মানসিকভাবে আস্থাশীল। যদিও শিবের অবস্থান এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি পার্বতীর নির্বন্ধে রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন ঠিকই, কিন্তু 'সংগম' সফল না হওয়ার মতো নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনাকে ঘিরে পার্বতীর এই মনোবেদনা তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হয়েছে। প্রসঙ্গত *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এর গণেশ-জন্মকথা মনে পড়তে পারে। স্বরূপত নির্গুণ, নির্বিকার এবং গৃহধর্ম পালনে নিস্পৃহ শিব তাঁরই বীর্যে পার্বতীর গর্ভধারণের একান্ত অনুনয়টিকে সেখানেও বারংবার খারিজ করে দিয়েছিলেন।[২২] অনুরূপে, *ব্রহ্মবৈবর্ত্ত*-এর এই গণেশ জন্মকথাতেও শিব পার্বতীকে বোঝান, যিনি ত্রিলোকজননী, সকলের মাতা, তাঁর এ'রূপ চাঞ্চল্য ('তুমি তো জগৎ-মাতা ত্রিলোক-ধারিণী/ সামান্য কারণে কান্না দোষ মনে গণি।।'[২৩]) মানায় না। যদিও পার্বতী তাঁর অবস্থানে অবিচল। শিব তাঁকে পরামর্শ দেন 'সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা' শ্রীহরির আরাধনা করে একবছরব্যাপী 'পুণ্যক' ব্রত সম্পন্ন করলে ('হরেরারাধনং কৃত্বা ব্রতং কুরু বরাননে।/ ব্রতঞ্চ পুণ্যকং নাম বর্ষমেকং করিষ্যসি।।'[২৪]) তাঁর মনোবাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। শিবের কাছে পার্বতী 'পুণ্যক' ব্রতের বিধান শুনলেন। এরপর ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মাকর্তৃক প্রেরিত শিব পরমেশ্বর বিষ্ণুকে পার্বতীর অভীপ্সিত ব্রতের যৌক্তিকতা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন।[২৫] শিব-বিষ্ণু কথোপকথন পর্বের একজায়গায় ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং মহাদেবকে এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, 'পুণ্যক ব্রতের প্রভাবে স্বয়ং গোলোকনাথ পার্ব্বতীর গর্ভে ('স্বয়ং গোলোকনাথশ্চ পুণ্যকস্য প্রভাবতঃ। পার্ব্বতীগর্ভজাতশ্চ তব পুত্রো ভবিষ্যতি।।') তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই কৃপানিধি স্বয়ং দেবগণের ঈশ অর্থাৎ ঈশ্বর; এই নিমিত্ত তিনি জগত্রয়ে গণেশ এই নামে বিখ্যাত হইবেন।'[২৬] বিষ্ণুকৃত এই আশীর্বচন গণেশের জন্মোৎপত্তির বৃত্তান্তে আদৌ কতদূর সফল হয়েছিল, পরবর্তী আলোচনাতেই তা স্পষ্ট হবে।[২৭] যা হোক, শ্রীহরির আজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে শঙ্করসহ পার্বতী ব্রতের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করলেন। পৌরোহিত্যের ভার সনৎকুমারের ওপর অর্পিত হল। মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী থেকে টানা এক বছর ধরে ('মাঘে শুক্লত্রয়োদশ্যাং ব্রতারম্ভঃ শুভঃ প্রিয়ে') চলল ব্রত মহোৎসব পালন। ব্রতানুষ্ঠান যথাবিহিত সম্পন্নও হল। শেষে সমাপ্তিদিবসে এল পুরোহিতকে দক্ষিণাদানের প্রসঙ্গ। দক্ষিণারূপে সনৎকুমার চেয়ে বসলেন স্বয়ং মহাদেবকেই ('সুব্রতে সুব্রতে মহ্যং দেহীতি পতিদক্ষিণাম্'[২৮])। কিন্তু পার্বতীও নাছোড়বান্দা। তাঁর পক্ষে কোনও অবস্থাতেই স্বামীকে দক্ষিণারূপে দান করা সম্ভব নয়। স্বয়ং শিবকেই দিয়ে দিলে কীভাবে তিনি সন্তানের জন্ম দেবেন?[২৯] এ'দিকে দেবতারাও সহজে ছাড়ার পাত্র নন। একে একে শিব, ব্রহ্মা, ধর্মরাজ, ইন্দ্র, বৃহস্পতি সকলেই পার্বতীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, স্বধর্মরক্ষার্থে ব্রাহ্মণকে

তাঁর অভীপ্সিত দক্ষিণা প্রদান করাটাই বিধেয়। নচেৎ ব্রতের ফললাভ ঘটবে না। এ পর্যায়ে একটা দীর্ঘ কথোপকথনের পর্ব চলে।[৩০] যুক্তি-প্রতিযুক্তির লড়াই। একা পার্বতী একদিকে, অন্যদিকে সম্মিলিত দেবকুল। পার্বতী বলেছেন স্বামী ছাড়া স্ত্রীর অস্তিত্বের অর্থহীনতার কথা, পুরুষ ব্যতিরেকে প্রকৃতির অসারতার কথা। যেভাবে একটি বিপরীতলিঙ্গক পুরুষশাসিত কাঠামোয় স্ত্রীর সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য স্বামীর সাপেক্ষে নির্ণীত হয়, পার্বতীর বয়ানগুলি পর পর লক্ষ করলে ঠিক তেমনটাই মনে হবে।[৩১] আশ্চর্য লাগে, স্বরূপত যিনি নিত্যশক্তি, আদিমাতা, অনন্যস্বতন্ত্র, তিনিই বর্তমান আখ্যানে স্বামীমুখাপেক্ষী এবং নিরাপত্তাহীনতায় কাতর! স্বামীই তাঁর অস্তিত্বের মূল চালকশক্তি, একমাত্র অবলম্বন। পার্বতী কিছুতেই যেন সাধারণোচিত দাম্পত্যের এই বাধ্যতামূলক periphery অতিক্রম করতে চাইছেন না। শেষমেশ আত্মবিস্মৃত দেবীকে তাঁর নিত্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন করতে আসরে নামলেন স্বয়ং নারায়ণ। প্রকৃতি যে পুরুষ-সাপেক্ষ নয়, বরং পুরুষ-নিরপেক্ষভাবেই শ্রেষ্ঠ, আদি এবং জগৎ-কারণ— বিষ্ণু পার্বতীকে যেন সেই সত্যটাই ধরিয়ে দিতে চাইলেন।[৩২] তত্ত্বত বিষ্ণুর মায়াশক্তিরূপই পার্বতী। তিনিই শিবকে তপস্যার ফলরূপে পার্বতীকে প্রদান করেছেন[৩৩] কাজেই, শিব ব্যতীত পার্বতী নিরস্তিত্ব, গুরুত্বহীন— এমন ভাবনা সংগত নয়। এটা পরিষ্কার যে, পার্বতীকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য, আদিকল্প সম্বন্ধে সচেতন করার অর্থই হল দেবী যাতে নির্দ্বিধায় শিবকে দক্ষিণারূপে দান করতে পারেন। আসলে বিষ্ণুর উদ্দেশ্য পার্বতীকে তাঁর individuality সম্বন্ধে সজাগ করে প্রকারান্তরে তাঁকে দেবতাদের পরিকল্পনার অনুকূলে নিয়ে আসা। যে পরিকল্পনামাফিক পরবর্তী অংশে শিব-শক্তির সংগম অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে, এমনকী শিবের বীর্যে পার্বতীর সন্তানের জন্ম দেওয়ার ইচ্ছেটাও মিটবে না, পাঠক নিশ্চয়ই বুঝেছেন এ অংশেই তার মুখবন্ধ রচিত হয়েছে। যদিও পার্বতী এতদ্‌সত্ত্বেও একবগ্গা। শেষে বিষ্ণু উপায় বাতলালেন এইভাবে যে, দেবী প্রথমে শিবকে দক্ষিণারূপে দান করবেন, তারপর বিষ্ণুদেহ ও গাভীদেহ অভিন্ন হওয়ায় এবং শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে অভেদ সম্পর্ক হওয়ায় পার্বতী ব্রাহ্মণকে বহু গাভী প্রদান করবেন। এরপর ব্রাহ্মণ গাভীর বিনিময়ে শিবকে প্রত্যর্পণ করবেন।[৩৪] বিষ্ণুর পরামর্শ অনুযায়ী পার্বতী তেমনটাই করলেন। কিন্তু, এবার বাধ সাধলেন সনৎকুমার। তিনি লক্ষ গাভীর বদলেও মহামূল্যধন শিবকে কিছুতেই আর পার্বতীকে ফেরত দিতে চাইলেন না।[৩৫] শেষে শোকসন্তপ্ত পার্বতী মরণেচ্ছা প্রকাশ করলে বিষ্ণু পুনরায় আবির্ভূত হয়ে তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তিনি স্বয়ং তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন।[৩৬] এরপর দেবগণের আজ্ঞায় সনৎকুমার শিবকে ফিরিয়ে দিলেন।[৩৭] পার্বতীও প্রসন্ন মনে ব্রতকার্য সম্পন্ন করে শিবের সঙ্গে শয্যাকক্ষে গেলেন। সংগমের উপযুক্ত পরিবেশ পরিপার্শ্বে সম্পূর্ণ। এই আসঙ্গভোগের উদ্দেশ্য পার্বতী দ্বিতীয়বারের জন্য শিবের ঔরসে সন্তানের

জন্ম দিতে চলেছেন। শ্রীহরির বরে তেমন আশ্বাসই পেয়েছেন তিনি। কিন্তু শিব-পার্বতীর এবারের রতিবিহারও বড়ো নিরুপদ্রব রইল না। কৃষ্ণ যতই পার্বতীকে সন্তানপ্রাপ্তির বর দিন না কেন, শিবের বীর্যে পার্বতীর গর্ভসঞ্চার হলে এক অতিকায় দেব-পীড়ণকারী জাতকের জন্ম-সম্ভাবনার প্রশ্নে বিষ্ণু প্রমাদ গুনলেন।[৩৮] অতএব কোনও অবস্থাতেই শিব-পার্বতীর সংগম-যাপনকে সন্তান জন্মের পূর্ণতায় পৌঁছতে দেওয়া যাবে না। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের বেশে কৈলাসের বহির্দ্বারে উপনীত হলেন কৃষ্ণ। প্রথমেই ডাকলেন মহেশ্বরকে। তারপর পার্বতীকে। বললেন, তিনি সপ্তরাত্রি উপবাসী আছেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর। শিব-পার্বতীর কাছে অন্ন-জলের প্রার্থনা জানালেন। ব্রাহ্মণের কাতর মিনতি শুনে শিব প্রথমেই শয্যা ত্যাগ করলেন। স্বভাবতই শিববীর্য ('যেমনি উঠিলা শিব সহসা তখন।/ শয্যা-মাঝে হ'ল তাঁর বীর্য্যের পতন।।'[৩৯]) পার্বতীর যোনিপথে প্রবিষ্ট না হয়ে পালঙ্কমধ্যে পড়ে রইল। আবারও সংগমে ব্যাঘাত ঘটল। পার্বতী তাড়াতাড়ি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে শিবের সঙ্গে দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। গৃহদ্বারে উপস্থিত অতিথি 'নারায়ণ'-তুল্য। অতএব, তাঁর পরিচর্যা করাই গৃহীর কর্তব্য।[৪০] শিব-পার্বতীও ব্রাহ্মণের সেবায় নিযুক্ত হলেন। সেবাশেষে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ শিব-পার্বতীর সামনে থেকে অন্তর্হিত হলেন ঠিকই, কিন্তু অদৃশ্যভাবে তাঁদের শয্যাকক্ষে প্রবেশ করে পালঙ্কমধ্যে পতিত শিববীর্যের সঙ্গে নিজেকে সংমিশ্রিত ('এই কথা বলি বিপ্র অন্তর্হিত হয়।/ বালকের রূপ বিপ্র ধরে সে সময়।।/ শিবের বীর্য্যের সাথে মিশিয়া তখন।/ সদ্যোজাত শিশুসম চাহে অনুক্ষণ।।'[৪১]) করে গণেশরূপে অবতীর্ণ হলেন। পার্বতী জানতেও পারলেন না কীভাবে বিষ্ণু তাঁর অজান্তে তাঁকে নিষ্ক্রিয় রেখে শিবের স্খলিত বীর্যের সঙ্গে নিজেকে মিশ্রিত করে 'গণেশ'রূপে আবির্ভূত হয়েছেন! পরবর্তী অংশে অবশ্য দৈববাণীর মাধ্যমে পার্বতী জানতে পেরেছেন স্বয়ং কৃষ্ণই তাঁদের ঘরে সন্তানরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।[৪২] এরপর শিব-পার্বতী সানন্দে গণেশরূপী কৃষ্ণকে তাঁদের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আলোচ্য পুরাণের গণেশজন্মের উপাখ্যানটিকে তিনটি অভিমুখে খেয়াল করা যেতে পারে। প্রথমত, পার্বতীর perspective থেকে মনস্তাত্ত্বিক অভিমুখে বিশ্লেষণ করা যাক। আখ্যানের গোড়া থেকেই পাঠক দেখছেন, পার্বতী একমাত্র শিবের বীর্যেই 'গর্ভবতী' হতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর আকাঙ্ক্ষা heteronormative sexual pattern-এর অনুবর্তী। শরীর-নির্ভর সন্তান-উৎপাদনের তত্ত্বই কার্যত একটা পর্যায় অবধি তাঁর মনোভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে পার্বতীর দেবীসুলভ মহত্ত্বকে অনেকটা পরিমাণে কমিয়েছে। কারণ, 'দেবী' যেখানে আপামর ভক্তের 'মাতা', সেখানে তিনি মাতৃত্বের 'সর্বজনীন' স্তরে উন্নীত। তাঁকে কী কেবল

বিপরীতলিঙ্গক সমাজের চাহিদা অনুযায়ী সন্তান জন্মের biological perception-এ আটকে থাকা মানায়? যদিও বর্তমান আখ্যানে পার্বতীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রথম থেকেই physical sphere of motherness-এর কোটিতে আবদ্ধ। এক্ষেত্রে universal mother হয়ে ওঠা তাঁর অনায়ত্ত থেকে গেছে। তত্ত্বত যিনি নিত্যা, আদ্যা মূলাপ্রকৃতি, তিনি এ আখ্যানে আত্মস্বরূপ সম্পর্কে অনবগত। নিজের নিত্যত্ব সম্বন্ধে এই বিস্মরণ-ই কার্যত তাঁকে পার্থিব সীমায় আটকে রেখেছে। অথচ শুরু থেকেই আকাঙ্ক্ষাপূরণের পথে বিস্তর বাধা। দেবলোকের কেউই চায় না শিবের বীর্যে পার্বতীর গর্ভসঞ্চার হোক। প্রথমবারের ব্যর্থতার পর শিবের পরামর্শেই পার্বতী 'পুণ্যক' ব্রত করেছেন। কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করে দ্বিতীয়বারের জন্য 'গর্ভবতী' হতে চেয়েছেন। কৃষ্ণ তাঁকে ইচ্ছানুরূপ বরও দিয়েছেন। আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে, তিনি কৃষ্ণের মতোই মহিমময় এক সন্তান 'লাভ' করবেন। পাঠক জানেন, বিশেষ একটি ঘটনা-পরম্পরায় পার্বতী সত্যিই সন্তান 'লাভ' করেছেন। 'গণেশ' কৃষ্ণের মতোই গুণদীপ্ত, জ্যোতির্ময়। কিন্তু এই পুত্র-প্রাপ্তিযোগে পার্বতীর biologically 'মা' হওয়ার খিদে মিটেছিল কিনা, বলা শক্ত। তিনি 'যেভাবে' শিবের বীর্যে গর্ভধারণ করতে চেয়েছিলেন, স্বামীর ঔরসে সন্তানের জন্ম দিতে না-পারার যে 'অভাববোধ' নিয়ে কৃষ্ণের কৃপাযাচনা করেছিলেন, তাঁর সেই গোপন অতৃপ্তি কি আদৌ ঘুচেছিল? টানা এক বছর ধরে যে 'মনস্কামনা' নিয়ে তিনি পুণ্যক ব্রত-অনুষ্ঠান করলেন, কৃষ্ণ সেই 'বাসনা'-র ঠিক কতটা পূরণ করতে পেরেছেন? 'গণেশ'-জন্মের এই গল্পে পার্বতীর আকাঙ্ক্ষা বরাবর অপূর্ণ-ই থেকে গেছে। এমনকি কৃষ্ণের আশীর্বাণী-ও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এর 'গণেশ' কোনও অবস্থাতেই পার্বতীর 'গর্ভজাত' নয়।[৪৩] দেবলোকের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে কৃষ্ণ ছদ্মবেশে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন শিব-পার্বতীর সংগমে। একেবারে পরিকল্পনামাফিক পার্বতীকে বাদ দেওয়া হয়েছে সন্তান-জন্মের কাঙ্ক্ষিত শরীরী-প্রক্রিয়া থেকে। পার্বতীর মনস্তত্ত্বের নিরিখে বিচার করলে এ কী প্রকারান্তরে পার্বতীর সঙ্গে একধরনের নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনাই নয়? হয়তো তাই। নিহিত অর্থে একজন স্ত্রীর স্বামীর ঔরসে সন্তানের জন্ম দিতে চাওয়ার ইচ্ছের বিপরীতে সম্মিলিত পুরুষতন্ত্রের স্বার্থপ্রণোদিত আঁতাতও বটে। তবে এর একটা অন্য তাৎপর্যও অনুমান করা সম্ভব। হয়তো এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে পার্বতী তাঁর স্বামীর বীর্যে 'গর্ভধারিণী' হতে না পারার আক্ষেপটুকু অনায়াসে অতিক্রম করে গেছেন। এই আখ্যান মাতৃত্বের এক সীমাবদ্ধ কুঠুরি, যা স্থূল অর্থে নিতান্ত শরীরময় ও জৈবিক, তা থেকে একধরনের প্রসারিত মানসিক অবস্থানে উত্তরণের সম্ভাব্যতাকেও চিনিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ত, *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এর প্রকল্পে বিষ্ণু বা কৃষ্ণই কেন্দ্রীয় দেবতা। এই পুরাণের যাবতীয় ঘটনাধারা কৃষ্ণের সাপেক্ষেই পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত। কাজেই, কৃষ্ণপক্ষ এক্ষেত্রে সবচেয়ে জোরালো। পরব্রহ্মের শ্রীকৃষ্ণরূপে বিবর্তন বা পরিণতিলাভ এই পুরাণকথায় বর্ণিতব্য। লক্ষ বিষয় হল, শিব এবং পার্বতীর সন্তানরূপে স্বীকৃত হয়েছেন যিনি, সেই 'গণেশ'-ও কার্যত 'বিষ্ণুর'-ই অংশাবতার। বিশেষ অর্থে একাধারে বিষ্ণু এবং শিবাত্মজ। এই পরিকল্পনার মধ্যে ধর্ম-সম্প্রদায়গত অভিমুখ থাকা সম্ভব। বৈষ্ণব কাল্ট এবং শৈব কাল্ট কতকটা অবিচ্ছিন্নভাবে, একত্রীকরণের মধ্য দিয়ে গণেশজন্মের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এই যোগবন্ধনের গল্পে বৈষ্ণব কাল্ট যদি dominating factor হয়, তবে শৈব কাল্ট-এর সঙ্গে তাঁর নিকটবর্তী সম্বন্ধ। বরং শক্তি কাল্ট-এর সঙ্গে সম্বন্ধ খানিক দূরতর। গণেশজন্মের প্রক্রিয়ায় শিব-পার্বতীর যৌথ অংশগ্রহণের ছক ভেঙে শিব-বিষ্ণুর ঐক্য স্থাপনের মধ্যে এই ধরনের সমীকরণ খাটতে পারে। গণেশের জন্মমুহূর্তে বৈষ্ণব কাল্ট এবং শৈব কাল্ট যেমন পরস্পরের দিকে আক্ষিপ্ত হয়েছে, শক্তি কাল্ট তেমনই অনেকটাই subordinate হয়ে গেছে। পার্বতীর ভূমিকাকে প্রায় নাকচ করে দিয়ে সূক্ষ্মভাবে বিষ্ণু-শিবের জনকত্বে গেঁথে তোলা গণেশজন্মের এই আখ্যান বাংলায় তো বটেই, ভারতীয় পুরাণকথার নিরিখেও এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। পরবর্তী ক্ষেত্রে অবশ্য সমাজ-অনুমোদিত ঐক্যদাম্পত্যের (monogamy) প্রতীকী ছাঁচে গড়ে তোলা শিব-পার্বতীর পরিবারে সন্তানরূপে গণেশের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। মনে হয়, পারিবারিক স্তরে গ্রহণযোগ্যতা তৈরির প্রশ্নটিকে মাথায় রেখেই মা-ছেলের (পার্বতী ও গণেশ) সম্পর্কের বিন্যাসটিকে যতদূর সম্ভব বানিয়ে তোলা হয়েছে।

তৃতীয়ত, ভারতীয় সংস্কৃত পুরাণের চৌহদ্দিতে বহুবিচিত্র গণেশ-জন্ম কথা। কোথাও নারী এককভাবে গণেশের জন্মদাত্রী। কোথাও বা গণেশ একা পুরুষের জাতক। ব্যতিক্রমী দু'একটি জায়গায় গণেশের জন্ম-বৃত্তান্তে নারী-পুরুষের মিলিত অংশগ্রহণেরও নজির মিলেছে। যদিও গণেশের জন্ম-প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য বোঝাতে এইটুকু আলেখ্যই যথেষ্ট নয়। এই ত্রিমাত্রিক birth type-এর বাইরেও বহুবর্ণিল গণেশজন্মের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে কত আশ্চর্য জটিল বাঁক। *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ*-এর 'গণেশ খণ্ড'-এর নবম অধ্যায়ে গণেশের জন্মমুহূর্তেও তেমনই এক দ্যোতনা অন্তঃশীল রয়েছে। বিশ্লেষণ করা যাক। আখ্যান অনুসরণে আমরা দেখেছি, কীভাবে সামূহিক স্বার্থে ব্রাহ্মণরূপী কৃষ্ণের ছলনার শিকার হয়েছেন সংগমরত শিব-পার্বতী। ভিক্ষাপ্রার্থী ব্রাহ্মণের কাতরোক্তি শুনে তাঁরা রমণভঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছেন। পরিস্থিতিক্রমে শিব-পার্বতী নিযুক্ত হয়েছেন অতিথি-সেবায়। আতিথ্য গ্রহণের পর্বে ব্রাহ্মণরূপী কৃষ্ণ ঠিক কীভাবে বুঝিয়েছেন পার্বতীকে? হরিভক্তির গুরুত্ব বোঝানোটা যেমন একটা দিক,

তেমনই পার্বতীর কাছে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের বিষ্ণুভক্তির প্রার্থনাও আর একটা দিক। ‘বিষ্ণুভক্তিপ্রদা’ পার্বতীকে ক্রমান্বয়ে ‘নিত্যরূপা’, ‘সনাতনী’, ‘জগৎ-জননী’ এইসব পরিচয়ে সম্বোধন কোথাও যেন তাঁকে ‘সর্বজনীন’ মাতৃত্বের ধারণার অভিমুখে চালিত করে।[৪৪] ‘হরিমাহাত্ম্য’ ঘোষণার মধ্যে দিয়ে এ কী প্রকারান্তরে পার্বতীর মানসিকতা নিয়ন্ত্রণের প্রচ্ছন্ন চেষ্টাও নয়? একে তো পার্বতীর অজ্ঞাতেই তাঁকে আসন্ন সন্তানজন্মের প্রক্রিয়া থেকে কায়দা করে বাদ দেওয়া হল, তার ওপর আবার কৃষ্ণ তাঁকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলছেন যাতে শিবের বীর্যে সন্তান ধারণ করার ‘আকাঙ্ক্ষা’ থেকে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সরণ ঘটতে পারে। গণেশরূপে কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁদের ঘরে আসতে চলেছেন— ব্রাহ্মণের বচনে এমন আশ্বাস পেয়েছেন পার্বতী।[৪৫] এরই সূত্রে মনে হয়, শিবের ঔরসে জৈবিক উপায়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার চেয়ে পুত্ররূপে কৃষ্ণকে ‘লাভ’ করা ঢের বেশি সৌভাগ্যের— এইরকম একটি বিশ্বাসের ভূমিতে পার্বতীকে দাঁড় করাবার কোনও অলিখিত উদ্দেশ্য নিয়েই এই বোঝাবুঝির পর্বটা চলতে থাকে। এরপরই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হয়েছেন। অন্যদিকে, কৈলাসের বহির্দ্বারে তখন শিব-পার্বতীকে অতিথির অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে ঘটনা-প্রবাহ প্রায় উল্লম্ফনের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করেছে অন্তঃপুরে। সেখানে পালঙ্কমধ্যে শিববীর্য তখনও অরক্ষিত পড়ে আছে। শুধু পাঠক জানছেন, শিব-পার্বতীর অলক্ষ্যে, তাঁদেরই ব্যক্তিগত কক্ষে, কীভাবে ওই স্খলিত ‘শিব’-বীর্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণবেশী ‘কৃষ্ণ’ নিজেকে সংমিশ্রিত করে (‘কৃত্বান্তর্দ্ধানমীশশ্চ বালরূপং বিধায় সঃ।/ জগাম পার্ব্বতীতল্পং মন্দিরাভ্যন্তরস্থিতম্।।/ তল্পস্থে শিববীর্য্যে চ মিশ্রিতঃ স বভূব হ।/ দদর্শ গেহশিখরং প্রসূতো বালকো যথা।।’[৪৬]) গণেশরূপে আবির্ভূত হলেন। কৃষ্ণ এখানে শিবের স্খলিত বীর্যকে ব্যবহার করে গণেশের জন্ম সংঘটনের মুহূর্তটি তৈরি করেছেন। বিপ্রবেশী কৃষ্ণের শিববীর্যের সঙ্গে এই মিশ্রণ-প্রক্রিয়ায় কৃষ্ণের ‘ভূমিকা’-টি সরাসরি, তিনিই জন্মের প্রত্যক্ষ কারণ। শিব পরোক্ষে থেকেছেন কিছুটা। যদিও তাঁর বীর্যে গণেশজন্মের পরিকল্পনা প্রথম থেকেই শৈব পরিবারের সঙ্গে গণেশের সংস্রবটিকে অবধারিত করেছে। পরবর্তীতে পার্বতী দৈববাণী মারফত জানতে পেরেছেন কৃষ্ণ পুত্ররূপে তাঁর ঘরে এসেছেন। তিনি ভয়ে ভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন, নবজাতককে দেখে অভিভূত হয়েছেন, বালকের কণ্ঠে মা ডাক শুনেছেন, এমনকি শিবকে ডেকে দেখিয়েছেন কৃষ্ণ সন্তানরূপে ‘তাঁদের’ ঘরে এসেছেন। ‘কল্পে কল্পে ধ্যান যার,/ করিয়াছ অনিবার,/ সেই হরি কৃষ্ণ ভগবান্/ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ তরে, আসিয়া মোদের ঘরে,/ হইলেন মোদের সন্তান’--- পার্বতীর বয়ানে ‘মোদের’ এই বিশেষ উচ্চারণটি গণেশকে একাধারে শিব-শক্তির পরিবারভুক্ত করেছে।[৪৭] পাঠক জানেন, *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর গণেশ পার্বতীর গর্ভজাত নয়। সন্তান হিসেবে পার্বতী তাঁকে ‘গ্রহণ’

করেছেন মাত্র। জন্ম-সম্বন্ধে গণেশ এক্ষেত্রে ‘শিব’ এবং ‘কৃষ্ণ’-এর আত্মজ। তাঁদের অংশগ্রহণের যৌথতায় গণেশের জন্মোৎপত্তি। এই বিশেষ জন্মপ্রক্রিয়াটি পুরাণ-বৃত্তের গণেশ জন্মকথায় একটি ব্যতিক্রমী discourse। নারীর অংশগ্রহণকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেওয়া এই অলৌকিক জন্মকথায় শিব এবং কৃষ্ণের একত্বের মধ্যে একধরনের homoerotic undertone সূক্ষ্মভাবে কাজ করেছে। নারী-পুরুষের যৌন সংগমের ‘ফল’ হিসেবে সন্তান ধারণের ছকটাই একটা সমাজসিদ্ধ প্রেক্ষিত। কিন্তু, এর সমান্তরালে যৌনতার যে বিকল্প অভিব্যক্তি ক্ষেত্রবিশেষে থাকতে পারে, এই অলৌকিক জন্ম-প্রসঙ্গের মধ্যে তা অবলীলায় ঠাঁই পেয়েছে। সামাজিক stereotype ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাওয়া এই ধরনের সম্পর্কের কল্পনায় homoerotic sentiment-এর ভাগ যেমন আছে, তেমনই পুরুষ-নারীর শারীরিক ক্রিয়ানির্ভর সন্তানজন্মের biological concept অতিক্রম করার চেষ্টাও আছে। নিহিত স্তরে হলেও এই সমান্তর রতিবোধের স্বীকৃতি ভারতের খোলামেলা কামসংস্কৃতির একটা উজ্জ্বল দিক।

শিব-শক্তি পরিবারে ‘বিষ্ণু’-র অনুপ্রবেশকে কেবলমাত্র *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এর ‘গণেশ খণ্ড’-এর আখ্যান সমর্থনে বিবেচনা না করে বিশদে ভাবা যেতে পারে। সাধারণভাবে একে heteronormative sexual structure-এ দাম্পত্য পরিসরের বাইরে থেকে আসা তৃতীয় এক পুরুষ-পক্ষের (বিষ্ণু), হয় স্বামী-পক্ষের (শিব) সঙ্গে পরিস্থিতি সাপেক্ষে, অথবা স্ত্রী-পক্ষের (পার্বতী) প্রতি আকর্ষণবশত যুক্ত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যায়। যেমন,

ক. শিব-পার্বতীর একান্ত ব্যক্তিগত রমণমুহূর্তে পরিকল্পনামাফিক রতিভঙ্গ করে একে তো কৃষ্ণ তাঁদের ভবিষ্যৎ জাতকের সম্ভাবনা ব্যর্থ করে দিয়েছেন, তদুপরি এই ধরনের অলৌকিক জন্মকথায় পুরুষ-নারীর শৃঙ্গারসম্ভোগের ধারণাটিকে ব্যর্থ করে দিয়ে ‘role of women’ বা নারীর নিজস্ব ভূমিকাকে একেবারেই subordinate করে দেওয়া হয়েছে। উলটে ঘুরপথে নারীবিহীন পুরুষের (শিব) স্খলিত বীর্যের সঙ্গে ওই বহিরাগত তৃতীয় পুরুষ-পক্ষের (কৃষ্ণ) সংমিশ্রণের ‘ফল’ হিসেবে গণেশ-জন্মের প্রতীকী বৃত্তান্ত তৈরি হয়েছে। কাজেই, ‘পরিবার’ ধারণার প্রেক্ষিতে ‘পুত্র’ সন্তানের জন্ম এবং তাকে কেন্দ্র করে বংশধারার ক্রমিক অগ্রগতির সমাজসম্মত heteronormative ছকটি এই সমীকরণের আওতায় নিঃসন্দেহে খারিজ হয়েছে। পরিবর্তে, শিব-কৃষ্ণের জনকত্বে গেঁথে তোলা *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এর গণেশ-জন্মের কল্পনার গভীরে একধরনের সমান্তরাল সমরতিচেতনা বিকল্প প্রকাশমাধ্যম খুঁজে নিয়েছে। যদিও সাধনমার্গে এর ব্যাখ্যা ভিন্নতর। এর উদ্দেশ্য পূর্ণশক্তি সত্ত্বগুণাধার ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের জননীশ্রেষ্ঠ পার্বতীর সন্তানস্নেহ আস্বাদন। তবে ব্যাখ্যা যাই হোক, নারী-নিরপেক্ষভাবে পুরুষ-অংশেই এই জন্মঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

খ. *মহাভাগবতপুরাণ* অনুসারে, স্কন্দদেবকৃত পার্বতীর স্তন্যসুধাপান প্রত্যক্ষ করে কৃষ্ণের মনে পার্বতীর মাতৃস্নেহ লাভের বাসনা উদ্রিক্ত হয়। ফলে তিনি গণেশরূপে আবির্ভূত হন। এই আখ্যানচূর্ণ কিছুটা পরিবর্তিত আকারে বাংলার বহুপ্রচলিত দুর্গা ষষ্ঠীর ব্রতকথাতেও জায়গা করে নিয়েছে।[৪৮] মহাদেবের অনুপস্থিতিতে স্নানরত দুর্গা যখন গাত্রমলের সঙ্গে ধুলো মিশিয়ে একটি সুন্দর পুতুল গড়ে তুলছিলেন, তখন সেই স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় নারায়ণ ওই পুতুলটি দেখতে পেলেন। এই প্রেক্ষিতে নারায়ণের মনোভাবটি লক্ষ করার মতো: 'নারায়ণ মনে মনে ভাবলেন, এইবার আমার খুব সুবিধে হয়েছে, আমার চিরকালের আশা পূর্ণ হবে! ভগবতীর স্তনপান করতে আমার বড়ো সাধ। কিন্তু ওঁর গর্ভে জন্মাবার তো কোনো উপায় নেই। ওই পুতুলে আমি আবির্ভাব হব। এই বলে তিনি গড়া পুতুলে আবির্ভাব হলেন। দুর্গাকে 'মা' 'মা' বলে কোলে গিয়ে স্তনপান করতে লাগলেন।'[৪৯] এই নবজাত পুত্রই পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরায় 'গণপতি' নামে পরিচিত হবেন। কার্যত এখানেও বিষ্ণু 'গণপতি'র স্বরূপে আত্মগোপন করেছেন।

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝেছেন, শিব-শক্তি পরিবারে 'গণেশ'-রূপে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্তির ছকটা দ্বিস্তরীয়। প্রথম স্তরের *ব্রহ্মবৈবর্ত* পুরাণোক্ত গণেশ-জন্ম ধরলে পার্বতীকে নিষ্ক্রিয় রেখে শিববীর্যের সঙ্গে কৃষ্ণের সংমিশ্রণে গণেশ-জন্মের অবতারণা। আর, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিবের অনুপস্থিতিতে পার্বতীকৃত পুত্তলিকায় কৌশলে বিষ্ণুর অনুপ্রবেশ। লক্ষ করলে দেখা যায়, সন্তানলাভের দুটি ক্ষেত্রেই শিব-পার্বতীর দাম্পত্যের পরিসরে বিষ্ণু যখনই প্রবিষ্ট হচ্ছেন, তখন কোনও একটি পক্ষ ('ক.'ক্ষেত্রে স্ত্রী-পক্ষ এবং 'খ.' ক্ষেত্রে স্বামী-পক্ষ) ক্রিয়াহীন থাকছেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রমাণে গণেশ পার্বতীর গর্ভজ সন্তান নয়। জন্ম-মূলে তিনি শিব এবং কৃষ্ণের অংশজাত। এখন প্রশ্ন হল, শিব এবং বিষ্ণুর এই পারস্পরিক রতিচেতনার কল্পনা কি *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এর 'গণেশখণ্ড'-এর একটি বিচ্ছিন্ন নির্মাণ? নাকি, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য পুরাণ-পরম্পরায় এর পূর্ব ঐতিহ্য পাওয়া সম্ভব? এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে অয়াপ্পা জন্মের ঘটনা। Teun Goudriaan তাঁর *Maya Divine and Human* শীর্ষক গ্রন্থে দেখিয়েছেন, মূলত দক্ষিণ ভারতের ধর্মগ্রন্থগুলোতেই এই জন্মকথা বিশেষভাবে জনপ্রিয়।[৫০] এছাড়া Rick Jarow তাঁর *Tales for the dying : the death narrative of the Bhagavata-Purana* গ্রন্থে *ভাগবত পুরাণ*-এর দক্ষিণী সংস্করণ অনুসারে এই জন্মকথা ব্যাখ্যা করেছেন।[৫১] বিষ্ণু তাঁর নারীরূপ মোহিনীর মাধ্যমে অসুরদের সঙ্গে ছলনা করার

পর শিব মোহিনীকে দেখতে পান এবং তাঁকে দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন। শিবের বীর্য মাটিতে পড়ে সোনা ও রূপার আকরিক তৈরি করে।[৫২] পুরাণের গল্পের এই সংস্করণে শিব কামে পরাভূত হয়েছেন। আবার, মোহিনীর প্রতি শিবের কামমুগ্ধতার বৃত্তান্ত *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ*-এ কিছুটা অন্য রূপে পাওয়া যাচ্ছে। নারদের মুখে বিষ্ণুর মোহিনী রূপ ধারণের বৃত্তান্ত শোনার পর শিব প্রাথমিকভাবে অবিশ্বাস করেন। সত্যতা যাচাই করতে পার্বতীসহ শিব বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হন। শিব নিজে যাতে বিষ্ণুর এই রূপান্তরকে চাক্ষুষ করতে পারেন, সে'কারণে তিনি বিষ্ণুকে পুনরায় তাঁর মোহিনী রূপ ধারণ করতে অনুরোধ জানান। বিষ্ণু মৃদু হেসে ধ্যানমগ্ন হলেন এবং শিবের সামনে মোহিনী রূপে পুনরাবির্ভূত হলেন। এই মোহিনী রূপ এতই মনোমুগ্ধকর এবং আকর্ষণ-উদ্রেককারী ছিল যে, শিব ওই রূপ দর্শনমাত্রেই কামজর্জরিত হয়ে মোহিনীর দিকে ধাবিত হন। এই দৃশ্য দেখে পার্বতী লজ্জায় ও ঈর্ষায় অধোবদন হয়ে রইলেন।[৫৩] কামপ্রমত্ত শিব মোহিনীর হাত ধরেন এবং তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। কিন্তু মোহিনী নিজেকে ছাড়িয়ে নেন এবং আরও দূরে চলে যেতে থাকেন। শিবও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। শেষপর্যন্ত শিব মোহিনীর হাত ধরে ফেলেন এবং তাঁদের মধ্যে হিংস্র যৌন সংগমের ফলে শিবের বীর্য মাটিতে পতিত হয়। এই বীর্য থেকেই দেবতা মহাশাস্তার জন্ম হয়, যিনি দুটি বিশেষ আঞ্চলিক ফর্মে দক্ষিণে বেশ সমাদৃত। এই হরিহরপুত্র কেরলে অয়াপ্পা এবং তামিলনাড়ুতে আইয়ানার নামেই বহুল পরিচিত।

সুতরাং বিষ্ণু এবং শিবের সংগমযুক্ত হওয়ার নিদর্শন ভারতীয় ধর্মসাহিত্যের পরম্পরায় দুর্লক্ষ্য নয়। গবেষকরা এই জাতীয় যোগবন্ধনকে মূলত দুটি ধারায় ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক Ruth Vanita এবং Saleem Kidwai সম্পাদিত *Same-Sex Love in India : Readings from Literature and History* শীর্ষক গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে Ruth Vanita বিষ্ণু এবং শিবের এই ধরনের সম্মিলনের মধ্যে এক অন্তর্লীন সমরতিচেতনার মাত্রা লক্ষ করেছেন। অন্য আর একটি লেখায় তিনি এই ধরনের গল্পগুলিকে যৌন বিনিময়ের ক্ষেত্রে লিঙ্গ-তারল্যের নিদর্শন বলে চিহ্নিত করেছেন।[৫৪] পুরাণ আলোচক Devdutt Pattanaik আবার এই সংসর্গকে ভারতীয় দর্শনমার্গের দৃষ্টিতে বিচারের পক্ষপাতী। তাঁর মতে শিব-বিষ্ণুর সম্মিলনকে কামুকতার নিরিখে বিচার করা এক ধরনের আরোপিত নির্মাণ। *The Man Who Was a Woman and Other Queer Tales from Hindu Lore* গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে, বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধে বীতস্পৃহ নির্গুণ শিবকে মোহিনীরূপে আকর্ষণপূর্বক বিষ্ণু তাঁকে বস্তুলোকমুখী করতে চেয়েছেন। দেবমণ্ডলে একমাত্র বিষ্ণুরই এই ক্ষমতা আছে যে সময়ে সময়ে তিনি শিবের

মতো নিরাসক্ত, নির্মোহ, ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বরকেও নারীরূপে মোহগ্রস্ত করতে পারেন।[৫৫] কাজেই, একে ভারতীয় সাধনমার্গের বিচারে 'লীলাবিলাস' বা 'মাহাত্ম্য' হিসেবেও দেখা যেতে পারে।

তবে মতান্তর যাই থাকুক, অয়প্পা জন্মের ক্ষেত্রে শিব-বিষ্ণুর এই সম্মিলন যতটা প্রচারিত, *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এর গণেশজন্মের প্রসঙ্গে একেবারেই তা নয়। পূর্ববর্তী কোনও গবেষকই বঙ্গীয় পুরাণকথার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে গণেশজন্মের এই সূত্রটি বিস্তারিত করেননি। কেউ কেউ ইঙ্গিতে সেরেছেন, কিন্তু তাতে শিব-কৃষ্ণের যৌথ অংশগ্রহণের বিষয়টি খোলসা হয়নি।[৫৬] বাংলা মঙ্গলগীতে পুরাণানুসরণ লক্ষ করার মতো। প্রথমভাগের গণেশ বন্দনায় বা দেবখণ্ডের কোনও পর্বে কালেভদ্রে গণেশের জন্মবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলা হয়েছে বটে, তবে সেখানেও এই জাতীয় প্রসঙ্গ একেবারেই আসেনি। এর একটিমাত্র পূর্বসূত্র রয়ে গেছে উনিশ শতকের শ্রীহট্টের কবি রাধানাথ রায় চৌধুরীর রচনায়। তাঁর *পদ্মাপুরাণ*-এর 'গণপতির জন্মকথা' শীর্ষক অংশে *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এর আখ্যানচূর্ণের সঙ্গে খানিক কল্পনা মিশিয়ে কবি সরাসরি লিখেছেন, 'শুভযোগে শঙ্করের বীর্য্যপাত হয়।/ পার্ব্বতীর গর্ভে নাহি বেশীক্ষণ রয়।।/ মহাতেজবন্ত বীর্য্য গর্ভে নাহি ধরে।/ দশদণ্ড পরে বীর্য্য আসিল বাহিরে।।/ অব্যর্থ শিবের বীর্য্য ব্যর্থ নাহি হয়।/ বিষ্ণু তেজ আসি তাতে যুক্ত হয়ে রয়।।/ সেই তেজে বীর্য্য হতে জন্মিল তনয়।/ তাহা দেখি মহামায়া বড় তুষ্ট হয়।।'[৫৭] বুঝতে অসুবিধা হয় না, শিবের বীর্যকে ব্যর্থ হতে না দিয়ে তার সঙ্গে বিষ্ণুর তেজের যোগবন্ধন এবং ফলস্বরূপ গণেশোৎপত্তি--- এই ভাবনা রাধানাথ অবশ্যই পেয়েছেন বঙ্গদেশীয় *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* থেকেই। একেবারে প্রকাশ্যে এত স্পষ্ট করে তিনি ছাড়া মঙ্গলগীতের আর কোনও কবি গণেশজন্মের এইরকম বর্ণনা দিয়েছেন কিনা, আমাদের অন্তত জানা নেই।

পুরাণের জনপ্রিয় আখ্যানে গণেশ পার্বতীর একার সন্তান। একটি-দু'টি ক্ষেত্রে শিবাত্মজ। কেবল *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* প্রমাণেই তিনি উৎসমূলে শিব ও কৃষ্ণাংশে জাত এবং পরবর্তী অবস্থায় 'পার্বতীপুত্র'-রূপে শিব-শক্তি পরিবারে গৃহীত। আমাদের মনে হয় বঙ্গদেশে সংকলিত *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এ দুই পুরুষ-দেবতার অংশগ্রহণে গণেশজন্মের এই ঘটনা বিজ্ঞানদৃষ্টিতে কিছুটা অবান্তর মনে হলেও এই ধরনের কল্পনার গভীরে আকাঙ্ক্ষাপূরণের অভিপ্রায় মিশে থাকতে পারে। যে ভূখণ্ডে এই ধরনের narrative পুষ্ট হয়েছে, সেখানে বিপরীতলিঙ্গক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত ছকের বাইরেও কামসংস্কৃতির যে একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রথম থেকেই ছিল, *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এর গণেশজন্মই তার মোক্ষম প্রমাণ। পাশাপাশি এও লক্ষণীয়, এই নারী-বিবর্জিত জন্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে দুই পুরুষদেবতার অংশগ্রহণের মাত্রা যতই আড়ালে-আবডালে থাক, তাকে একটিমাত্র শ্লোকের আধারে এতই সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে

সচরাচর পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে 'প্রদ্যুম্নেশ্বর' (হরিহর-পুত্র) মন্দিরের প্রস্তরফলকে উমাপতিধর লিখিত একটি শ্লোকের গুরুত্ব অনুধাবন করা যেতে পারে। যথা: 'লক্ষ্মীবল্লভশৈলজাদয়িতয়োরদ্বৈতলীলাগৃহং প্রদ্যুম্নেশ্বরশব্দলাঞ্ছনমধিষ্ঠানং নমস্কুর্ম্মহে।/ যত্রালিঙ্গনভঙ্গকাতরতয়া স্থিত্বান্তরে কান্তয়ো-র্দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্নতনুতাশিল্পেহন্তরায়ঃ কৃতঃ।।' বিশেষজ্ঞ ননীগোপাল মজুমদার শ্লোকটির অনুবাদে লিখেছেন, 'We bow down to the temple called by the name pradyumnesvara, that abode of the playful union of the beloved of Lakshmi and the husband of Mountain's daughter, where, because of the apprehension of the cessation of embrace the two goddesses have taken stand between their lovers and thus somehow interfered with the complete union of bodies, (at least) in its representation in art.'[৫৮] এই ব্যাখ্যা থেকেই স্পষ্ট যে, সমাজ-নির্ণীত মূল্যবোধ কীভাবে শিল্পের মধ্যেও বিকল্প যৌনতার অভিব্যক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কার্যত শিব-কৃষ্ণের সংগমমুহূর্ত বা মৈথুনদৃশ্যের কল্পনা 'heterosexual' সমাজ-মানসে কিছুটা অস্বস্তিকর, অনাকাঙ্ক্ষিত বলেই ধর্মপত্নীদের (লক্ষ্মী ও পার্বতী) মাঝখানে এনে শিব ও কৃষ্ণের 'অভিন্নতনুতা'-য় বাধ সাধা হয়েছে। আমাদের আলোচিত উপাখ্যানেও নারীর প্রসব-প্রক্রিয়ার বিপরীতে সন্তানজন্মের একটি অন্যতর উপস্থাপনা আছে ঠিকই, কিন্তু অচিরেই তার অভিমুখ সমাজনির্দিষ্ট মূল্যবোধের চাপে সম্ভবত বদলে গেছে। সন্তানজন্মের যে প্রক্রিয়াটি একান্তভাবে নারী-বহির্ভূত এবং পুরুষনির্ভর, তাকে একটি সমাজসিদ্ধ পারিবারিক প্রেক্ষাপটে পার্বতীর আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে এমনভাবে সাজানো হল, যাতে গণেশজন্মের উৎসে শিব-কৃষ্ণের যৌথতার চিহ্নটিই গৌণ হয়ে যায়! এই অলৌকিক জন্মকথায় বিষ্ণুর বরে পার্বতী সন্তান পেয়েছেন, বিষ্ণু-ও গণেশরূপে পার্বতীর স্নেহসুখ লাভ করেছেন, কেবল দেবলোকের স্বার্থরক্ষার চক্করে একা পার্বতীর-ই শিবের ঔরসে সন্তানধারণের ইচ্ছেটা অপূর্ণ থেকে গেছে! তবে মাতৃত্বের সীমাবদ্ধ সংজ্ঞা থেকে এক অর্থে তাঁর উত্তরণও ঘটেছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এর গণেশজন্মের আখ্যানটিকে বাহ্যত গণেশের 'জনক-জননী' লাভের গল্প মনে হলেও এর গভীরে গণেশ জনকযুগলের (শিব ও কৃষ্ণ) একটি প্রচ্ছন্ন সূত্র নিঃশব্দে রয়ে গেছে।

মনে রাখতে হবে, এই আখ্যানে বিষ্ণু ও শিবাংশে জাত গণপতি নরমুণ্ডধারী। হস্তীমুখ দেবতা নন। *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এ গণেশের আবির্ভাবের পর তাঁর মুখদর্শনের জন্য দেবতাকুল কৈলাসে সমবেত হন। সেই অনুষ্ঠানেই শনির দৃষ্টিপাতে গণেশ মুণ্ডহীন হন। পরে বিষ্ণুর উদ্যোগে পুষ্পভদ্রা নদীতীরে শয়নরত এক হস্তীর মুণ্ড কেটে এনে

গণেশের ধড়ে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে তাঁকে পুনর্জীবন প্রদান করা হয়। গ্রহদোষে সদ্যোজাত গণেশের মুণ্ডচ্ছেদের মোটিফটি পরে *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এর আখ্যানেও ফিরে আসবে। এখানে অবশ্য গ্রহরাজ শনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। পার্বতীর আদেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি নবজাতকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে বাধ্য হন। যদিও শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ডহীন হওয়ার ঘটনা *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এ কার্যকারণ পরম্পরায় যুক্ত অর্থাৎ একে শিবের প্রতি কশ্যপের পূর্ব অভিশাপের ফল বলা যায়। *ব্রহ্মবৈবর্ত্ত*-এর ১৮ নং অধ্যায়ে বিঘ্নেশের বিঘ্নসৃষ্টির কারণ হিসেবে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।[৫৯] একসময় মালী ও সুমালী নামে দুই শিবভক্ত দৈত্যকে সূর্য হত্যা করতে উদ্যত হলে ভক্তবৎসল শিব শূলের দ্বারা সূর্যের বক্ষস্থল বিদ্ধ করেন। শিবতেজতুল্য অব্যর্থ শূলের প্রভাবে আহত হয়ে সূর্য নিশ্চেতন অবস্থায় রথ থেকে মাটিতে পড়ে যান। এই অবস্থায় তাঁর পিতা কশ্যপ পুত্রকে উর্দ্ধচক্ষু ও মৃতপ্রায় দেখে বুকে জড়িয়ে ধরে শোকে হাহাকার করতে থাকেন। সূর্যের এই আকস্মিক পতনে সমস্ত দেবতারা হাহাকার করে উচ্চৈঃস্বরে রোদন শুরু করেন, এমনকী জগৎচরাচরও অন্ধকারে আবৃত হয়ে একেবারে অন্ধের মতো হয়ে যায়। ক্রোধান্ধ কশ্যপ সূর্যের এই পরিণতির জন্য শিবকে দায়ী করে অভিশাপ দেন যে, শিব যেমন শূল দ্বারা তাঁর পুত্রের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করেছেন, ঠিক সে'ভাবেই শিবপুত্রেরও একদিন মুণ্ডচ্ছেদ হবে। বোঝা যায়, এক পুত্রশোকাতুর পিতা আরেক পিতাকে একই যন্ত্রণায় কাতর করে পুত্রশোকের গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছেন। এরপর আশুতোষ শিব ক্রোধশূন্য হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের অংশ ত্রিগুণাত্মক সূর্যকে জীবনদান করেন। ব্রহ্মাপৌত্র তপস্বী কশ্যপের এই অভিশাপের মধ্যেই কালক্রমে শিবাত্মজ গণেশের শিরচ্ছেদের মুখবন্ধ রচিত হয়েছে।

সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে গণেশের একদন্ত হওয়ার কাহিনি *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ*-এ যেমন ব্যাখ্যাত হয়েছে, তেমনই বঙ্গদেশীয় *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর ৪১ থেকে ৪৪ নং অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে সেই কাহিনি বিশদে বর্ণিত হয়েছে।[৬০] বঙ্গদেশে গণেশ যে কেবল 'বাল'-রূপেই আটকে নেই, বরং এক বীর যোদ্ধারূপে পরিস্থিতি সাপেক্ষে প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতেও সক্ষম, গণেশের সেই শক্তিমত্তার প্রমাণ পাওয়া গেছে এই পর্বাধ্যায়গুলিতে।

ভার্গব পরশুরাম কৈলাসের সুরম্য পরিবেশে শিব-পার্বতীর অভ্যন্তরগৃহের দরজার বামদিকে কার্তিক এবং দক্ষিণে গণেশসহ ক্ষেত্রপালাদিকে দর্শন করেন। তাঁদের সম্ভাষণ করে কুঠার হাতে ভেতরে প্রবেশ করতে গেলে দ্বারপাল গণেশ পরশুরামকে 'ভ্রাতা' সম্বোধন করে বলেন যে, শিব-পার্বতী যেহেতু ব্যক্তিগত কক্ষে নিদ্রিত আছেন, ফলে এই সময় তাঁদের অনুমতি ছাড়া ভেতরে প্রবেশ করা উচিত হবে না। কিছুক্ষণ পরে শিবের আদেশ অনুসারে

গণেশ স্বয়ং তাঁকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবেন, ততক্ষণ তিনি যেন অভ্যন্তরদ্বারেই প্রতীক্ষা করেন। পরশুরাম প্রত্যুত্তরে গণেশকে বলেন যে, তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করে শিব এবং পার্বতীকে একবার প্রণাম করেই শীঘ্র বিদায় নেবেন। কারণ, শিবের প্রসাদেই তিনি কার্তবীর্য ও সুচন্দ্রাদিকে হত্যা করে পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করতে সমর্থ হয়েছেন। কাজেই, কৃতজ্ঞতাবশত গুরু এবং গুরুপত্নীকে প্রণাম জানানো তাঁর কর্তব্য। এ'কথা শোনার পর গণেশ পরশুরামকে নানা যুক্তি দিয়ে বোঝান যে, স্ত্রী-পুরুষ নির্জনে একত্রে কালযাপন করলে অথবা একাসনে থাকলে সেই স্থানে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ সঙ্গত নয়। যদিও গণেশের কোনও যুক্তিই প্রবল পরাক্রান্ত পরশুরাম গ্রাহ্য করেননি। তিনি উপহাস করে গণেশের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য উচ্চারণ করে ভর্ৎসনার সুরে বলেন, গণেশের মুখেই এমন শাস্ত্রবিধান যেন তিনি প্রথম শুনছেন, ঈশ্বরের কাছেও বোধহয় এমন কথা শোনেননি! যারা বিকৃতচিত্ত ও কামুক, তাদের জন্য এই নির্দেশ খাটবে। কিন্তু, মহাতপা পরশুরাম বিকারশূন্য শিশুর মতোই অপাপবিদ্ধ। কাজেই, তাঁর ক্ষেত্রে এইসব শাস্ত্রবাক্য অচল। তা ছাড়া, নিতান্ত 'বালক' যে গণেশ, তাঁর এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত। পরশুরাম শিব-পার্বতীকে দর্শন করে পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত কার্যই করবেন, গণেশের এই বিষয়ে অনধিকারচর্চার কারণ নেই। উপরন্তু, শিব-পার্বতী তো একা গণেশেরই পিতা-মাতা নয়, সমগ্র জগতেরই পিতা ও মাতা। ফলে তাঁদের দর্শন করার ক্ষেত্রে গণেশের নিষেধাজ্ঞা নেহাতই অপ্রয়োজনীয়। গণেশকে এইভাবে নিরস্ত করে পরশুরাম অভ্যন্তরকক্ষে নির্দ্বিধায় প্রবেশ করতে চান। লক্ষণীয়, এত উপেক্ষার পরও গণেশ ক্রোধ সম্বরণ করে শান্ত রইলেন। প্রসঙ্গত ব্রহ্মবৈবর্তে তাঁকে জিতক্রোধ ও সত্ত্বগুণাধার বিষ্ণুর অংশজাত বলে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বলা হয়েছে। তিনি আবার পরশুরামকে বোঝানোর জন্য নানাবিধ শাস্ত্রসিদ্ধ যুক্তির অবতারণা করেন এবং তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। পাশাপাশি এও জানান যে, শিব এই সময় সুরতক্রীড়ায় উন্মুখ হয়েছেন, ফলে পরশুরামের আপাতত অভ্যন্তরদ্বারেই অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু এতবার বোঝানো সত্ত্বেও গণেশের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে, তাঁর সদুপদেশদানকে নিতান্ত বালকোচিত বাতুলতা ভেবে, তাঁকে একরকম অবজ্ঞা করেই পরশুরাম কুঠার হাতে নির্ভয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে উদ্যত হন। গণেশ আবারও তাঁকে বিনয় সহকারে ভেতরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু পরশুরাম হুংকার করে গণেশের নিষেধ বার বার প্রত্যাখ্যান করলে পরস্পরের বাকযুদ্ধ এবং করতাড়না অর্থাৎ হাতাহাতি আরম্ভ হয়। এরপর পরশুরাম কুঠার নিক্ষেপের ইচ্ছা প্রকাশ করলে কার্তিক তাঁকে সাবধান করে বলেছেন, গুরুসদৃশ গুরুপুত্রকে হত্যা করা তাঁর যোগ্য কাজ নয়। এমনকি অস্ত্রনিক্ষেপে উদ্যত পরশুরামকে আটকাতে গেলে ক্রোধান্ধ ভৃগুনন্দন গণেশকে ছুঁড়ে

ফেলে দেন। এরপরেও ক্রোধশূন্য গণেশ পরশুরামকে সীমালঙ্ঘন না করার পরামর্শ দিয়েছেন। যদিও পরশুরাম বারবার তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দেন। গণেশকে অগ্রাহ্য করে শরনিক্ষেপ শুরু করলে গণেশও এইবার তাঁর বলবত্তার পরিচয় দেন। ধর্মসাক্ষী করে তিনি প্রথমে নিজের শুঁড়টিকে কোটি যোজন বিস্তৃত করেন, বার বার শুঁড় ঘুরিয়ে তার সাহায্যে পরশুরামকে শতধা বেষ্টন ও ঘূর্ণিত করে উপরে উঠিয়ে দেন এবং যোগবলে স্তম্ভিত করে বৈকুণ্ঠসহ চরাচর ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়ে শেষে মাটিতে ফেলে দেন। স্তম্ভন দূর হলে ক্রোধবিবশ পরশুরাম চরম মুহূর্তে গণেশের প্রতি অমোঘশক্তি পরশু নিক্ষেপ করেন। গণেশ ওই দিব্যাস্ত্রের আঘাত বামদন্তে গ্রহণ করায় তাঁর একটি দাঁত উৎপাটিত হয়। দন্তভঙ্গের সময় বীরভদ্র, কার্তিক ও ক্ষেত্রপালগণ হাহাকার করে ওঠেন। পুরাণকারের বর্ণনায় সেই মুহূর্তে গণেশের রক্তমাখা বামদন্ত যেন গৈরিকযুক্ত স্ফটিক পর্বতের মতো সশব্দে মাটিতে পড়ে। এই ভীষণ শব্দে পৃথিবী ভয়ে কেঁপে ওঠে, কৈলাসবাসী ভয়ে মূর্ছিত হয়, এমনকী শিব-পার্বতীরও নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাঁরা বাইরে বেরিয়ে এসে ভগ্নদন্ত আহত অক্রোধী গণেশকে রক্তমাখা মুখে লজ্জায় সহাস্যে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। পার্বতী কার্তিকের কাছে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ শুনে শোকে এবং ক্রোধে জর্জর হয়ে শিবের সামনেই পরশুরামকে বহু তিরস্কার করেন, এমনকী তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হন। তখন জগৎপালক বিষ্ণু বামন অবতারের বেশে আবির্ভূত হয়ে বহু প্রযত্নে পার্বতীর কোপ থেকে পরশুরামকে রক্ষা করেন। বিষ্ণু বলেন যে, গণেশ-কার্তিক যেমন পার্বতীর পুত্র, তেমনই শিবের শিষ্যত্বপ্রাপ্ত পরশুরামও তাঁর পুত্র। দৈবদোষেই তাঁর দুই পুত্রের বিক্ষোভ ঘটেছে। কাজেই, একে দৈবনিদান বলেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এ স্বয়ং বিষ্ণুই এরপর গণেশের 'একদন্ত' রূপটিকে বেদগ্রাহ্য বলে প্রকাশ করেছেন। অতএব দৈবনির্ধারণেই গণেশ পরশুরামের দ্বারা ভগ্নদন্ত হয়ে 'একদন্ত'-এর পরিচয়লাভ করেছেন। এইভাবে বিষ্ণুমুখে গণেশের সামবেদোক্ত নামাষ্টক স্তোত্র শ্রবণের মধ্য দিয়ে পার্বতীর ক্রোধের উপশম ঘটেছে। পার্বতীকে বোঝানোর পর বিষ্ণু পরশুরামকেও গণেশের স্তব করে কাণ্বশাখোক্ত দুর্গা স্তব করার পরামর্শ দিয়েছেন। নারায়ণের নির্দেশ অনুসারে পরশুরাম দুর্গাস্তব করে শ্রীহরিকথিত স্তবে সানন্দে গণেশের অর্চনা করেছেন। শিবের আদেশে ভ্রাতা গণেশের পূজা ভক্তিভাবে সম্পূর্ণ করে তিনি গুরুদেব ও গুরুপত্নীকে প্রণাম জানিয়ে প্রস্থান করেছেন।

এখানে লক্ষ করার বিষয় হল, প্রথম থেকেই বালক গণেশের শক্তি সম্বন্ধে পরশুরামের কোনও ধারণা ছিল না। তিনি গণেশকে সাধারণ বালকের মতোই হীনবল ও সীমিতসামর্থ্য ভেবেছেন। কার্তবীর্য নিধনকারী পরশুরামের নিজের শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি অহংকার একটা পর্যায়ে এতখানিই বেড়ে গিয়েছিল যে, উলটোদিকে থাকা গণেশের

গুরুত্ব মূল্যায়নে তাঁর ভুল হয়েছিল। শিব-পার্বতীর ব্যক্তিগত অবসরযাপন যাতে নিরুপদ্রব হয়, দ্বাররক্ষী হিসেবে গণেশ শুধু সে'টুকুই নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। তাঁর পক্ষে পরশুরামকে অবহেলা তো দূরের কথা, উপরন্তু গুরুভ্রাতা বলে গণেশ ধৈর্যের সঙ্গে বারবার তাঁকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু পরশুরামের দম্ভ এমনই আকাশচুম্বী যে, গণেশের কোনও পরামর্শই তাঁর মনঃপূত হয়নি। বরং গণেশের কাছ থেকে এই ঔচিত্যের পাঠগ্রহণ তাঁর অসহ্য ও মূল্যহীন মনে হয়েছে। অন্যকে উপেক্ষা করার এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই পরশুরাম চরিত্রের দুর্বলতা নিহিত। গণেশের ওপর কুঠার প্রয়োগ করে তিনি হয়তো তাঁর ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন, কিন্তু শাস্তিদানের এই আপাত-সাফল্য কী প্রকারান্তরে ক্ষমতাগর্বী ভার্গবের চরিত্রেই এক অনপনেয় কালিমা লেপন করে না? ক্রোধান্ধ পরশুরাম শিবদত্ত অস্ত্র গণেশের ওপর প্রয়োগ করে অস্ত্রের অমর্যাদা তো করেছেন-ই, পাশাপাশি গুরুপুত্রকে ঘায়েল করে পরোক্ষে শিব-পার্বতীকেও অসম্মান করেছেন। তা ছাড়া যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে গণেশ যখন পরশুরামকে শুঁড়ে বেঁধে তাঁর অমিতশক্তির প্রমাণ দিয়েছেন, তখন অন্তত পরশুরামের সংযত হওয়া উচিত ছিল। গণেশ তো নিমেষেই পারতেন পরশুরামের দর্পচূর্ণ করতে, লক্ষ কোটি পরশুরামকে হত্যা করার ক্ষমতা তাঁর আছে। ৪৪ নং অধ্যায়ে ক্রোধবিবশা গৌরীর বাক্যেও গণেশের এই বীরদর্পের স্বীকৃতি মিলেছে। কিন্তু প্রকৃত যোদ্ধা তো তিনিই, যিনি অপ্রয়োজনে নিজশক্তির অপচয় করেন না। তা ছাড়া পরশুরাম তাঁর প্রতিপক্ষ নন, তিনি শিবের প্রিয়শিষ্য। ফলে গণেশ নমনীয়ভাবেই তাঁকে বুঝিয়েছেন, শাস্ত্রবাক্যের অবতারণা করে তাঁর বোধোদয় ঘটাতে চেয়েছেন। কিন্তু, ভার্গব প্রথম থেকেই একবগ্গা, তাঁর উদ্ধত অভিমান এবং উদ্যত উপেক্ষার সামনে গণেশকে দাঁড়াতে হয়েছে বারবার। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়েই তিনি পরশুরামকে সচেতন করে বলেছিলেন, 'আপনি অতিথি, বিদ্যাসম্বন্ধে আমার ভ্রাতা এবং ঈশ্বরের প্রিয় শিষ্য; এই জন্যই আপনাকে সহ্য করিতেছি। আমি কার্ত্তবীর্য্য নহি; ও সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ রাজাগণও নহি; বিপ্র! আমি বিশ্বেশ্বরের পুত্র আমাকে তুমি জান না।'[৬১] শেষাংশের এই 'আমাকে তুমি জান না'-র মধ্যে ('ন জানাসি মাঞ্চ বিশ্বেরাত্মজম্') পুরাণকার শিবপুত্র গণেশের পূর্ণশক্তির পূর্বাভাষ দিয়েছেন। যদিও পরশুরাম তা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর অহংতাড়িত মনোবৃত্তি ক্রোধ সম্বরণের পরিবর্তে তাঁকে আরও বেপরোয়া করে তুলেছে। ফলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে যেনতেন-প্রকারেণ একটা পাল্টা জবাব দিতে ভৃগুপতি সচেষ্ট হয়েছেন। পরশুরামের এই অসংযমের বিপরীতেই পুরাণকার এঁকেছেন গণেশের স্থিতধী চরিত্র। পিতৃপ্রদত্ত অস্ত্রকে ব্যর্থ হতে না দিয়ে নিজের বামদন্তে ধারণ করে দন্তভঙ্গের ক্ষতিটুকু স্বীকার করেছেন যেমন, তেমনই প্রকৃত বীরের মতো দিব্যকুঠারের গৌরবরক্ষা করেছেন, যাতে পিতার মহিমা ম্লান না হয়। এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা

ব্রহ্মবৈবর্তের গণেশের অন্যতম সিদ্ধি। একদিকে পরশুরামের নিয়ন্ত্রণহীন স্বেচ্ছাচার, পরিস্থিতির গুরুত্ব না-বোঝা, ক্রমবর্ধমান আত্মপ্রাধান্য এবং অন্যদিকে দায়িত্ব-সচেতন গণেশের স্থৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে এই উপাখ্যান।

আখ্যান অনুসরণে এই দন্তভঙ্গের ব্যাখ্যা যাই হোক, পণ্ডিতেরা এই ঘটনার মধ্যে অন্তত দুটি মাত্রা লক্ষ করেছেন। প্রথমত, বিষ্ণুর দশাবতার স্তোত্র অনুসারে পরশুরাম নিজেই বিষ্ণুর অবতার, আবার *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* প্রমাণে গণেশও বিষ্ণুর-ই অবতার। কাজেই, পরশুরামের দ্বারা গণেশের দন্তভঙ্গের যৌক্তিকতা কোথায়? এর উত্তর লুকিয়ে আছে তন্ত্রমার্গের সম্প্রদায়গত বিরোধের মধ্যে। তন্ত্রধর্মে পরশুরাম শ্রীকুলের তত্ত্বাচার্যরূপে গৃহীত। অন্যদিকে, গণেশ বামচারী মার্গের প্রধান আচার্য। ফলে পরশুরামের দ্বারা গণেশের দন্তভঙ্গের এই পৌরাণিক বৃত্তান্তের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে শ্রীকুল বনাম বামমার্গের অন্তর্বিরোধের দার্শনিক বয়ান থাকা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* অনুসারে গণেশ বিষ্ণু এবং শিবাত্মজ। ভারতীয় ধর্ম-পরম্পরায় গণেশ বিশেষভাবে শিবেরই প্রতিরূপ। গণপতির মতো এক নায়কের মধ্যে শিবের সমস্ত গুণ সংক্রান্ত হয়েছে। ঋগ্‌বেদের আদিবরাহ বা এমুস বরাহের মতোই গণেশের একদন্ত হওয়াকে symbol of fertility বা symbol of phallus রূপে গণ্য করা হয়। এই দৃষ্টিতে একদন্ত যেহেতু লিঙ্গের প্রতীক, ফলে মনে হয় শিবলিঙ্গের সমস্ত প্রতীকতা একদন্ত গণেশের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে, তাঁকে সাক্ষাৎ শিব বলে ভাবা সম্ভব। এইভাবে পরশুরামের কারণে একদন্ত হওয়ার মাধ্যমে গণেশ শিবলিঙ্গের সমানধর্মা হয়েছেন।[৬২]

ব্রহ্মবৈবর্ত-এ বিষ্ণুমুখে গণেশের যে সামবেদোক্ত নামাষ্টক স্তোত্র উচ্চারিত হয়েছে, সেখানে তাঁকে গণেশ, একদন্ত, হেরম্ব, বিঘ্ননায়ক, লম্বোদর, শূর্পকর্ণ, গজবক্ত্র এবং গুহাগ্রজ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৬৩] এই প্রত্যেক নামধারণের কারণও বিষ্ণুকৃত ব্যাখ্যা থেকে জানা গেছে। গণেশের এই নামাষ্টক স্তোত্র সমস্ত স্তবের সারভূত এবং বিঘ্ননাশক। স্তোত্রধৃত প্রতিটি নাম ব্যাখ্যাসহ উচ্চারণ করে বিষ্ণু গণেশের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করেছেন। যেমন, গণেশের 'গ' বর্ণ জ্ঞান ও 'ণ' বর্ণ মুক্তির দ্যোতক। অতএব যিনি জ্ঞান এবং মুক্তি প্রদানে সমর্থ, তিনিই পরব্রহ্মস্বরূপ গণেশ। এক শব্দের অর্থ প্রধান এবং দন্ত শব্দের অর্থ বল, কাজেই যিনি সর্বাপেক্ষা প্রধান বলসম্পন্ন তিনিই একদন্ত। হে অর্থে দীন এবং রম্ব অর্থে পালক, অর্থাৎ দীনজনের প্রতিপালক যিনি, তিনিই হেরম্ব। বিঘ্ন শব্দের অর্থ বিপদ এবং নায়ক শব্দের অর্থ খণ্ডন, ফলে বিপদভঞ্জন করেন যিনি, সেই বিপদবিনাশক-ই বিঘ্ননায়ক নামে পরিচিত। বিষ্ণুপ্রদত্ত নৈবেদ্য ও শিবদত্ত নানাবিধ ভোগে তাঁর উদর লম্বমান হয়েছে বলেই তিনি লম্বোদর নামে

খ্যাত। যাঁর কুলোর মতো কান অর্থাৎ শূর্পাকৃতি কর্ণযুগল বিঘ্ননিবারণ করে সেই সম্পদ ও জ্ঞানস্বরূপ দেবতা শূর্পকর্ণ নামে পরিচিত। যাঁর মস্তকে মুনিপ্রদত্ত বিষ্ণুর নিবেদিত পুষ্প রয়েছে, তিনিই গজেন্দ্রবদনযুক্ত হয়ে গজবক্ত্র নামধারণ করেছেন। কার্তিকের পূর্বে তিনি মহাদেবের ভবনে আবির্ভূত হয়েছেন বলে তাঁকে গুহাগ্রজ বলা হয়েছে। যারা এই শুভ নামাষ্টক স্তোত্র ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে, তারা সুখী এবং সর্বদা বিজয়ী হয়। গরুড় থেকে সাপের মতো বিঘ্ন তাদের থেকে পলায়ন করে। তারা গণেশের অনুগ্রহে মহাজ্ঞানী হয়। পুত্রার্থী পুত্র এবং বিবাহেচ্ছুক ব্যক্তি সুন্দরী পত্নী লাভ করে। জড়বুদ্ধি ব্যক্তি এই শ্লোকের প্রভাবে কবিশ্রেষ্ঠের মর্যাদা পায়।

মহাভাগবতপুরাণ-এ গণেশ প্রসঙ্গ :

পুরাণ-বর্ণিত গণেশ-জন্মের আখ্যানগুলির মধ্যে গৌরীর গাত্রমলজাত গণেশের আবির্ভাবই বঙ্গীয়-মানসে সবচেয়ে পপুলার discourse। বঙ্গদেশে এই কাহিনি একমাত্র *মহাভাগবত* পুরাণেই লভ্য।[৬৪] পার্বতী তাঁর গায়ের ধুলো মিশিয়ে যে পুতুল গড়েছিলেন, যাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে তিনি গণেশকে সৃষ্টি করেছেন, প্রকৃত পরিচয়ে তিনি নারায়ণ। ভগবতীর স্তন্যপানেচ্ছুক বিষ্ণুই ওই নির্মীয়মান পুত্তলিকায় আত্মগোপন করেছিলেন। ফলে এই পুরাণে গণেশ স্বরূপত নারায়ণেরই বিকল্পমূর্তি। পরে স্নানাগারের দ্বাররক্ষী রূপে তিনি মায়ের আদেশ পালন করতে গিয়ে শিবের শূলাঘাতে মুণ্ডহীন হন। শোকসন্তপ্ত পার্বতীর ক্রোধ প্রশমিত করতে শিব স্বয়ং বনমধ্যে শয়নরত এক গজরাজের মস্তক কেটে এনে ছিন্নশির বালকের ধড়ে সংযোজনমাত্রেই নবজাতক প্রাণ ফিরে পান। এরপর নারায়ণরূপী গণেশ গজাননরূপে গণপতির পদলাভ করেন। এই পুরাণবর্ণিত কাহিনির কিয়দংশই বঙ্গদেশে দুর্গাষষ্ঠীর ব্রতকথার আকারে প্রচলিত হয়েছে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ-এ গণেশ প্রসঙ্গ :

বৃহদ্ধর্মপুরাণ-এর আখ্যান অনুসারে পার্বতী বারকয়েক শিবকে অনুরোধ করেছেন বংশরক্ষা এবং পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করার জন্য তাঁদের মিলিত অংশগ্রহণে সন্তানের জন্ম কতখানি জরুরী – 'নির্ব্বংশস্য ক্রিয়া নাস্তি তস্মাৎ ত্বং সাত্বিকোভব।/ অদৈব ময়ি সঙ্গম্য ঔরসং জনয়াত্মজম্।।'[৬৫] প্রত্যুত্তরে শিবের তিনটি যুক্তি: প্রথমত, তিনি গৃহস্থ নন, চালচুলোহীন বিবাগী। তাঁর সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ অসুরনিধন ও পৃথিবী রক্ষার প্রয়োজনে দেবতাদের কুচক্রের ফল। দ্বিতীয়ত, গৃহস্থ মানুষ বংশলোপের ভয়ে পুত্র কামনা করে। কিন্তু তাঁরা তো অমর্ত্যলোকের বাসিন্দা। কাজেই পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করার ভাবনাও অর্থহীন। তৃতীয়ত, দাম্পত্য-যাপনে শিব পার্বতীকে 'পরম বন্ধু' রূপেই ('ভার্য্যৈব পরমো বন্ধুঃ'[৬৬]) পেতে চান। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই বন্ধুতা ঘটলেও

পুত্র সবসময়ই 'পাশশঙ্কু'-র ('ভদ্রে ভবেদপত্যং বৈ পাশশঙ্কুনিরূপ্যতে'[৬৭]) মতোই হয়ে থাকে। কাজেই, পুত্রলাভ নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া শিব-পার্বতী তো জগতের প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই নিজেদের সংযুক্ত করে আনন্দ উপভোগ করেন অর্থাৎ তাঁরাই প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষের সন্তান জন্মের কারণ হন। নিজেরা 'অনপত্য' বা নিঃসন্তান হয়েও সর্বদা আত্মারাম হয়েই রমণ সম্পন্ন করেন। শিবের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করেও পার্বতীর অতৃপ্ত মাতৃহৃদয় শান্ত হল না। তিনি বলেন, শিব কেবল সন্তান উৎপাদন করেই যোগক্রিয়ায় মগ্ন থাকতে পারেন। তাঁর যোগানুষ্ঠানে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটবে না। সন্তান পালনের পূর্ণ দায়িত্ব পার্বতীর। কিন্তু, পুত্রমুখচুম্বনের আকাঙ্ক্ষা যেহেতু তাঁর হয়েছে এবং শিব যখন তাঁকে পত্নীরূপে স্বীকার করেছেন, তখন সন্তান জন্ম দেওয়ার দায়িত্ব তাঁকে নিতেই হবে। এ'ভাবে বারবার অনুনয় করেও শিবকে সম্মত করা গেল না। শিব পার্বতীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, তিনি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলে সেই পুত্র বিবাহে অনিচ্ছুক হবে, ফলত পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বংশরক্ষা হবে না। এত বোঝানোর পরও কাজ না হলে শিব রেগে গিয়ে আসন ছেড়ে উঠে যান। পার্বতীও দুঃখে অন্যমনা হয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করেন। এই সময় জয়া-বিজয়া শিবের কাছে গিয়ে পার্বতীর রোষভঙ্গের জন্য তাঁকে অনুনয় করলে তিনি বিষণ্ণ পার্বতীকে এইভাবে আশ্বাস দিলেন যে, দেবীর যদি পুত্রমুখদর্শনের সাধ এতখানিই হয়ে থাকে, তবে তিনি যেন তাঁর পরিধেয় রক্তবর্ণ বস্ত্রটিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে তার মুখচুম্বন করেন। শিববাক্যকে পরিহাস ভেবেও পার্বতী তাঁর বস্ত্রটিকে পুত্রভাবে যখনই কোলে তুলে নেন, তখনই ওই ক্রোড়গত বস্ত্রখণ্ড জীবনপ্রাপ্ত হয়ে কোল থেকে পড়ে যায় এবং বারবার স্পন্দিত হতে থাকে। পার্বতী ওই স্পন্দমান অস্তিত্বটিকে শিবের কাছে নিয়ে গিয়ে স্বহস্তে ধারণ করে 'জীব' 'জীব' বলে বিস্ময় প্রকাশ করেন। এই সময় নবজাতক প্রাণযুক্ত হয়ে 'মা মা' বলে কাঁদতে থাকলে পার্বতী সানন্দে পুত্রকে কোলে নিয়ে স্তন্যসুধাপান করান। ওই বালকও স্তন্যপান করে প্রসন্নমুখে মাতা পার্বতীর দিকে তাকিয়ে থাকে। দেবী তাঁকে পুত্রজ্ঞানে চুম্বন করেন। কিছুক্ষণ আলিঙ্গনের পর দেবী নবজাতককে শিবের কোলে দিয়ে তাঁকেও পুত্রলাভের সুখ উপলব্ধি করতে বলেন। প্রসঙ্গত শিব বলেন যে, তিনি নিছক পরিহাসবশেই বস্ত্রকে পুত্র ভেবে গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন, যদিও পার্বতীর ভাগ্যবলেই সেই বস্ত্রখণ্ড পুত্ররূপে জীবনলাভ করেছে। বস্ত্রনির্মিত নির্জীব দেহের এই সজীব রূপান্তর শিবের কাছেও সমান বিস্ময়ের। কীভাবে এমনটা সম্ভব হয়েছে, তা বোঝার জন্য শিব ওই পুত্রকে হাতে নিয়ে অতিযত্নে তাঁকে দেখেন। নবজাতকের শরীরের সমস্ত অঙ্গ মনোযোগ সহকারে লক্ষ করার সময় শিব বুঝতে পারেন যে, পার্বতীর উৎপন্ন পুত্রের গ্রহরিষ্ট অর্থাৎ জন্মকালীন গ্রহদোষ আছে। অতএব এই পুত্রের আয়ুষ্কাল সামান্য। শিবের মনে হয় স্বল্পায়ু

পুত্রের মৃত্যুলাভই সমীচীন, তা না হয়ে প্রাপ্তবয়স্কাবস্থায় গুণবান পুত্রের মৃত্যু হলে তা ভীষণ শোকের কারণ হয়। এই ভাবনা চলাকালেই উত্তরদিকে মাথা করে থাকা শিবের হস্তধৃত সেই শিশুর মুণ্ডচ্ছেদ ঘটে এবং ছিন্নমুণ্ড মাটিতে পড়ে যায়। স্বভাবতই শোকাকুল পার্বতী ছিন্নমুণ্ড পুত্রকে নিয়ে 'হা বৎস, হা বৎস' বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন। শিব তখন পার্বতীকে আশ্বস্ত করে ওই ছিন্নমস্তকটিকে শিশুর দেহে প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দেন। যদিও মস্তকযোজনা করতে গিয়ে পার্বতী ব্যর্থ হন। এই সময় শিবের উদ্দেশে এক দৈববাণী হয়। সেখানে বলা হয়, নবজাতকের মস্তকে রিষ্টি বা গ্রহদোষ থাকায় এই মস্তক সংযোগে তাঁকে পুনর্জীবিত করা অসম্ভব, অন্যের মস্তক এনে মৃত শিশুর স্কন্ধে প্রতিস্থাপন করে তাঁর জীবনদান করা যাবে। তবে শিশুটি যেহেতু শিবহস্তে উত্তরমুখে শায়িত ছিল, ফলে উত্তরদিকে মাথা করে আছে এমন কোনও জীবের মস্তকই প্রয়োজন। শিব দৈববাণী অনুসারে নন্দীকে ডেকে তাঁকে এই কাজের দায়িত্ব দেন। নন্দী ত্রিলোক পরিক্রমা করে শেষে অমরাবতীতে গিয়ে ইন্দ্রবাহন ঐরাবতকে উত্তরশিরে শায়িত দেখে তার মস্তকছেদনে উদ্যত হন। স্বভাবতই ঐরাবতও গর্জন করে ওঠে। সেই গর্জনে ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতারা সেখানে উপস্থিত হন। দেবরাজ ইন্দ্র এ'কাজে বাধা দিলে তাঁর সঙ্গে নন্দীর এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষে ইন্দ্রকে নির্জিত করে নন্দী ঐরাবতের মুণ্ডচ্ছেদ করে সেই কর্তিত মুণ্ড শিবকে দেন। নন্দীর রণসাফল্যে আনন্দিত হয়ে শিব তাঁকে আলিঙ্গন করে সেই হস্তীমুণ্ড শিশুর ধড়ে সংযোজনমাত্রেই মৃত পুত্রের জীবনপ্রাপ্তি ঘটে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ-এ গণেশজন্মের প্রেক্ষাপট হিসেবে শিব-পার্বতীর মানসিক অবস্থানের মধ্যে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে, প্রসঙ্গত সে বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। লৌকিক জগতে হর-পার্বতীর 'দাম্পত্য' একধরনের আদর্শায়িত রূপ পেলেও এর মধ্যে জরুরী কতকগুলি ছিদ্র ছিল। শিব স্বরূপত এবং কার্যত নির্গুণ, নির্বিকার এবং সংসার সম্পর্কে উদাসীন। সন্তান উৎপাদনেও তাঁর গভীর অনীহা। অন্যদিকে পার্বতী ঘোরতর সংসারী। তাঁর মূল্যবোধ অনেকাংশেই পিতৃপ্রধান ব্যবস্থা সমর্থিত এবং স্বীকৃত 'social code'-গুলির অনুবর্তী। কাজেই heteronormative sexual pattern অনুসারে 'দাম্পত্য'-এর সাফল্যের জন্য পুরুষ-নারীর সঙ্গমে সন্তান উৎপাদনের সামাজিক theory-তে তিনি মানসিকভাবে আস্থাশীল।[৬৮] বিপরীতলিঙ্গক পিতৃশাসিত সমাজে বিবাহ ব্যাপারটিই কার্যত পুরুষের অবাধ নারীসম্ভোগের এবং সন্তান উৎপাদনের একধরনের সমাজনিষ্ঠ নিয়মতান্ত্রিক পথ। *মনুসংহিতা* মতে, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। পুরুষের বউ এর প্রয়োজন সন্তান উৎপাদনের জন্য আর এই

সন্তান অনিবার্যভাবেই হবেন পুরুষ সন্তান। বিবাহের অন্য অনেক উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা হল বংশধারার অগ্রগতি বা প্রজন্মের বিস্তার। একটি মেয়ের মাধ্যমে একজন পুরুষ এই প্রজনন কর্মটি সম্পন্ন করবেন, এমনটাই পুংশাসিত ব্যবস্থার চালু দস্তর। ভাবতে অবাক লাগে, বিবাহ-ই একমাত্র সম্পর্ক যেখানে রক্তের সম্পর্কে যুক্ত নয় এমন দুটি মানুষ একটি মিলিত জীবনের সূত্রপাত করে। অথচ যৌনমিলনের মাধ্যমে নিজেদের রক্তের সম্পর্কের কেউ পৃথিবীতে আসুক-- এমনটাই বিবাহসৃষ্ট 'পরিবার' ব্যবস্থার কাছে সমাজের প্রত্যাশা।[৬৯] কিন্তু 'উৎপাদন' মাত্রেই যে শারীরিক হবে তা কেন? এমন অনেক সফল দম্পতি আছেন যারা একই ক্ষেত্রে বা আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে মানসিকভাবেও (সাংস্কৃতিক অথবা নান্দনিক শিল্পকর্মে যুক্ত) প্রজননক্ষম। কিন্তু এই জাতীয় কোনও মানস-উৎপাদনের তত্ত্বকে পিতৃতন্ত্র আদৌ স্বীকার করে না, একমাত্র শরীর-সম্বন্ধযুক্ত উৎপাদনকেই মান্যতা দেয়। এ'ভাবে দেখলে পার্বতীর মনস্তত্ত্বকে একান্তভাবেই পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক মনে হয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অন্তত এক্ষেত্রে তাঁকে দেবীসুলভ কোনও উচ্চতা দেয় না, বরং বিপরীতলিঙ্গক পিতৃশাসিত ব্যবস্থার আদলের সঙ্গে মানানসই বানিয়ে দেয়। তাঁর চিন্তা ও আচরণের অনেকাংশই নির্ণীত হয়েছে পিতৃপ্রধান ব্যবস্থার perspective থেকে। তাছাড়া আরেকটা অনুমানও বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে, শিব যেমন গার্হস্থ্যযাপনের খুঁটিনাটিতে অনভ্যস্ত, উদাসীন, বিবাগী; তেমনই ক্ষেত্রবিশেষে আবার নারীসঙ্গলোলুপও বটে। তাঁর যত্র-তত্র বীর্যস্খলনের এবং দাম্পত্য-বর্হিভূত উত্তরাধিকার তৈরির অনেকান্ত লীলা পুরাণের গল্পে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এর থেকেই হয়তো পার্বতীর মনে এমন এক বিশ্বাস জন্মেছিল যে, শিবের ঔরসে সন্তানের মা হলে সংসার ব্যাপারে বহির্মুখ স্বামীকে হয়তো ঐক্যদাম্পত্যের (monogamy) কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনা যাবে। লোকপ্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, দাম্পত্য সন্তানে ফলধারণ করে। সন্তানের জন্মটাই যেন নারী-পুরুষের দাম্পত্য-যাপনের একমাত্র পূর্ণতার ফল, স্বামীকে দেওয়া স্ত্রীর জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই কার্যত একধরনের patriarchal নির্মাণ, যা মেয়েদের দেহ ও মনের ওপর পুরুষতন্ত্রের প্রভুত্ব নিশ্চিত করে। পার্বতীর divinity বা দেবত্ব এখানে অনেকটাই আচ্ছন্ন হয়েছে ঐতিহ্যবাহিত হিন্দু সমাজের চিরাচরিত বিশ্বাস এবং ধারণা অনুসারে। লিঙ্গ-মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখলে তাঁর মনোভঙ্গি এ প্রসঙ্গে পুংলিঙ্গশাসিত সমাজ-মানসের অনুগামী থেকেছে, লিঙ্গ-অতিক্রমী কোনও অবস্থানে পৌঁছতে পারেনি।

উপরোক্ত ভাবনাসূত্রে মনে হয়, *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এর গণেশ জন্মমূলে 'পার্বতীর'-ই অঙ্গজ, তাঁরই ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার ফল। প্রথম জন্মে শিবাশীষ নিশ্চয়ই একটা ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু জন্মপ্রক্রিয়ায় পার্বতীর সঙ্গেই গণেশের

সংস্রব। কারণ, দেবীর বস্ত্রাঞ্চল থেকেই তিনি উদ্ভূত। যদিও ঘটনা-পরম্পরায় মৃত্যুছোঁয়া প্রথম জন্মের পর তিনি শিব-পার্বতীর পরিবারে গজানন-রূপে অধিষ্ঠান করেছেন। এই পুনরাবির্ভাবে শিব এবং নন্দীর উদ্যোগও স্মরণযোগ্য। তাঁদের নির্বন্ধেই নবজাতকের হস্তীমুণ্ডলাভ ঘটেছে। এমনকী, এই পুনর্জাত গজানন শিবপুত্রের পরিচয়েই সম্মানিত হয়েছেন। কাজেই *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এর বর্ণনাক্রম লক্ষ করলে মনে হয়, গণেশজন্মের বৃত্তান্ত প্রাথমিকভাবে female line ধরে এগোলেও পরবর্তী স্তরে শিবপুত্রের স্বীকৃতিলাভের পর মুখ্যত male line-ই অনুসরণ করেছে। তা ছাড়া গণেশের রূপাঙ্কনেও শিবের ভাবধারার অনুসরণ লক্ষ করা যায়। পার্বতীর প্রতিপালনে বেড়ে উঠলেও তিনি শিবের মতোই পরমযোগী, অর্থাৎ ভাবমূর্তিতে শিবেরই ছায়া লক্ষণীয়। এর থেকে মনে হয়, মূলে গণেশজন্ম শক্তি কাল্ট-এর আশ্রয়গত হলেও গজানন হিসেবে পুনর্জন্মের পর গণপতির ভাবরূপ শৈব কাল্টেরই প্রভাবাধীন থেকেছে।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ-এর গণেশ বালরূপী, শিব-পার্বতীর সন্তানরূপেই তাঁর প্রকটন। পুনর্জন্মলাভের পর এই বালগণেশের রূপবর্ণনা করে বলা হয়েছে, তিনি অতি সুন্দর, খর্বকায়, স্থূলতনু, গজবদন, 'জবাকুসুমসঙ্কাশ' বা রক্তবর্ণ, 'মৃগাঙ্কধবলানন', চতুর্ভুজ, 'স্রবদ্দানগন্ধলুব্ধালি' অর্থাৎ কপোলনিঃসৃত মদস্রাবের সুগন্ধে প্রলুব্ধ অলিকুলের দ্বারা শোভিত এবং 'মহাদ্ভুতলোচন' অর্থাৎ অত্যাশ্চর্য নয়নে শিবের কাছে বিরাজমান ছিলেন। এখানে শিবের ক্রোড়স্থিত গজমুখকে বিশেষভাবে 'শিবনন্দন' বলা হয়েছে। এই শিবপুত্রকে দর্শনের জন্য সমস্ত দেবতারা উপস্থিত হয়েছেন এবং ব্রহ্মার প্রতিনিধিত্বে সেই বালককে গাণপত্যে অভিষিক্ত করা হয়েছে। ব্রহ্মা তাঁকে 'লম্বোদর' নামে অভিহিত করে সমস্ত দেবগণের মধ্যে অগ্রপূজ্য হিসেবে 'দেবরাজ'-এর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই চতুর্বাহু বালকের আয়ুধ হিসেবে বর্ণলোচনা সরস্বতী লেখনী, ব্রহ্মা জপমালা, ইন্দ্র গজদন্ত এবং লক্ষ্মী পদ্ম প্রদান করেছেন। এ ছাড়া পরিধানের জন্য শিব ব্যাঘ্রচর্ম ও বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র এবং বাহন হিসেবে পৃথিবী মূষিক উপহার দিয়েছেন। এরপর উপস্থিত মুনিগণ সেই রক্তবর্ণ শিবপুত্রের স্তব আরম্ভ করেন।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ-এ ব্রহ্মার বরে পুনর্জাত শিবপুত্র প্রথমপূজ্য রূপে স্বীকৃত হয়েছেন। যেহেতু শিবপুত্র গণেশ এবং শিব অভিন্নসত্তা, ফলে প্রথমে গণেশের পূজা সম্পূর্ণ করে পরে শিবের পূজা করণীয়। প্রজাপতি ব্রহ্মার ঘোষণামাফিক গণেশ একে একে বিবিধ পদমর্যাদা এবং নামসূচক অভিধা লাভ করেছেন। অগ্রপূজ্যতা ছাড়াও তিনি দেবগণের এবং বিশেষভাবে শিবগণের অধিপতি অর্থাৎ গণপতিরূপে নির্বাচিত হন। হস্তীমুখ হওয়ায় নাম হয় 'গজানন'। নন্দী ইন্দ্রের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে এবং ইন্দ্রবাহন ঐরাবতকে বধ করে তাঁর মস্তক এনেছেন

বলে গণেশ 'একদন্ত' নামে পরিচিত হন। গণেশের বীজরূপ নাম হয় 'হেরম্ব'। নিন্দার্থে তিনি 'লম্বোদর' নামে খ্যাত। তাঁর স্মরণমাত্রেই যাবতীয় বিঘ্ন অপসারিত হয় বলে শিবপুত্র গণেশ 'বিঘ্নেশ' নাম লাভ করেন। কেবল পদাধিকার বা বিভিন্ন নামঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি ব্রহ্মা, গণেশের মাহাত্ম্যের কথাও তাঁর বাক্যে উচ্চারিত হয়েছে। যে ব্যক্তি যাত্রাকালে বা কোনও শুভ কাজের সূচনামুহূর্তে গণেশকে স্মরণ করবে, তার যাত্রা বা সেই শুভকাজটি নিশ্চিতভাবেই সফল হবে। সমস্ত মঙ্গলকার্যেই এই 'গণাধিপ' বা গণপতির পূজা করা কর্তব্য। কারণ, গণেশ সন্তুষ্ট হলে তবেই সব দেবতারা পূজিত হয়ে ভক্তের কার্যসাধক হবেন।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ অনুসারে, গণেশ পার্বতীর প্রতিপালনে বেড়ে উঠলেও সংসারবিমুখ পরমযোগী হলেন। ঋষিগণ প্রতিনিয়ত তাঁর সঙ্গস্পর্শধন্য হয়ে বিবিধ নামে তাঁকে অর্চনা করেন। এখানে ঋষিদের স্তবে গণেশের পঞ্চাশটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন - গণেশ, গণনাথ, হেরম্ব, গিরিশাত্মজ, পার্বতী-নন্দন, বীর, দেবরাজ, গজানন, লম্বোদর, বিঘ্নরাজ, যোগী, সদ্‌যোগলক্ষণ, অগ্রপূজ্য, চতুর্বাহু, একদন্ত, লিপীশ্বর, ব্যাঘ্রচর্মাধর, ধীর, মঙ্গলরূপবান, শুক্লাস্য, মূষিকারোহী, মোক্ষদায়ক, দন্তকর, দন্তী, বৈষ্ণব, পরমার্থদৃক, পঞ্চপাণি, পঞ্চবক্ত্র, শিব, শঙ্কর, ঈশ্বর, হাবগত, নৃত্যকারী, শিবপুত্র, স্রবন্মদ, আনন্দানন্দ, অতিমনা, শৈব, ধর্ম, ধনেশ্বর, অনন্ত, জগদাধার, শশিসূর্যলোচন, সমুদ্রপাতা, সামুদ্রজঠর, অজয়, দিব্যরূপ, বারিনাথ, জয়, বিজয়। গণেশের এই পঞ্চাশটি নাম যে ব্যক্তি যাত্রা, পূজা ও দানকালে, শ্রাদ্ধকর্মে, গঙ্গাস্নানে, সন্তানের মঙ্গলকার্যে কিংবা প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে অথবা ভক্তিযুক্ত মনে শ্রবণ করে, তাদের বিঘ্ন দূর হয়, সম্পদ বৃদ্ধি হয়, সন্তানের মঙ্গল হয় এবং ইষ্টদেবে ভক্তি ও বাঞ্ছিত অর্থলাভ হয়ে থাকে।[৭০]

উপরের আলোচনা থেকে বঙ্গদেশের পৌরাণিক ঐতিহ্যে গজানন-গণেশের উপস্থাপনা এবং তাঁর রূপাঙ্কনের একটি স্পষ্ট বাঁকবদল লক্ষ করা যায়। পুরাণবিদদের মতে, সপ্তম শতকের পূর্বেই *দেবীপুরাণ*-এর রচনা ও সংকলনকাল ধরা হলে (কোনওমতেই ৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী নয়) বুঝতে হবে প্রাচীন বঙ্গদেশে 'বাল গণপতি'-র সমান্তরালে 'বীর গণপতি'-র একটি আদিধারা পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যেই বিকশিত হয়েছিল। বিশেষভাবে পুরুষাংশে জাত গণেশ জন্মকথায় গণেশের রূপায়ণ যে বলবীর্যবান পূর্ণপুরুষ রূপে, *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এর গণেশ-পরশুরাম মহাযুদ্ধের মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। ভুললে চলবে না, *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এর গণেশ পুণ্যকব্রতধারিণী পার্বতীর সন্তানরূপে শিব-শক্তি পরিবারে ঘটনা-পরম্পরায় গৃহীত হলেও জন্মমূলে তিনি কৃষ্ণ এবং শিবাত্মজ। কাজেই, বলবত্তায় তাঁর অধিকার জন্মসিদ্ধ। *দেবীপুরাণ*-এ অবশ্য গণেশের জন্মটাই purposive, শত্রুনিধনের জন্য পরিকল্পিত। দেবতারা

সম্মিলিতভাবে তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করে তাঁকে রণসাজে সাজিয়েছেন, যুদ্ধাস্ত্র প্রদান করেছেন। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে পূর্ণ হয়েছে রণস্থল। *দেবীপুরাণ*-এর এই বিনায়ক তো শক্তিমান যোদ্ধাই, তাঁর কোনও কুসুম-কোমল শৈশব নেই, নেই মাতৃসান্নিধ্য-বিজড়িত কোনও স্নেহাঞ্চল, জন্মকাল থেকেই তিনি যুদ্ধমোদী। শক্তিমান পুরুষ-প্রতীক হিসেবেই তাঁর অবতারণা। মনে হয়, masculinity-এর যে সমাজ-নির্ণীত সংজ্ঞা, তার সঙ্গে সংগতি রেখেই male soul হিসেবে তাঁর চারিত্র নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, *দেবীপুরাণ*-এর এই বীর গণপতির রূপায়ণ অথবা *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এর গণেশ-পরশুরাম মহাযুদ্ধের মধ্যে যে প্রবলবলী গণপতির পরিচয় ধরা আছে, বঙ্গদেশের ধর্ম-সামাজিক ক্ষেত্রে এই গণপতির অভিযাত্রা পরবর্তীকালে আর তেমন বিস্তৃত হয়নি। এই বলবীর্যদৃপ্ত পূর্ণযুবা গণপতি শিবপুত্র বা বিষ্ণুপুত্র রূপে বীরদর্পী হয়েও শক্তিরঙ্গবঙ্গভূমিতে ততটা অস্তিত্ববান হতে পারেননি। শক্তিসংসর্গে অর্থাৎ মাতৃস্নেহাশ্রয়ে 'সন্তান গণপতি'-রূপে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এতটাই বেড়েছে যে বীর গণেশের সমান্তরাল ধারাটি ক্রমশ ম্লান হতে হতে একসময় বঙ্গীয় স্মৃতিতে প্রায় লুপ্ত হয়েছে। স্বামী নির্মলানন্দের একটি আক্ষেপোক্তি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য: "...সামরিক গণের সহিত গণেশের সম্বন্ধ অস্বীকার্য্য নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, গণদেবতার এই বীর্য্যদৃপ্তলীলা আমরা অধুনা বিস্মৃত।"[৭১] এই উক্তি থেকেও স্পষ্ট যে, *দেবীপুরাণ*-এর বিষ্ণু-অংশজাত এবং শিবের ইচ্ছাসৃষ্ট বীর গণপতির রূপায়ণ পৌরাণিক পরম্পরায় ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়েছিল। *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এ গণেশের একদন্ত হওয়ার ঘটনায় তাঁর পরাক্রমের প্রকাশ ঘটলেও বিষ্ণু ও শিবাত্মজ গণেশ ক্রমশ শিব-পার্বতীর পুত্ররূপে একটি পারিবারিক চালচিত্রে সংস্থিত হয়েছেন। *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এর বর্তমান রূপটি দশম থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে বঙ্গীয় পণ্ডিতদের হাতে বিবিধ সংযোজন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়েছে। এই সময়পর্ব থেকেই শক্তি কাল্ট-এর সংস্রবে গণেশ বহুলাংশেই এককভাবে পার্বতীপুত্ররূপে অথবা শিব-পার্বতীর সন্তান হিসেবে বালগণেশ বা সন্তান গণপতির মূর্তিতে সমাদর লাভ করেছে। দশম বা একাদশ শতকে সংকলিত *মহাভাগবত পুরাণ*-এ গণেশ স্বয়ং বিষ্ণুর প্রতিমূর্তি হলেও তাঁর স্বাধীন স্বতন্ত্র বীরত্বব্যঞ্জক প্রকাশমূর্তিটি *দেবীপুরাণ*-এর পরে আর ফিরে আসেনি। ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সংকলিত *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এও শিব-পার্বতীর পুত্ররূপেই গণেশ প্রসিদ্ধ হয়েছেন। ফলে পৌরাণিক আখ্যানে বালগণেশের এই উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠার মধ্যেই পূর্বতন বীর গণপতির আদিধারাটি আত্মলোপ করেছে বলে মনে হয়।

৩.৩

মূর্তিশিল্প এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্যে গণেশ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশের নানা প্রান্তে গণেশের স্থানক, আসন এবং নর্তনশীল মূর্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। এইসব মূর্তিপ্রমাণের সূত্রে বাংলায় গণপতি উপাসনার চিহ্নগুলি শনাক্ত করা যায়। বর্তমানে বাংলার প্রেক্ষিতে গাণপত্য ধর্ম একটি ক্ষয়িষ্ণু পরম্পরা হলেও অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক বা ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বঙ্গদেশের পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মে গণেশ উপাসনার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। পূর্বোক্ত তিন প্রকার ভঙ্গির মধ্যে গণেশের চতুর্ভুজ আসন মূর্তিই আপেক্ষিক বাহুল্যে বঙ্গদেশে সবচেয়ে সম্মানিত। তবে প্রাচীন ও মধ্যপর্বের বাংলায় গণেশের মূর্তিবিন্যাসের ক্ষেত্রে আরেকটি রূপও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তা হল ষড়ভুজ বা অষ্টভুজের নৃত্যগণপতি। বৃহৎবঙ্গের নানা প্রান্তে বিশেষত অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে নৃত্যরত গণেশমূর্তির প্রাচুর্য দেখা গেছে।

এই নির্দিষ্ট কালখণ্ডে অবিভক্ত বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যতম শাখা হিসেবে শৈবধর্মের ব্যাপক বিস্তৃতি লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূলধারায় গণেশের প্রবেশ যেহেতু শিবগণরূপেই প্রথম পর্বে ঘটেছে, স্বভাবতই এই সময়ের গণেশমূর্তির রূপায়ণে শৈব প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। সপ্তম শতকে 'পরমশৈব' শশাঙ্কের রাজত্ব থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতকে বিজয় সেনের আমল পর্যন্ত একটা বড়ো সময় জুড়ে অবিভক্ত বাংলায় গণেশের রূপায়ণ, অন্তত মূর্তিতে এবং একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় কোষকাব্যের প্রমাণ ধরলেও শিবগণ হিসেবেই ঘটেছে। প্রাচীন বঙ্গে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের অনেকেই 'পরমসৌগত' অর্থাৎ বৌদ্ধমতের অনুগামী হলেও একমাত্র দ্বিতীয় মহীপাল ছাড়া বাংলা ও বিহারের পাল রাজাদের কেউই দীক্ষিত বৌদ্ধ ছিলেন না। চন্দ্ররাজাদের মধ্যেও লহড়চন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করেন। এমনকী 'ময়নামতী শাসন' থেকে বিষ্ণু ও শিবের উদ্দেশে তাঁদের শাসনদানের কথাও জানা গেছে। একইভাবে পালরাজারাও বৌদ্ধমত সমর্থনের পাশাপাশি স্মার্তব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। নারায়ণপালের প্রপৌত্র প্রথম মহীপাল ও তাঁর পুত্র নয়পাল শৈবধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। শেষবয়সে 'পরমসৌগত' মহীপাল যে শিব-শক্তির উপাসনায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাম্রশাসনগুলিতেও তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং বোঝা যায়, বৌদ্ধধর্মের প্রতি সহানুভূতির পাশাপাশি স্মার্তব্রাহ্মণ্য ধর্মব্যবস্থার প্রতিও পালরাজাদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল, এমনকী হিন্দু দেবতা ও ব্রাহ্মণদেরও তাঁরা নির্দ্বিধায় ভূমিদান করতেন। আচার্য

দীনেশচন্দ্র সরকার ‘মহীপালের চতুর্থ বর্ষের নারায়ণপুর মূর্তিলেখ’-র আলোচনা প্রসঙ্গে পালযুগের বঙ্গদেশে বৌদ্ধ-প্রভাবিতদের ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু রীতিতে সংমিশ্রিত হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন।[৭২] উদাহরণ হিসেবে মনে পড়বে, সমতটের বিলিকন্ধকবাসী বুদ্ধমিত্র স্থাপিত বিনায়ক-ভট্টারকের যে মূর্তি কুমিল্লার নারায়ণপুর থেকে পাওয়া গেছে, তা *নিষ্পন্নযোগাবলী* বা *সাধনমালা*-র মতো বৌদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত বিনায়কের লক্ষণের সঙ্গে মেলে না। বরং *বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ*-এর বর্ণনার সাদৃশ্যেই সেখানে গণপতি-বিনায়কের মূর্তি রূপায়ণ ঘটেছে। জম্ভলমিত্র বা বুদ্ধমিত্রের বণিক পরিবার আদৌ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন কিনা, তা নিয়েও সংশয় আছে। নামদুটিতে বৌদ্ধ প্রভাব থাকলেও দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁদের হিন্দু বলেই অনুমান করেছেন। এ এ ছাড়া কুমিল্লা জেলার মন্ধুকে চতুর্ভুজ গণেশের একটি অপূর্বসুন্দর আসনমূর্তি পাওয়া গেছে। (চিত্র ৪) বর্তমানে এ’টি ময়নামতী জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। গণেশমূর্তির বেদীতে উৎকীর্ণ লেখ অনুযায়ী, পালরাজা দ্বিতীয় গোপালের প্রথম রাজ্যাঙ্কে মূর্তিটি নির্মিত হয়। গণেশ এখানে মহারাজালীলাসন বা সুখাসনে উপবিষ্ট। তাঁর চার হাতে যথাক্রমে মাতুলুঙ্গ, মূলক, মোদকপাত্র ও পরশু বা কুঠার রয়েছে। তিনি সর্প-উপবীত পরিধানকারী। বেদিতে তাঁর বাহন হিসেবে ক্রীড়ারত মূষিককে দেখা যায়। কাজেই, এইসব উদাহরণের সাক্ষ্যে মনে হয় হিন্দু-বৌদ্ধের ধর্মবৃত্তে তেমন কোনও জলচল ভেদ ছিল না। এই যুগে একমাত্র দার্শনিকদের তর্কবিস্তার ছাড়া হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মমতের বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথকভাবে চেনার অন্য উপায় ছিল না। আসলে মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজে গৃহী বৌদ্ধ ও হিন্দু গৃহস্থের মধ্যে পার্থক্য তেমন ছিল না। অবদান-জাতকাদি বৌদ্ধ লোক-সাহিত্যের চেয়ে রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু ধর্মগ্রন্থের জনপ্রিয়তা বঙ্গীয় সমাজের সাধারণ স্তরে অনেক বেশি লক্ষ করা গেছে। ‘পরমসৌগত’ মদনপাল-ও তাঁর রাজমহিষী চিত্রমতিকাকে মহাভারত পাঠ করে শোনাবার জন্য জনৈক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন। এমনকী এই পর্বের বাংলায় বুদ্ধ-ও হিন্দুরের কাছে বিষ্ণুর অবতার বলে পূজিত হতেন।

এই ধর্মীয়-সামাজিক বাতাবরণের মধ্যেই স্মার্তব্রাহ্মণ্য ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গণপতি-গণেশ বঙ্গদেশে গুরুত্বলাভ করেন। মনে রাখতে হবে, আদিপর্বে বঙ্গদেশের ধর্মীয় ঐতিহ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল প্রথমপূজ্য হিসেবে নয়, সিদ্ধিদাতা ও বিঘ্নবিনাশক রূপে। সর্বভারতীয় স্তরে গণপতি-গণেশের ধারণার উৎসমূলে বিনায়ক জাতীয় অপশক্তির কোনওরকম তত্ত্বপ্রেরণা যদি থেকেও থাকে, পৌরাণিক ধর্মের মূলধারায় গৃহীত হওয়ার পর সেই বিঘ্নবাচক অপকারিত্বের আর কোনও চিহ্ন থাকে না। কাজেই, বঙ্গদেশের ধর্মধারায় গণেশের অন্তর্ভুক্তি আদ্যন্ত পৌরাণিক দেবতা হিসেবে ঘটেছে। মৈথিল স্মৃতিনিবন্ধ প্রমাণে তিনি দিকবন্ধনের দেবতা। শিব-শক্তি পরিবারের

সদস্য হিসেবেই প্রাথমিক স্তরে বাংলার মূর্তি-ভাস্কর্যে তাঁর অবতারণা। কিছু ক্ষেত্রে মাতৃকামূর্তিতে পার্শ্বদেবতা হিসেবে রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর। বাংলার উমা, গৌরী বা বিশালাক্ষী মূর্তির যেখানেই 'সহদেবতা' হিসেবে জায়গা পেয়েছেন গণপতি, প্রতি ক্ষেত্রেই মাতৃকাপ্রকৃতির 'সন্তান' অথবা মাতৃকাগণের 'প্রধান' হিসেবে তাঁর একটি বিশিষ্ট পরিচয় তৈরি হয়েছে। পালযুগের তেমনই কয়েকটি সানুচর মাতৃপ্রতিমায় গণেশের আসন ও স্থানক মূর্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া হল -

১। লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত শেষ পালরাজা পলপালের রাজত্বের পঁয়ত্রিশ বছরে উৎকীর্ণ দেবী পূর্ণেশ্বরীর মূর্তিতে পার্শ্বদেবতা বা অনুচর হিসেবে গণেশ উপস্থিত (চিত্র ৫)। পদ্ম-বেদির উপরিভাগে সন্তানসহ মাতৃমূর্তির ডানপাশে এক ক্ষুদ্রাকার গণপতি মহারাজালীলাসনে উপবিষ্ট। এখানে তিনি মাতৃকার গণদের অধিপতি। চতুর্ভুজ গণেশের ওপরের হাতদুটিতে যথাক্রমে মূলক ও কুঠার দেখা যাচ্ছে। নিচের হাতদুটি হাঁটুতে রেখে বিলাসাসন উপভোগ করছেন তিনি। মূর্তির পাদপীঠের লেখটিতে সিদ্ধ ও শ্রমণদের পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে।

২। পালযুগে গৌড়বঙ্গে দশম শতকে উৎকীর্ণ একটি সানুচর গৌরী মূর্তি (নামান্তরে চণ্ডী, উমা বা বিশালাক্ষী) মেট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। (চিত্র ৬) চতুর্ভুজ এই মাতৃমূর্তির বামদিকে কিছুটা ওপরে গণেশ বিদ্যমান। মূর্তিতে দেবী গৌরী তাঁর বাঁদিকের ওপরের হাতে যে পদ্মনালটি ধারণ করেছেন, সেই পদ্মের মধ্যে চতুর্ভুজ গণেশ আসনমূর্তিতে উপবিষ্ট। ক্ষুদ্রাকার গণেশ এখানে লম্বোদর ও গজমুখ। মস্তক মুকুটবিহীন। গলার যজ্ঞোপবীতটি নাভির ওপর পর্যন্ত এসেছে।

৩। দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে পালযুগের গৌড়বঙ্গে উৎকীর্ণ একটি সানুচর মাতৃকামূর্তিতে গণেশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। (চিত্র ৭) এই চতুর্ভুজ উমা বা বিশালাক্ষী মূর্তির ডানদিকে দ্বিভুজ গণপতি স্থানক মূর্তিতে বিরাজিত। খর্বাকার লম্বোদর গজানন এখানে মুকুট ও অন্যান্য অলংকার পরিহিত। গলদেশে যজ্ঞোপবীত দৃশ্যমান। দেহের নিম্নভাগে স্বল্পায়তন ধুতির মতো পরিচ্ছেদ। ডানহাতে কুঠারটি নিচের দিক করে ধরেছেন। বামহাতে রয়েছে মোদকপাত্র। শুণ্ডাগ্র দ্বারা তিনি মোদকাস্বাদনে রত। ভঙ্গির দিক থেকে তাঁর পা দু'খানি সমপদস্থানক। তিনি পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান। যদিও মূর্তিটি দ্বিভঙ্গ। কারণ কোমর থেকে বামদিকে যৎসামান্য হেলানো। গণেশ এখানে দেবীমাতৃকার সন্তান বা ক্ষেত্রপাল জাতীয় দেবতা। দেবীর সামনের ডান হাত বরাভয়মুদ্রায় গণেশের শির

স্পর্শ করেছে। উল্লিখিত চিত্রটি ইনভ্যালুয়েবল ডট কম নামক নিলামসংস্থা থেকে গৃহীত। ২০১৬-র ২৩ শে মার্চ মূর্তিটি প্যারিসে নিলাম হয়েছে।

৪। ক্ষেত্রসমীক্ষাপর্বে পুরুলিয়ার জৈন প্রত্নস্থল দেউলঘাটায় একটি ছোটো কক্ষে সংরক্ষিত চতুর্ভুজ এক মাতৃকামূর্তির ডানদিকে একটি ক্ষুদ্রাকার গণেশ মূর্তি দেখেছি আমরা। সম্ভবত জৈন শাসনদেবী বা যক্ষিণী জাতীয় দেবীর সহচর বা পার্শ্বদেবতা হিসেবে গণেশ এখানে উপস্থিত। বাঁদিকে আরেকজন দেবতা আছেন। তিনি ধনুকধারী স্কন্দ। তিনি গজমুখ, লম্বোদর ও যজ্ঞোপবীতধারী। অলংকৃত দেহ। নিচে বাহন ইঁদুরটিকেও দেখা যায়। অতিরিক্ত চন্দন ও সিঁদুর মাখানোর ফলে মূর্তিটির কারুকার্য বর্তমানে বিনষ্ট হয়েছে।

প্রাচীন বঙ্গে মানভূম অঞ্চলে (বর্তমান পুরুলিয়া) নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে জৈনদের যে প্রভাববলয় গড়ে উঠেছিল, এই জাতীয় মূর্তিপ্রমাণ থেকেই তা স্পষ্ট। উল্লিখিত কালসীমায় কাঁসাই, দামোদর, শিলাবতী ও সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে জৈন ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মানুষদের প্রচেষ্টায় গ্রামে গ্রামে বহু জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষভাবে দামোদর ও কাঁসাইকে কেন্দ্র করে একটি বিস্তৃত trade root বুধপুর ও পাকবিড়রার উপর দিয়ে বেনারস থেকে তাম্রলিপ্ত বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আরেকটি বাণিজ্যপথ ছিল দামোদরের তীরবর্তী তেলকূপি হয়ে রঘুনাথপুর, ক্ষেপুতপুর, দাসপুর, ঘাটাল হয়ে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত। এই দুটি মূল বাণিজ্যপথেই তামার ব্যবসা চলত। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দ্বারাই মুখ্যত মানভূমের জৈনমন্দিরগুলিতে চব্বিশজন তীর্থঙ্কর সহ অন্যান্য দেব-দেবীরা পূজিত হতেন। W.B. District Gazetteers-এও এ বিষয়ে সমর্থন মিলেছে। পরে ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দিলে জৈন ব্যবসায়ীরা দক্ষিণভারতে স্থানান্তরিত হওয়ায় তাদের স্থাপিত মন্দিরগুলি প্রথম অবস্থায় পরিত্যক্ত হলেও পরে হিন্দুদের দ্বারা অধিকৃত হয়। হাতবদলের ফলে কখনও নাম পালটে জৈন শাসনদেবী অম্বিকা রূপান্তরিত হন পার্বতীতে, ঋষভনাথ হন ভৈরবনাথ, ত্রিশলা পরিবর্তিত হন গণেশ জননীতে। জৈনধর্মে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের যে চব্বিশ জন শাসনদেবীর নাম পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুধর্মে সুপরিচিত। যেমন, কালী, অম্বিকা, মহাকালী, গৌরী, তারাবতী, ভৈরবী, চামুণ্ডা পদ্মাবতী প্রমুখ দেবী হিন্দুধর্মমণ্ডলেও সমান মর্যাদায় পূজিত। আসলে জৈনধর্মে শক্তিবাদ প্রবেশের সূত্রে বিভিন্ন দেবীমাতৃকার উপাসনা জৈনদের মধ্যে গৃহীত হয়। শক্তি ছাড়াও স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাস্যের অন্তর্গত শিব, সূর্য, গণেশ প্রমুখ দেবতার সাধনাও জৈনদের মধ্যে প্রচলিত হয়। আদি তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের সঙ্গে শিবের ভাবসাদৃশ্য জৈন ধর্মসমাজে সুবিদিত। পুরুলিয়ার অনেক জৈন প্রত্নস্থলেই বহু প্রাচীন শিবলিঙ্গ ও খোদিত বৃষমূর্তি দেখা যায়। যেহেতু বর্ধমান মহাবীর প্রবর্তিত জৈন ধর্মে সাধনার

বিরলতা লক্ষ করা যায়, ফলে সাধনাপ্রবণ জৈনরা শৈবধর্ম থেকে তন্ত্রকে গ্রহণ করে জৈনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে পূর্বাচার্য কীর্তানন্দ অবধূত জানিয়েছেন। কাজেই, পুরুলিয়ার প্রাচীন দেবদেউলগুলিতে জৈন তীর্থঙ্করদের সঙ্গে শিবলিঙ্গ, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর সহাবস্থান প্রায়শই দেখা গেছে।

মানভূমে তো বটেই, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে এইরকম মাতৃকাপ্রকৃতির পার্শ্বচর হিসেবে গণপতির অধিষ্ঠান বৃহৎবঙ্গের সর্বত্র মিলেছে। প্রসঙ্গত, ব্রিটিশ মিউজিয়াম (চিত্র ৯) এবং সানফ্রান্সিসকোর এশিয়ান আর্ট মিউজিয়ামে (চিত্র ১০) রক্ষিত সন্তানসহ ললিতা এবং পার্বতীর দুটি প্রস্তরমূর্তির উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রথমোক্ত ললিতামূর্তিতে দ্বিভুজ গণেশ দ্বিভঙ্গ হয়ে পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান। বাঁ-হাতে মোদকপাত্র এবং ডান হাতে কুঠারটি ধরে অস্ত্রের মুখ নিচের দিক করে ভূমিতে ঠেকিয়ে রেখেছেন। একদন্ত, লম্বোদরের কোমরের অংশটি বামদিকে বেশ কিছটা বক্রভাবে হেলে রয়েছে। ডান পা-টিও সামান্য বেঁকিয়ে তির্যকভাবে রেখেছেন। দ্বিতীয় মূর্তিতে পার্বতীর পার্শ্বদেবতারূপে চতুর্ভুজ গণেশকে দেখা যায়। হাতগুলিতে যথাক্রমে মূলক, পরশু, মোদকপাত্র ধারণ করেছেন। বাঁদিকের ওপরের হাতে বরমুদ্রা শোভমান। এইসব মূর্তি নিদর্শনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গণপতি মাতৃগণের অধিপতি রূপে দেবীর দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থান করেছেন।

মাতৃকাদেবীর পার্শ্বদেবতা হিসেবে প্রাচীন বঙ্গে গণেশ যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা জৈনধর্মে গুরুত্বলাভ করেছেন, তেমনই উল্লিখিত কালখণ্ডে গণেশের নৃত্যরূপ পূর্বভারতে গজাননের মূর্তিসংস্থানের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ হয়ে আছে। আগের অংশেই দেখেছি, বঙ্গীয় পুরাণাদির সূত্রে প্রাচীন বাংলায় গণেশ শক্তি বা পার্বতী ছাড়াও শিব এবং বিষ্ণুর সঙ্গে জন্মসম্পর্কে যুক্ত। কাজেই, পার্বতীপুত্রের পরিচয়টুকুর সমান্তরালে বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতিতে গণেশ শিব বা বিষ্ণুপুত্র হিসেবে এবং স্বয়ং বিষ্ণুর-ই একটি রূপভেদ হিসেবে পৌরাণিক আখ্যানে এমনভাবে বিকশিত হয়েছেন যে, মূর্তিরূপায়ণের ক্ষেত্রেও শিব অথবা বিষ্ণু-কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ভাবরূপের সংযোগ তৈরি হতেই পারে। নটরাজ শিব বা নটবর কৃষ্ণের প্রতিরূপ হিসেবে সম্মানিত গণেশের নৃত্যমূর্তির রূপায়ণে এই অন্তর্নিহিত সমন্বয়সূত্র কাজ করেছে। অনেকে দক্ষিণী নটরাজ মূর্তির সঙ্গে এই জাতীয় নৃত্যগণেশের সাদৃশ্যের কথা বলেন। যদিও 'Bengal School'-এর নটরাজ শিবের সঙ্গে দক্ষিণভারতীয় নটরাজের আবয়বিক সংস্থানের পার্থক্য আছে। কারণ, বাংলায় বহুবাহু 'উর্ধ্বলিঙ্গ' শিব-নটরাজ তাঁর 'bull-mount' নন্দীর পিঠের ওপর নৃত্যরত। দক্ষিণে তেমনটি দেখা যায় না।[৭৩] বাংলায় গণেশের নৃত্যমূর্তিগুলিতে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। হয় গণেশ তাঁর বাহন ইঁদুরের ওপর নৃত্যভঙ্গিতে দণ্ডায়মান, না হলে পদ্মের ওপর নৃত্যরত। একটি-দুটি নিদর্শনে মাত্র ভূমিপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান। বালগোপাল

বা কৃষ্ণের শৈশবলীলায় কালীয়নাগের ওপর তাঁর নৃত্যপ্রদর্শনের অনুষঙ্গও নটবর কৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্যমোদী গণেশের ভাবসাযুজ্যের সূত্র তৈরি করতে পারে।

বাংলায় নৃত্যগণেশের মূর্তিসংস্থানের ক্ষেত্রে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য কম-বেশি সমস্ত মূর্তিতেই দেখা গেছে। প্রথমেই অবয়ব-সংস্থানের প্রসঙ্গ। নৃত্য গণেশের মূর্তি স্বভাবতই দণ্ডায়মান। তবে standing pose and posture-এর ক্ষেত্রে কখনও দ্বিভঙ্গ (কোমর থেকে দেহকাণ্ড ডান বা বাঁয়ে সামান্য হেলে থাকে), কখনও ত্রিভঙ্গ (মৃণালদণ্ডের মতো পা থেকে কোমর, কোমর থেকে নিজের গ্রীবা এবং গ্রীবা থেকে মস্তক পর্যন্ত যথাক্রমে বাম ও ডানদিকে হেলে থাকে), আবার কখনও নৃত্যবেগ দেখানোর জন্য অতিভঙ্গ ঠামের প্রয়োগ দেখা যায়। পদসঞ্চালনের মুদ্রা হিসেবে ভরতনাট্যম্ নৃত্যধারায় যা তিস্র জাতি অর্থাৎ 'তা কি টা' বলে পরিচিত, গণেশের বেশিরভাগ নৃত্যমূর্তিতেই সেই 'তা কি'- ছন্দের পদভঙ্গির অনুসরণ দেখা গেছে। নৃত্য গণেশের হাতের সংখ্যা সাধারণভাবে ছয় অথবা আট হয়ে থাকে। মধ্যপ্রদেশের একটি নৃত্য গণেশমূর্তিতে হাতের সংখ্যা দশও দেখা গেছে। তবে বাংলায় ছয় বা আট হাতের নৃত্য গণেশ-ই সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। *শ্রীতত্ত্বনিধি*-তে উল্লিখিত মুদ্গলপুরাণোক্ত 'দ্বাত্রিংশ গণপতি ধ্যান'-এর ১৫ নং শ্লোকে নৃত্যগণেশের ধ্যানের বর্ণনায় বলা হয়েছে "পাশাঙ্কুশাপূপকুঠারদন্তচঞ্চৎকরাক্লৃপ্তবরাঙ্গুলীয়কম্।/ পীতপ্রভং কল্পতরোরধস্তং ভজামি নৃত্তোপপদং গণেশম্।।"[৭৪] তাঁর ছয়টি হাতে থাকবে যথাক্রমে পাশ, অঙ্কুশ, চালের মোদক, কুঠার ও ভগ্নদন্ত। নৃত্যবেগে চলমান একটি হাত আশীর্বাদ প্রদানের জন্য (বরদাহস্ত) থাকবে। হাতের আঙুলগুলি রত্নখচিত আংটি দ্বারা সজ্জিত থাকবে। তিনি কল্পতরুর নীচে নৃত্যমুদ্রায় বিদ্যমান। ধ্যানে তাঁকে পীতপ্রভ বা হলুদবর্ণ বলা হয়েছে। নৃত্যরূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য গণেশের বাম পা কিছুটা বক্রভাবে থাকে। যদিও প্রাপ্ত মূর্তিগুলির নিরিখে হাতের অবস্থান-ভঙ্গি বিচিত্র, এক-এক মূর্তিতে একেকরকম। হস্তসংখ্যাও চার, ছয়, আট নানারকম হয়ে থাকে। কোথাও নটরাজ শিবের পরিচিত নৃত্যমুদ্রার ব্যবহার ঘটেছে, কোথাও তিনি কটিহস্ত অর্থাৎ কোমরে হাত রেখে অলসভাবে দণ্ডায়মান। কোথাও বা তিনি বরদাহস্ত, কোথাও অভয়হস্ত, কখনও গজহস্ত বা শক্তি প্রদর্শনের ভঙ্গি, আবার কখনও কটকহস্ত অর্থাৎ হাতে পদ্মফুল ধরে থাকার ভঙ্গিমা দেখা যায়।

এনামুল হক তাঁর *Bengal Sculpture : Hindu Iconography upto C. 1250 A. D.* শীর্ষক গ্রন্থে ব্রোঞ্জ, পাথর এবং বাংলার গণেশমূর্তির নমুনা হিসেবে সর্বমোট তিয়াত্তরটি মূর্তির কথা বলেছেন। তার মধ্যে ত্রিশটি মূর্তি নৃত্যরত গণেশের।[৭৫] এখানে নৃত্যগণেশের কয়েকটি মূর্তিপ্রমাণ হাজির করা হল –

১। সুন্দরবন থেকে প্রাপ্ত কালিদাস দত্ত প্রদত্ত আনুমানিক দশম শতকের একটি কালো পাথরের ষড়ভুজ নৃত্যগণেশ মূর্তি কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে আছে। (চিত্র ১১) মূর্তিটি প্রায় অক্ষত হলেও চালচিত্রের ওপরের বাঁদিকের কিছুটা অংশ ভাঙা। ফলে বাম চালচিত্রের ওপরের অংশ থেকে বাঁদিকের ওপরের হাতের বেশ কিছুটা অংশ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। গণেশ খর্বদেহ, লম্বোদর, একদন্ত ও গজমুখ। শুণ্ডের সাহায্যে মোদকভক্ষণ করছেন। মাথায় জটামুকুট পরিহিত। নিম্নাংশ বস্ত্র পরিবৃত। নাভির নিম্নে কটিবন্ধনী দৃশ্যমান। গলায় হার ও উপবীত শোভিত। বাঁ দিকের ওপরের হাতের আয়ুধটি ভগ্ন হওয়ায় ঠিক চেনা যায় না। পরের হাতে কুঠার ধৃত, যদিও কুঠারের সম্মুখ অংশ ভাঙা। সামনের বাঁদিকের হাতটিতে মোদকপাত্রটি ধরে আছেন। ডানদিকের ওপরের হাতে মূলক বা মূলা, পরের হাতে অক্ষমালা এবং নিচের হাতটি আয়ুধহীন অবস্থায় রয়েছে। প্রাবন্ধিক কৃষ্ণকালী মণ্ডল ‘দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও সুন্দরবন অঞ্চলের গণেশ’ শীর্ষক প্রবন্ধে এই মূর্তিটির বিশ্লেষণে যদিও ‘ডান ঊর্ধ্বে পাশ’ এবং ‘ডান নিম্নে মণ্ড’ লিখেছেন। কিন্তু মূর্তিদর্শনে আমাদের তেমনটি মনে হয়নি। বাঁদিকের ওপরের হাত (ভগ্ন) এবং ডানদিকের নিচের হাত এই ধরনের মূর্তিতে অনেকসময়ই নৃত্যপ্রদর্শনের বিশেষ ভঙ্গি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গণেশ এখানে পদ্মের ওপর নৃত্যরত। ডান পা-টি পদ্মের ওপর স্থিত, বাঁ পায়ের পাতায় ভর দিয়ে গোড়ালি উঁচু করে নৃত্যভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। তাঁর পদ্ম আসনের নিম্নাংশের বাঁ দিকে দুগ্ধপাত্র হাতে পূজারী ও ডান দিকে জোড়করে এক ভক্তকে দেখা যাচ্ছে। পাদপীঠের দ্বিতীয় অংশের ডানদিকে মূষিকের অবস্থান। ইঁদুরের সামনেই একটি মোটা পদ্মনাল। এর ওপরের দ্বিস্তরীয় গোলাকার পদ্মেই গণেশের অধিষ্ঠান। পদ্মনালের বাঁদিকে একটি পরিপূর্ণ নৈবেদ্য পাত্র দেখা যাচ্ছে।

২। নিউ দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দশম শতকের বিহারের একটি নৃত্যগণেশ মূর্তির বিবরণ দিয়েছেন প্রাবন্ধিক বি. শর্মা তাঁর ‘Unpublished Pala and Sena Sculptures in the National Museum, New Delhi’ প্রবন্ধে।[৭৬] (চিত্র ১২) মূর্তিটি এক্ষেত্রে দ্বিভঙ্গ। গণেশ খর্বদেহ, একদন্ত ও লম্বোদর। মাথায় জটামুকুট। হাতে ও গলায় অলংকার পরিহিত। নাভিনিম্নে কোমরবন্ধ ও দেহের নিম্নভাগ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। গলা থেকে যজ্ঞোপবীত নিচ পর্যন্ত ঝুলছে। হাতের সংখ্যা আট। বাম ও ডানদিকের ওপরের হাত দুটিতে সর্প ধরে আছেন। বামদিকের দ্বিতীয় হাতে মূলা বা মূলক ও তৃতীয় হাতে মোদকপূর্ণ পাত্র ধরেছেন। সামনের বাঁদিকের হাতটি গজহস্ত মুদ্রারত। ডানদিকের ওপরের হাতে ডমরু, পরের হাতে অক্ষমালা ও নিচের হাতে কুঠার শোভিত। যদিও অক্ষমালা ধরলেও সামনের ডানদিকের হাত বরমুদ্রারত। বাঁ পা-টি সামান্য তেরছাভাবে ভূমিতে পাতা। ডান

পায়ের আঙুলগুলিতে ভর দিয়ে গোড়ালি উঁচু করে আছেন। পদ্ম বা ইঁদুর বাহনে নয়, গণেশ এখানে বিশেষ নৃত্যভঙ্গিতে ভূমির ওপর বিদ্যমান। নৃত্য গণপতির রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিভঙ্গের দিক থেকে তিনি যে নটরাজ শিবের সমানধর্মা, বিশেষভাবে এই মূর্তিটিই তার প্রমাণ। এখানে গণেশের সম্মুখস্থ ডান ও বামহাতের নৃত্যভঙ্গি নটরাজ শিবের বিশিষ্ট হস্তমুদ্রার সঙ্গে এতটাই অভিন্ন যে, শিবের দ্বিতীয় মূর্তি হিসেবে গণেশের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়মূল হয়। তা ছাড়া হস্তধৃত সর্প ও ডমরুর সঙ্গেও শিবের অব্যর্থ সাদৃশ্য মেলে। এই মূর্তির নিচে একটি অভিলেখ-ও যুক্ত আছে বলে প্রাবন্ধিক বি. শর্মা জানিয়েছেন।

৩। পালরাজত্বে আনুমানিক একাদশ শতকে প্রাপ্ত কালো পাথরের একটি নৃত্যগণেশ মূর্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের Chazen Museum Of Art-এ সংরক্ষিত আছে। (চিত্র ১৩) মূর্তিটি অষ্টভুজ ও ত্রিভঙ্গ। সম্মুখস্থ ডানহাতের বরমুদ্রাটি ভাঙা। অন্যান্য অংশ অভগ্ন। গণেশের দেহ খর্বাকার। তিনি একদন্ত ও লম্বোদর। গজমুখের শুণ্ডের সাহায্যে বাঁদিকের হস্তধৃত মোদকপাত্র থেকে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করছেন। মাথায় জটামুকুট পরিহিত। মুকুটের নিচ থেকে কপালের ওপর পর্যন্ত অলংকার নেমে এসেছে। হাতে বাজুবন্ধ ও বলয় দৃশ্যমান। দেহের নিম্নাংশে হাঁটু পর্যন্ত ধুতির মতো বস্ত্র পরিধান করেছেন। গলায় নানাবিধ হার ও স্বর্ণোপবীত দেখা যাচ্ছে। নাভিনিম্নে কটিবন্ধ ও পায়ে নূপুর শোভিত। বাঁদিকে ওপরের প্রথম হাতটি দোলাহস্ত, নৃত্যপ্রদর্শনে ব্যবহৃত। দ্বিতীয় হাতে মূলক বা মূলা জাতীয় সবজি, তৃতীয় হাতে পাশ বা সর্প এবং চতুর্থ হাতে মোদকপাত্র ধরে আছেন। ডানদিকে ওপরের প্রথম হাতে অক্ষমালা, দ্বিতীয় হাতে কুঠার, তৃতীয় হাতে ভগ্নদন্ত এবং চতুর্থ হাত-টি বরমুদ্রায় শোভিত। তিনি পদ্মের ওপর নৃত্যভঙ্গিতে অবস্থানরত। তাঁর ডান পা-টি পদ্মের ওপর কিছুটা বক্রভাবে পাতা। বাঁ পায়ের আঙুলগুলিতে ভর দিয়ে গোড়ালি উঁচু করে বিশেষ ভঙ্গিতে নৃত্যরত। তাঁর দু'পাশে দু'জন পুরুষ বাদক, সম্ভবত গজকর্ণ ও গোকর্ণ, নৃত্যে তাল সংগত করছেন। এরা পদ্ম-বেদির দু'দিকে উপবেশনরত। চালচিত্রটি অলংকৃত, কারুকার্যমণ্ডিত। দু'ধারে দুই উড়ন্ত বিদ্যাধর আছেন। মধ্যে প্রভাবলীর ওপরে একটি সগুচ্ছ আম্রপল্লব দেখা যাচ্ছে। পদ্ম-আসনের নিম্নভাগ প্রশস্ত ও অলংকরণযুক্ত। নিচের বেদির কয়েকটি ধাপ নকশা কাটা। মধ্যের অংশে কারুকার্যময় পুষ্প খচিত। নিচের বেদির ডান দিকে বাহন ইঁদুর গণেশের দিকে মুখ উঁচু করে চেয়ে আছে। বাঁদিকে এক ভক্ত নমস্কারের ভঙ্গিতে প্রণত।

৪। পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গারামপুর থেকে প্রাপ্ত কালো পাথরে নির্মিত দ্বাদশ শতকের একটি নৃত্যরত গণেশমূর্তি ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। (চিত্র ১৪) মূর্তিটি দ্বিভঙ্গ। গণেশ একদন্ত, লম্বোদর ও খর্বদেহ। মস্তকে জটামুকুট,

হাতে-গলায় অলংকারাদি পরিহিত। গলায় হার ছাড়াও যজ্ঞোপবীত শোভিত। দেহের নিম্নাংশে রত্নখচিত স্বল্পায়তন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। হাতের সংখ্যা আট। ডান দিকের নিচের হাতটি ছাড়া অন্য তিনটি হাতই ভাঙা। সামনের ডানহাতে সম্ভবত বরদমুদ্রার ভঙ্গি ছিল বলে মনে হয়। বাঁদিকের ওপরের হাতটি আয়ুধহীন, পরের হাতে পদ্ম এবং নিচের হাতে সর্প ধারণ করেছেন। সামনের হাতে মোদকপাত্র ধরেছেন। শুঁড়ের সাহায্যে মোদক ভক্ষণ করছেন। পদযুগল এখানেও পদ্মের ওপর সংস্থিত। বাঁদিকের পা তেরছাভাবে পদ্মের ওপর পেতে রেখেছেন। ডান পায়ের আঙুলগুলিতে ভর দিয়ে গোড়ালি উঁচু করে রয়েছেন। গণেশের পদ্ম-বেদির দু'দিকে সহযোগী দুই বাদক অন্য নৃত্যভঙ্গিতে উপস্থিত।

৫। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত ব্যাসল্ট পাথরে নির্মিত দ্বাদশ শতকের একটি নৃত্যগণেশ ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। (চিত্র ১৫) বৃহৎবঙ্গে নৃত্য গণপতির যে ঐতিহ্য অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে পূর্ণবিকশিত হয়েছিল, উদ্দিষ্ট মূর্তিটি সেই ধারায় একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদাহরণ। অন্যান্য মূর্তির মতো গণেশ এখানে পদ্মের ওপর বা ভূমিতে নৃত্যরত নন, বাহন ইঁদুরের ওপরেই নৃত্যভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। মূর্তিটি ত্রিভঙ্গ। খর্বদেহ, একদন্ত ও গজাননরূপেই তাঁর অবতারণা। মস্তকে জটামুকুট শোভিত, সারা দেহ অলংকারে সুসজ্জিত। গলায় উপবীত ধারণ করেছেন। নিম্নাংশ বস্ত্র পরিবৃত। পায়ে নূপুর পরেছেন। হাতের সংখ্যা আট। বাঁদিকের হাতগুলিতে পদ্ম, সর্প ও মোদকপাত্র ধরেছেন। সামনের হাতটিতে সম্ভবত বরমুদ্রার ভঙ্গিতে ছিলেন, ভেঙে যাওয়ায় স্পষ্ট বোঝা যায়নি। ডানদিকের হাতগুলিতে কুঠার, স্বদন্ত ও অক্ষমালা ধারণ করেছেন। সামনের হাতটি একইভাবে অভয়মুদ্রা প্রদানকারী। বাহন ইঁদুরের পিঠের ওপর গণেশ পা দু'খানি রেখেছেন। ডান পা একটু পিছিয়ে তির্যকভাবে পেতে রেখেছেন। বাঁ পায়ের আঙুলগুলিতে ভর দিয়ে গোড়ালি উঁচু করে রেখেছেন। এমনকী বাম পায়ের গোড়ালির অংশটি পার্শ্ববর্তী ডান পা সামান্য স্পর্শ করে আছে। বাহন ইঁদুর মুখ উঁচু করে গণেশের হস্তধৃত মোদকপাত্রের দিকে চেয়ে আছেন। ইঁদুরটি এখানে দ্বিস্তরীয় পদ্মের ওপর অবস্থিত। মূর্তির ওপরের চালচিত্রে প্রভাবলীর মধ্যে সপল্লব আম্রগুচ্ছ সিদ্ধি ও সাফল্যের প্রতীক হিসেবে বর্তমান। বাংলাদেশের দিনাজপুর থেকেও একাদশ-দ্বাদশ শতকের একটি অষ্টভুজ নৃত্যগণেশের মূর্তি পাওয়া গেছে। (চিত্র ১৬) এখানেও গণেশ ইঁদুরের ওপর নৃত্যভঙ্গিতে দণ্ডায়মান।

৬। পালযুগে আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতকে কালো পাথরে নির্মিত একটি অষ্টভুজ নৃত্যগণেশের মূর্তি এক জাপানী মূর্তি সংগ্রাহকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পাওয়া গেছে। (চিত্র ১৭) উচ্চতায় মূর্তিটি ২২ ইঞ্চি বা ৫৫. ৯

সেন্টিমিটার। শৈলীর দিক থেকে এ'টি পূর্বোক্ত মূর্তির বেশ কাছাকাছি। এখানেও গণেশ ত্রিভঙ্গ, একদন্ত ও লম্বোদর। মাথায় অলংকারখচিত জটামুকুট। দেহের নিম্নভাগে হাঁটু পর্যন্ত ধুতির মতো বস্ত্র পরিধান করেছেন। একইভাবে হাতে বাজুবন্ধ ও বলয়, গলায় হার ও উপবীত, নাভিনিম্নে কটিবন্ধ ও পায়ে নূপুর শোভিত। হাতের আয়ুধসজ্জাও প্রায় একজাতীয়। বাঁদিকের ওপরের হাতটি শূন্য, পরের হাতে মূলা, তৃতীয় হাতে সর্প ও সামনের হাতে মোদকপাত্র ধরে আছেন। শুঁড়ের সাহায্যে মোদক ভক্ষণ করছেন। ডানদিকের ওপরের হাতে অক্ষমালা, পরের হাতে কুঠার ও নিচের হাতে স্বদন্ত ধরেছেন। সামনের হাত-টি অভয়প্রদানকারী। পায়ের অবস্থান-ভঙ্গিও অনুরূপ। পদ্মের ওপর নৃত্যরত। পদ্ম-আসনের দু'দিকে দুই সহযোগী বাদক। এক্ষেত্রেও পদ্মাসনের নিচের অংশটি প্রশস্ত, নকশা কাটা ও ধাপযুক্ত। তফাত শুধুমাত্র ভক্ত ও বাহনের অবস্থানে। বাহন ইঁদুর এখানে মধ্যের অংশে উপস্থিত। বেদীর ডানদিকে গণেশ ভক্ত করজোড়ে প্রণত। বাঁদিকে গণেশের ভোগরূপে প্রদত্ত একটি মোদকপূর্ণ পাত্র রয়েছে।

৭। বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত একাদশ-দ্বাদশ শতকের একটি মুণ্ডহীন ভগ্ন নৃত্যগণেশ মূর্তি ক্ষেত্রসমীক্ষাপর্বে আমরা দেখেছি। (চিত্র ১৮) মিউজিয়ামে প্রদর্শিত তথ্য অনুসারে, মূর্তিটি বাঁকুড়ার জয়পুরের শলদা থেকে রাধারমণ ঘটকের সংগৃহীত। গণেশের মাথা এবং হাতের আঙুলগুলি ছাড়া মূর্তির অবশিষ্ট অংশ অক্ষত। ফলে চতুর্ভুজে হস্তায়ুধগুলি কি কি ছিল বলা সম্ভব নয়। গণেশ এখানে ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে দণ্ডায়মান। কণ্ঠহার, বাজুবন্ধ ও দেহের নিম্নাংশের পরিধানটি দেখা যায়। মূর্তির দৈহিক গঠন, ত্রিভঙ্গ ঠাম এবং লম্বিত উদর দেখেই বিশেষজ্ঞরা এ'টিকে নৃত্যগণেশের মূর্তি বলে শনাক্ত করেছেন।

বাঁকুড়ার মোলবোনার শিবমন্দিরে ক্ষেত্রসমীক্ষাকালে চতুর্ভুজ গণেশের একটি আশ্চর্য মূর্তি আমাদের চোখে পড়েছে। (চিত্র ১৯) মূর্তিটি বিশেষ এই কারণে যে, স্থানীয় লোকেদের মধ্যেও এই মূর্তিটির পরিচয় 'অপদেবতা' হিসেবে। মূল শিবমন্দিরে তো নয়ই, বাইরের চাতালে বহু ভাঙা পাথরের মূর্তির মধ্যে সেটির অধিষ্ঠান। ব্রাহ্মণপূজ্য নয় বলে অনেকে এই মূর্তি নিম্নবর্ণের মানুষের পূজ্য বলে মনে করেন। পূজারীর মতে, এ'টি ক্ষেত্রপাল বা নিম্নজাতির দেবতা হিসেবে পরিচিত। হয়তো কোনও আদিম উপজাতি সমাজের পূজ্য-ও হতে পারেন। এই মূর্তি শাস্ত্রসম্মত নয় বলে একে স্থানীয় গ্রামদেবতা হিসেবে বাইরে রাখা হয়েছে। মন্দিরের বাইরে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার ফলে বর্তমানে মূর্তির কিছু অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। তা ছাড়া সমগ্র দেহ এমনভাবে সিঁদুরলিপ্ত যে মুখমণ্ডল ও আয়ুধগুলি অতিমাত্রায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবে হস্তভূষণগুলির মধ্যে যে বিশেষত্বটি বাংলার গণেশমূর্তির

আলোচনায় সবচেয়ে জরুরি তা হল, ইনি বাঁদিকের নিচের হাতে নরকরোটি ধারণ করেছেন। মুকুটপরিহিত একটি কাটা মুণ্ড। মুণ্ডের চোখ-নাক পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। চতুর্ভুজ গণেশমূর্তির প্রথাগত আয়ুধসজ্জার দিক থেকে এ'টি অবশ্যই ব্যতিক্রম। বাঁদিকের ওপরের হাতটি শুণ্ডাগ্র স্পর্শ করে আছে। হস্তদ্রব্যটি প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। মোদক হওয়াই সঙ্গত। যেহেতু শুণ্ডাগ্র দ্বারা মোদক আস্বাদন গণেশমূর্তির ক্ষেত্রে একটি পরিচিত মুদ্রা। ডানদিকের ওপরের হাতে উদ্যত কুঠার ও নিচের মুষ্টিবদ্ধ হাতে ওই মুকুটযুক্ত নরমুণ্ডের চুলের গোছা ধরে আছেন সম্ভবত। এতই অস্পষ্ট যে মন্তব্য করা মুশকিল। মূর্তিটি নৃত্যরত। গণেশ এখানে লম্বোদর ও একদন্ত। বিশেষ এই মূর্তিতে তাঁর মধ্যপ্রদেশটি একটু বেশিরকমের স্থূল। গজকর্ণটিও শোভমান। গজাননের হস্তীশুণ্ডটি বামদিকে প্রসারিত হয়ে ওপরের হাতে প্রায় মিশে গেছে। নাভিনিম্নে কোমরবন্ধনী ও স্বল্পায়তন কোনও বস্ত্রখণ্ড বা ব্যাঘ্রচর্ম পরিচ্ছেদ হিসেবে থাকতে পারে। গাঠনিক স্তরে মূর্তিটির এতই ক্ষয় হয়েছে যে, দেহের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। পা দু'খানির ভঙ্গিও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বাম পায়ের সাহায্যে ভূমি স্পর্শ করে আছেন। ডানদিকের পা-টি ঈষৎ বক্রভাবে শূন্যে উত্তোলিত। অনেকটা শিবের উর্ধ্বতাণ্ডব মূর্তির মতো। তা ছাড়া শুধু নৃত্যভঙ্গিতেই নয়, হস্তধৃত কপাল বা নরকরোটি ধারণের সূত্রেও তিনি শিবের সঙ্গে সগোত্র। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ও ক্ষেত্রগবেষক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় 'বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় নতুন গণেশ মূর্তির সন্ধান' শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন, দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী রাজগ্রামের বিরিঞ্চি নারায়ণ শিবমন্দিরের পাশে বর্তমান বাসিন্দা দিলীপ কুণ্ডুর বাড়ির ভিত কাটার সময় বেশ কিছু পাথরের মূর্তির মধ্যে মোলবোনার গণেশমূর্তির মতোই একইরকম একটি মূর্তি পাওয়া যায়। কাটামুণ্ডধারী সেই গণেশমূর্তি দেখেই তারা ভয়ে তৎক্ষণাৎ মূর্তিটিকে মাটির নিচে সমাধিস্থ করে দেন।[৭৭]

ঢাকার রামপাল প্রত্নক্ষেত্র থেকেও একটি পঞ্চমুখী ও দশভুজ হেরম্ব গণেশের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। বর্তমানে মূর্তিটি মুন্সীগঞ্জের একটি বৈষ্ণব মঠে রক্ষিত আছে। পণ্ডিত নলিনীকান্ত ভট্টশালী সেই মূর্তি প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, হেরম্ব গণেশের পাঁচ মুখ, দশ হাত, বাহন সিংহ, মস্তকে জটামুকুট।[৭৮] প্রস্তরনির্মিত এই মূর্তির প্রভাবলীর উপরিভাগে ছয়টি ক্ষুদ্রাকার গণেশমূর্তি খোদিত আছে, যা গাণপত্যের ছয়টি শাখা বা সম্প্রদায়ের প্রতীক। এর দ্বারা অবিভক্ত বঙ্গে গণপতি উপাসনার চিহ্ন দৃঢ়মূল হয়। মূর্তির ডানদিকের হাতগুলিতে রয়েছে বরমুদ্রা, জপমালা, শর ও টঙ্ক। আরেকটি হাত ভাঙা। বাঁ দিকের হাতে ভগ্নদন্ত, পাশ, অভয়মুদ্রা ও মোদকভাণ্ড রয়েছে। সপ্তম হাতের বস্তুটি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় চেনা যায় না। (চিত্র ২০) ভট্টশালী একে মুগডালের বীচিপূর্ণ পাত্র ভাবলেও এনামুল হক কর্তিত নরমুণ্ড ভেবেছেন। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত আবার লিখেছেন, "আমি তা মনে করি না। গণেশের কোনো

প্রতিমাতে অদ্যাবধি নরমুণ্ড দেখা যায়নি।”[৭৯] এই নির্ধারণ ঠিক নয়। কারণ, *শারদাতিলক তন্ত্র*-এ হেরম্ব গণপতির মূল ধ্যানমন্ত্রে (‘শিরোহক্ষাত্মিকাম্ মালাং’), রাঘব ভট্টের টীকোক্ত ধ্যানান্তরে (‘কপালং’) এবং রাঘবভট্টেরও পূর্বকালীন টীকা *গূঢ়ার্থদীপিকা* (‘শিরোভির্গ্রথিতাং মালাং’) প্রমাণে গণেশের আয়ুধ সংস্থানের যে বর্ণনা আমরা পাই, তাতে তাঁর একটি হাতে কপাল বা শিরোহস্থিখণ্ড অথবা শিবের দ্বারা গ্রথিত মুণ্ডমালা থাকা শাস্ত্রসম্মত ব্যাপার। কাজেই মনে হয়, এনামুল হকের অনুমান এক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য। এই প্রসঙ্গে মোলবোনার নরকপালধারী গণেশমূর্তির সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রাপ্ত হেরম্ব গণেশের আয়ুধগত সাদৃশ্য-ও প্রমাণিত হয়। মোলবোনার নর্তনশীল গণেশ হেরম্ব গণপতি না হলেও শিবপুত্র বা শিবের দ্বিতীয় মূর্তি হিসেবে তাঁর হাতে নরমুণ্ড বা মুণ্ডমালা থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বাঁকুড়ার এই নৃত্যগণেশই সম্ভবত এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত নরকপালধারী গণেশমূর্তির একমাত্র দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশের পাহাড়পুর সংগ্রহশালায় একাদশ-দ্বাদশ শতকের দুটি নৃত্যগণেশ এবং একটি চতুর্ভুজ আসনমূর্তির গণেশ রয়েছে। (চিত্র ২১) এ ছাড়া বিক্রমশীলা মহাবিহারের মিউজিয়ামেও একটি ষড়ভুজ নৃত্যগণেশ মূর্তি সংরক্ষিত আছে। (চিত্র ২২)

এই ধরনের মূর্তিপ্রমাণের সূত্রে মনে হয়, প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের বঙ্গে শিবসদৃশ বা কৃষ্ণসদৃশ গণেশের নৃত্যমূর্তির বিশেষ প্রচলন ছিল। মূর্তিশিল্পে নৃত্যগণেশের নিদর্শনের পর আমাদের আলোচ্য গণপতির বেশ কিছু আসন ও স্থানক মূর্তি, যেখানে এককভাবে গণপতি রূপায়িত হয়েছেন।

ক। চিত্রে পালযুগের একটি চতুর্ভুজ গণেশ দেখা যাচ্ছে। ইনি অর্ধপর্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট। হাতগুলিতে যথাক্রমে মূলক, অক্ষমালা ও মোদকপাত্র ধারণ করেছেন। বাঁদিকের সামনের হাতের আঙুলগুলি ভগ্ন হওয়ায় হস্তদ্রব্যটি দেখা যাচ্ছে না। বেদিকার নিচে উপস্থিত বাহন ইঁদুর গণেশের দিকে মুখ করে চেয়ে আছে। (চিত্র ২৩)

খ। পোর্টল্যাণ্ড আর্ট মিউজিয়ামে পাল আমলের আরেকটি চতুর্ভুজ গণেশ ললিতাসনে পদ্মের ওপর উপবিষ্ট রয়েছেন। তিনি বাঁদিকের ওপরের হাতে কুঠার ও নিচের হাতে মোদকপাত্র এবং ডানদিকের ওপরের হাতে মূলক ও নিচের হাতে অক্ষমালা ধারণ করেছেন। গণেশ শুণ্ড দ্বারা মোদক আস্বাদনে রত। বাহন ইঁদুর নিম্ন-বেদিকার দক্ষিণপার্শ্বে পদ্মের ওপর উপস্থিত। (চিত্র ২৪)

গ। বাঁকুড়ার রাইপুর ব্লকের (জে. এল. নং ২৩৯) তারাফেনী উপত্যকায় দেমুশান্যা গ্রাম জৈন প্রত্নস্থল হিসেবে পরিচিত। এই গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় একটি ছোট মন্দিরের সিমেন্টের চাতালে জৈন তীর্থঙ্করদের কতকগুলি ভগ্নমূর্তির সঙ্গে একটি সিঁদুরলিপ্ত গণেশমূর্তি ক্ষেত্রসমীক্ষাপর্বে আমরা দেখেছি। (চিত্র ২৫) প্রস্তরনির্মিত মূর্তিটি অক্ষত এবং নিত্য পূজিত হয়। আনুমানিক উচ্চতা তিনফুট। নীলাভ রামখড়ি পাথরে তৈরি এই মূর্তিতে গণেশ বাঁ পা মুড়ে, ডান পা ঝুলিয়ে ললিতাসনে উপবিষ্ট। মূর্তিটি চতুর্ভুজ। ডানদিকের একটি হাতে পরশু বা কুঠার ও অন্য হাতে একটি মোদকপাত্র ধারণ করেছেন। গণেশের শুঁড়টি কিছুটা বেঁকে ডান হস্তধৃত ওই মোদকপাত্রের প্রায় ভেতরে ঢুকে গেছে। বাঁদিকের একটি হাতে পাশ বা বন্ধনরজ্জু ধরেছেন, অন্য হাতের আয়ুধটি অতিরিক্ত সিঁদুরচর্চিত হওয়ায় অস্পষ্ট। গণেশের গায়ে সর্পোপবীত, মাথায় ত্রিজটা মুকুট ও কোমরবন্ধে সম্ভবত ঘণ্টামালিকা আছে। মূর্তির পাদপীঠে বাহন ইঁদুর উপস্থিত। প্রভাবলীর দু'দিকে দু'জন উড়ন্ত বিদ্যাধরের মূর্তি দেখা যাচ্ছে।

ঘ। বাঁকুড়ায় দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে শৈবতীর্থ এক্তেশ্বর (জে. এল. নং ২০২) চৈত্র মাসের শিবের গাজনের জন্য বিখ্যাত। এই মন্দিরে চামুণ্ডা, লোকেশ্বর, বিষ্ণু, ভাঙা বাসুদেব মূর্তির সঙ্গে ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত একটি অক্ষত গণেশমূর্তি ক্ষেত্রসমীক্ষাকালে আমরা দেখেছি। (চিত্র ২৬) বেগলার তাঁর রিপোর্টে সর্বপ্রথম এই মূর্তিটির উল্লেখ করেছিলেন। গণেশ এখানে পদ্মবেদীর ওপর বাঁ পা মুড়ে ও ডান পা ঝুলিয়ে ললিতাসনে উপবিষ্ট। বেদির পাদপীঠে অবস্থিত ইঁদুরের ওপর ডান পা-টি রেখেছেন। গলায় সর্পোপবীত, হাতে কেয়ূর, বলয় প্রভৃতি অলংকার, পায়ে নূপুর, মাথায় জটামুকুট, কটিদেশও অলংকারে সজ্জিত। চতুর্ভুজ গণেশের বাঁদিকের ওপরের হাতে পরশু ও নিচের হাতে মোদকভাণ্ড এবং ডানদিকের ওপরের হাতে পদ্ম ও নিচের হাতে জপমালা বিদ্যমান। প্রভাবলীর দু'পাশে উড়ন্ত কিন্নর-কিন্নরী বা বিদ্যাধরদের মূর্তি এখানেও দৃশ্যমান।

ঙ। বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের বহুলাড়ায় (ওন্দা থানা, জে. এল. নং ২১১) সিদ্ধেশ্বর মন্দির জৈনদের প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে সিদ্ধেশ্বর শিবলিঙ্গ ছাড়াও পার্শ্বনাথ, মহিষমর্দিনী দুর্গা ও ক্লোরাইট পাথরে তৈরি একটি চতুর্ভুজ গণেশমূর্তি আমরা দেখেছি। (চিত্র ২৭) গণেশ এখানে একটি কারুকার্যময় বেদিকার ওপর পর্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট। পাদপীঠের মাঝামাঝি জায়গায় ইঁদুর বাহন উপস্থিত। ইঁদুরের বাঁ দিকে একজন পুরুষ ও নারী গণেশ এখানে একদন্ত ও লম্বোদর। মাথায় রত্নমুকুট, গায়ে নাগোপবীত, হাতে বালা ও ভুজবন্ধ, পায়ে নূপুর এবং কোমরবন্ধনী দেখা যাচ্ছে। হাঁটুর ওপর পর্যন্ত একটি ছোটো ধুতি জাতীয় বস্ত্র পরিধান করেছেন। বাঁদিকের ওপরের হাতের অস্ত্রটি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, সম্ভবত কুঠার হবে। নিচের হাতে মোদকপূর্ণ পাত্র। গণেশ তাঁর

বামমার্গী শুণ্ডের সাহায্যে ওই পাত্র থেকে মোদক ভক্ষণ করছেন। ডানদিকের ওপরের হাতে অক্ষমালা ও সামনের হাতটিতে ভগ্নদন্ত ধারণ করে আছেন। সামনের হাতের কনুইয়ের অংশটি ডান পায়ের হাঁটু স্পর্শ করে আছে। প্রভাবলীর দু'দিকে উড়ন্ত দুই বিদ্যাধরের মূর্তি দেখা যাচ্ছে।

চ। বহুলাড়ার গণেশমূর্তির মতোই পর্যঙ্কাসনে উপবেশনরত আরেকটি গণেশমূর্তি আমরা দেখেছি বাঁকুড়ার ওন্দা থানার হরিহরপুর (ওন্দা, জে. এল. নং ১০৮) গ্রামের শিবমন্দির লাগোয়া চত্বরে। (চিত্র ২৮) শিবমন্দিরের পার্শ্ববর্তী চত্বরে একটি বাঁধানো চাতালে তীর্থঙ্করদের অনেকগুলি ভাঙা মূর্তি, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতির সঙ্গে গণেশ মূর্তিটিও অক্ষত অবস্থায় বর্তমান। এ'টি অন্যান্য গণেশমূর্তির তুলনায় বেশ খানিকটা আলাদা। গজমুখের বৈশিষ্ট্যটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রকট। চতুর্ভুজ এই গণেশের হস্তীশুণ্ডটিও দক্ষিণমুখী। ডানদিকগামী শুঁড়ের গণেশমূর্তিতে শিবত্বের ছাপ স্পষ্ট। বিশ্বাস অনুসারে এই জাতীয় মূর্তি সংসারবিমুখ, পরমযোগী, নিরাকাঙ্ক্ষ মহাদেবের আসনের অভিমুখী বলে একে গৃহের পক্ষে অনুপযুক্ত এবং সংসারত্যাগী সাধকগণের পরমসেব্য মনে করা হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় আমরা এমন দক্ষিণমার্গী শুণ্ডযুক্ত গণপতি বিশেষ একটা পাইনি। গণেশের বাঁদিকের ওপরের হাতের আয়ুধটি চেনা যায় না। নিচের হাতটি মোড়া বাঁ-পায়ের ওপর রাখা। ডানদিকের ওপরের হাতে কুঠার রয়েছে। সামনের হাতটি ডান পায়ের হাঁটুর ওপর রাখা। গণেশ প্রায় যেন গাঁওবুড়োর মতো সুখাসন উপভোগ করছেন। গণেশের মস্তক মুকুটহীন। একধরনের আদিম অসংস্কৃত দেহবিন্যাস তাঁর। গায়ে নাগোপবীত ছাড়া খুব একটা অলংকার নেই। কেবল ডান পায়ে বালা দেখা যায়। গণেশের বসবার বেদীর নিচে বাহন হিসেবে বেশ বড়ো একটি ইঁদুর রয়েছে।

ছ। বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদ তীরবর্তী পাত্রসায়র থানার নাড়িচার সর্বমঙ্গলা মন্দিরের গর্ভগৃহে একটি গণেশমূর্তি আমরা দেখেছি। (চিত্র ২৯) মূর্তিটি মহিষমর্দিনী দুর্গা, সর্বমঙ্গলা, কার্তিকের সঙ্গে একই বেদীতে অবস্থিত ও নিত্য পূজিত। সিঁদুরলিপ্ত হওয়ায় আয়ুধগুলি স্পষ্ট নয়। ক্লোরাইট পাথরে তৈরি এই মূর্তি চতুর্ভুজ। গণেশ এখানে অর্ধপর্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট। গণেশের শুণ্ডটি বামমার্গী। বাঁদিকের নিচের হাতে থাকা মোদকটি শুণ্ডের সাহায্যে ভক্ষণ করছেন গণপতি।

জ। দক্ষিণ বাঁকুড়ার রানীবাঁধ থানার অম্বিকা নগরের নিকটবর্তী কুমারী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত একাদশ-দ্বাদশ শতকের গণেশের একটি আসনমূর্তি বর্তমানে বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত আছে। এই পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালাটি পরিদর্শনের সময় গণেশের বেশ কয়েকটি প্রত্ননিদর্শন আমাদের নজরে পড়েছে। (চিত্র ৩০) সেগুলির মধ্যে উদ্দিষ্ট গণেশমূর্তিটিই আয়তনে সবচেয়ে বড়ো। পুরাকৃতি ভবনের

প্রত্নতত্ত্ব গ্যালারির উওর-পূর্ব দিকের একটি প্রদর্শন বেদিতে মূর্তিটি রাখা আছে। বক্রতুণ্ড, লম্বোদর, একদন্ত গণেশ এখানে অর্ধপর্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট। সিদ্ধিদাতার হস্তসংখ্যা চার। তিনি জটামুকুট পরিহিত। অলংকৃত দেহ। নাগোপবীত দৃশ্যমান। ডানদিকের ওপরের হাতে কুঠার ও নিচের হাতে অক্ষমালা এবং বামদিকের ওপরের হাতে মূলক ও নিচের হাতে সম্ভবত মোদকপাত্র ধরা ছিল। নিচের হাতটি কিছুটা ভেঙে যাওয়ায় হস্তদ্রব্যটি স্পষ্ট নয়। তবে বোঝা যায়, গণেশ তাঁর বামমার্গী শুঁড়ের সাহায্যে মোদকপাত্র থেকে মোদক আস্বাদন করছেন। পদ্মাসনের নিচে ইঁদুরবাহন এবং একজন গণেশভক্ত যুক্তকরে উপস্থিত। গণেশের মাথার পেছনে একটি উলটোনো এর মতো আকৃতিবিশিষ্ট প্রভামণ্ডল বা জ্যোতির্বলয় দেখা যায়। তার দু'দিকে মাল্যধারী দু'জন উড়ন্ত বিদ্যাধরের মূর্তি দৃশ্যমান।

ঝ। পুরুলিয়ার প্রত্নক্ষেত্র তেলকূপির অতীতের দেবদেউলগুলির মধ্যে উত্তরদুয়ারী এককক্ষবিশিষ্ট সপ্তম দেউলের প্রবেশপথে একটি গণেশের মূর্তি ছিল বলে জে. ডি. বেগলারের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে। এ ছাড়া একাদশ দেউলের প্রবেশদ্বারের ওপরেও একটি গণেশের মূর্তি খোদিত ছিল। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার ২ নং ব্লকের অন্তর্গত জয়পুর গ্রামের কালীমন্দিরে একটি গণেশ-জননী মূর্তি এবং গণেশের একটি প্রস্তরনির্মিত স্থানকমূর্তির বিবরণ দিয়েছেন *মন্দিরনগরী তেলকূপি : সেকাল একাল* গ্রন্থে গবেষক সুভাষ রায়।[৮০] জয়পুর গ্রামটি অতীতে তেলকূপির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। গ্রামের ব্যানার্জী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে মূর্তি দুটি সংরক্ষিত আছে। প্রথম মূর্তিটি বেগলারের রিপোর্টে বা দেবলা মিত্রের *Telkupi* গ্রন্থেও স্থানীয় গ্রামবাসীদের ধারণা মোতাবেক গণেশ-জননী বা 'Divine Mother'-রূপে চিহ্নিত হলেও সুভাষ রায়ের মতে এ'টি শিশু মহাবীর ও মাতা ত্রিশলার মূর্তি। শিশু মহাবীরের ঠিক নিচেই খোদিত সিংহ লাঞ্ছন চিহ্নটি তার প্রমাণ। সম্ভবত ইঁটের তৈরি কোনও জৈন দেবদেউলে এ'টি মহাবীরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেবলা মিত্র-ও মূর্তিটি নির্মাণের সময়কাল নবম শতক বিবেচনা করেছেন। ঐতিহাসিক বিচারে নবম, দশম ও একাদশ শতকে তৈলকম্প বা তেলকূপিতে জৈন দেবমন্দিরগুলি নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে সেগুলি হিন্দুধর্মে অধিভুক্ত হয়। উদ্দিষ্ট মূর্তির বামদিকস্থ একক গণেশমূর্তির বেশ কিছুটা অংশ ভাঙা। বালি পাথরে তৈরি সমপদ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ গণেশ। বর্তমানে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় মূর্তিটি অনেকটাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

ঞ। পুরুলিয়ার কংসাবতী নদীর তীরবর্তী বোড়াম বা দেউলঘাটায় মাতৃকামূর্তির সঙ্গে গণপতির পার্শ্বদেবতারূপে অবস্থান আমরা প্রথম অংশেই লক্ষ করেছি। এ'টি ছাড়াও জৈন প্রত্নক্ষেত্র দেউলঘাটায় গণেশের একটি এককমূর্তি

ক্ষেত্রসমীক্ষাপর্বে চোখে পড়েছে। (চিত্র ৩১) চতুর্ভুজ মূর্তিটি স্থানক অর্থাৎ গণেশ এখানে পদ্মের ওপর সমপদ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। পদ্মের নিচে ইঁদুর উপস্থিত। মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় তিন ফুট। গণেশের মাথায় মুকুট, গায়ে সর্পোপবীত ও একটি আজানুলম্বিত মালা শোভমান। ধুতি জাতীয় বস্ত্র পরিধান করেছেন। শুঁড়টি বামমার্গী। ডানদিকের ওপরের হাতে অক্ষমালা ও নিচের হাতে কুঠার ধারণ করেছেন। বামদিকের ওপরের হাতের আয়ুধটি চেনা যায় না। নিচের হাতটি ভাঙা। মূর্তির উপরিভাগে জৈন স্থাপত্যের আদলে দু'দিকে গন্ধর্ব ও গান্ধর্বী দৃশ্যমান। তবে অতিরিক্ত সিঁদুর ও চন্দনলিপ্ত হওয়ায় গণেশের দেহ-সৌষ্ঠবের সূক্ষ্ম কারুকার্যগুলি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ট। পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার অন্তর্গত কাঁসাই নদ তীরবর্তী বুধপুর জৈন প্রত্নস্থল হিসেবে বিখ্যাত। একসময় এখানে পঞ্চায়তন দেব-দেউল গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন দেউলের নিচের অংশটিকে ব্যবহার করে পুরোনো পাথরগুলি বসিয়ে ১৯২৬ সালে একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে বুদ্ধেশ্বর শিবমন্দির নামেই এ'টি সাধারণ্যে পরিচিত। এই মন্দির লাগায়ো চত্বরেই আমরা গণেশের একটি আসন ও একটি স্থানক মূর্তি দেখেছি। এ ছাড়া মন্দিরের ভেতরের কুলুঙ্গিতে আরেকটি ছোটো গণেশমূর্তি রয়েছে। গণেশের চতুর্ভুজ আসনমূর্তিটি জেলার সবচেয়ে বড়ো গণেশমূর্তির দৃষ্টান্ত। (চিত্র ৩২) প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর গণেশ এখানে ললিতাসনে উপবিষ্ট। তিনি একদন্ত ও লম্বোদর। অলংকৃত দেহ। গলায় উপবীত। ধুতি জাতীয় বস্ত্রে দেহের নিম্নাংশ আচ্ছাদিত। মাথায় মুকুট। বাঁদিকের ওপরের হাতে মূলক ও নিচের হাতে সম্ভবত মোদক (ভগ্ন হওয়ায় অনুমানযোগ্য) ধরেছেন। ডানদিকের ওপরের হাতে কুঠার রয়েছে। সামনের হাতের আঙুলের অংশটি ভগ্ন হওয়ায় হস্তদ্রব্যটিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। পদ্মবেদীর নিম্নাংশে মাঝামাঝি জায়গায় ইঁদুর উপস্থিত। গণেশের স্থানক মূর্তিটিতেও তিনি প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর সমপদভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। (চিত্র ৩৩) তিনি একদন্ত ও লম্বোদর। তাঁর মাথায় মুকুট, গলায় নাগোপবীত। চতুর্ভুজ মূর্তির বেশিরভাগ অংশ ভেঙে যাওয়ায় হস্তসংখ্যা বা আয়ুধগুলি স্পষ্ট নয়। সামনের হাতদুটি একমাত্র বোঝা যাচ্ছে। বাম দিকের নিচের হাতে বোধহয় কুঠার ছিল। কারণ, বাকি অংশ ভেঙে গেলেও নিচের দিক করে রাখা অস্ত্রের অগ্রভাগটি দেখা যাচ্ছে। পদ্ম-বেদির নিচের অংশে ইঁদুর দৃশ্যমান। দুটি মূর্তির ক্ষেত্রেই উপরিভাগ বা চালচিত্রের অংশটি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে।

তৈলকম্প বা তেলকূপি ব্রাহ্মণ্য প্রত্নস্থল নাকি জৈন অধ্যুষিত ক্ষেত্র এ নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের। গবেষক সুভাষ রায়ের মতানুসারে আমাদেরও মনে হয়, তেলকূপি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ্য প্রত্নক্ষেত্র কখনওই ছিল না।[৮১] মানভূমের

অতীত ঐতিহ্য, বিলুপ্ত ইতিহাস বা ধর্ম-সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা জানেন নবম থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যে সম্ভবত পাল রাজত্বকালেই তেলকূপিকে কেন্দ্র করে একটি বৃহৎ জৈন প্রত্নস্থল গড়ে উঠেছিল। বেগলারের রিপোর্ট থেকে বাইশটি দেউলের কথা জানা গেলেও আদিপর্বে সম্ভবত চব্বিশজন তীর্থঙ্করের জন্য চব্বিশটি দেউল তৈরি হয়। নবম থেকে দ্বাদশ শতক তৈলকম্প তথা মানভূমের সুবর্ণযুগ, কারণ আজকের পুরুলিয়ার বেশিরভাগ দেবদেউল-ই ওই সময়ের মধ্যে গড়ে ওঠে। পালযুগে বৌদ্ধধর্মের প্রসারতা বাড়লেও মানভূমে জৈনধর্মের শেষ শিখাটুকু প্রজ্জ্বলিত ছিল। একাদশ শতকে তৈলকম্পের রাজা রুদ্রশিখরের ব্যক্তিগত ধর্মপন্থা আমাদের অজানা হলেও তৎকালীন জৈন শ্রেষ্ঠীদের মন্দির নির্মাণের প্রকল্পে তিনি কোনওরকম হস্তক্ষেপ করেননি। না হলে এই হারে জৈন মন্দির উল্লিখিত কালপর্বে নির্মিত হত না। আগের অংশেই বলা হয়েছে, ত্রয়োদশ শতক থেকে ব্যবসায় ভাঁটা বা তামার খনির আকরিক নিঃশেষিত হওয়ার কারণে এই অঞ্চলের জৈন বণিকেরা দক্ষিণে স্থানান্তরিত হওয়ায় পরিত্যক্ত জৈন দেউলগুলি একসময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের আওতাভুক্ত হয়। সেনপর্বে, বিশেষত বল্লাল সেনের আমলে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হয় এবং অর্থাগমের পথও বন্ধ হয়ে যায়। বল্লাল সেন সুবর্ণবণিকদের উপবীত কেড়ে নিয়ে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দেন। গুপ্ত ও পালযুগে বৈশ্য সমাজের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, ক্রমে সেন আমলে তা অস্তমিত হতে থাকে। দীনেশচন্দ্র সেন-ও তাঁর *বৃহৎবঙ্গ*-এ লিখেছেন, ধনকুবের বণিকরা কীভাবে এই পর্বে 'বেণে' হয়ে সমাজের এককোণে পড়ে রইল এবং নব্য ব্রাহ্মণ্য শক্তি বৈশ্য শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করল।[৮২] জৈন বণিকদের একাংশ সম্ভবত এই সময়ে রাজধর্মের প্রতিকূলতায় বিব্রত হয়েই অন্যত্র পাড়ি জমিয়েছিলেন। যাঁরা থেকে গিয়েছিলেন, মানভূমের সরাক সমাজ হয়তো তাঁদেরই প্রতিনিধি। মানভূমের পরিত্যক্ত জৈন দেউলগুলি সেনযুগ থেকেই ব্রাহ্মণদের অধিভুক্ত হয় এবং জায়গায় জায়গায় জৈন দিগম্বর মূর্তি অপসৃত হয়ে নবরূপে হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা ঘটে। কখনও আবার মূর্তিগুলির সংস্কার করে বা বস্ত্র পরিয়ে ভৈরব, বিষ্ণু, লোকেশ্বর বিষ্ণু প্রভৃতি নামে পূজিত হতে থাকে। এইভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত মূর্তিগুলি নতুন নামে ও নতুন মন্ত্রে গৃহীত হয়। এই সংস্কারের প্রক্রিয়া চলেছিল আনুমানিক পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত। গবেষক সুভাষ রায় তাঁর গ্রন্থে *বাঁকুড়ার মন্দির* গ্রন্থের প্রণেতা বিশিষ্ট গবেষক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতের সমর্থনে লিখেছেন, "... সেন রাজাদের আমলেই রাঢ় দেশে জৈন ধর্মের অবনতি শুরু হয়। ... সেন রাজারা উদার ধর্মমতাবলম্বী ছিলেন বলে সরাসরি জৈন ধর্মের উচ্ছেদ না ঘটে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিশাল জঠরে জৈন ধর্মের ক্রমশ অবলুপ্তি ঘটতে থাকে।"[৮৩] পাশাপাশি আরেকটি

ঐতিহাসিক সূত্রেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। অধ্যাপক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে জানিয়েছেন, বিহারের বাঁকা জেলার মন্দার পর্বত জৈন তীর্থঙ্করদের নির্বাণলাভের স্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। এই প্রাচীন জৈন তীর্থক্ষেত্র মন্দার পর্বত থেকে ভাগলপুর হয়ে মথুরা পর্যন্ত একটি বাণিজ্যপথ ছিল। আবার, বর্ধমান-বাঁকুড়া-তমলুক থেকে ভাগলপুর হয়ে উত্তরভারত পর্যন্ত আরেকটি বাণিজ্যপথ ছিল। জৈনধর্ম প্রবক্তা মহাবীরের নামে স্থাননাম বর্ধমান হয়। মহাবীর স্বয়ং নাকি মন্দার পর্বতে গিয়েছিলেন। বাঁকা থেকে বর্ধমানের বাঁকানদী পর্যন্ত জৈনধর্ম সেই যুগে একই সময়ে বিস্তারলাভ করেছিল। বর্ধমানের মূর্তিগুলিও সেই জৈনযুগে জৈনধর্মীদের প্রতিষ্ঠিত।[৮৪]

উপরোক্ত নিদর্শনগুলি থেকে স্পষ্ট যে, প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের বাংলায় মাতৃকাপ্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে গণপতি যেমন মূর্তিভাস্কর্যে রূপায়িত হয়েছেন, তেমনই শিবসাদৃশ্যে আসনমূর্তি ও নৃত্যমূর্তিতেও বঙ্গদেশের নানা প্রান্তে পূজিত হয়েছেন। ইসলাম-পূর্ব বাংলায় পঞ্চোপাস্যের আদিদেব হওয়ার আগেও গণপতি রাজবৃত্তে এবং জনবৃত্তে একইভাবে মর্যাদা লাভ করেছেন, কখনও পার্শ্ব বা সহচর দেবতা হিসেবে, কখনও বা একক মূর্তিরূপে।

৩. ৪

বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্যে গণপতি

বঙ্গদেশে গণপতি পৌরাণিক ঐতিহ্যবাহিত হয়েই স্মার্ত হিন্দুর ধর্মজীবনে গৃহীত হয়েছে। বাংলায় সংকলিত পুরাণাদি শাস্ত্রে গণপতিকেন্দ্রিক যেসব আখ্যান-ব্যাখ্যান পল্লবিত হয়েছে, তারই নানা চূর্ণ বঙ্গীয় ধর্ম-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মিশে আছে। বিশেষ কোনও দেবতাকে ঘিরে এই ধরনের পৌরাণিক অনুষঙ্গ পুরাণের চৌহদ্দির বাইরে অনেকসময় সাহিত্যের পরিসরেও প্রকাশমাধ্যম খুঁজে নেয়। প্রাচীন বঙ্গদেশে বিভিন্ন সংকলনমূলক গ্রন্থ বা সংস্কৃত কোষকাব্যেও এইরকম দেবমাহাত্ম্য বর্ণনার মাধ্যমে বিশেষ কোনও দেবতার আবয়বিক পরিচয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরই সঙ্গে ওই দেবতার প্রতি জনমানসের ভক্তিভাবময় প্রার্থনা কখনও কবি-বয়ান আশ্রয় করে টুকরো টুকরো পঙ্‌ক্তিতে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। যদিও এই ধরনের প্রকীর্ণ কবিতা সংকলন গ্রন্থে বা সংস্কৃত কাব্যে গণেশ যে বিস্তৃত পরিসরে বন্দিত হয়েছেন এমন নয়। পৃথক কোনও অধ্যায় বা বিশেষ একটি 'বর্গ' যে তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছে, তাও নয়। তুলনা টানলে দেখা যাবে বিষ্ণু, শিব বা দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণনার নজির এই ক্ষেত্রে গণেশের চেয়ে ঢের বেশি। তবে এই শ্লোকধৃত বর্ণনাগুলি অনুসরণ করলে প্রাচীন বাংলায় গণপতির অবস্থান এবং ভাব-মূর্তির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কয়েকটি দিক খেয়াল করা যায়। এই পর্যায়ে আমাদের

অবলম্বন বঙ্গদেশের দুটি সংস্কৃত শ্লোক সংকলনমূলক গ্রন্থ (*সুভাষিতরত্নকোষ* এবং *সদুক্তিকর্ণামৃত*) এবং একটি সংস্কৃত কাব্য (*আর্যাসপ্তশতী*)।

সুভাষিতরত্নকোষ

আনুমানিক দ্বাদশ শতকে বিদ্যাকর সংকলিত *সুভাষিতরত্নকোষ* বা *কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়* শীর্ষক কোষকাব্যের 'সুগতব্রজ্যা'-র বুদ্ধ বন্দনার অংশটুকু বাদ দিলে সামগ্রিক অর্থে এই সংকলন পৌরাণিক দেব-দেবীর বর্ণনায় পরিপূর্ণ। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সংকলকের সূত্রে গ্রন্থের প্রথমাংশে বৌদ্ধ মতের সামান্য চিহ্ন থাকলেও এর দুই তৃতীয়াংশ শ্লোকই পৌরাণিক ধর্মের লক্ষণাক্রান্ত। পৌরাণিক দেব-দেবীদের মধ্যে বিশেষত শিব, হরি বা বিষ্ণু, দুর্গা প্রমুখ প্রাধান্যবিস্তারী হলেও শিবগণের নেতৃস্থানীয় হিসেবে গণেশের যৎকিঞ্চিৎ উপস্থিতি দেখা যায়। গ্রন্থের 'সুগতব্রজ্যা', 'লোকেশ্বরব্রজ্যা', 'মঞ্জুঘোষব্রজ্যা' এবং 'মহেশ্বরব্রজ্যার' পর 'ততস্তদূর্গব্রজ্যা' বা 'শিবগণব্রজ্যা' শীর্ষক অংশটি আরম্ভ হয়েছে। গণপতি বিষয়ক শ্লোকগুলি কার্যত এই অংশেই পাওয়া যায়। এখানে গণপতি-গণেশ শিবগণ রূপে উপস্থাপিত। ফলে বঙ্গদেশীয় শৈব কাল্টের সঙ্গেই তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ। শিবানুচরদের প্রধান অর্থাৎ শিবগণের অধিপতি রূপে তিনি বন্দিত। যদিও প্রথম পূজ্যের আসন তখনও তাঁর অনায়ত্ত রয়ে গেছে। *সুভাষিতরত্নকোষ*-এর এই পঞ্চম ব্রজ্যায় গণপতির উল্লেখযুক্ত অন্তত পাঁচটি প্রকীর্ণ শ্লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রথম তিনটি শ্লোক যথাক্রমে রাজশেখর, ভবভূতি ও মণ্ডন রচিত। কবিদের মধ্যে এঁরা সর্বভারতীয়। শেষ শ্লোক দুটি বসুকল্পের রচনা, তিনি বাঙালি কবিরূপে স্বীকৃত। সাধারণভাবে শ্লোকের বর্ণনার দুটি প্রান্ত। এক, দেবতার মূর্তিগত উপস্থাপনা। এক্ষেত্রে বিশেষ কোনও মহিমাব্যঞ্জক কার্যকলাপ বা আচরণ বর্ণনার মাধ্যমে দেবতার বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে। দুই, ভক্ত-কবির ভক্ত-সাধারণের হিতার্থে সংশ্লিষ্ট দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা। মূলসহ শ্লোকের গদ্যানুবাদগুলি প্রথমে দেখে নেওয়া যাক।

১। অব্যাদ্বো বলিতাঙ্ঘ্রিপাতবিচলদ্ভূগোলহেলোন্মুখ–

ভ্রাম্যদ্দিক্করিকল্পিতানুকরণো নৃত্যন্ গণগ্রামণীঃ।

যস্যোদণ্ডিতশুণ্ডপুষ্করমরুদ্ব্যাকৃষ্টসৃষ্টং মুহুস্

তারাচক্রমুদক্তশীকরপৃষল্লীলামিবাভ্যস্যতি।।   - রাজশেখরস্য (৫/৮৩)[৮৫]

সেই 'গণগ্রামণী' বা গণপ্রধান আমাদের রক্ষা করুন, যাঁর পদভারে কম্পিত পৃথিবী এমনভাবে হেলে যায় যে উর্ধ্বমুখ দিকহস্তীরা যেরূপ ভ্রাম্যমান হয়, তদনুরূপ নৃত্যের অনুকরণ তিনি স্বয়ং সম্পাদন করেন। হস্তীশুণ্ডের মাধ্যমে জলধারণ ও নির্গমনের সময় ফোয়ারার মতো বিন্দু বিন্দু জলকণা যেমন চারদিকে বিস্তৃত হয়, তেমনি গণেশর পদ্মবৎ উর্ধ্বগামী শুণ্ড দিয়ে বাতাস অভ্যন্তরে ধারণ এবং নির্গমনের ফলে তারামণ্ডলও যেন একবার সংকুচিত, আরেকবার উদ্‌ভাসিত হচ্ছে। এইরূপ লীলা তিনি বারংবার অভ্যাস করে চলেছেন।

২। সানন্দং নন্দিহস্তাহতমুরজরবাহূতকৌমারবর্হি-

ত্রাসান্নাসাগ্ররন্ধ্রং বিশতি ফণিপতৌ ভোগসংকোচভাজি।

গণ্ডোড্ডীনালিমালামুখরিতককুভস্তাণ্ডবে শূলপাণে

বৈনায়ক্যশ্চিরং বো বদনবিধুতয়ঃ পান্তুঃ চীৎকারবত্যঃ।। - ভবভূতেঃ (৫/৮৪)[৮৬]

শূলপাণি শঙ্করের তাণ্ডব নৃত্যের সঙ্গে নন্দী যখন সানন্দে নিজ হস্ত দ্বারা মুরজ বা পাখোয়াজ জাতীয় বাদ্য সংগত করছিল, তখন সেই বাদ্যের শব্দ শুনে(সম্ভবত বাদ্যনির্গত ধ্বনিকে ময়ূর বজ্রনির্ঘোষ ভেবে ভুল করেছে) কার্তিকের ময়ূর এসেছে, স্বভাবতই ময়ূরকে দেখে ভয় পেয়ে সাপ ফণা গুটিয়ে গণেশের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। ফলস্বরূপ বিনায়ক চিৎকারের ভঙ্গিতে এমনভাবে মাথা নাড়াচ্ছেন যে তাঁর গাল থেকে উড্ডীন অলিকুল চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে— এইরূপ চিৎকাররত মস্তক কম্পনকারী গণপতি আমাদের রক্ষা করুন।

৩। যদম্বা তাতো বা দ্বয়মিদমগাদেকতনুতাম্

তদর্ধং চার্ধং চ ক্ব নু গতমথার্যঃ কথয়তু।

জগত্তত্তজ্জাতং সকলনরনারীময়মিতি

প্রতীতিং কুর্বাণো জয়তি শিখিভর্তুর্গজমুখঃ।। - মণ্ডনস্য (৫/৮৫)[৮৭]

যখন শিব-পার্বতী(গণেশ-কার্তিকের পিতা-মাতা) অভিন্নতনু অর্থাৎ একশরীর প্রাপ্ত হন, তখন তাঁদের বাকি অর্ধাংশ কোথায় যায়— ময়ূরবাহন কার্তিক যখন অগ্রজ গণেশকে এই প্রশ্ন করেছেন, তখন যে গজমুখ উত্তরে বলেছেন, পৃথিবীর সকল পুরুষ শিবের অর্ধাংশ এবং সকল নারী পার্বতীর অর্ধাংশ থেকে সৃষ্ট, সেই সত্যদ্রষ্টা গণেশ জয়যুক্ত হোক।

৪। কপোলাদুড্ডীনৈর্ভয়বশবিলোলৈর্মধুকরৈর

মদাম্ভঃসংলোভাদুপরি পতিতুং বদ্ধপটলৈঃ।

চলবৃর্হচ্ছত্রশ্রিয়মিব দধানো'তিরুচিরাম্

অবিঘ্নং হেরম্বো জগদঘবিঘাতং ঘটয়তু।। - বসুকল্পস্য (৫/৯৩)[৮৮]

মদস্রাবের আকর্ষণে হস্তীমুখ গণেশের গালে ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমরেরা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, আবার ভয়ে চঞ্চল হয়ে তাদের গাল থেকে উড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে— সেই সময় এমন মনে হচ্ছে যেন ময়ূরের পাখায় প্রস্তুত চলমান ছত্রের মতো রুচিকর শোভা তিনি ধারণ করেছেন। এইরূপ সৌন্দর্যসম্পন্ন হেরম্ব বা গণেশ জগতের পাপ নাশ করে নির্বিঘ্ন প্রদান করুন।

৫। একঃ স এব পরিপালয়তাজ্জগন্তি

গৌরীগিরীশচরিতানুকৃতিং দধানঃ।

আভাতি যো দশনশূন্যমুখৈকদেশ-

দেহার্ধহারিতবধুক ইবৈকদন্তঃ।। - বসুকল্পস্য (৫/৯৪)[৮৯]

তিনি একাই জগতের পালন করেন। তাঁর মধ্যে শিব-পার্বতীর কার্যকলাপ বা আচরণের অনুকরণ পরিদৃষ্ট হয়। নিজের দন্তহীন মুখের একভাগ বা একাংশের মাধ্যমে একদন্ত গণেশ অর্ধনারীশ্বর শিবের সমান প্রতীয়মান হন।

রাজশেখরের বর্ণনায় নৃত্যরত গণপতির মূর্তি আভাসিত। গণেশের নৃত্যভঙ্গির দুর্দামতায়, তাঁর পাদবিক্ষেপে পৃথিবীই কেবল আনত নয়, দিকহস্তীরাও উন্মত্তের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে। এদের চাঞ্চল্যের অনুরূপ মুদ্রা গণেশ নিজের নৃত্যবিভঙ্গে ফুটিয়ে তুলছেন। 'গণগ্রামণী' সম্বোধনে তাঁর গণপতিত্বের মর্যাদা সুস্পষ্ট। পরবর্তী দুটি পঙ্ক্তির বর্ণনা এই জাতীয় নৃত্য উপস্থাপনার চরিত্র চিনিয়ে দেয়। সাধারণ নৃত্যের স্তর থেকে একে পৃথক করে একধরনের cosmic dance-এর আবহ তৈরি করে। শুঁড়ের সাহায্যে হাতির জলশোষণ এবং জল উদ্গীরণের ভঙ্গি অনুকরণকারী লীলাধীশ গণেশ গজমুখের মাধ্যমে জলধারণ করলে তারামণ্ডল যেমন সংকুচিত বা প্রসুপ্ত হয়, তেমনই জল নির্গমনের সময় পুনরায় উদ্ভাসিত হয়। এই কবিকল্পনা ধারণ এবং উদ্গীরণের নিরিখে তান্ত্রিকী সৃষ্টিতত্ত্বের সমপর্যায়ী। সংশ্লেষণ কালে সংবৃতিমার্গে তারামণ্ডলের আত্মস্থীকরণ, পরক্ষণেই নিষ্কাশন

মুহূর্তে নিবৃত্তিমার্গে তারাচক্রের পুনঃপ্রকাশ ঘটছে। নৃত্যপর গণেশের এই divine beauty-র বর্ণনায় কেবল হস্তীমুখের সাদৃশ্যটুকুই নয়, এক আপনভোলা বিশ্বস্রষ্টার বিরাটত্বের মহিমময় রূপ ফুটে উঠেছে। পাঠস্মৃতি হিসেবে কাজী নজরুলের একটি বহুবন্দিত গীতের প্রথম পঙ্ক্তির সঙ্গে আলোচ্য বর্ণনা সমধর্মী মনে হয় : 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে/ বিরাট শিশু আনমনে।/ প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা/ নিরজনে প্রভু নিরজনে।' পাল-সেন যুগের বাংলায় নৃত্যরত গণেশমূর্তির আধিক্য পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরনের সাহিত্যিক রূপায়ণের সমর্থন করে। একাদশ-দ্বাদশ শতকের বঙ্গদেশে গণেশের যে অবয়বের বহুল প্রচলন ছিল, তা আটহাতের নৃত্যরত গণেশ মূর্তি। সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে নটরাজ ভাবনা গণেশের এই নৃত্যভঙ্গির নেপথ্যে কাজ করেছে বলে মনে হয়। গণেশ শিবাত্মজ ও শিবানুচর বলে মহেশ্বরের নৃত্যকুশলতার ছাপ তাঁর নৃত্য উপস্থাপনাতেও একইভাবে পড়েছে। সমগ্র পূর্বভারতেই নটরাজ শিব ও নৃত্যমোদী গণেশ এই অর্থে এক অভিন্ন ভাবরূপের দ্যোতক।

ভবভূতির বর্ণনায় গণপতির এক অ-স্থির, সশব্দ মূর্তি দেখা যায়। এই শ্লোকের বর্ণনাটি চলচ্ছবির মতো উপভোগ্য, শব্দময় এক চিত্রকল্প যেন। শিব, নন্দী, গণেশ এবং কার্তিক ছাড়াও এখানে উপস্থিত ময়ূর (কার্তিকের বাহন) এবং সাপ (পুরাণ-প্রমাণে গণেশ সর্পোপবীতধারী হওয়ায় সাপটি তাঁর হতে পারে অথবা নর্তনশীল সর্পমালী শিবের কণ্ঠভূষণও হতে পারে। শ্লোকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি)। শিবতাণ্ডব, সংগত হিসেবে নন্দীর 'হস্তাহত' মুরজ বাদ্যের গম্ভীর ধ্বনি, সেই আওয়াজ শুনে কার্তিকের ময়ূরের আগমন, ময়ূরকে দেখে ত্রস্ত ভঙ্গিতে সাপের গণেশের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ, স্বভাবতই বিব্রত অবস্থায় বিনায়কের চিৎকৃত ভঙ্গিতে ঘন ঘন মস্তক সঞ্চালন, ফলস্বরূপ মদজলপানকারী ভ্রমরদের তাঁর গাল থেকে এলোমেলোভাবে বিভিন্ন দিকে সঞ্চরণ--- এই পুরো ছবিটাই কার্যত বহুবিচিত্র শব্দের সমাহারে নির্মিত এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির রূপায়ণ। মৃদু কৌতুকহাস্যের আবহে এক সরস, প্রাণবন্ত জীবনচিত্রের উপস্থাপনা। এই শ্লোকে গণপতি চিৎকারপ্রবণ, স্থিতিহীন, কার্যসাধনে তৎপর। যদিও সাধনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে এই মুখাভিব্যক্তির অন্যার্থ টের পাওয়া যায়। ক্রমাগত মস্তক সঞ্চালনের এই যে ভঙ্গি, এর মধ্যে সম্মতিসূচক অনুমোদনের ইঙ্গিতটিও লভ্য। কাজেই, গণপতির এই মস্তক কম্পন জগৎবাসীর পক্ষে হিতকর, আশীষবাহী, সদর্থক এক ধারণা। এই শব্দসৃষ্টিকারী গণপতিই বিঘ্ননাশন রূপে ভক্ত-সাধারণের রক্ষাকর্তা।

মণ্ডণের বর্ণনায় গণেশ বুদ্ধিধর, সত্যদ্রষ্টা, প্রকৃত জ্ঞানবান। শিখিবাহন কার্তিকের জ্যেষ্ঠ হিসেবে বোধে এবং বিচক্ষণতায় তিনিই অগ্রগণ্য। তাই সংশয়াবিষ্ট কার্তিকের কৌতূহল নিরসন করে গণেশই তাঁকে সত্যদর্শন করান।

অর্ধনারীশ্বররূপী উমা-মহাশ্বরের অবশিষ্ট অর্ধাঙ্গ থেকেই যে পৃথিবীর সমস্ত নারী-পুরুষের সৃষ্টি হয়েছে--- সৃজন-প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত সত্যের এই বোধ একমাত্র গণেশেরই অধিগম্য হয়েছে। সদংশে শিব এবং আনন্দাংশে শক্তির মিলনজাত সদানন্দময় গণেশ-ই জ্ঞানমার্গে পূর্ণতম। এই শ্লোকে পুরাণবৃত্তের বহুপ্রচলিত কার্তিক-গণেশ দ্বৈরথের মধ্যে গণপতিকেই কার্তিকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এবং শুদ্ধজ্ঞানী রূপে পরোক্ষে অভিনন্দিত ও জয়যুক্ত করা হয়েছে।

বসুকল্পের দুটি রচনাই গণপতির মহিমাব্যঞ্জক। প্রথমটিতে গণপতির অঙ্গসৌষ্ঠবের বর্ণনা পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্রের অনুসারী। এখানে গণেশের বাহ্যরূপের বর্ণনার মাধ্যমে তাঁকে সৌন্দর্যের সর্বোত্তম মূর্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গণেশের কপোল-নিঃসৃত মদস্রাবে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরেরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে বসছে, আবার (সামান্য মস্তকসঞ্চালনের কারণেই সম্ভবত) ভয়ে চাঞ্চল্যবশত যখন তারা ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাচ্ছে--- দেখে এমনটা মনে হচ্ছে যেন ময়ূরের পেখম দিয়ে প্রস্তুত চলমান এক ছাতার মতো অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি তিনি ধারণ করেছেন। এই শ্লোকে গণপতি 'হেরম্ব' রূপে জগৎ-সংসারের পাপনাশী এবং নির্বিঘ্ন প্রদানকারী দেবতা। দ্বিতীয় শ্লোকে গণেশ একদন্ত রূপে বন্দিত। শিব-গৌরীর আচরণের অনুকরণ করতে করতে তিনি একাই এই ত্রিজগতের পালন করেন। একদন্ত গণপতি নিজের দন্তবিহীন মুখের একাংশের মাধ্যমে অর্ধনারীশ্বর শিবের সমকক্ষ বিবেচিত হন। উদ্দিষ্ট বর্ণনায় গণেশ শিবের সমানধর্মা বা বিকল্পরূপ দ্বিতীয়মূর্তি হিসেবে কল্পিত।

সুভাষিতরত্নকোষ-এ গণপতি সম্পর্কে যেসব epithet বা নামসূচক অভিধা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেগুলি যথাক্রমে - 'গণগ্রামণী' (৮৩), 'বিনায়ক' (৮৪), 'গজমুখ' (৮৫), 'হেরম্ব' (৯৩) এবং 'একদন্ত' (৯৪)। লক্ষণীয়, 'গণগ্রামণী' সম্বোধনে গণপতিত্বের মর্যাদা সুস্পষ্ট। 'বিনায়ক' বহু-বিবর্তিত ধারণা। *বামনপুরাণ*-এর ব্যাখ্যা ধরলে বিনায়ক শব্দে নায়কের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে সন্তান জন্মের দ্যোতনা স্পষ্ট। অন্য অর্থে বিনায়ক নায়কবিহীন দলের অন্তর্গত একজন অথবা বিশিষ্ট নায়ক স্বয়ং। শেষোক্ত অর্থই বর্তমান প্রসঙ্গে লাগসই মনে হয়। কারণ, এই পর্যায়ে গণপতির পদ শিবগণের নায়কত্বমূলক। গজমুখ শব্দে হস্তীশরীরের সাদৃশ্য কল্পনা আছে। 'হেরম্ব' শব্দে শিবপুত্রের ইঙ্গিত আছে। আবার, *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* পুরাণ-প্রমাণে বিষ্ণুকৃত ব্যাখ্যায় 'হেরম্ব' অর্থে আর্তজনের পরিত্রাতা। পরশুরামের কুঠারাঘাতে গণেশের ভগ্নদন্ত বা 'একদন্ত' হওয়ার বৃত্তান্ত *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এর ভাষ্য অনুসারী।

ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে *সুভাষিতরত্নকোষ*-এর বর্ণনায় গণপতিকে বহুলাংশেই শৈব প্রভাবান্বিত বলে মনে হয়। যদিও মণ্ডন এবং বসুকল্পের শ্লোকে গণেশের মহিমা বর্ণনের প্রয়োজনে তাঁকে শিব-পার্বতীর সঙ্গে

সমভাবে যুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মাতাপিতৃপরিচয়ের নিরিখে গণপতি সংক্রান্ত ভাবনাকে একটি পারিবারিক অবয়বে ধরবার চেষ্টা হয়েছে হয়তো। তবে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, পার্বতী দুটি শ্লোকেই ‘অম্বা’ অথবা ‘গৌরী’ হিসেবে স্বনামে উল্লিখিত হয়েছেন। গণেশের ‘মাতা’ বা ওইজাতীয় কোনও সম্পর্কের স্পষ্ট উল্লেখ হয়নি, শিবকে যেখানে স্পষ্টতই গণেশের ‘তাত’ বা পিতারূপে অভিহিত করা হয়েছে। মনে হয়, পার্বতীপুত্র রূপে গণেশের গ্রহণযোগ্যতা বঙ্গীয় জনমানসে পুরাণাদির সূত্রে স্বীকৃত হলেও দ্বাদশ শতকের এই সংকলনে বিশেষভাবে শিবপুত্র রূপেই তাঁকে উপস্থাপন করা হয়েছে। পার্বতীর পার্শ্বোল্লেখ থাকলেও মুখ্যত শিবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করেই এখানে তাঁর অবতারণা। প্রসঙ্গত ভবভূতির শ্লোকটিও মনে পড়তে পারে। তা ছাড়া অধ্যায়নাম ‘শিবগণব্রজ্যা’-তেও এই গণভুক্তির লক্ষণ স্পষ্ট।

সদুক্তিকর্ণামৃত

দ্বাদশ শতকে সেন রাজসভায় মহাসামন্তচূড়ামণি বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস *সদুক্তিকর্ণামৃত* নামক গ্রন্থটি সংকলন করেন। এই গ্রন্থের ‘দেবপ্রবাহ’-এর অন্তর্গত ‘উনত্রিশ’ সংখ্যক উপবর্গটি বিশেষভাবে গণেশেরই উদ্দেশে নিবেদিত। বিভাগের শিরোনামেই (‘গণেশঃ’) তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেন আমলে বিশেষভাবে শিব এবং কৃষ্ণের বহুলতা সত্ত্বেও দেবপ্রবাহের তালিকায় অন্যবিধ পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে গজানন-গণেশ একাসন লাভ করেছেন। বর্তমান অংশে পাঁচটি শ্লোক তাঁর উদ্দেশে সমর্পিত। এই প্রবণতা সংকলক এবং তাঁর পোষ্টার ভারতীয় সনাতন ধর্মের ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যকে চিহ্নিত করে। মূলসহ শ্লোকের গদ্যানুবাদগুলি প্রথমে দেখে নেওয়া যাক।

পূর্বোক্ত *সুভাষিতরত্নকোষ*-এর অন্তর্গত বসুকল্প রচিত শ্লোক দুটিকে শ্রীধর দাস উদ্দিষ্ট সংকলনে ‘গণেশ’ নামাঙ্কিত অংশের প্রথম দুটি রচনা হিসেবে (১৪১ ও ১৪২ নং শ্লোক) স্বীকৃতি দিয়েছেন। অপ্রয়োজন বোধে বর্তমান আলোচনায় ওই দুটি শ্লোকের পুনর্ব্যাখ্যা করা হল না। গণেশ বিষয়ক তৃতীয় শ্লোক থেকেই এই পর্যায়ে আলোচনা করা হল।

১। শ্লোক ১৪৩ :

সন্ধ্যাসিন্দূররাগারুণগগনতলাসঙ্গিগঙ্গোত্তমাঙ্গ-

ত্বঙ্গন্নক্ষত্রমালাকৃতরুচিররুচিঃ কর্ণশংখীকৃতেন্দুঃ।

নিস্তোয়াম্ভোদবৃন্দৈঃ শ্রুতিযুগলচলশ্চামরাড়ম্বরশ্রী-

রব্যাজালংকৃতির্বঃ প্রবিতরতু গণগ্রামণীর্মঙ্গলানি।। - দক্ষস্য[৯০]

সন্ধ্যাকালীন সিঁদুররাঙা আকাশতলে আলিঙ্গনরত গঙ্গার 'উত্তমাঙ্গ' অর্থাৎ মস্তকে কম্পমান নক্ষত্রমালা যাঁর দেহকান্তিকে অত্যন্ত মনোহর করেছে, চন্দ্র-ই হয়েছে যাঁর কানের শঙ্খনির্মিত অলঙ্কার; জলহীন মেঘেরা যাঁর কর্ণযুগল এমনভাবে সঞ্চালন করে যেন চামরের আড়ম্বরের মতো প্রতিভাত হয়; সেই প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক লক্ষণযুক্ত গণপ্রধান গণেশ আমাদের প্রভূত মঙ্গল বিতরণ করুন।

২। শ্লোক ১৪৪ :

গর্জদ্গভীরঘনঘর্ঘরঘোরঘোষ-

দিগ্দন্তিভীতিজননোদ্গতকণ্ঠনাদঃ।

ধুন্বন্ মুখং তব নিরস্যতু সর্ববিঘ্নং

লম্বোদরঃ সহজনাট্যরসপ্রবৃত্ত।। - পাপাকস্য[৯১]

গর্জনশীল গম্ভীর মেঘের প্রচণ্ড ঘর্ঘর ধ্বনি থেকে উৎপন্ন ঘোষ বা নাদের মতো যে দিকহস্তীদের আওয়াজ, গণেশের কণ্ঠনাদ তাদেরকেও ভয়ার্ত করে তোলে। এইরূপ স্বাভাবিক অভিনয়ের আনন্দে প্রমত্ত লম্বোদর গণেশ তাঁর সম্মতিসূচক মুখাভিব্যক্তির মাধ্যমে আমাদের সমস্ত বিঘ্ন নিরসন করুন।

৩। শ্লোক ১৪৫:

দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।

বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ।। - উমাপতিধরস্য[৯২]

দেবরাজ ইন্দ্রের মস্তকশোভিত মন্দার পুষ্পের লালরঙা মধুর মতো গণেশের চরণকমলের রেণুরাশি (ধুলোকণা অর্থে) আমাদের সমস্ত বিঘ্ন হরণ করুক।

উপরোক্ত দক্ষ রচিত শ্লোকটি কেবল বিষয়ভিত্তিতেই অভিনব নয়, এর অন্য গুরুত্বও আছে। বঙ্গদেশে রচিত বা সংকলিত গণপতি বিষয়ক যেসব প্রকীর্ণ কবিতা আমরা এযাবৎ লক্ষ করেছি, তার মধ্যে গণেশের মূর্তি বর্ণনার আভিজাত্য বা মহিমা প্রকাশের গৌরবটুকুই ছিল মুখ্য। কিন্তু, বর্তমান শ্লোকে দেবতার বহিরঙ্গের বৈভব ছাপিয়ে প্রকৃতিময় এক বিস্তার ঘটেছে। এই বিশ্বের প্রকাশই যেন তাঁর মূর্তি। প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যের সঙ্গে গণেশের অঙ্গসৌষ্ঠবের সদৃশতায় প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের একত্ব ব্যক্ত হয়েছে। সিঁদুররাঙা সন্ধ্যের আকাশে আসঙ্গলীন গঙ্গার মস্তকে কম্পিত নক্ষত্রমালার দ্যুতিতে যিনি শোভনসুন্দর হয়েছেন ('সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত' মনে পড়তে পারে), চন্দ্র-ই হয়েছে যাঁর কানের শঙ্খনির্মিত শুভ্রালঙ্কার, জলহারা মেঘের দ্বারা যাঁর কান দু'খানি এমনভাবে সঞ্চালিত হয় যেন চামরের দোদুল্যমানতার মতো আড়ম্বর মনে হয়, সেই জগৎমূর্তি গণপতিই দক্ষের শ্লোকে বন্দিত হয়েছেন। লক্ষ করার বিষয় হল, মূর্তির অবয়বগত সীমা পেরিয়ে('মূর্তিতে কি দিবে ধরা') ভুবনজোড়া আসনে গণেশের এই যে অধিষ্ঠান, প্রকৃতির সঙ্গে একীকরণের ফলে তাঁর নিত্যত্বের এই স্বীকৃতি, এর মধ্যে মূর্তিচিন্তার সাকারত্বকে স্বীকার করেও প্রকৃতির এক সম্প্রসারিত সীমাহীন উদাত্ততায় গণপতির মঙ্গলময় রূপ বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বময় এই বিস্তারের মধ্যে এমন একটা পরিব্যাপ্তির বোধ আছে যেখানে দেবতাও হয়ে ওঠেন 'রব্যাজালংকৃতি' অর্থাৎ প্রকৃতির মতোই নকলহীন, স্বতন্ত্র, মৌলিক এক অস্তিত্ব। এই প্রাকৃতিক লক্ষণ-সমন্বিত 'গণগ্রামণী' গণেশকে জগতের পক্ষে কল্যাণকর বলা হয়েছে।

পাপাকের শ্লোকেও গণপতির মূর্তির অন্য বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। গণেশের কণ্ঠনাদ এই বর্ণনার অন্যতম আকর্ষণ। তাঁর নাদগম্ভীর কণ্ঠ, প্রচণ্ড গর্জনশীল মেঘের ঘর্ঘর ধ্বনি থেকে উৎপন্ন নাদের মতো যে দিকহস্তীদের আওয়াজ, তাদেরও ভয় উদ্রেক করে। এই শব্দমুখরিত লম্বোদর 'সহজনাট্যরসপ্রবৃত্ত' অর্থাৎ স্বাভাবিক অভিনয়ের আনন্দে প্রমত্ত। পূর্ববর্তী শ্লোকেও বলা হয়েছে গণেশের ভাবমূর্তিতে কোনও নকলনবিশি নেই। তিনি প্রাকৃতিক লক্ষণযুক্ত। এই স্ব-ভাবময় প্রাতিস্বিক গণপতি গাণপত্যদের কাছে 'স্বানন্দনাথ', আপনাতেই আপনি পূর্ণ। তাঁর কণ্ঠনাদ, সচল মুখভঙ্গিমা সহজানন্দরসে পূর্ণ। এমন সহজাত অভিনয় ক্ষমতা সম্পন্ন স্থূলোদর গণেশ মস্তক সঞ্চালনের মাধ্যমে যে সম্মতিসূচক অভিব্যক্তি প্রদান করেন, তাতেই জীবের সমস্ত বিঘ্নের নিরসন হয়। এখানে গণেশের কণ্ঠসামর্থ্য বা মস্তক সঞ্চালনের গুরুত্ব নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বতন্ত্র স্বাভাবিক নাট্যপ্রিয়তার অনন্যতাও ঘোষিত হয়েছে।

সেন রাজসভার পঞ্চ কবিরত্নের অন্যতম উমাপতিধরের রচনায় গণেশের উপস্থিতি মহিমাব্যঞ্জক। এখানে গণেশকে কবি 'হেরম্ব' রূপে সম্বোধন করে তাঁর পদরজকে দেবরাজ ইন্দ্রের মুকুটশোভিত পারিজাত পুষ্পের

রক্তিম মধুর সমানধর্মা বলেছেন। তাঁর চরণপদ্মের ধূলিকণা ভক্ত-সাধারণের সমস্ত বিঘ্ন হরণ করুক--- এটিই ভক্ত-কবির ঐকান্তিক প্রার্থনা। উদ্দিষ্ট শ্লোকটি বিঘ্নহর্তা গণেশের মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে জগৎবাসীর বিঘ্ন অপনোদনের আকাঙ্ক্ষা থেকে কল্পিত।

সদুক্তিকর্ণামৃত সংকলনে গণপতির সমপর্যায়ী শব্দ হিসেবে হেরম্ব, একদন্ত, গণগ্রামণী ও লম্বোদর এই নামসূচক অভিধাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম তিনটি শব্দের অর্থব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে। 'লম্বোদর' শব্দটি বাহ্যত গণেশের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সূচক। যদিও সাধনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এর ব্যাখ্যা ভিন্নতর। *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এর বিষ্ণুকৃত বর্ণনায় 'লম্বোদর' বলতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ধারণকর্তাকে বোঝানো হয়েছে।

আর্যাসপ্তশতী

সেন রাজসভার পঞ্চ কবিরত্নের অন্যতম গোবর্ধন আচার্য হালের গাথাসপ্তশতীর অনুকরণে নিজস্ব প্রকীর্ণ কবিতা গ্রন্থ *আর্যাসপ্তশতী* রচনা করেন। এই গ্রন্থে গণেশ বিষয়ক শ্লোক মাত্র তিনটি। মূলসহ শ্লোকের গদ্যানুবাদগুলি প্রথমে দেখে নেওয়া যাক।

১। শ্লোক ২০:

অঙ্কনিলীনগজাননশঙ্কাকুলবাহুলেয়যহতবসনৌ।

সস্মিতহরকরকলিতৌ হিমগিরিতনয়াস্তনৌ জয়তঃ।।[৯৩]

গজানন গণেশের ভয়ে আকুল যা, বাহুলেয় অর্থাৎ কার্তিকের দ্বারা যাঁর আবরণ উন্মোচিত, হাস্যমুখ মহাদেবের করমর্দিত হিমালয়পুত্রীর সেই স্তনযুগল জয়যুক্ত হোক।

২। শ্লোক ২৭:

একরদ দ্বৈমাতুর নিস্ত্রিগুণ চতুর্ভুজাপি পঞ্চকর।

জয় ষণ্মুখনুত সপ্তচ্ছদগন্ধিমদাষ্টতনুতনয়ঃ।।[৯৪]

হে একদন্ত, দ্বৈমাতুর, ত্রিগুণাতীত, চতুর্ভুজ হয়েও পঞ্চবাহু(হস্তীশুণ্ড এখানে বাহুসদৃশ), ষণ্মুখ বা কার্তিকের প্রণম্য, সপ্তচ্ছদ বা ছাতিমের গন্ধের মতো মদগন্ধী এবং অষ্টমূর্তি শিবপুত্র, তোমার জয় হোক।

৩। শ্লোক ২৮:

মঙ্গলকলশদ্বয়ময়কুম্ভমদম্ভেন ভজত গজবদনম্।

যদ্দানতোয়তরলৈস্তিলতুলনালম্বি রোলম্বৈঃ।।[৯৫]

যাঁর মুখমণ্ডলে মঙ্গলকলসরূপ দুটি কুম্ভ বর্তমান এবং যাঁর (কপোলনিঃসৃত) মদজলে চঞ্চল ভ্রমরেরা শ্যামতিল বা কালোতিলের সারূপ্য প্রাপ্ত হয়, সেই গজাননকে নিরহংকার চিত্তে ভজনা করুন।

গোবর্ধন রচিত প্রথম শ্লোকে গণেশের নামোল্লেখ থাকলেও বর্ণনাটি মূলত স্তন্যসুধাদানরত পার্বতীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই শ্লোকে পার্বতী গণেশ-জননী রূপে স্বীকৃত। হিমালয়কন্যার স্তনযুগল হস্তীমুখের করমর্দনের আশঙ্কায় আকুল— এই উল্লেখে গণেশের বালরূপ বা সন্তানরূপের পরিচয় পরোক্ষে প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি কার্তিক এবং শিবের একত্র উল্লেখে একটি সুন্দর পারিবারিক চিত্র সম্পূর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্লোকটি একান্তভাবেই গণেশ-সম্বন্ধী এবং তাঁর মাহাত্ম্যের সূচক। এখানে গণেশ সম্পর্কে আটটি নামসূচক অভিধা উচ্চারিত হয়েছে। এদের মধ্যে ‘নিস্ত্রিগুণ’ শব্দ গণেশের পারম্যের দ্যোতক। ত্রিগুণাতীত অর্থে তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাতীত ব্রহ্মবাচক আইডিয়া। এই ধরনের উল্লেখে সমকালে গণপতির মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান অনুমান করা যায়। ‘ষণ্মুখনুত’ বা কার্তিকের প্রণম্য বলার মধ্যেও এই অগ্রবর্তিতার চিহ্ন স্পষ্ট। ‘একরদ’, ‘চতুর্ভুজাপি পঞ্চকর’ এবং ‘সপ্তচ্ছদগন্ধিমদ’ জাতীয় উল্লেখগুলি গণেশের অঙ্গসৌষ্ঠব বা দেহরূপের বর্ণনা সংক্রান্ত। *ব্রহ্মবৈবর্ত* পুরাণানুসারী ব্যাখ্যায় গণেশ একদন্ত। গজমুখ হওয়ায় চারটি বাহু ছাড়াও হস্তীশুণ্ড পঞ্চম বাহুসদৃশ। পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্রানুযায়ী যেহেতু হস্তীমূর্তি গণেশের ঘাড় বা গাল থেকে মদস্রাব নিঃসৃত হয়, ফলে তাঁর দেহভাগ মদগন্ধী হতেই পারে। ছাতিমের গন্ধও তীব্র ও মাদকতাময় হওয়ায় এক্ষেত্রে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। ‘দ্বৈমাতুর’ এবং ‘অষ্টতনুতনয়’ শব্দ দুটি কার্যত গণেশের মাতাপিতৃপরিচয়ের নির্দেশক। এখানে দ্বৈমাতুর অর্থে গণেশ গৌরী ও গঙ্গা উভয়েরই সন্তান হিসেবে মহিমান্বিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে *মৎস্যপুরাণ* ও *পদ্মপুরাণ*-এর ‘সৃষ্টিখণ্ড’-এর গণেশ জন্মভাষ্যের অনুষঙ্গ থাকতে পারে। বক্ষ্যমাণ শ্লোকে গণেশ ‘অষ্টতনুতনয়’ অর্থাৎ অষ্টমূর্তি শিবপুত্র। ক্ষিতিমূর্তি সর্ব, জলমূর্তি ভব, অগ্নিমূর্তি রুদ্র, বায়ুমূর্তি উগ্র, ব্যোমমূর্তি ভীম, যজমান মূর্তি পশুপতি, চন্দ্রমূর্তি মহাদেব এবং সূর্যমূর্তি ঈশান--- এই আট মূর্তির একত্রীভূত রূপ যে দেবাদিদেব মহেশ্বর, গণেশ সেই শিবেরই পুত্র। এই উল্লেখে মহামহিম পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে গণপতির মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।

তৃতীয় শ্লোকে গণপতির অঙ্গসৌষ্ঠবের উৎকর্ষ বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। বিঘ্নহর্তা গজানন মঙ্গলমূর্তি বলেই তাঁর মুখমণ্ডলে মঙ্গলকলসের মতো দুটি কুম্ভের কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর গাল নিঃসৃত মদস্রাবের আকর্ষণে ভ্রমরেরা যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন তাদের দেখে কালো তিলের মতো মনে হয়। এইরূপ মঙ্গলময় গজানন দর্পহারী বলে তাঁকে নিরহংকার হয়ে ভজনা করতে বলা হয়েছে। এখানে গণপতির ভক্তরা কেমন মন নিয়ে উপাস্যের ভজনা করবেন, গোবর্ধন মাত্র একটি শব্দে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। একমাত্র নিরহংকার ভক্তই গণপতির যথার্থ সেবক হতে পারে। সাধনমার্গীয় ব্যাখ্যায় গণপতির ধ্যানমন্ত্রের আদ্য শব্দ 'খর্ব্বং'-এর নিহিতার্থ করা হয়েছে নিরভিমান অর্থাৎ অহংহীন। কাজেই যে দেবতা স্বয়ং অহংকারবিহীন, তাঁর অনুগামীদের যে দর্পশূন্য হয়েই তাঁর শরণে আসতে হবে, শ্লোকধৃত 'অদম্ভেন' শব্দে সেই ইঙ্গিতও প্রছন্ন থাকতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশ্রুত পণ্ডিত জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ* শীর্ষক গ্রন্থে উদ্দিষ্ট শ্লোকটির অনুবাদ করতে গিয়ে 'অদম্ভ' শব্দের অর্থ 'অকপট' বুঝিয়েছেন। আমাদের মনে হয়, 'অপকট' শব্দটি 'অদম্ভ'-এর অর্থ হিসেবে সুপ্রযুক্ত হয়নি। দম্ভ বা অহংকারশূন্য অর্থেই শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে, 'অপকট' অর্থে নয়।[৯৬]

লক্ষ করার বিষয় হল, প্রাচীন বঙ্গদেশে স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাস্যের ক্রমে গণপতি যেহেতু তখনও অন্তর্ভুক্ত হননি, প্রথম পূজ্য রূপে অগ্নিই সর্বত্রমান্য, ফলে দ্বাদশ শতকের সংস্কৃত কোষকাব্যে বা সেন আমলে গোবধর্নের কাব্যের কোথাও একবারও গণেশকে প্রথম দেবতা রূপে উল্লিখিত হতে দেখা যায় না। আগেই দেখানো হয়েছে, অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে বঙ্গদেশে সংকলিত পুরাণাদি শাস্ত্রে গণপতি প্রথম পূজ্যের পদলাভ করেছেন। যদিও প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের বাংলায় স্মার্ত হিন্দুর ধর্মজীবনে বিশেষত পঞ্চোপাসনার বৃত্তে আরম্ভ-দেবতা রূপে তাঁর স্বীকৃতি তখনও জোটেনি। সম্ভবত সাহিত্যে উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও তাঁর অন্যান্য বিশেষত্ব কবিকল্পনায় ফুটে উঠলেও শিবগণের অধিপতি অথবা গৌরীপুত্রের পরিচয়েই তিনি আটকে আছেন। স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চদেবতার ক্রমে তখনও তিনি অনাগত। বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্যে মঙ্গলমূর্তি গণেশ তাঁর অপার্থিব বৈভবে, নৃত্যরসভঙ্গিমায়, জ্ঞানালোক বিচ্ছুরণে কিংবা সৃষ্টি ও প্রলয়ের লীলাখেলায় অনন্যস্বতন্ত্র, যেন শক্তি ও সৌন্দর্যের সমন্বিত প্রতিমা। এই সতত মৌলিক, চিরভাস্বর গণেশ গণপতিত্বের গুণে ভক্তজনের নমস্য বটে, কিন্তু প্রথমপূজ্য নন। তিনি তুষ্ট হয়ে ভক্তসাধারণের সামূহিক মঙ্গল বিধান করবেন, তাঁর যে কোনও রকম শরীরী প্রকাশই জগৎবাসীর পক্ষে হিতকর, এমনকি তিনি জগপতি রূপে গৌরী-গিরীশের কার্যধারার অনুকরণ করেন। গণেশের মহিমা ঘোষণায় রাজশেখর, ভবভূতি, মণ্ডন, পাপাক, দক্ষ, বসুকল্প, উমাপতিধর প্রমুখ কবি এতখানি উচ্চকণ্ঠ, অথচ নির্দিষ্ট করে

একজনও তাঁকে দেবতামধ্যে 'প্রথম স্থানীয়' বলেননি। পঞ্চদশ শতকের আগে অর্থাৎ রঘুনন্দন-পূর্ব বঙ্গদেশে গণেশ যে স্মৃতিবিধানে প্রথম পূজ্যের পদলাভ করেননি; মঙ্গলমূর্তি, নৃত্যপর এবং জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হয়েও শিবগণের অধিপতিপদেই আটকে আছেন, সাহিত্যক্ষেত্রের এই অনুল্লেখ থেকেও তা একভাবে প্রমাণ করা যায়।

৩.৫

স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাসনা এবং গণপতি :

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকেই বঙ্গীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে গজানন-গণেশ ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। পৌরাণিক আখ্যানে, অভিলেখ বা মূর্তিলেখে, পাল-সেন আমলের অসংখ্য মূর্তিতে, কোষকাব্যের অন্তর্গত একাধিক শ্লোকের বন্দনাসূত্রে প্রাচীন বঙ্গদেশে গণেশের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা একটি সুস্পষ্ট ভিত্তি লাভ করেছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূল স্রোতে তো বটেই, বাংলার তান্ত্রিকী ঐতিহ্যেও গণপতির সমান্তরাল প্রতিষ্ঠা এই পর্ব থেকেই লক্ষ করা গেছে। সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশের ধর্মীয় বৈচিত্র্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গণপতি কখনও শিব-শক্তির, কখনও বা বিষ্ণুর বৃত্তভুক্ত হয়েছেন। শৈব, বৈষ্ণব বা শাক্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে এই মিলন-মিশ্রণের সমীকরণ বঙ্গীয় ধর্ম-পরম্পরায় গণপতির ক্ষেত্রে চিরকাল অব্যাহত থেকেছে। ভারতব্যাপী তাঁর অনন্যস্বতন্ত্র পরিচয় সিদ্ধ হলেও, এমনকী সে সম্পর্কে প্রাচীন ও মধ্যবাংলার সাধক-কবিগণ যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হলেও ('মঙ্গলগীতে গণেশ প্রসঙ্গ' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য) বঙ্গদেশের ধর্মীয় ঐতিহ্যে তাঁর একক উদ্‌যাপন কখনওই বিরাট রূপ লাভ করেনি, প্রথমপূজ্যের মর্যাদাতেই আটকে আছেন। যদিও স্মার্ত হিন্দুর ধর্মব্যবস্থায়, মুখ্যত 'পঞ্চোপাসনা'-য় এই প্রথম দেবতার স্থানলাভও গণেশের ক্ষেত্রে অন্তত শুরু থেকেই ঘটেনি। 'গণেশ, সূর্য, শিব, বিষ্ণু ও শক্তি'— পঞ্চোপাসনার এই দেবতা পঞ্চকের অধিষ্ঠান ভারতের সর্বত্র এই পারম্পর্যে ঘটলেও বঙ্গদেশের নিরিখে গণেশের প্রথমপূজ্যের স্থানাভিষিক্ত হতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে। আসলে বঙ্গদেশে পঞ্চোপাস্যের বর্গে গণেশভুক্তির মধ্যে অন্য এক দেবতার (অগ্নি) স্থানবদলের ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

নির্গুণ পরমব্রহ্মের সগুণ পঞ্চ প্রকাশরূপের কল্পনা থেকেই পঞ্চায়তন পূজার ধারণা প্রবর্তিত হয়। পঞ্চোপাসনার মাধ্যমে বর্তমান হিন্দুধর্মের প্রধান পাঁচটি সম্প্রদায়ের (গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত) সর্বোচ্চ বা কেন্দ্রীয় দেবতার আপসমূলক উপাসনা বোঝানো হয়। প্রত্যেক উপাসক গোষ্ঠীর কাছে তাঁদের উপাস্য দেবতা সর্বমান্য বা কেন্দ্রস্থ হলেও এই বিধিমতে অন্য দেবতারাও উপেক্ষণীয় নন, অর্থাৎ এই পঞ্চোপাসনার ধারণার মধ্যে একধরনের সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে।[৯৭] কারণ, নির্দিষ্ট উপাসকগোষ্ঠীর প্রধান উপাস্য এবং তাঁর বিশেষ মাহাত্ম্যমূলক

পুরাণকথার অংশটুকু বাদ দিলে তাত্ত্বিক ভিত্তিতে অর্থাৎ ধর্মীয় ও দার্শনিক পরিভাষায়, আচার-অনুষ্ঠানে, উপাসনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই ধর্মধারাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশি যে এদের পারস্পরিকতা তৈরি হওয়া বেশ সহজ ছিল। যদিও তত্ত্ববিশ্বের বাইরে বাস্তবে সামাজিক ক্ষেত্রে ছবিটা সবসময় এইরকম ছিল না। তবে সগুণ উপাস্যভেদে পরস্পর পৃথক এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নৈকট্য তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে পুরাণ এবং স্মৃতিশাস্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এমনকী বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যেও এই জাতীয় সমন্বয়মূলক মানসিকতার প্রতিফলন ধরা পড়েছে।[৯৮]

আমরা জানি, প্রথমত ঋগ্‌বেদের অনেকান্ত 'গণপতি'-র ধারণা, দ্বিতীয়ত পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে (*মৈত্রায়ণী সংহিতা, তৈত্তিরীয় আরণ্যক*) 'হস্তীমুখ', 'দন্তী' শীর্ষক একাধিক therimorphic elephant deity–র উল্লেখ, তৃতীয়ত *মানবগৃহ্যসূত্র*-এর বহুবচনান্ত বিঘ্নকর 'বিনায়ক' থেকে *যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা*-য় রুদ্র-ব্রহ্মার দ্বারা এক গণাধিপত্যে অভিষেক এবং malevolent থেকে benevolent স্তরে ক্রমোত্তীর্ণ 'গণপতি-বিনায়ক' খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে পুরাণের গজমুখ গণেশরূপে পরিচিত হয়েছেন।[৯৯] উল্লিখিত সময়পর্ব থেকেই ক্রমশ ভারতীয় সংস্কৃত পুরাণ পরিসরে প্রথমপূজ্য হিসেবে হস্তীমুখ গণেশের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। পুরাণের এই সর্বসিদ্ধিপ্রদ, বিঘ্নবিনাশক, আদিপূজ্য গণেশ খ্রিস্টীয় নবম শতকের মধ্যেই আদি শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত পঞ্চোপাসনায় প্রথম উপাস্যরূপে ভারতব্যাপী স্বীকৃত হন। আগেই বলা হয়েছে, বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে পঞ্চোপাস্যের ক্রমে গণেশভুক্তি এই সময় থেকেই ঘটেনি। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে এই বক্তব্যের যাথার্থ্য বোঝা সম্ভব। সপ্তম-অষ্টম থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশে রচিত ও সংকলিত আটটি পুরাণের মধ্যে (*দেবীপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, কালিকাপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, মহাভাগবতপুরাণ, দেবীভাগবতপুরাণ* এবং *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*) অন্তত তিনটিতে (*ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মহাভাগবত* এবং *বৃহদ্ধর্ম্ম*) গণেশ শাস্ত্রীয়ভাবে আদিদেব বা প্রথম পূজ্যের স্থানলাভ করেছেন। যদিও পুরাণসিদ্ধ হলেও বঙ্গীয় স্মৃতির বিধানে আদিপূজ্য হতে তাঁকে সম্ভবত পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

প্রথম স্তরে শৈবধর্মের আশ্রয়গত হয়েই পুরাণোক্ত গণেশ বিঘ্নহর্তা এবং সিদ্ধিদাতা মূর্তিতে বঙ্গীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে প্রবিষ্ট হন। আগের উপ-অধ্যায়েই দেখানো হয়েছে, বঙ্গদেশে গণেশের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া গেছে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে, কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রলিপিতে। পুরাণ-প্রমাণের দিক থেকে বিবেচনা করলেও সপ্তম-অষ্টম শতকের রচনা ও সংকলন বলে অনুমিত *দেবীপুরাণ*-এ গণপতির আবির্ভাব এবং মাহাত্ম্যের

সবিস্তার বর্ণনা পাওয়া যাবে। এখানেও গণেশের উদ্ভবের সঙ্গে শিব ও বিষ্ণুর প্রগাঢ় সংস্রব লক্ষণীয়। আনুমানিক দশম বা একাদশ শতকের প্রথমভাগে আসাম-সন্নিহিত বঙ্গদেশের কোনও অঞ্চলে রচিত *মহাভাগবতপুরাণ*-এ পার্বতীপুত্র গণেশ আক্ষরিকভাবে স্বয়ং বিষ্ণুই। দশম থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে বর্তমান রূপে নির্মিত *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এও গণেশ বিষ্ণু ও শিবাত্মজ (পরে অবশ্য শিব-পার্বতীর পুত্ররূপে গৃহীত)। কাজেই বঙ্গীয় পুরাণের ঐতিহ্য মাথায় রাখলে দেখা যাবে, প্রাচীন বাংলায় গণেশের অস্তিত্ববিস্তার ঘটেছিল মূলত দুই পুরুষ দেবতার সূত্রে - শিব এবং বিষ্ণু। যদিও বঙ্গীয় পুরাণমণ্ডলে বিষ্ণু এবং শিব ছাড়াও পার্বতীপুত্রের পরিচয়ও তিনি *ব্রহ্মবৈবর্ত*, *মহাভাগবত* এবং পরে *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এর (দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) সূত্রে লাভ করেছেন। এ ছাড়া মূর্তিপ্রমাণের দিক থেকেও প্রেক্ষিতটি বোঝা সম্ভব। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে প্রধানত পাল ও সেন আমলে বাংলায় বিভিন্ন ধরনের গণেশমূর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে। আগের উপ-অধ্যায়েই সেগুলি পেশ করা হয়েছে। এই সময় থেকে সিদ্ধিদাতা হিসেবে ব্যবসায়ী মহলেও তাঁর ক্রমবিস্তার ঘটতে (নারায়ণপুর মূর্তিলেখ স্মর্তব্য) থাকে। যদিও তখনও পর্যন্ত তিনি স্মার্ত হিন্দুর প্রধান পাঁচ দেবতার বাইরেই ছিলেন। শিবগণের প্রধান হিসেবেই (শিব নামান্তরে 'গণপতি') সাধারণ্যে তাঁর প্রসিদ্ধি ঘটেছিল। স্বরূপত তিনি শিবেরই দ্বিতীয় মূর্তি। নটরাজ শিবের অনুকৃতিমূলক মূর্তিভঙ্গিমায় ষড়ভুজ বা অষ্টভুজ নৃত্য গণেশের অজস্র নমুনা প্রাচীন বঙ্গদেশে বিস্তর মিলেছে। মনে হয় পূর্বভারতে শৈব ধর্মের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেই এই নৃত্যমোদী গণেশমূর্তি ব্যাপকতা লাভ করেছিল। এর সমান্তরালে বঙ্গদেশের কুলধর্মরূপে যে শক্তি উপাসনা ও শাক্ত ধর্মের ঐতিহ্য প্রবহমান ছিল, তার সঙ্গেও গণপতির প্রথমাবধি সংযোগ। পূর্ববঙ্গের কয়েকটি তান্ত্রিকী পরম্পরায় সশক্তিক গণপতির সাধনা প্রচলিত ছিল। ফলে বিষ্ণু, শিব বা শক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে কেবল ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূলধারাতেই নয়, বামাচারী তন্ত্রমার্গেও গণপতি উপাসনার একটি পার্শ্বধারা ইসলাম-পূর্ব বঙ্গদেশে বর্তমান ছিল।

উপরোক্ত আলোচনা সূত্রে বোঝা যায়, শৈব বা শাক্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েই প্রাথমিকভাবে বঙ্গীয় ধর্মসমাজে গণেশের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই প্রথম স্তরে তিনি স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাস্যের (অগ্নি-সূর্য-শিব-বিষ্ণু-শক্তি) বর্গভুক্ত ছিলেন না। অন্তত পঞ্চদশ শতকের পূর্বে প্রথমপূজ্য বা আদিদেবরূপে গণেশ যে স্মার্ত হিন্দুর ধর্মাচারে গৃহীত হয়েছেন, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। মৈথিল স্মৃতিনিবন্ধ প্রমাণে তিনি মূলত দিকাধিপতি বা দিকপাল জাতীয় দেবতা। দিকবন্ধনে তাঁকে স্মরণ করে সাধনবিঘ্ন এড়াতে হয়। পূজারম্ভে দিগ্‌বন্দনায় যেমন বলা হয় 'দক্ষিণে গণেশায় নমঃ'। এই দক্ষিণ দিক গণেশের উদ্দেশে সমর্পিত, তিনি দক্ষিণের অধিদেবতা। পৌরাণিক

গণেশের ভাবকল্পনার মধ্যে শ্রুতির অগ্নির যে archetype সম্পুটিত আছে, সেই অগ্নিও দক্ষিণ-পূর্বদিকেরই অধিদেবতা। আবার, দক্ষিণমূর্তি শিবের সঙ্গে অভিন্নতত্ত্ব হওয়ায় তাঁকে দক্ষিণদিকস্থ দেবতা বলা হতে পারে। বীর মিত্র রচিত *বীরমিত্রোদয়* এবং মিত্র মিশ্র রচিত *মদনপারিজাত* শীর্ষক মৈথিল স্মৃতিনিবন্ধ প্রমাণেও গণেশের এই দক্ষিণ দিকপালের পরিচয়টিই পাওয়া যায়।[১০০] মনে হয় এই সূত্রে তিনি ক্ষেত্রপালজাতীয় দেবতার পঙ্‌ক্তিভুক্ত। পাশাপাশি কোষকাব্যের প্রমাণের দিকেও নজর দিলে দেখা যাবে, প্রাচীন বঙ্গে গণেশের আদিপূজ্যতা লাভের লিখিত নিদর্শন সেখানেও নেই। পাল আমলের *সুভাষিতরত্নকোষ* অথবা সেন যুগের *সদুক্তিকর্ণামৃত* বা গোবর্ধনের *আর্যাসপ্তশতী*– সর্বত্রই অপ্রধান পৌরাণিক দেবদেবীর মধ্যে গণেশ গৃহীত হয়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিবগণ হিসেবে, দু'-একটি ক্ষেত্রে শিব-পার্বতীর পুত্ররূপে তাঁর উল্লেখ ঘটেছে। প্রাচীন বঙ্গদেশের এইসব সাহিত্যপ্রমাণের একটিতেও গণেশ 'প্রথমপূজ্য'-রূপে স্বীকৃত নন। সমকালে স্মার্ত হিন্দুর ধর্মকার্যে অর্থাৎ স্মৃতিপ্রমাণে আদিপূজ্যের সম্মান পেলে নিশ্চয়ই শ্লোককারের বর্ণনায় একবার হলেও তার প্রতিফলন ঘটত। গণেশের নৃত্যমোদিতা, নাট্যরসপ্রিয়তা, সুন্দর আকর্ষণীয় দেহসৌষ্ঠব, এমনকী বিঘ্নবিনাশক হিসেবে তাঁর গুরুত্বের কথা কবিদের বয়ানে উঠে এলেও তাঁকে আদিপূজ্যের স্থান দেওয়া হয়নি। এইসব প্রমাণের সূত্রে মনে হয় পঞ্চদশ শতকের আগে বঙ্গদেশে পঞ্চোপাসনার ধারায় গণেশ আদৌ প্রথম পূজ্য ছিলেন না। পঞ্চদশ শতকে রঘুনন্দনের বিধানে গণেশ স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাসনায় প্রথম দেবতারূপে আসনলাভ করেন। অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে ভারতের সর্বত্র পঞ্চোপাসনায় গণেশ দিয়ে শুরু দেখেছেন।[১০১] এই নির্ধারণ ঠিক নয়। কারণ, রঘুনন্দন-পূর্ব স্মৃতিকারদের ভাষ্যে গণেশ নয়, বৈদিক অগ্নির-ই প্রথম পূজ্যতা স্বীকৃত ছিল। বঙ্গদেশের religiosocial system-এর মধ্যেই এই বিশেষত্ব নিহিত। ইতিহাসের পথরেখা অনুসরণ করলে দেখা যায়, বঙ্গদেশে গুপ্তপূর্ব যুগ থেকেই আর্যসংস্কার দৃঢ়মূল করার জন্য নানা উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মগধ যেহেতু ছিল বাংলার দ্বারপ্রান্তে, স্বভাবতই খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে থেকেই কৃষি এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় আর্যসভ্যতার সঙ্গে স্থানীয় সভ্যতার আদান-প্রদান খুবই বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া মৌর্যযুগ থেকে রাজধর্ম হিসেবে বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিস্তার ঘটতে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে উৎকীর্ণ সাঁচি স্তূপে বঙ্গদেশ বৌদ্ধ-এলাকা হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।[১০২] খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে মুখ্যত গুপ্তরাজবংশের আমলেই রাঢ়বঙ্গে অর্থাৎ গঙ্গা-পদ্মাবিধৌত সমগ্র দক্ষিণ গাঙ্গেয় সমভূমিতে আর্যপ্রভাব সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই সময় থেকেই রাঢ়বঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির অধীন হয়। গুপ্তরাজারা উত্তরাপথের মানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য মধ্যদেশ থেকে শাস্ত্রযাজী ব্রাহ্মণ এনে

বঙ্গদেশে তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছিলেন। গুপ্তযুগের অনুশাসনগুলিতে ব্রাহ্মণদের বসবাস করানো, অগ্নিহোত্র ও অন্যান্য যজ্ঞানুষ্ঠান এবং দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায়। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনে দুশো পাঁচজন ব্রাহ্মণকে জমি দিয়ে শ্রীহট্টে বসবাস করানোর কথা উল্লিখিত আছে। গুপ্ত আমলে বঙ্গদেশে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান পালিত হলেও বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতা করা হয়েছে, এমন কোনও প্রমাণ নেই। সপ্তম শতকে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক নিজে পরমশৈব ছিলেন। ফলে বৈদিক ধর্মের মধ্যে বিশেষ আনুকূল্য লাভ করেছিল শৈবমত। বিভিন্ন তাম্রশাসনে চতুর্বেদী ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের উল্লেখ যেমন আছে, তেমনই অগ্নিহোত্র, পঞ্চমহাযজ্ঞ, বলিচরুসত্র, হেমাশ্বমহাদান ইত্যাদির ব্যয়ভার বহনের জন্য ভূমিদানেরও দৃষ্টান্ত আছে। শশাঙ্কের আমলে বঙ্গদেশে শৈবধর্মের প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। চন্দ্র বংশের রাজাদের অনেকেই পরমসৌগত অর্থাৎ বুদ্ধভক্ত ছিলেন। যদিও ময়নামতী শাসনের সাক্ষ্যে শেষ দুই চন্দ্ররাজা লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের (বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে) যথাক্রমে বিষ্ণুভট্টারক ও শিবভট্টারকের উদ্দেশে শাসনদানের কথা জানা যায়। বৌদ্ধধর্মের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ হলেও দ্বিতীয় মহীপাল ছাড়া বাংলা-বিহারের পাল রাজাদের কেউই দীক্ষিত বৌদ্ধ ছিলেন না। দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসন-ধৃত ধর্মপালের বর্ণনার ('বর্ণান্ স্থাপয়িতা স্বধর্মে'[১০৩])সাক্ষ্যে বোঝা যায় পাল রাজারা বর্ণাশ্রমে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁরা হিন্দুদেবতা ও ব্রাহ্মণদের নির্দ্বিধায় ভূমিদান করতেণ। নারায়ণপালের বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রথম মহীপাল ও নয়পালের শৈবধর্মের প্রতি অনুরক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নারায়ণপালের মন্ত্রী গুরবমিশ্র বৈদিক আচার-আচরণ ও সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। এ ছাড়া পালরাজবংশের অন্যান্য মন্ত্রী, যেমন দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র প্রমুখ বৈদিক শাস্ত্রাদিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পালযুগের বর্ণাশ্রম-সমাজব্যবস্থায় হিন্দুধর্মাশ্রিত ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোনও সামাজিক ফারাক ছিল না। ফলে বৌদ্ধ প্রভাবিতরা যেমন এই সময় থেকেই ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু রীতিতে মিশ্রিত হয়েছেন, তেমনই ব্যাপকার্থে সাধারণ মানুষেরাও স্মার্তব্রাহ্মণ্য জীবনচর্যায় সংস্থাপিত হতে শুরু করেছেন।[১০৪] পালদের পর বর্মণদের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি আনুকূল্য আরও বৃদ্ধি পায়। বর্মণবংশের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী ভট্টভবদেব বেদাদি শাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। তবে একথা সত্য যে, সেন আমলেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম সর্বাধিক পৃষ্ঠপোষণা লাভ করে। প্রথম পর্যায়ে শৈব ধর্ম এবং পরে লক্ষণসেন ও কেশব সেনের সূত্রে বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। গুপ্ত আমল থেকে সেনযুগ পর্যন্ত (খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতক) ধারাবাহিকভাবে বাংলার শাসকেরা ধর্মকার্য পরিচালনার জন্য আর্যাবর্ত থেকে ঋগ্‌বেদ, যর্জুবেদ (বাজসনেয়ী শাখা) ও সামবেদে অভিজ্ঞ এমন সব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আহ্বান জানাতেন। বর্মণ ও সেনরাজারাও বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি

উপাসনাপদ্ধতি জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের বর্মণ বংশোদ্ভূত সামল বর্মা তাঁর রাজ্যে ব্রাহ্মণ আনাতেন, 'ব্রহ্মবাদী' সামন্তসেন শেষ বয়সে গঙ্গাতীরে যাগকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেনযুগে বল্লালসেন ও লক্ষণসেনও পৌরাণিক সংস্কৃতির অন্যতম প্রচারক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী *রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস* গ্রন্থে লিখেছেন, "বৈদিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে অন্যান্য স্থানের ন্যায় রাঢ়েও ব্রহ্মাপূজা অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। তেমনি সূর্যের স্থান নিয়েছে বিষ্ণু ও ধর্মরাজের উপাসনায় এবং একই পরিবারভুক্ত হওয়ার কারণে এদেশে শৈবগোষ্ঠীতে গণপতির অস্তিত্ব হারিয়ে গেছে।"[১০৫] উল্লিখিত সময়পর্বে বঙ্গদেশের স্মার্তব্রাহ্মণ্য ধর্মব্যবস্থায় যজ্ঞক্রিয়া ছিল একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ধর্মোপাসনায় নিত্যকর্ম হিসেবে যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পালিত হত। অবশ্য এই যজ্ঞভিত্তিক ধর্মাচার মূলত অভিজাতমণ্ডলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে পৌরাণিক সংস্কৃতি ও স্মার্ত আচার-বিচার প্রচারের জন্য শাসকগণ সদা সচেষ্ট ছিলেন। স্বভাবতই রাঢ়বঙ্গের পৌরাণিক ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে 'পঞ্চোপাসনা', তাতে তখনও পর্যন্ত আদিদেবরূপে অগ্নিরই প্রাধান্য ছিল। যজ্ঞপ্রধান বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে অগ্নিহোত্র যাগ ব্যয়সাধ্য হলেও রাজন্যবৃত্তে এই যজ্ঞকর্মের প্রচলন ছিল। 'দেবতাদের মুখ'-রূপে প্রসিদ্ধ হব্যবাহী অগ্নিই ছিলেন প্রাচীন বঙ্গদেশে প্রথম দেবতা। অগ্নির অর্চনা করেই অন্য দেবতাদের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করা হত। ব্রাহ্মণের পূজা-উপাসনায় বা স্মার্ত কাজে যাগযজ্ঞে বৈদিক অগ্নিই ছিলেন আদি উপাস্য। লক্ষণীয় যে, বঙ্গীয় ধর্মচর্যায় গণেশের প্রবেশ সপ্তম শতকের মধ্যভাগে হলেও প্রথম ধাপেই তাঁর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা হয়নি। দশম শতকের মৈথিল স্মৃতিনিবন্ধেও দিকপালজাতীয় দেবতা হিসেবে তাঁকে কিছুটা অপ্রধান পর্যায়েই গণ্য করা হয়েছে। পুরাণ-প্রমাণে আদিপূজ্যতা পেয়েও স্মার্তব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় তিনি দেবতা পঞ্চকের মধ্যে প্রথম স্থানীয় নন। শ্রুতির অগ্নিই ছিল সর্বমান্য আদিদেবতা। প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় ধর্মচিন্তায় গণপতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত আলোচনায় দেখা গেছে, কীভাবে বৈদিক দেবভাবনার পূর্ববীজ পৌরাণিক গণেশের ভাবকল্পনার মধ্যে অনুস্যূত হয়েছে। এক্ষেত্রে বৈদিক বৃহস্পতি, ইন্দ্র, সূর্য এবং রুদ্র-শিবের সঙ্গে পুরাণের গণেশের সাধর্ম্য গবেষকমহলে সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং বিশ্লেষিত হলেও শ্রুতির অগ্নির মধ্যেই যে পৌরাণিক গণেশের মূল বৈদিক archetype বা আদিকল্পটি রয়ে গেছে, তা অনেকাংশেই পূর্বজদের চোখ এড়িয়েছে। পাশ্চাত্য গবেষকদের মধ্যে একমাত্র Charles Eliot-ই অগ্নিরূপে গণেশকে বিষ্ণু ও শিবের সমানধর্মা ভেবেছেন।[১০৬] আচার্য হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যও গণেশের স্বরূপ-সন্ধানের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিমধ্যে এলিয়টের বক্তব্য ব্যবহার করেছেন।[১০৭] কিন্তু, কেবল বিষ্ণু বা শিবরূপেই কেন, অনন্যনিরপেক্ষভাবেও শ্রুতির অগ্নিকে পুরাণের

গণেশের পূর্বমুখ বলা চলে। দুই দেবতার গাত্রবর্ণগত এবং ভূমিকাগত সাদৃশ্য তো আছেই, বিশেষভাবে তাঁদের মধ্যেকার তাত্ত্বিক সাদৃশ্যের দিকটিও প্রথম অধ্যায়ে পেশ করা হয়েছে। অগ্নি এবং গণেশের এই সাদৃশ্য-সন্ধান বঙ্গদেশের ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। কারণ, শ্রুতির অগ্নির স্থানচ্যুতির মধ্য দিয়েই পৌরাণিক গণেশ স্মার্ত হিন্দুর ধর্মব্যবস্থায় আদিদেব পদবাচ্য হয়েছেন। পঞ্চদশ শতকে স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দনই প্রথম অগ্নির পরিবর্তে গণেশকে পঞ্চোপাস্যের প্রথম দেবতারূপে মান্যতা দিয়েছেন। তাঁর *আহ্নিকতত্ত্ব* গ্রন্থের 'অথ দেবপূজা' শীর্ষক অংশে *পদ্মপুরাণ* এবং *ভবিষ্যপুরাণ*-এর সমর্থনে বলা হয়েছে, 'আদৌ বিনায়কঃ পূজ্যো অন্তে চ কুলদেবতাঃ।'[১০৮] গাঙ্গেয় সমভূমির হিন্দু বাঙালির identity-র অন্যতম রূপকার রঘুনন্দন বঙ্গদেশে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের অসম্ভাব্যতা বুঝতে পেরেছিলেন। যজ্ঞনির্ভর অগ্নিপ্রধান বৈদিক সংস্কারের সঙ্গে যে হিন্দু বাঙালির নিজস্ব কুলসংস্কারের একটি স্বতঃবিরোধ পূর্ববর্তী শতক থেকেই চলে আসছিল, প্রাজ্ঞ রঘুনন্দনের তা বুঝতে ভুল হয়নি। রঘুনন্দন-পূর্ব স্মৃতিকারদের রচনায় পঞ্চোপাসনায় অগ্নিপ্রাধান্য স্বীকৃত হলেও রঘুনন্দনের সময় থেকেই এই trend ভেঙে যায়। রঘুনন্দন-পরবর্তী স্মৃতিকার, যেমন গোবিন্দানন্দ মিশ্রের *বর্ষক্রিয়াকৌমুদী*-তেও পঞ্চোপাসনায় গণেশের আদিপূজ্যতা অব্যাহত, এমনকী চতুর্থী তিথিতে গণেশ পূজার বিধানগুলিও পুরাণ-প্রমাণ সমেত উল্লিখিত।[১০৯] লক্ষ করার বিষয় হল, বৈদিক অগ্নিকে গণেশ দিয়ে ব্যবস্থিত করার এই প্রক্রিয়ায় আরেক দেবতার ছায়া অলক্ষ্যে রয়ে গেছে। তিনি চতুর্মুখ প্রজাপতি ব্রহ্মা, শ্রুতির অগ্নির পৌরাণিক suppliment। কিন্তু পুরাণ-প্রমাণে ব্রহ্মা কলিতে পুষ্কর ছাড়া অন্যত্র অপূজ্য হওয়ায় রঘুনন্দন ব্রহ্মার বদলে বৈদিক অগ্নিকে পৌরাণিক গণেশের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেন। রূপ, শক্তি এবং ধর্মের নিরিখে অগ্নি, ব্রহ্মা ও গণেশের মধ্যে একটা অন্তর্লীন ভাবৈক্য ছিল বলেই স্মার্তপ্রবর রঘুনন্দন ধর্ম-সামাজিক ক্ষেত্রের বাস্তব প্রয়োজন বুঝে একদেবতার আসনে অন্যদেবতাকে বসালেন। এই বাস্তব প্রয়োজনের দিকটাই সামান্য বিশ্লেষণ করা যাক। আসলে প্রাচীন বঙ্গদেশীয় রাজারা যতই যজ্ঞক্রিয়ানির্ভর বৈদিক সংস্কার প্রচারের জন্য উৎসুক হোন না কেন, সাধারণ ব্রাহ্মণ সমাজেও যাগযজ্ঞপ্রধান বৈদিক সাহিত্য বা আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি ততখানি আগ্রহ ছিল না। তা ছাড়া যেসব ব্রাত্য আর্য আর্যাবর্ত ছেড়ে পূর্বাঞ্চলে বাস করতেন, তাঁরাও যজ্ঞীয় বেদবিদ্যাকে খুব একটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। পাশাপাশি যে সমস্ত বাঙালি কুলধর্ম ত্যাগ করে আর্যসংস্কার গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও যজ্ঞের আচার-অনুষ্ঠান অনুশীলনের ক্ষেত্রে মনোযোগের অভাব দেখা যেত। ফলে প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন সময়ে রাজাদের প্রভূত আনুকূল্য সত্ত্বেও বৃহত্তর সমাজের আন্তরিক সমর্থনের অভাবে এখানে যজ্ঞনির্ভর বৈদিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।

দশম শতকের প্রখ্যাত দার্শনিক কুসুমাঞ্জলি-র লেখক বলেছেন যে, বাংলার মীমাংসকগণ বেদের তাৎপর্য বিশেষ অবগত ছিলেন না। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও বাঙালির বেদচর্চাকে তেমন মর্যাদা দেননি। বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট *পিতৃদয়িতা*-য় স্পষ্টই লিখেছেন, সেকালের বাঙালিদের মধ্যে বৈদিক অনুশীলনের প্রতি একধরনের অনীহা দেখা গিয়েছিল। হলায়ুধও তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*-এ বঙ্গদেশে বেদবাদের বিরলতা দেখেছেন। এইসব ধর্মশাস্ত্রনিবন্ধকারদের মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, গুপ্ত-পাল-সেন আমলে, এমনকী বৈদিক ধর্মাবলম্বী বর্মণশাসনেও কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষণা সত্ত্বেও পূর্বভারতে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান-পূজাপদ্ধতি এবং যাগযজ্ঞ কখনওই বিশেষ জনপ্রিয় হয়নি। ফলে প্রাচীন-মধ্যযুগের বঙ্গদেশে যজ্ঞপ্রধান বৈদিক কর্মকাণ্ডের এই বিরলতায় আদিপূজ্য অগ্নির গুরুত্ব ক্রমেই সীমাবদ্ধ হয়ে আসছিল। তা ছাড়া বঙ্গীয় ধর্ম-সমাজে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণও অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। সংগত কারণেই বেদবাদের বিশিষ্ট রূপান্তর যেমন পৌরাণিক স্মার্ত ধর্মে, তেমনই শ্রুতির অগ্নিরও পৌরাণিক সম্পূরকের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। শাস্ত্রীয় ধারণায় লৌকিক আনন্দের সৃজনকর্তা ব্রহ্মা অগ্নিপ্রতীকেই পূজিত হন।[১১০] অগ্নি থাকলে ব্রহ্মার পৃথক উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। কাজেই, বৈদিক অগ্নির যোগ্য বিকল্প ব্রহ্মা হতেই পারতেন। কিন্তু, পুরাণমতে ব্রহ্মাপূজা কলিতে একমাত্র পুষ্করতীর্থেই আবদ্ধ বলে রঘুনন্দন দেবতাত্রয়ীর তত্ত্বগত ঐক্য বা ভাব-সামঞ্জস্য মাথায় রেখে অগ্নির স্থানে সিদ্ধিদাতা গণেশকে আদিপূজ্য করেন। এই সূত্র ধরেই অগ্নি তথা ব্রহ্মার ভাব ও কার্যধারার সম্পূরক হিসেবে বিঘ্নহর্তা গণেশ বঙ্গীয় পঞ্চোপাসনায় গৃহীত হন। বঙ্গীয় পুরাণে তিনি আদিপূজ্যের সম্মান এর আগেই লাভ করেছিলেন, রঘুনন্দনের বিধানে স্মার্ত হিন্দুর ধর্মচর্যায় আদিদেবরূপে পূর্ণপ্রতিষ্ঠ হলেন। এই সময় থেকেই মঙ্গলগীতের গণেশবন্দনার অংশগুলিতে তাঁকে প্রথমপূজ্য হিসেবে পাওয়া যাবে। উদাহরণ বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের *মনসামঙ্গল* (মতান্তরে *মনসাবিজয়*)-এর গণেশবন্দনা (আনু. ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দ)। মনে হয় এইটিই বাংলায় প্রাপ্ত প্রথম গণেশবন্দনা, যেখানে রঘুনন্দনের স্মৃতির বিধানকে মান্যতা দিয়ে কবি গণেশকে অগ্রপূজ্যের মর্যাদা দিয়েছেন। স্মৃতিচালিত হিন্দু সমাজে রঘুনন্দন-কৃত বিধানে গণেশের প্রথমপূজ্যতা সর্বত্র স্বীকৃত হলেও কোনও এক সময় যে পঞ্চদেবের মধ্যে অগ্নিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, মঙ্গলগীতের একটি প্রমাণের সূত্রে তা দেখানো যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে শ্রীহট্টের কবি রাধানাথ রায়চৌধুরীর *পদ্মাপুরাণ*-এর বন্দনা অংশটি খেয়াল করা যাক।[১১১] বস্তুত এটি অর্বাচীনকালের মঙ্গলগীতের দৃষ্টান্ত হলেও প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অতীত উদ্ধারের প্রশ্নে প্রমাণটির গুরুত্ব রয়েছে। সমকালে গণপতি আদিদেব হলেও ('নমো আদিদেব প্রভু অশুভনাশন') কবি বন্দনা অংশের তৃতীয় স্থানে তাঁর বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থের সূচনায় 'পঞ্চদেব-বন্দনা' বলে একটি স্বতন্ত্র অংশ পাওয়া যায়, যেখানে

প্রধান পাঁচ দেবতা হিসেবে শিব, সূর্য, অগ্নি, বিষ্ণু ও শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও পঞ্চদেবতার মধ্যে ক্রমিক বিচারে অগ্নি আদিপূজ্য নন, তৃতীয় স্থানে তাঁকে ('নমো নমো হুতাশন কৃশানু পাবক।/ দীনজনে ধনদাতা দারিদ্র্যনাশক') রাখা হয়েছে। প্রশ্ন জাগে, পঞ্চদেবতার মধ্যে অগ্নি বঙ্গদেশে পূর্বে প্রচলিত হলেও পঞ্চদশ শতকে রঘুনন্দনের সময় থেকেই অগ্নির প্রথম স্থানটি গণেশকে দেওয়া হয়েছে। তাহলে এত পরবর্তী সময়ের রচনায় এই ধরনের নিদর্শন কেন এল? এর থেকে মনে হয় কোনও নির্ধারিত সমীকরণের আওতায় ফেলে ধর্মীয় ঐতিহ্যকে একমাত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। যে বিশেষ যজ্ঞনির্ভর বৈদিক সংস্কারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে বঙ্গদেশে অগ্নি একসময় প্রথমপূজ্য হয়েছিলেন, সেই trend পঞ্চদশ শতকে রঘুনন্দনের স্মৃতির বিধানে ভেঙেছিল ঠিকই, কিন্তু তা পুরোপুরি নির্মঞ্জিত হয়ে যায়নি। ধর্মীয় ঐতিহ্যের স্মৃতিচূর্ণের মতোই কখনও তা ব্যতিক্রম হিসেবেও ফিরে আসতে পারে। শ্রীহট্টের রাধানাথের রচনায় হয়তো তেমনটাই হয়েছে। পূর্বতন ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রমাণ হিসেবে পরবর্তীকালের বন্দনাতেও অগ্নি পঞ্চদেবতার অন্তর্গত হয়েই রয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয়, তৎকালে গণেশ আদিদেব হলেও পঞ্চোপাস্যের বর্গভুক্ত নন। পঞ্চদেবের মধ্যে অগ্নির একদা-অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি যেমন ব্যতিক্রমী নজির হিসেবে রাধানাথের *পদ্মাপুরাণ*-এর বন্দনায় ফিরে এসেছে, তেমনই অগ্নি থেকে গণেশ পর্যন্ত যাত্রার মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছেন যে ব্রহ্মা, তাঁর রূপান্তর হিসেবেও গণপতিকে একটি মঙ্গলগীতের বন্দনায় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিবায়ন* বা *শিবসঙ্কীর্তনগীত*-এর কথা বলা যেতে পারে।[১১২] সমগ্র মঙ্গলগীতের পরিসরে এই একটিমাত্র গণেশবন্দনা, যেখানে ব্রহ্মার রূপভেদ হিসেবে গণপতি কল্পিত হয়েছেন, এমনকী পরোক্ষে তাঁকে ত্রিদেবের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। প্রথম কল্পে ব্রহ্মা উদ্ভিন্নযৌবনা গোয়ালিনীর সঙ্গ করার অভিযোগে সাবিত্রীর দ্বারা শাপভ্রষ্ট হয়েছেন। দ্বিতীয় কল্পে তিনিই কৃষ্ণ হয়ে বৃন্দাবনে গোয়ালার ঘরে অন্ন গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় কল্পে তিনিই আবার পার্বতীর গাত্রমলজাত পুত্ররূপে কৈলাসে আবির্ভূত হয়েছেন, শনির দৃষ্টিপাতে মুণ্ডচ্ছেদের পর দেবতাদের সম্মিলিত চেষ্টায় গজানন প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পরবর্তীতে হস্তীমুখ গণেশ শিব-পার্বতীর সন্তান হিসেবে বিখ্যাত হয়েছেন। এই তিন জন্মের পরিক্রমায় ব্রহ্মাই কার্যত অভিশাপজনিত কারণে কৃষ্ণ ও গণেশরূপে অবতীর্ণ। গণেশের সঙ্গে ব্রহ্মার পূর্বসূত্রতা প্রতিষ্ঠার দিক থেকে বর্ণনাটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বকে সগুণ পঞ্চদেবতার কল্পনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পঞ্চায়তন পূজার মূল ভিত্তি। নিম্নে প্রদত্ত রেখাচিত্রে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাতীত সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব উর্ধ্বমুখী ত্রিকোণের তিনটি বিন্দুতে দেবতাত্রয়ীর ভাবকল্পনার মধ্যে প্রকাশরূপ লাভ করেছে। এঁরা হলেন সদংশে তমোগুণাধার শিব, চিদংশে

সত্ত্বগুণাধার বিষ্ণু এবং আনন্দাংশে শুদ্ধ রজোময়ী আদ্যা মূলাপ্রকৃতি স্বয়ং। নিম্নমুখী ত্রিকোণে পূর্বোল্লিখিত সৎ ও চিৎ বিন্দুস্থিত দুই দেবতার সঙ্গে আনন্দস্বরূপিণী শক্তির সম্মিলনের ফলে যথাক্রমে দুটি মিলনবিন্দু সৃষ্টি হয়েছে। সদংশস্থিত শিব এবং আনন্দময়ী শক্তির মিলনজাত সদানন্দ বিন্দুতে রজঃ এবং তমোগুণ-সমন্বিত গণপতি জ্ঞানতত্ত্ব রূপে স্বীকৃত। অন্যদিকে, চিদংশ স্থিত বিষ্ণুর সঙ্গে আনন্দরূপিণী দেবীর চিদানন্দরূপ মিলনবিন্দুতে সত্ত্ব ও রজোগুণাধার তেজোময় সূর্যের অবস্থিতি। এ ছাড়া নিম্নমুখী ত্রিকোণে উর্ধ্বমুখী ত্রিকোণের শীর্ষবিন্দু অর্থাৎ আনন্দবিম্ব বিন্দুর প্রতিবিম্ব বিন্দুতে মলিন রজ বা মিশ্র রজোগুণাত্মক ব্রহ্মা উপস্থিত, যিনি লৌকিক আনন্দের সৃজনকর্তা এবং সাধারণ্যে অগ্নিপ্রতীকেই পূজিত। যদিও পঞ্চোপাস্যের বর্গে ব্রহ্মা অন্তর্গত নন। এযাবৎ আলোচনায় দেখেছি, অগ্নি একটা সময় পর্যন্ত প্রথমপূজ্য ছিলেন, পরে তাঁর স্থানে গণেশভুক্তি ঘটেছে। সদানন্দময় জ্ঞানতত্ত্ব গণেশ জলতত্ত্ব-প্রধানগণের উপাস্য হিসেবে স্মার্তমার্গে পঞ্চোপাসনায় গৃহীত হয়েছেন। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডে অগ্নির আধারেই ব্রহ্মা included বলে আলাদা করে ব্রহ্মাপূজার প্রয়োজন পড়ে না। তা ছাড়া পুরাণ-প্রমাণে ব্রহ্মা কলিতে অপূজ্য এবং তাঁর পূজায় শাপমোচনাদির সমস্যা থাকায় তিনি সাধারণ গৃহপরিসরে ব্রাত্য। বঙ্গদেশে স্মার্ত হিন্দুর ধর্মাচারে প্রথম দেবতা হিসেবে অগ্নিপ্রাধান্য স্বীকৃত ছিল। রঘুনন্দন পঞ্চদশ শতকে স্মার্তধর্মের পঞ্চোপাসনায় সদানন্দরূপ জ্ঞানাধীশ গণেশকে অগ্নির পরিবর্তে আদিপূজ্য করেছেন। রেখাচিত্রের মাধ্যমে পঞ্চোপাস্যের মধ্যে গণেশের অবস্থানটি স্পষ্ট করা হল[১১৩] :

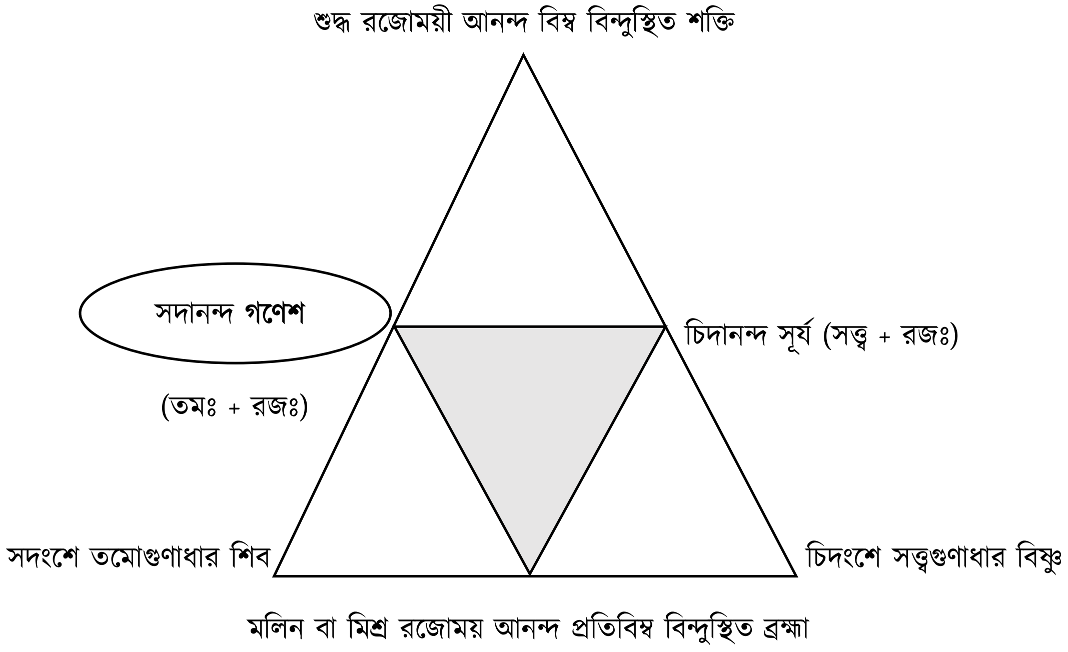

ষট্‌কোণবিশিষ্ট ব্রহ্মভাবচক্রে দেবতা-পঞ্চকের মধ্যে সদানন্দময় গণেশের অধিষ্ঠান

৩.৬

তন্ত্রমার্গে গণেশ প্রসঙ্গ :

তন্ত্রের দশমহাবিদ্যা তত্ত্বের সঙ্গে ভৈরবের মতোই গণেশরও ওতপ্রোত সংযোগ। গাণপত্য পরম্পরায় এক-এক মহাবিদ্যার সঙ্গে কখনও উর্ধ্বতন প্রভু (patron) সম্পর্কে, কখনও অধস্তন দাস (servant) সম্পর্কে, কখনও বা সাধনসঙ্গী বা স্বামী (consort) সম্পর্কে, আবার কখনও পুত্র (son) সম্পর্কে অবস্থাবিশেষে এক-একটি রূপভেদে গণেশ যুক্ত থাকেন। ক্রমানুসারে যথা: 'কালী'-র সঙ্গে 'গণনাথ' ভৃত্য সম্পর্কে, 'তারা'-র সঙ্গে 'সদ্যোজাত' বা 'উচ্ছিষ্ট গণেশ' স্বামী সম্পর্কে, 'ষোড়শী'-র সঙ্গে 'মহাগণপতি' পুত্র সম্পর্কে, 'ভুবনেশ্বরী'-র সঙ্গে 'পুষ্টিপতি গণেশ' ভৃত্য সম্পর্কে, 'ভৈরবী'-র সঙ্গে 'সারদা গণপতি বা সারদেশ' সাধনসঙ্গী বা স্বামী সম্পর্কে, 'ছিন্নমস্তা'-র সঙ্গে 'দুর্মুখ গণপতি' পুত্র সম্পর্কে, 'ধূমাবতী'-র সঙ্গে 'ধূর্ম্রবর্ণ গণেশ' প্রভু সম্পর্কে, 'বগলামুখী'-র সঙ্গে 'হরিদ্রা গণেশ' প্রভু সম্পর্কে, 'মাতঙ্গী'-র সঙ্গে 'মোহিনীশ্বর গণপতি' স্বামী সম্পর্কে এবং সর্বশেষ 'কমলা'-র সঙ্গে 'লক্ষ্মীবল্লভ গণেশ' প্রভু সম্পর্কে সংযুক্ত।[১১৪]

শ্রীবিদ্যার্ণব তন্ত্র-এর উত্তরার্দ্ধ প্রথম ভাগের 'মাতৃকার্ণব' অনুসারে শিবের উর্ধ্বমুখ থেকে নির্গত মন্ত্রসমূহ উর্ধ্বান্মায়ের মন্ত্র হিসেবে পরিচিত। এইভাবে পূর্বমুখ থেকে নির্গত মন্ত্র পূর্বাম্নায়, দক্ষিণমুখ থেকে নির্গত মন্ত্র দক্ষিণাম্নায়, পশ্চিমমুখ থেকে উদ্ভুত মন্ত্র পশ্চিমাম্নায় এবং উত্তরমুখ থেকে উচ্চারিত মন্ত্র উত্তরাম্নায়ের অন্তর্গত। *কুলার্ণব তন্ত্র* মতে, উত্তরাম্নায়ের মন্ত্র আশু ফলপ্রদ হয়। এই তন্ত্রগ্রন্থ অনুসারে, মহাগণপতি প্রমুখের মন্ত্র উর্ধ্বাম্নায়ের, হরিদ্রা গণপতির মন্ত্র পূর্বাম্নায়ের এবং উচ্ছিষ্ট গণপতির মন্ত্র দক্ষিণাম্নায়ভুক্ত বলা হয়েছে।[১১৫]

আগমাদি তন্ত্রশাস্ত্রগ্রন্থে বিভিন্ন দেব-দেবী এবং তাঁদের উপাসনা পদ্ধতির ষড়াম্নায় ভেদের কথা পাওয়া যায়। যেমন, *শ্রীবিদ্যার্ণব তন্ত্র*-এ ষড়াম্নায় হিসেবে উর্ধ্বাম্নায়, উত্তরাম্নায়, দক্ষিণাম্নায়, পূর্বাম্নায়, পশ্চিমাম্নায় এবং অধরাম্নায়ের উল্লেখ আছে। আম্নায়ভেদে গণেশের নানা উপাস্য রূপ। তবে তন্ত্রভেদে এক-একটি আম্নায়-নির্দিষ্ট রূপের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন, *শ্রীবিদ্যার্ণব* অনুসারে মহাগণপতির উপাসনা উর্ধ্বাম্নায়ে হলেও লক্ষ্মী গণেশ বা হরিদ্রা গণেশ দক্ষিণাম্নায়ে এবং উচ্ছিষ্ট গণেশ উত্তর আম্নায়ে পূজিত হন। এ ছাড়া পূর্বাম্নায়ে বিরিঞ্চি গণেশ ও পশ্চিমাম্নায়ে ক্ষিপ্রপ্রসাদ গণেশের উপাসনা করা হয়। *পুরশ্চর্যার্ণব* শীর্ষক শাস্ত্রগ্রন্থে আবার *শারদাতিলক* এবং *মেরুতন্ত্র*-এর উদাহরণের সমর্থনে সর্বপ্রথম দক্ষিণাম্নায়ে উপাস্য লক্ষ্মী গণেশ, শক্তি গণেশ, ক্ষিপ্রপ্রসাদ বিনায়ক, বক্রতুণ্ড, হেরম্ব

ও হরিদ্রা গণেশের ধ্যানমন্ত্র তথা পুরশ্চরণের বিধান দেওয়া হয়েছে। এরপর উর্ধ্বাম্নায়ে উপাস্য মহাগণপতি, পূর্বাম্নায়ে উপাস্য বিরিঞ্চি গণপতি, পশ্চিমাম্নায়ে উপাস্য কাশীর চতুষষ্টি বিনায়ক বা ক্ষিপ্রপ্রসাদ বিনায়ক এবং উত্তরাম্নায়ে উপাস্য উচ্ছিষ্ট গণপতির মন্ত্র, ধ্যান ও পুরশ্চরণবিধি বর্ণিত হয়েছে।[১১৬]

কবি সুন্দর শর্মা রচিত *উচ্ছিষ্ট গণপতি কল্প* থেকে মতঙ্গাশ্রমে মহাবিদ্যা মাতঙ্গীর ভৈরবরূপে উচ্ছিষ্ট গণেশের আবির্ভাবের কথা জানা যায়। মতঙ্গাশ্রম বলতে অনেকে দক্ষিণে মতঙ্গশিষ্যা শবরীর আশ্রম অর্থাৎ শবরীমালা বুঝলেও দশমহাবিদ্যার নবম বিদ্যা দেবী মাতঙ্গীর মূলপীঠ ছিল পূর্ববঙ্গ, আজকের বাংলাদেশে। এই দেবী মাতঙ্গী ছিলেন বৌদ্ধ সাধক তিলোপার ষষ্ঠ গুরু, যিনি পূর্ববঙ্গস্থ মতঙ্গাশ্রমেই তাঁকে মহামুদ্রার অন্তিম পাঠ প্রদান করেছিলেন। বিদ্যাবান নামক অসুরের বেদজ্ঞান এবং বেদাচারণের অহংকার চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে মতঙ্গমুনির হোমকুণ্ডজাত উচ্ছিষ্ট গণপতির আবির্ভাব-মাহাত্ম্যের কথা পূর্ববঙ্গের তান্ত্রিকী গাণপত্য পরম্পরায় প্রচলিত। কবি সুন্দর শর্মা রচিত *উচ্ছিষ্ট গণপতি কল্প* ছাড়াও *উচ্ছিষ্ট তন্ত্র, মাতঙ্গী তন্ত্র* প্রভৃতি গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। বেদাচারী বিদ্যাবান তাঁর রাজত্বসীমায় বেদচর্চা এবং বৈদিক ধর্মানুষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য অবৈদিক ধর্মধারার আচরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে বেদানুসারী ছাড়া শূদ্র, চণ্ডাল ও অন্যান্য বেদ-বহির্ভূত সাধনপন্থের অনুসারীগণ উপেক্ষিত হন। এমনকী স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত এই ধর্মব্যবস্থায় দুর্গতির শিকার হন। কারণ, বিদ্যাবান বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান অনুশীলনের পাশাপাশি নির্গুণ ব্রহ্মবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতিরিক্তি অন্যান্য সগুণাত্মক দেবতারা তাঁর মতাদর্শে প্রত্যাখ্যাত হন। এমনকী বেদাচারী ছাড়া অন্য ধর্মাচরণকারীদের তিনি 'ম্লেচ্ছ' বলে মনে করতেন। বেদবাদের এইরূপ চরম প্রচারের ফলে অবৈদিক তথা লোকায়ত ধর্মধারায় অপরিহার্য পঞ্চমকার সাধনবিধি ক্রমশ বিদ্যাবানকৃত ধর্মব্যবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। এমতাবস্থায় দেবতারা পর্যন্ত বিপন্নতা বোধ করেন। তাঁরা শরণাপন্ন হলেন দেবাদিদেব শিবের। তিনি দেবগণের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে মতঙ্গ ঋষির অবতার ধারণ করে মর্ত্যে আবির্ভূত হন। মতঙ্গাশ্রমে দেবী মাতঙ্গী বা নীল সরস্বতীর উদ্বোধনার্থে সাধনা আরম্ভ হল। দেবী কৃপাবশত মতঙ্গের আশ্রমে তাঁর কন্যারূপে অবতীর্ণ হলেন। মতঙ্গমুনির কন্যকা অর্থে মাতঙ্গী নাম হল তাঁর। এই দেবী ছিলেন কৃষ্ণবর্ণা। যথাকালে মাতঙ্গীনাম্নী কন্যার যৌবনোদ্গম হওয়ায় তাঁর বিবাহের জন্য সুপাত্রের সন্ধান শুরু হল। কিন্তু কোনও বৈদিক ব্রাহ্মণ বা বেদানুসারী ক্ষত্রিয় পুরুষ এই কৃষ্ণবর্ণা চাণ্ডালিনীকে বিবাহে সম্মত হল না। শেষে মাতঙ্গী স্বামীলাভের জন্য গণপতির সাধনা শুরু করলেন। পিতা মতঙ্গ তাঁকে উচ্ছিষ্ট গণপতির দ্বাত্রিংশাক্ষর মহামন্ত্র প্রদান করলেন। পিতা-পুত্রী একযোগে তাঁকে জাগ্রত করার জন্য

সাধনায় নিরত হলেন। ফলস্বরূপ, মাতঙ্গীর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে ঋষি মতঙ্গের হোমাগ্নি থেকে উচ্ছিষ্ট গণেশ আবির্ভূত হন। মতঙ্গের যজ্ঞকুণ্ডজাত সেই রক্তবর্ণ নগ্নবেশী গজানন পুরুষকে দর্শনমাত্রেই মাতঙ্গী তাঁকে পতিরূপে প্রাপ্তির কামনা করেন। চৈত্রের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে মতঙ্গের মানসকন্যা মাতঙ্গী দেবীর সঙ্গে উচ্ছিষ্ট গণেশের বিবাহ সম্পন্ন হয়। বাংলার তান্ত্রিকী গাণপত্য পরম্পরায় এই উচ্ছিষ্ট গণপতি বা মোহিনীশ্বর-ই নবম মহাবিদ্যা মাতঙ্গী বা উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর ভৈরবরূপে স্বীকৃত। বিবাহের পর জাহ্নবী তীরে বিশ্বকর্মা উচ্ছিষ্ট এবং মাতঙ্গীর প্রমোদক্রীড়ার জন্য স্বানন্দভবন নির্মাণ করে দেন। সেখানে মহাবিদ্যার সঙ্গে কেলিপরায়ণরত উচ্ছিষ্ট তান্ত্রিকী বামমার্গের প্রতিষ্ঠাকল্পে উপদ্রুত সাধকদের আহ্বান করেন। বেদানুসারীরাও একে একে বেদানুশীলন ছেড়ে তন্ত্রমার্গে সম্পৃক্ত হলেন। ইতোমধ্যে উচ্ছিষ্টের আবির্ভাব এবং তাঁর নেতৃত্বে বেদাচারের বিপরীতে তন্ত্রধর্মের প্রচার-প্রসারের কথা জানতে পেরে তাঁকে নির্জিত করতে বিদ্যাবান স্বানন্দভবনে উপস্থিত হন। বেদবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক বিদ্যাবান চারপাশে বামাচারী তন্ত্রমার্গের সশক্তিক সাধনাভ্যাস দেখে ব্যথিত হন এবং উচ্ছিষ্ট গণেশ নির্জিত করার অভিপ্রায়ে তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। ঠিক হয়, বাকযুদ্ধে যিনি পরাভূত হবেন, তাঁর দ্বারাই প্রতিপক্ষের নিধন হবে। একটানা ছয়দিন ধরে বেদাচারী বিদ্যাবানের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট গণপতির বাদানুবাদ চলে। অবশেষে সপ্তম দিবসে বৈশাখের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে ব্যর্থ হন বিদ্যাবান। উচ্ছিষ্ট গণেশ তাঁর আচরণীয় বৈদিক মতাদর্শের অসারতা প্রমাণ করেন। শেষপর্যন্ত কোনও কিছুই কি ঠিক/ভুল, পাপ/পুণ্য, শুদ্ধ/অশুদ্ধ অথবা উচ্চ-নীচের ভেদভাবসম্পন্ন হতে পারে, যদি জগতের সমস্তই ব্রহ্মের অধীন হয় ('সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মাসি')? একমাত্রিকভাবে এই জগতের কোনও কিছুকেই কি divine বা non divine— এই ভেদজ্ঞানে বিভাজিত করা সম্ভব, যদি জগৎমাত্র ব্রহ্মের-ই প্রকাশ হয়? যারা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বিষয়ে এই জাতীয় ভেদবুদ্ধির দ্বারা চালিত হন, তারা মায়া বা অবিদ্যাগ্রস্ত বলেই তাদের এই ধরনের টানাপোড়েনের শিকার হতে হয়। ফলে ব্রহ্মের সত্যস্বরূপ তাদের কাছে চিরকাল অপ্রকট রয়ে যায়। উচ্ছিষ্ট গণপতি বিদ্যাবানের সম্মুখে অথর্ববেদোক্ত উচ্ছিষ্ট সুক্ত ব্যাখ্যা করেন এবং উচ্ছিষ্টাচারের যোগতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁকে শিক্ষাদান করেন। বিতর্কে পরাস্ত হওয়ায় পূর্বের নিয়মানুসারে উচ্ছিষ্ট গণেশ মিথুনাবদ্ধ অবস্থাতেই অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্যাবানকে নিধন করেন। বিদ্যাবান ব্রহ্মার বর পেয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যু ঘটবে আধা-মানুষ আধা-পশুদেহযুক্ত এমন কারও হাতে, যিনি কামকেলিরত অবস্থাতেই তাঁকে হত্যা করবেন। অর্থাৎ যাঁর আচরণ হবে পশুসদৃশ, অথচ নিজে যিনি হবেন ব্রহ্মজ্ঞানী। বিদ্যাবানের নিধনের পর উচ্ছিষ্ট গণপতি বামমার্গীদের সুরক্ষা প্রদান করে এতদঞ্চলে তন্ত্রমার্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কলিযুগের ঘোর তমিস্রায় তন্ত্রধর্মের বামাচারই যে

একমাত্র পথপ্রদর্শক হতে পারে ('বামমার্গৈক কেবলম্'), উচ্ছিষ্ট গণপতি তা ঘোষণা করেন। সত্যযুগে যেমন বেদাচার, ত্রেতায় যেমন স্মৃতির বিধান, দ্বাপরে যেমন পুরাণের নির্দেশ, কলিতে তেমনই বামাচার পাথেয়। এরপর সশক্তিক উচ্ছিষ্ট গণপতি অন্তর্হিত হন। এই সময় থেকেই উচ্ছিষ্ট গণেশের দ্বাত্রিংশাক্ষর মন্ত্র মাতঙ্গী তথা নীল সরস্বতীর সাধনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়।[১১৭]

মাতঙ্গীর যে বিশেষ রূপভেদটি উচ্ছিষ্ট গণেশ বা মোহিনীশ্বর গণপতির পত্নীরূপে বিদিত, তিনি উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী। *রুদ্রযামল*-এ তারার দুটি পটলের মধ্যে একটি উগ্রতারার, অন্যটি নীল সরস্বতীর পটল। উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর-ই নামভেদ নীল সরস্বতী। *উচ্ছিষ্টতন্ত্র*-এ তাঁকে বলা হয়েছে বিদ্যারাজ্ঞী, মহাসরস্বতী ও মহাচীনযুবতী। *বিনায়ক তন্ত্র* তাঁকেই বলেছে মহাবিদ্যা। *বিনায়ক রহস্য*-এ তিনিই আবার সমস্ত মহাবিদ্যার সারাৎসাররূপে কীর্তিত হয়েছেন। *মেরুতন্ত্র*-এর উত্তরাম্নায় পটলে উচ্ছিষ্ট গণেশ ও মাতঙ্গীর বর্ণনা পাওয়া যায়। *মেরুতন্ত্র*-এদেবতাদের শক্তি নিরূপণ তাঁকে 'গণেশস্য সরস্বতী' বলা হয়েছে। কৃষ্ণানন্দ *বৃহৎ তন্ত্রসার*-এ *ফেৎকারিণীতন্ত্র* প্রমাণে উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীকে 'সুমুখীদেবী' ও 'মহাপিশাচিনী' বলেছেন। তন্ত্রান্তরে তাঁকেই বলা হয়েছে 'করি হৃদ্বহ্নিবল্লভা'। এই মহাবিদ্যার আকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, দেবী শবাসনে উপবিষ্ট, রক্তবসনা, রক্তালংকারে ভূষিত, গুঞ্জাহারে শোভিত এবং ষোড়শবর্ষীয় যুবতী। তাঁর সমুন্নত পয়োধরযুগল, বামহাতে নরকপাল ও ডানহাতে কর্তৃকা বিদ্যমান। ইনি জ্যোতিঃস্বরূপা। তবে এই দেবীর মন্ত্রসিদ্ধিকামনায় উচ্ছিষ্ট গণেশের মতোই উচ্ছিষ্টদ্রব্য দ্বারা বলিদান ও হোমের নিয়ম আছে। *বৃহৎ তন্ত্রসার* এ সম্পর্কে বলেছেন, "এই দেবতাকে উচ্ছিষ্টদ্রব্যদ্বারা বলি প্রদান করিতে হয়। এই মন্ত্র সাধনে তিথি ও নক্ষত্রাদি বিচার করিতে হয় না, সকল সময়ে সাধন করিতে পারে এবং অঙ্গন্যাসাদিও অনাবশ্যক। অরিদোষাদি গণ্য করিবে না, অশৌচাদি দোষ এই মন্ত্রসাধনে বাধা জন্মাইতে পারে না এবং অন্য কোনও নিয়মের বাধ্য হইতে হয় না।"[১১৮]

উচ্ছিষ্ট গণপতি এবং তাঁর শক্তি উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী বা নীল সরস্বতীর উপরোক্ত লীলামাহাত্ম্যের মধ্যে একটি তত্ত্বব্যাখ্যান নিহিত। এখানে 'উচ্ছিষ্ট' শব্দের অভিধানির্ভর অর্থ যতই আহার্যের অবশিষ্ট, পরিত্যক্ত বা চলতি কথায় এঁটো হয়ে যাওয়া বর্জ্য অংশ বোঝাক না কেন, এর সাধনতত্ত্বগত অর্থ ভিন্ন। যেমন, ব্রহ্ম শব্দরূপে স্বতই 'উচ্ছিষ্ট' অর্থাৎ বাক্‌রূপে পরমতত্ত্ব 'উচ্ছিষ্ট' হয়েই জগৎময় প্রকাশিত হয়। পূর্ণতত্ত্বের এই যে প্রাকৃতসীমায় নিরন্তর প্রকাশ, উচ্ছিষ্টের ধারণার মধ্যে সেই সত্যই দ্যোতিত। সর্বস্বরূপ ব্রহ্মের উৎকৃষ্ট অংশ বা সারবস্তুই 'উচ্ছিষ্ট' নামে সাধনমার্গে পরিজ্ঞাত। কাজেই, সশক্তিক উচ্ছিষ্ট গণেশ এখানে পূর্ণব্রহ্মের তত্ত্বসারমূর্তি। তাঁর সাধনায় কুল-শীল-

জাতি-মানকেন্দ্রিক ভেদবুদ্ধি মূল্যহীন। জাতপাতের বিচার অথবা স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের সীমানির্ণয় এঁর উপাসনায় খাটবে না। আবর্জনার স্তূপে অথবা অপরিচ্ছন্ন, অপাঙ্‌ক্তেয় যা কিছু, তার মধ্যেই এই ব্রহ্মমূর্তি গজাননের সাধনা বিধেয়। পঞ্চমকার সাধনায় অপরিহার্য মদ্য এবং মাছ, মাংস প্রভৃতি আমিষান্নের তথাকথিত উচ্ছিষ্ট বা এঁটো হয়ে যাওয়া অংশ এই গণেশের উপচারবিশেষ। তন্ত্রসাধনার বামাচারী মার্গে মিথুনমুদ্রায় তাঁর উপাসনা প্রশস্ত। স্থূলত যা পরিত্যাজ্য বলে মনে হয়, সাধককে সেই অপরিচ্ছন্ন বা অসংস্কৃতের মধ্যে রাখার অর্থই হল তাঁর অহংনাশ বা আমিত্বের লোপ। শুচি-অশুচি নিয়ে সাধারণের মনে যে ছুৎমার্গ কাজ করে, উচ্ছিষ্ট গণেশের সাধনায় সেই বাহ্যসীমা অতিক্রম করে সাধক পৌঁছোন শুদ্ধ-অশুদ্ধের ক্ষুদ্রতাবিহীন এক পরম স্তরে। বৈদিক ধর্মের যাবতীয় গ্রহণ-বর্জনের মাপকাঠির বিপরীতে বামমার্গের এই উচ্ছিষ্ট সাধনায় অশুচিস্নাত হয়েই ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা করতে হয়। আপাত অসংস্কৃত স্তরে থেকেই উপাসক শুদ্ধাশুদ্ধির সীমাতীত সাধনসত্য লাভ করেন।

এ ছাড়া চৌর গণেশের ধারণা বঙ্গীয় তন্ত্রমার্গে সুবিদিত। সর্বাগ্রে চৌর গণেশের উপাসনা না করলে তিনি সাধনার ফল হরণ করেন। এখানে 'ফলহারক' অর্থে উপাস্যের 'চৌর' নামকরণ করা হয়েছে। *মহানির্ব্বাণ তন্ত্র* ও *প্রাণতোষণী তন্ত্র*-এ চৌরগণেশের বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়া তন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার রচিত *তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি ও রহস্য পূজা পদ্ধতি* গ্রন্থেও চৌর গণেশন্যাস বিবৃত হয়েছে। গণপতির বিভিন্ন তামসিক মূর্তিগুলির মধ্যে বিঘ্নরাজ বা চৌরগণেশ অন্যতম। বিঘ্ন বা উপদ্রবসৃষ্টি যেমন বিঘ্নরাজের বৈশিষ্ট্য, তেমনই সাধকের সাধনফল অপহরণ করাই চৌরগণেশের কাজ। প্রতিদিন সকালে গুরু, কুণ্ডলিনী ও ইষ্টদেবতা ধ্যানেরও পূর্বে চৌরগণেশ ন্যাস সাধক-সম্প্রদায়ের বাধ্যতামূলক রীতি। এর সাধনার্থ এই যে, সর্বাগ্রে সিদ্ধিদাতা গণেশকে সন্তুষ্ট না করলে বা তাঁকে উদ্বোধিত করতে ব্যর্থ হলে তিনি সাধকের সংস্কারপুষ্ট ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ করতে সহায়তা করেন না। ফলে সমস্ত কর্মই প্রবৃত্তিপুষ্ট রিপুর দ্বারা সহজেই অপহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে অমরনাথ চক্রবর্তী সংকলিত *অঘোর সদন* গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'গণেশের বিমর্ষিনী বা চৌর্য্যা নামা শক্তির সাহায্যেই সাধনার বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। তাই চৌর গণেশের ন্যাস করিয়া তাঁহার কৃপায় নিজ প্রধান দ্বাদশ-অঙ্গ শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।' চৌরগণেশ ন্যাসের ক্ষেত্রে সাধকের অঙ্গশুদ্ধির একটি নির্দিষ্ট ক্রম আছে। যেমন, প্রথমে হৃদয়ে 'ক্রোঁ'-বীজ দশবার জপ করতে হয়। এরপর দক্ষিণ ও বাম নেত্রে 'হ্রীঁ হ্রীঁ', দক্ষিণ ও বাম কর্ণে 'হ্রীঁ হ্রীঁ', দক্ষিণ ও বাম নাসাপুটে 'হূঁ হূঁ', মুখে (অধরে ও ওষ্ঠে) 'স্ত্রীঁ স্ত্রীঁ', নাভিতে 'ক্লীঁ', লিঙ্গমূলে 'হসৌঃ', গুহ্যে 'ব্লুঁ' এবং ভ্রূমধ্যে 'হূঁ'-বীজ দশবার করে জপ করা কর্তব্য। এইভাবে শরীরমধ্যস্থ একাদশ স্থানে একাদশ বীজমন্ত্র জপের মাধ্যমে চৌর গণেশের

আনুকূল্য পাওয়া সম্ভব।[১১৯] যদিও তন্ত্রান্তরে ব্রহ্মসাধনের ফলহরণে চৌর গণেশ সমর্থ নন। এই বিষয়ে *মহানির্বাণ তন্ত্র*-এর তৃতীয় উল্লাসের ১১৯ নং শ্লোকে ('বিনা চৌরগণেশাদি-জপপঞ্চ কুল্লুকাং বিনা।/ অকস্মাৎ পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারো ভবেদ্ ধ্রুবম্।।'[১২০]) ব্রহ্মমন্ত্র সাধনের ক্ষেত্রে চৌরগণেশাদির ন্যাস বা কুল্লুকা প্রভৃতি অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন বলা হয়েছে। এইসব আচরণ ছাড়াই পুরশ্চরণ দ্বারা অল্পসময়ের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভব।

আনুমানিক দশম-একাদশ শতকে গুর্জরবাসী লক্ষণ দেশিকেন্দ্র রচিত *শারদাতিলকতন্ত্র* আসমুদ্র হিমাচল ভারতের নব্য তান্ত্রিক আচার্যদের দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়েছে। যেমন, বঙ্গদেশে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মুখ্যত *শারদাতিলক*-এর অবলম্বনেই *বৃহৎ তন্ত্রসার*-এ তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি সংকলন করেছেন। *শারদাতিলক*-এর ত্রয়োদশ পটল বা অধ্যায় গণেশের নামে সমর্পিত, নাম 'গণপতিপ্রকরণ'। মানুষের মনোরথ পূর্ণকারী সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদ গণপতির মন্ত্রগুলি এই পর্যায়ের আলোচ্য। এই পটলের দ্বিতীয় শ্লোকে গণপতির বীজমন্ত্র উল্লিখিত হয়েছে।[১২১] *প্রাণতোষণী* বা *প্রাণতোষিণী তন্ত্র*-এর পঞ্চম কাণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম-ও 'গণেশপ্রকরণ'। এখানে গণেশের ধ্যান, মন্ত্র ও তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতি বিবৃত হয়েছে। এই প্রকরণে 'মহাগণপত্যুপনিষৎ' শীর্ষক অংশটিও সংযোজিত।[১২২] গণেশকে সেখানে পরব্রহ্মের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইতোপূর্বেই তা আলোচনা করেছি। এ ছাড়া কৃষ্ণানন্দ সংকলিত *বৃহৎ তন্ত্রসার*-এ গণেশের মন্ত্র ও পূজা প্রয়োগ *শারদাতিলক*-এর অনুসরণে বর্ণিত। পাশাপাশি কুলাবধূত হরিহরানন্দ ভারতী রচিত *মহানির্ব্বাণতন্ত্র*-এর বিধানও বাংলার তান্ত্রিক সমাজে গৃহীত। *মহানির্ব্বাণতন্ত্র*-এর দশম উল্লাসের ১১৫ - ১১৭ নং শ্লোকে গণেশের ঋষ্যাদি ন্যাস, অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও প্রাণায়াম বর্ণিত হয়েছে।[১২৩] উদ্দিষ্ট অংশগুলিতে গণেশের বীজ (*শারদাতিলক* বা *মহানির্ব্বাণতন্ত্র* মতে, 'শশিধর (বিন্দুযুক্ত) পক্ষান্তক গ' বা 'গঁ' এবং *বৃহৎ তন্ত্রসার* প্রমাণে 'গং'), গণপতি-মন্ত্রের আদি উদ্‌গাতা ঋষি গণক, নীবৃৎ ছন্দ, বিঘ্নরাজ দেবতার নাম এবং পূর্ণাভিষেক কর্মের বিঘ্নশান্তির জন্য এর প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। মূল বীজমন্ত্রের সঙ্গে ছ'টি দীর্ঘস্বর যোগ করে (যেমন, 'ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ', 'ওঁ গীং') তার দ্বারা করন্যাস ও ষড়ঙ্গন্যাস করতে হবে। এরপর প্রাণায়াম করে গণপতিধ্যান করা কর্তব্য। গণেশের তন্ত্রোক্ত ধ্যানে যিনি সিঁদুরের মতো রক্তবর্ণ, ত্রিনয়নবিশিষ্ট, যাঁর উদরদেশ স্থূলতর, যিনি চতুর্ভুজে শঙ্খ, পাশ, অঙ্কুশ ও বরদমুদ্রা ধারণ করেছেন, যাঁর বিশাল শুঁড়ে বারুণীপূর্ণ কুম্ভ শোভা পাচ্ছে, তরুণ চন্দ্র যাঁর মস্তক বা চূড়ে শোভমান, যিনি গজবদন, যাঁর গণ্ডদ্বয় বা গালদুটি সর্বদা মদস্রাবে আর্দ্র, যাঁর দেহ সর্পরাজের দ্বারা ভূষিত, যিনি রক্তবস্ত্র ও রক্ত অঙ্গরাগ

ধারণ করেছেন, সেই গণপতি দেবকে ভজনার কথা বলা হয়েছে। গণপতির এই তান্ত্রিক ধ্যানের অনুষঙ্গ অনেকসময় মঙ্গলগীতের গণেশ-বন্দনার মধ্যেও অনুসৃত হয়েছে। যেমন, মুকুন্দের *অভয়ামঙ্গল*-এর গণেশ বন্দনা দ্রষ্টব্য। *শারদাতিলক*-এ চার লক্ষ এই ধ্যানমন্ত্র জপের পর আটটি হোম দ্রব্য দ্বারা (মোদক, চিড়ে, খই, ছাতু, আঁখ, নারকেল, শুদ্ধ পরিষ্কৃত তিল ও পাকা কলা) দশাংশ হোমের বিধান দেওয়া হয়েছে। এরপর তীব্রাদি শক্তিযুক্ত পীঠে বিঘ্নেশ্বরের পূজা করণীয়। এই তীব্রাদি শক্তি বা আধারশক্তি সংখ্যায় নয়, যেমন – পূর্বদিকে তীব্রা, অগ্নিকোণে জ্বালিনী, দক্ষিণে নন্দা, নৈর্ঋতকোণে ভোগদা, পশ্চিমে কামরূপিণী, বায়ুকোণে উগ্রা, উত্তরদিকে তেজোবতী, ঈশানকোণে সত্যা এবং মধ্যে বিঘ্ননাশিনী। সাধকসম্প্রদায় প্রথমে ষোড়শোপচারে গণেশের পূজা করে পঞ্চোপচারে সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও ভগবতীর পূজা করেন। পরে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পুনরায় গণেশের পূজা করতে হয়। এরপর আবরণদেবতার পূজা। গণপতির চারদিকে যথাক্রমে গণেশ, গণনায়ক, গণনাথ, গণক্রীড়, একদন্ত, বক্রতুণ্ড, লম্বোদর, গজানন, মহোদর, বিকট, ধূম্রাক্ষ এবং বিঘ্ননাশন প্রভৃতি আবরণদেবতার পূজার বিধান দেওয়া হয়েছে।[১২৪]

মহানির্ব্বাণতন্ত্র-এ পূর্বোক্ত চৌর গণেশ ছাড়া গণপতির অন্যান্য রূপভেদের বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে *প্রাণতোষণী, শারদাতিলক, বৃহৎ তন্ত্রসার, পুরশ্চরণরত্নাকর* এবং *আগম-তত্ত্ব-বিলাস* প্রভৃতি গ্রন্থে গণেশের বিভিন্ন রূপের ধ্যানমন্ত্র বিশ্লেষিত হয়েছে। যেমন, গাণপত্য তন্ত্রের শাক্ত ধারায় বগলামুখীর ভৈরবরূপে পরিচিত 'হরিদ্রা গণপতি'-র ধ্যান *প্রাণতোষণী*-তে পাওয়া যায়।[১২৫] *শারদাতিলক তন্ত্র*-এ গণপতির পাঁচটি রূপভেদ বর্ণিত। যেমন, মহাগণপতি, বিরি গণপতি, শক্তি গণপতি, ক্ষিপ্র গণপতি এবং হেরম্ব গণপতি। ধ্যানমন্ত্র অনুসারে দেবতার আকার বিষয়ে সামান্য পরিচয় দেওয়া যাক।[১২৬]

ক. মহাগণপতির ধ্যানে তাঁকে গজমুখ, চন্দ্রধর, রক্তবর্ণ ও ত্রিনেত্র বলা হয়েছে। তিনি বামাঙ্কস্থিত পদ্মধরা প্রিয়ার দ্বারা অনুরাগবশে নিরন্তর আলিঙ্গিত। হাতে ডালিম, গদা, ধনুক, ত্রিশূল, চক্র, পদ্ম, পাশ, উৎপল, ধান্যগুচ্ছ, স্বদন্ত ও শুণ্ডাগ্রে রত্নকলস ধারণ করেছেন। এই বর্ণনায় গণেশের কোন হাতে কোন আয়ুধ থাকবে তা স্পষ্ট নয়। *শারদাতিলক*-এর টীকাকার রাঘব ভট্টের মতে, মহাগণেশ দশভুজ এবং তাঁর বাঁ-দিকের নিচের হাত থেকে ডানদিকের নিচের হাত পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে দশটি আয়ুধের চিন্তা করতে হবে। যদিও গণেশ্বর বিমর্ষিণীর প্রমানানুসারে হস্তায়ুধসজ্জায় পার্থক্য দেখা যায়। আবার, তন্ত্র প্রদীপ টীকা অনুযায়ী মহাগণপতি দ্বাদশভুজ। রাঘব ভট্টের মতে, ক্রোড়াসীন প্রিয়ার বাঁ হাতে পদ্ম ধরা থাকবে এবং ডান হাতের দ্বারা তিনি আলিঙ্গনরত থাকবেন।

খ. বিরি গণপতির ধ্যানে তাঁকে সিঁদুরের মতো রক্তবর্ণ, হস্তীমুখ, ত্রিনেত্র, অর্ধচন্দ্রধারী ও চতুর্ভুজ বলা হয়েছে। দক্ষিণদিকের ওপরের হাতে পাশ, নিচের হাতে মধু বা মদ্যপূর্ণ কপাল, বাঁ-দিকের ওপরের হাতে অঙ্কুশ এবং নিচের হাতে প্রিয়ার যোনিদেশ স্পর্শ করে আছেন। বিরি গণেশের শক্তি পুষ্টি। ইনি চতুর্বাহু। দুটি হাতে পদ্ম ধারণ করেছেন। ডানদিকের নিচের হাত দিয়ে গণেশকে আলিঙ্গন করে আছেন। বাঁ-দিকের নিচের হাতে গণেশের ধ্বজাগ্র ('ধ্বজাগ্রকরা') স্পর্শ করেছেন। সম্প্রদায় বিশিষে পুষ্টিকে দ্বিভুজা-ও বলা হয়েছে। বিরি গণেশের শুণ্ডাগ্রে বসুমৎ বা ধনপূর্ণ পাত্র রয়েছে। যদিও টীকায় উল্লিখিত ধ্যানান্তরে বিরি গণপতি দশভুজ। ডানদিকের পাঁচটি হাতে যথাক্রমে বীজপুর, গদা, ধনু, শক্র ও মালা এবং বাঁ-দিকের হাতে বাণ, পাশ, উৎপল, দণ্ড ও রত্নকুম্ভ ধৃত। অন্যান্য লক্ষণগুলি মূল ধ্যানের অনুরূপ।

গ. শক্তি গণপতির ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে মুক্তোর মতো গৌরবর্ণ, মদস্রাবী গজমুখযুক্ত, চন্দ্রচূড়, রত্নমৌলি, ত্রিনয়ন ও চতুর্ভুজ বলা হয়েছে। ডান ও বাঁ-দিকের ওপরের হাতে পদ্ম ও অঙ্কুশধারী। ডানদিকের নিচের হাতে রত্নকুম্ভ ধারণ করেছেন। বাঁদিকের নিচের হাতে অঙ্কস্থিত পদ্মবর্ণা পুষ্টিদেবীর যোনি স্পর্শ করে আছেন। টীকায় একটি ধ্যানান্তর পাওয়া গেছে। গণেশ সেখানে জবাফুলের মতো রক্তবর্ণ, অর্ধচন্দ্রচূড়, ত্রিনয়ন ও চতুর্বাহু। ডান ও বাঁ-দিকের নিচের হাতে বরমুদ্রা ও ইক্ষুদণ্ড এবং ডান ও বাঁ-দিকের ওপরের হাতে পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করেছেন। তিনি ক্রোড়স্থ শ্যামাঙ্গী পদ্মধরা পুষ্টির দ্বারা আলিঙ্গিত। গণেশ শুণ্ডাগ্র দিয়ে নিজ শক্তির উত্তমাঙ্গ স্পর্শ করে আছেন যেমন, পুষ্টিও তেমনই গণেশের ধ্বজাগ্র স্পর্শ করে আছেন। এই বিভু গজমুখ শক্তি গণপতিকে 'সততং ভোগাতিলোলং' অর্থাৎ সবসময় ভোগে অতিলোলুপ বলা হয়েছে।

ঘ. ক্ষিপ্রপ্রসাদ গণেশের ধ্যানে তাঁকে রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, বালচন্দ্রধর ও চতুর্ভুজ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইনি উজ্জ্বল হার পরিধান করেন। শুণ্ডাগ্রে বীজপুর বা ডালিম বর্তমান। ডান ও বাঁ-দিকের ওপরের হাতে পাশ ও অঙ্কুশ এবং নিচের হাতে কল্পলতা ও বিষাণ বা দন্ত ধারণ করেছেন।

ঙ. হেরম্ব গণেশের মন্ত্র চতুবর্গ সিদ্ধিতে প্রয়োগ করা হয়। ধ্যানে তাঁকে মুক্তো, কাঞ্চন, নীল, কুন্দ ও কুঙ্কুমের মতো বর্ণবিশিষ্ট, ত্রিনয়ন, চন্দ্রধর, সূর্যের মতো প্রভাযুক্ত, পঞ্চমুখ, দশবাহু ও সিংহবাহন রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। উর্ধ্বস্থিত মুখ মুক্তাবর্ণ, অগ্রবর্তী মুখ স্বর্ণবর্ণ, উত্তরদিকের মুখ নীলবর্ণ, পূর্বদিকের মুখ কুন্দের মতো গাঢ় শ্বেতবর্ণ এবং দক্ষিণদিকের মুখ কুঙ্কুমের মতো রক্তবর্ণ। ইনি তেজস্বী ও মদগর্বে প্রমত্ত। ডান ও বাঁ-দিকের নিচের হাত দুটিতে বর ও অভয়মুদ্রা প্রদর্শিত। ওপরের দিকের হাতগুলিতে যথাক্রমে মোদক, দন্ত, টঙ্ক বা পরশু, মুণ্ড বা

কপাল, অক্ষমালা, মুদ্‌গর, অঙ্কুশ ও ত্রিশূল ধারণ করেছেন। ধ্যানান্তরে হেরম্ব গণেশ মুদ্‌গরের পরিবর্তে সর্প ধারণ করেছেন এবং তাঁর শুণ্ডাগ্রে স্বর্ণকুম্ভ ('স্বর্ণকুম্ভাঢ্য-শুণ্ডম্) রয়েছে।

পুরশ্চরণরত্নাকর-এও গণপতি বহুরূপে বিন্যস্ত। গ্রন্থানুসারে প্রাথমিকভাবে গণপতি, শক্তি গণপতি, মহাগণপতি, বিঘ্নগণপতি ও শক্তি গণেশ এই পাঁচটি রূপভেদ রয়েছে।[১২৭] এ ছাড়াও লক্ষ্মী গণেশ, ক্ষিপ্রপ্রসাদ গণেশ, হেরম্ব গণেশ, বক্রতুণ্ড গণেশ, হরিদ্রা গণেশ, বিরিঞ্চি গণনায়ক, বিঘ্ন গণেশ, বিরি বিঘ্নেশ্বর এবং উচ্ছিষ্ট গণেশের নাম ও ধ্যানগম্য রূপবর্ণনা পাওয়া যায়। রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্যের *আগম-তত্ত্ব-বিলাস* গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদের 'গণপতি প্রকরণ' অংশে মহাগণপতি, শক্তি গণপতি, বিরি গণপতি, হেরম্ব গণপতি, ক্ষিপ্রপ্রসাদ গণপতি, হরিদ্রা গণপতি ও উচ্ছিষ্ট গণপতির ধ্যান, মন্ত্রক্রম এবং পূজাবিধি বিশ্লেষিত হয়েছে।[১২৮] মধ্যযুগের বাংলায় উল্লেখযোগ্য তন্ত্র সংকলনগ্রন্থ হিসেবে পরিচিত *বৃহৎ তন্ত্রসার*-এর একটি বড়ো অংশ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ গণেশের উদ্দেশে অর্পণ করেছেন। এ থেকেও মধ্যবাংলার তন্ত্রমার্গে গণেশের প্রাসঙ্গিকতা টের পাওয়া যায়। তিনি গণেশের চারটি প্রধান রূপভেদ মহাগণেশ, হেরম্বগণেশ, হরিদ্রাগণেশ এবং উচ্ছিষ্ট গণেশের ধ্যান, মন্ত্র ও মন্ত্রান্তর বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন।[১২৯] যেমন,

ক. পূর্বোক্ত *শারদাতিলক*-এর মহাগণপতির অষ্টাবিংশত্যক্ষরমন্ত্র (২৮) *বৃহৎ তন্ত্রসার*-এর অন্তর্ভুক্ত তো হয়েছেই, পাশাপাশি দ্বাদশাক্ষর এবং একাদশাক্ষরের দু'টি ধ্যানমন্ত্রও উল্লিখিত হয়েছে। ধ্যানান্তরে মহাগণপতিকে মুক্তোর মতো গৌরবর্ণ দেহ, মদমত্ত হস্তীর মতো মুখ, ত্রিনেত্র, অর্ধচন্দ্রচূড় এবং রত্নমুকুটধারী বলা হয়েছে। হাতে পদ্ম, অঙ্কুশ ও রত্নকুম্ভ ধারণ করেছেন। ক্রোড়াসীন দেবী পদ্মকান্তিবিশিষ্ট। মহাগণেশের একটি হাত দেবীর যোনিদেশে নিহিত এবং দেবী-ও একটি হাতে গণেশের ধ্বজাভাগ স্পর্শ করে আছেন। এই মৈথুনমূর্তিতে গণেশ দশভুজ বা দ্বাদশভুজ নন, চতুর্ভুজ। দ্বিতীয় একাদশাক্ষর ধ্যানমন্ত্রেও তিনি অর্ধচন্দ্রচূড়, ত্রিনয়ন, জবাফুলের মতো রক্তবর্ণ এবং চতুর্ভুজ। হাতে ইক্ষুদণ্ড, বরমুদ্রা, পাশ ও অঙ্কুশ শোভিত। ক্রোড়স্থ প্রিয়া শ্যামাঙ্গী। গণেশ পদ্ম দ্বারা দেবীর বরাঙ্গ স্পর্শ করছেন, দেবীও তাঁর হস্তধৃত পদ্মের সাহায্যে গণেশের ধ্বজাগ্র স্পর্শ করে আছেন।

খ. শারদাতিলকোক্ত বর্ণনা ছাড়াও হেরম্ব গণেশের অন্য আরেকটি দশাক্ষর মন্ত্র *তন্ত্রসার*-এ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তিনি গজমুখ, রক্তবর্ণ, ত্রিনয়ন ও চতুর্ভুজ। কপালে তরুণচন্দ্র শোভিত। তাঁর মাথার ওপর একটি বীজপুর বা ডালিম রয়েছে। গলদেশে উজ্জ্বল হার। হাতে পাশ, অঙ্কুশ, কল্পলতা ও গজদন্ত ধৃত।

গ. তন্ত্রসারোক্ত হরিদ্রা গণেশের গাত্রবর্ণ হলুদ। হলুদরঙা বস্ত্র তাঁর পরিধেয়। চারটি হাতে যথাক্রমে পাশ, অঙ্কুশ, মোদক ও দন্ত বর্তমান। *বিশ্বসারতন্ত্র*-এর 'হরিদ্রাগণেশকবচ' শীর্ষক অংশটিও *তন্ত্রসার*-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ঘ. *বৃহৎ তন্ত্রসার*-এ উচ্ছিষ্ট গণেশের মন্ত্র ও পূজাপ্রণালী বিবৃত হয়েছে। এই গণেশের মন্ত্র হিসেবে 'গং হস্তিপিশাচিনি খে স্বাহা' পাওয়া যায়। যদিও সর্বতন্ত্রে গুপ্ত এই মন্ত্র গুপ্ত জগতের হিতকামনায় প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ এই প্রকার গণেশের পূজায় কোনও তিথি, বার বা উপবাসাদি নিষ্প্রয়োজন। যে ব্যক্তি যে যে কামনায় এই দেবতার আরাধনা করে, তার সেই সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। ধ্যানমন্ত্রে উচ্ছিষ্ট গণপতিকে রক্তবর্ণ, ত্রিনয়ন, সর্বাভরণভূষিত এবং রক্তবস্ত্র পরিধানকারী বলা হয়েছে। মস্তকে জটা এবং কপালে অর্ধচন্দ্র শোভিত। তিনি রক্তপদ্মাসনে উপবিষ্ট। ইনি চতুর্ভুজ, বৃহৎ শরীর, দ্বিদন্ত ও হাস্যমুখ। ডানদিকের ওপরের হাতে বরমুদ্রা ও নিচের হাতে একটি দাঁত রয়েছে। বাঁ-দিকের ওপরের হাতে পাশ ও নিচের হাতে অঙ্কুশ বিদ্যমান। উচ্ছিষ্টমুখে ও অশুচি অবস্থায় এই দেবতার মন্ত্র, জপ ও পূজাকার্যাদি সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে, মাংস দ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করে সেই নৈবেদ্য ভোজন করতে করতে উচ্ছিষ্ট গণেশের জপ করতে হয়। কোনও কোনও তন্ত্রে বলা হয়, এই দেবতার আরাধনায় পূজার পরিবর্তে কেবল মানসিক জপ করা কর্তব্য। আবার গর্গমুনির মতে, নির্জন বনে বসে রক্তচন্দনমাখা পান খেতে খেতে এই গণেশের জপ করতে হয়। এ ছাড়া অন্যান্য তন্ত্রমতে, করাঙ্গন্যাসের বদলে সাধক নিজেকেই গণেশস্বরূপ চিন্তা করে উচ্ছিষ্ট গণেশের জপ করতে পারেন। এই গণেশের বিশেষ প্রয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাজদ্বারে, অরণ্যে, সভায়, গোত্রসমাজে, বিবাদে, ব্যবহারে, যুদ্ধে, শত্রুসংকটে, নৌকায়, দ্যূতকার্যে, বিপদকালে, গ্রামদাহে, চৌরভয়ে এবং সিংহব্যাঘ্রাদি ভয়ে এই গণেশের নাম স্মরণ করলে বিঘ্নের বিনাশ হয়। *তন্ত্রসার* প্রমাণে যক্ষরাজ কুবের সর্বদা বিবিধ উপহার দ্বারা এই উচ্ছিষ্ট গণেশের আরাধনা করে ধনেশ্বরত্ব লাভ করেছিলেন।

বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্র-বর্ণিত গণেশের রূপভেদগুলি ছাড়া *শারদাতিলক, আগম-তত্ত্ব-বিলাস* প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে 'গণেশ স্তব' বা গণেশের স্তোত্রমূলক রচনা পাওয়া যায়। *শারদাতিলক*-এর ত্রয়োদশ পটলোক্ত 'গণেশস্তব' শীর্ষক অংশটি কুড়িটি শ্লোকে (১২৫ – ১৪৫ নং শ্লোক) বিন্যস্ত।[১৩০] প্রতিটি শ্লোকেই আলাদা আলাদা নামোচ্চারণের মাধ্যমে গণেশের চরিত্রের এক-একটি বিশেষ গুরুত্বের দিক পূজকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। পুরাণবর্ণিত লীলাকাহিনি বা মাহাত্ম্যমূলক কথাচূর্ণগুলি অনুষঙ্গ হিসেবে কখনও কখনও শ্লোকের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত সম্পদ প্রাপ্তির জন্য সর্বসিদ্ধিপ্রদ বিঘ্নেশের স্তুতি করার কথা বলা হয়েছে। গজানন ব্রহ্মমূর্তি। তিনি শ্রুতিসমূহের প্রথম, বাক্যেরও

প্রথম শব্দ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। বিঘ্নেশ্বর 'অম্বুদাভ' বা মেঘবর্ণরূপে সংসার-দাবানলকে মুখনিঃসৃত দানজলের মাধ্যমে শান্ত করেন। তিনি অনঙ্গশত্রু শিবপুত্ররূপে নবকুঙ্কুমের দ্বারা অঙ্গরাগ করে উন্মাদ-ব্যাকুল ভ্রমরদের নিজের কর্ণতাল দ্বারা নিবৃত্ত করেছেন। গজানন শুণ্ডাগ্রের সাহায্যে শিবজটামধ্যস্থ গঙ্গাজলকে লীলায় গ্রহণ করে শিবের অর্চনা করেছেন। পার্বতীর স্তন্যসুধা-পানরত কার্তিককে দেখে মূঢ়তাবশত এই নাগমুখ (বা হস্তীমুখ) বায়ুনিঃসৃত জলকণা দ্বারা শুণ্ড প্রক্ষালন করেছিলেন। গজাস্য গণেশ কাল বা সময়স্বরূপ। তিনি শুঁড় তুললেই যেসব মুক্তোর মতো সুদীপ্ত জলকণা শুঁড় থেকে আকাশে নিক্ষিপ্ত হয়, সেগুলিকেই তারা বলা হয়। তিনি গজেন্দ্রবদনরূপে বারিনিধিতে ক্রীড়ারত। আবার, সাপেদের উত্তরীয় করে দেবকুমার কার্তিকের সঙ্গেও ক্রীড়ায় ব্যাপৃত। সূর্যের মতো অরুণবর্ণ হেরম্বকে আগমের অর্থসমূহের অধ্যাপক এবং 'ভক্তজনের একমাত্র মিত্র' বলা হয়েছে। যিনি অতিবামন পাদপদ্মের মাধ্যমে ধরিত্রীকে কৃতার্থ করেন, সেই গজানন বেদসমূহের কারণ, অ-কারণ দুই-ই। দাঁতের অগ্রভাগের সাহায্যে মহাভারতের অনুলিপি করেছেন যিনি, সেই শিবপুত্র আনন্দঘন গণেশ 'পরমাত্মমূর্তির লীলাবতার'। তিনি পুরুষস্বরূপ অথবা হস্তীস্বরূপ এই ভেদের অযোগ্য, আদিভূত বিঘ্নরাজ। অঙ্কুশ, ভগ্নদন্ত ও অভয়মুদ্রাধারী গজানন শুণ্ডরন্ধ্রমুক্ত মুক্তাফলের মতো স্থূল জলকণার দ্বারা শিব-পার্বতীর অঙ্গমার্জনা করেন। শিবপুত্র গজদন্তবক্র গণেশ স্তবে পরমব্রহ্ম রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছেন। তিনি তত্ত্বত এক, স্বেচ্ছায় বহু হয়েছেন। তাঁকে ব্রহ্মাণ্ডের আদি বীজ চৈতন্যস্বরূপ বলা হয়েছে। ক্রোড়স্থিত শক্তির মুখপদ্ম দর্শনে বিশ্ববিমোহন গণেশ লোলনেত্র এবং মদগৌরবে হাস্যমুখ। তন্ত্রসাধনায় গণেশের মৈথুনমূর্তির অনুষঙ্গ এই জাতীয় বর্ণনায় এসেছে। গণেশকে সমস্ত শাস্ত্রের সারাৎসার বলা হয়। তাঁকে ছাড়া শাস্ত্রের অন্য প্রতিপাদ্য নেই। যদি থাকে, তবে তা 'বৌদ্ধাদি শাস্ত্রবৎ অসৎকল্প'। এখানে বৌদ্ধতন্ত্রের বিরুদ্ধে তির্যক মন্তব্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে হিন্দুতন্ত্র নিজ গৌরব প্রতিপন্ন করেছেন। গজাননকে পৃথিবীর নিয়ন্তা তথা চালকশক্তি বলা হয়েছে। তাঁর তেজে জনগনের বিঘ্নরূপ অন্ধকার বিলুপ্ত হয়। তিনি সাধকের হৃদয়স্থিত আনন্দঘন আত্মা বেদান্তগীত। শিবের জটামধ্যস্থ অর্ধচন্দ্রকে নিজের ভাঙাদাঁত ভেবে যিনি শুণ্ডাগ্রের সাহায্যে আকর্ষণ করেছিলেন, সেই গণপতি ভক্তের ঐশ্বর্য বিস্তার করেন। ভক্তগণ বিঘ্নবিনাশক গণেশকে নারকেল, কলা প্রভৃতি ফলের দ্বারা প্রতারণা করেও অভীষ্ট লাভ করেছেন। অন্তিম শ্লোকে বলা হয়েছে, যাঁরা বিধিপূর্বক গণেশস্তব পাঠ করেন, তাঁরা 'সমস্ত লক্ষ্মীর আশ্রয়' অর্থাৎ সদ্‌গুণযুক্ত হয়ে থাকেন। এই ধরনের বহুশ্লোকযুক্ত স্তবের মধ্য দিয়ে তন্ত্রশাস্ত্র যেমন গণপতির মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছে, তেমনই তান্ত্রিক

সমাজের বাইরে গণপতি-পূজক সাধারণ ভক্তদের মধ্যেও ভক্তিভাবের সঞ্চার হয়েছে। শারদাতিলকোক্ত এই গণেশস্তবটি *বৃহৎ তন্ত্রসার*-এরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এ ছাড়া *প্রাণতোষণী তন্ত্র*-এর 'গণেশ প্রকরণ'-এর মধ্যেও 'গণপতি স্তোত্র' শীর্ষক একটি অংশ পাওয়া যায়।[১৩১] সর্বমোট নয়টি শ্লোকে বিন্যস্ত এই স্তোত্রটি বৈষ্ণব আগমশাস্ত্র *নারদপঞ্চরাত্র*-এর 'জ্ঞানামৃতসার'-এর অন্তর্গত।[১৩২] নারদের মুখে স্তোত্রটি উচ্চারিত হয়েছে। গণেশকে এখানে সুরশ্রেষ্ঠ, লম্বোদর, পরাৎপর, হেরম্ব, গজবক্ত্র ও ত্রিলোচন বলা হয়েছে। তাঁর থেকেই সমস্ত মঙ্গলের সূচনা হয়। তিনি স্বয়ং মুক্তিদাতা, শুভদাতা, শ্রীদাতা, শ্রীকৃষ্ণস্মরণে তৎপর, পরমানন্দ, প্রধান এবং পার্বতীপুত্ররূপে বর্ণিত। গণেশকে সর্বদা পূজ্য ও জগৎপূজ্য বলে সর্ব্বেশ, জগদ্‌গুরু, জগন্নাথ ও জগদীশ বলা হয়েছে। সকলের অগ্রে গণেশের পূজা হয় এবং সকল যোগী, সুরেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণ-ও তাঁর পূজা করে থাকেন। পার্বতী শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা ও পুণ্যক ব্রতচারণ করে গণেশকে লাভ করেছিলেন। এই শ্লোকাংশটিতে বঙ্গদেশীয় *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর গণেশজন্মের অনুষঙ্গ রয়েছে। বৈষ্ণবাগম জাতীয় শাস্ত্র হওয়ায় বিষ্ণু বা কৃষ্ণের রূপভেদ হিসেবেই এখানে গণপতির মাহাত্ম্য বিশ্লেষিত হয়েছে। কাজেই, এই জাতীয় গণেশ স্তোত্র প্রকারান্তরে গণেশ-কৃষ্ণেরই গৌরব প্রতিষ্ঠার দ্যোতক। গণেশকে স্তোত্রে নারদ সুরসত্তম, সর্বোত্তম, গুরুতম, জ্ঞানীবর ও প্রশস্ততর গণেশ্বর বলে অভিহিত করেছেন। ফলবর্ণন অংশে জানানো হয়েছে, এই স্তোত্রের পাঠক প্রতি কার্যে জয়যুক্ত হবেন। যিনি এক বছর সুসংযত হয়ে সংকল্পপূর্বক এই স্তব পাঠ করবেন, তাঁর কৃষ্ণপরায়ণ এক বিশিষ্ট পুত্র লাভ হবে। সেই পুত্র যশস্বী, বিদ্বান, ধনী ও চিরজীবী হন এবং ঐশ্বর্য ও নির্মল যশ লাভ করেন। তাঁর কোনও বিঘ্ন থাকে না। তিনি ইহলোকে সুখভোগ করে অন্তে কৃষ্ণের পদলাভ করেন। এই জাতীয় ফলের আশ্বাসের মধ্য বিঘ্নবিনাশক গণপতির কৃষ্ণসারূপ্য নিঃসন্দেহে প্রকট হয়ে উঠেছে।

তন্ত্রোক্ত কায় বা চক্র সংস্থানের দৃষ্টিতে দেহাভ্যন্তরস্থ এক-একটি চক্রে এক-এক দেবতার অধিষ্ঠান বলে মনে করা হয়। গণেশ এক্ষেত্রে প্রথম চক্র পীতাভ-লোহিতবর্ণ চতুর্দল পদ্মবিশিষ্ট মূলাধারে অবস্থান ('ত্বং মূলাধারস্থিতোহসি নিত্যম্', *গণপতি উপনিষদ*, শ্লোক ৬) করেন। তিনি চতুর্ভুজ মূলাধারে 'লং'-বীজযুক্ত ভূতত্ত্ব বা পৃথ্বীতত্ত্বের অধিদেবতা। তাঁর কৃপাকণিকা না পেলে সাধক সাধনার উর্ধ্বপথে অগ্রসর হতে পারেন না। কারণ, ব্রহ্মগ্রন্থির আদিপীঠ বা আধারভূমিতেই তাঁর অবস্থান। আমরা দেখেছি, পৌরাণিক ঐতিহ্যেও গণেশ দ্বারপাল। তিনি দ্বার না ছাড়লে সাধক মূলাধার পরবর্তী অপরাপর কায় বা চক্রমধ্যে প্রবেশাধিকার লাভে সমর্থ হন না।[১৩৩]

৩.৭

অনুবাদ সাহিত্যে গণপতি :

মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ কাব্যধারায় কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ এবং কাশীদাস রচিত মহাভারত-এ গণপতি প্রসঙ্গ স্বল্প পরিসরে বর্ণিত হয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আদিপর্বের বিষয়মধ্যস্থ একটি সংক্ষিপ্ত পর্বরূপে গণেশ জন্মকথা পরোক্ষে বিবৃত হয়েছে। কাশীদাসী মহাভারতে অবশ্য কাব্যের প্রারম্ভে আদিদেব গণেশের বন্দনা মঙ্গলাচরণ জাতীয় একটি অবশ্য পালনীয় প্রথা রূপে গৃহীত। যদিও বিষয়াভ্যন্তরে গণপতি-সম্বন্ধিত কোনও বৃত্তান্ত কাশীরামের মহাভারতের অনুবাদে চোখে পড়ে না। প্রসঙ্গ দুটি যথাক্রমে বিশ্লেষণ করা যাক।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে গণেশের গজানন হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত নেহাতই একটি পরোক্ষ প্রসঙ্গ হিসেবে উপস্থাপিত। আদিপর্বের অন্তর্গত ‘উনত্রিশ’ শীর্ষক পর্বে শনির ভবনে দশরথের পুনর্বার আগমন এবং তাঁদের কথোপকথনের মধ্যে শনির কোপদৃষ্টির কার্যকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে গণেশের হস্তীমুখ হওয়ার পৌরাণিক বৃত্তান্ত শনিমুখে দশরথের সামনে পরিবেশিত হয়েছে। বাল্মীকি রচিত আদি রামায়ণে কার্তিকের জন্মোপাখ্যান বিবৃত হলেও গণেশ জন্মের বৃত্তান্ত অনুপস্থিত। কারণ, মূল রামায়ণ সংকলনের পর্বে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় – খ্রিস্টীয় তৃতীয়) পৃথক দেবতা হিসেবে সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে গজমুখ গণেশের অভ্যুত্থান ঘটেনি। পুরাণ-মণ্ডলে গণেশের গ্রহণযোগ্যতা স্বীকৃত হওয়ার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত কাব্যে গণেশ প্রসঙ্গ সচরাচর ব্যবহৃত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলায় আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনূদিত কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালিতেও বঙ্গীয় পুরাণকথার অনুসরণেই গণেশ-জন্ম প্রসঙ্গের আত্তীকরণ ঘটেছে। পদ্যানুবাদে কৃত্তিবাস *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* এবং *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এর আশ্রয়ে গণেশের মুণ্ডচ্ছেদ এবং হস্তীমুখ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে আদিদেব হওয়ার বৃত্তান্ত রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্গীয় স্মৃতি-পরম্পরায় পঞ্চদশ শতকের পূর্বে, আরও স্পষ্ট করে বললে রঘুনন্দন-পূর্ব যুগের স্মৃতিকারদের রচনায় গণেশ প্রথম পূজ্য রূপে স্বীকৃত হননি। রঘুনন্দনই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে পঞ্চপাস্যের প্রথম উপাস্য রূপে গণপতির প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করেন। ফলত, পঞ্চদশ শতকের সমকালে বা তার পরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশে রচিত যাবতীয় ধর্মমূলক সাহিত্যাদিতে গণেশের প্রথমপূজ্যতার উল্লেখ শাস্ত্র-সমর্থনেই গৃহীত হয়েছে। কৃত্তিবাসেও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেখানে কাহিনিটি এইরকম: দশরথ শনির বাসভবনে পুনর্বার উপস্থিত হলে শনি প্রীত হলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি দশরথের দিকে দৃষ্টিপাত না করেই বাক্যালাপ করতে লাগলেন। দশরথ এর কারণ জানতে চাইলে শনি তাঁকে গণেশ জন্মের বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন: ‘কোপদৃষ্টে সুদৃষ্টে যাহা পানে চাই।/ দেব দৈত্য নাগ নর হৈয়া যায়

ছাই।।/ পূর্ব্ব কথা কহি রাজা তাহে দেহ মন।/ যেমতে শিবের পুত্র হৈল গজানন।।'[১৩৪] শিব-গৌরীর পুত্রলাভের অব্যবহিত পরে নবজাতকের জন্মোৎসব উপলক্ষে দেবতারা সমবেত হন। কেবল গ্রহরাজ শনিদেব সেই আনন্দানুষ্ঠানে অনুপস্থিত। ফলে পার্বতী দূত পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৌরীর ইচ্ছায় শনি বাধ্যত সেখানে উপস্থিত হন। নবজাতকের মুখদর্শনের সময় শনি শুভ দৃষ্টিতেই তাঁর দিকে তাকান। তবু দর্শনমাত্রেই শিশুমুণ্ড ছাই হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ব্যথিত গৌরী ভগ্নহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাঁর পুত্রের মুণ্ডচ্ছেদের কারণ? দেবতারা তখন গৌরীকে শনির দৃষ্টিপাতের প্রভাবের কথা জানালে তিনি যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়ে শূলাঘাতে শনিকে বধ করতে উদ্যত হন। বিপদের আশঙ্কা করে দেবতারা স্তব-স্তুতির মাধ্যমে তাঁকে একপ্রকার শান্ত করেন। গৌরীর বরেই শনি যার দিকে তাকান তারই মুণ্ডহানি ঘটে, ফলে বিনা কারণে শনিকে শাস্তি প্রদান অযৌক্তিক— এই বলে দেবতারা ছিন্নমুণ্ড শিশুকে পুনর্জীবিত করবেন বলে গৌরীকে প্রতিশ্রুতি দেন। তখন ব্রহ্মা পবনদেবকে উত্তরদিকে মাথা করে শায়িত এমন কারও মাথা কেটে আনতে আদেশ দেন। ইন্দ্রবাহন ঐরাবত গঙ্গাজল পান করে উত্তরদিকে মাথা করে ঘুমোচ্ছিল। নির্দেশমতো পবন তার মাথাটিই কেটে আনেন। ওই হস্তীমুণ্ড সদ্যোজাতের ধড়ে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে গৌরীপুত্র গজানন হন। কিন্তু এই হস্তীমুখ বালক অন্যান্য দেবতার পুত্রদের মতো সুদর্শন নয়। তাঁদের মধ্যে গজমুখের স্থান কোথায় হবে এই ভেবে পার্বতী কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হলে ব্রহ্মা গজাননকে প্রথমপূজ্য রূপে ঘোষণা করে গৌরীর দুশ্চিন্তা দূর করেন। বরস্বরূপ ব্রহ্মা এও বলেন যে গজাননকে বাদ দিয়ে অন্য দেবতার পূজা করলে পূজা বা কাজ কোনওটিই সফল হবে না। অন্যদিকে ঐরাবতের মৃত্যুতে ইন্দ্র কাতর হলে ব্রহ্মার নির্দেশে পবন পুনরায় পশ্চিমদিকে মাথা করে শুয়ে থাকা একটি শ্বেতহস্তীর মস্তক কেটে এনে মুণ্ডহীন ঐরাবতের মস্তকরূপে সংযোজন করেন। এইভাবে শনির বাচনিকে গণেশের মুণ্ডচ্ছেদ এবং পুনরায় গজমুণ্ড ধারণের বৃত্তান্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিপর্বে বর্ণিত হয়েছে।

কাশীদাসী মহাভারতের প্রারম্ভে গণেশ বন্দনার মধ্য দিয়ে কবি কাব্যবিষয়ের নান্দীমুখ করেছেন।[১৩৫] এই বন্দনা শাস্ত্রানুমোদিত তো বটেই, বিবিধ পৌরাণিক এবং তান্ত্রিকী অনুষঙ্গের সমাহারে রচিত। গজানন-গণেশের অঙ্গসৌষ্ঠবের বর্ণনা ছাড়াও ত্রিজগতে তাঁর মাহাত্ম্য নির্ণয় এবং ভক্ত-সাধারণের তরফ থেকে তাঁর প্রতি কাশীরামের অনিঃশেষ ভক্তি প্রদর্শনের নিদর্শনও এতে পাওয়া যায়। কাশীরামকৃত এই গণেশ বন্দনা মঙ্গলগীতের আরম্ভ অংশের বন্দনা জাতীয়। গ্রন্থসূচনায় এই ধরনের গণেশ বন্দনার ব্যবহার সমকালীন সাহিত্যধারার প্রেক্ষিতে স্বাভাবিক তো বটেই, উপরন্তু মহাভারতের বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে।

আগেই দেখানো হয়েছে, মূল মহাভারত সংকলনের সময় (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ – খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক) আদিপর্বান্তর্গত গণেশ প্রসঙ্গ অনুপস্থিত হলেও পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে নবম শতকের মধ্যে ভারতীয় পুরাণকথায় গণপতির উত্তরোত্তর প্রসিদ্ধি এবং গণেশ কর্তৃক ভারতকথার অনুলিখনের প্রসঙ্গটি একটি প্রতিষ্ঠিত কিংবদন্তীর চেহারা নিয়েছিল। এমনকি প্রক্ষেপ হিসেবে ব্যাস-প্রোক্ত মহাভারতের আদিপর্বেও সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। স্বভাবতই সপ্তদশ শতকে কাশীরাম যখন মহাভারতের অনুবাদ সম্পন্ন করছেন, তখন গ্রন্থের নান্দী অংশে গণেশের প্রারম্ভিক স্তুতি করাটা তিনি অবশ্য কর্তব্য মনে করেছেন। যদিও অনুবাদক আদিপূজ্য রূপে গণেশকে বন্দনা করলেও একবারও তাঁর অনুলিপিকরণের প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেননি। এ থেকে মনে হয়, অনুবাদক-কবি এক্ষেত্রে গণেশ বন্দনার প্রথামাফিক ব্যবহারটিকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। বন্দনার বিষয়বস্তু অনুসরণ করলে দেখা যায়, গণেশ এখানে একান্তভাবেই ‘গৌরীর নন্দন’। তিনি বিঘ্ননাশী এবং সিদ্ধিদাতা। গণপতির মহিমময় রূপেই তিনি বন্দিত হয়েছেন। ব্রতাদি যাগ-যজ্ঞে তিনিই প্রথমপূজ্যের (রঘুনন্দনের বিধানে গণপতি ততদিনে পঞ্চোপাস্যের একতম রূপে শাস্ত্রসিদ্ধ হয়েছেন) সম্মান পেয়েছেন। স্বয়ং বিধাতাও সর্বপ্রথম তাঁর পূজা করেন। এরপর পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্রের অনুসরণে গণেশের বাহ্যরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি খর্বকায়, স্থূলোদর, গজমুখ এবং লম্বোদর-রূপ সুন্দরমূর্তি। তাঁর দেহ-কলেবর চন্দনচর্চিত। গাল থেকে নিঃসৃত মদস্রাবের আকর্ষণে ভ্রমরেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত গণেশ শত্রুশরীর বিদীর্ণ করে সেই রক্তে বিভূষিত হৃদয় হয়েছেন। পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলির বর্ণনা গণেশের তান্ত্রিক ধ্যানমন্ত্রের অনুসারী। এক্ষেত্রে তাঁর হস্তধৃত আয়ুধ হল: পাশ, অঙ্কুশ, জপমালা ও পদ্ম। ইঁদুরবাহন গণপতি সিঁদুরশোভিত, আজানুলম্বিত নাসাযুক্ত অর্থাৎ শুণ্ডধারী। তিনি ‘প্রচণ্ড মণ্ডল’, মুকুট পরিহিত, কর্ণকুণ্ডলে শোভিত এবং তিলকযুক্ত। তাঁর তিলক অন্ধকারনাশী। বিবিধ পরিচ্ছেদ তাঁর। কঙ্কণ ও বাজু পরিহিত হস্ত। পদযুগে নূপুর ও কিঙ্কিণীর রণন শোনা যায়। তিনি ‘জিতেন্দ্রিয়-যতি’ অর্থাৎ তপস্বীদের মতোই ইন্দ্রিয় দমনকারী, যোগীদের প্রিয় এবং যোগীদের মধ্যমণি বা শ্রেষ্ঠ (‘যোগীন্দ্র’) স্বরূপ। তাঁর চরণ স্মরণ করে বিবিধ কাব্য-গাথা রচিত হয়েছে। তাঁর আশীর্বাদধন্য হয়েই বাল্মীকি, বশিষ্ট, ব্যাস প্রমুখ ভূমণ্ডলে কবিশ্রেষ্ঠের খ্যাতিলাভ করেছেন। অনুবাদক গণেশকে ‘বিঘ্নেশ্বর’ রূপে সম্বোধন করে হরিনামামৃত পানের মধ্য দিয়ে তাঁর বিঘ্নহরণের প্রার্থনা জানিয়েছেন। পরিশেষে ভণিতায় নিজেকে ‘কৃষ্ণদাসানুজ’ বলে অভিহিত করে কাশীরাম জানিয়েছেন তিনি সর্বদা ঐকান্তিক চিত্তে গণপতির পাদপদ্ম ধ্যান করেন।

৩.৮

মঙ্গলগীতে গণেশ প্রসঙ্গ

ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের বাংলায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-সংরূপ হিসেবে বিকশিত মঙ্গলগীতের প্রারম্ভে ‘বন্দনা’ অংশের একটি প্রথানুগ ধাঁচা পাওয়া যায়। মধ্যবাংলার বেশিরভাগ উপস্থাপনযোগ্য শিল্পমাধ্যমের গোড়াতেই সাধারণত পুরাণ-প্রসিদ্ধ, ক্ষেত্রবিশেষে নির্দিষ্ট কবির গীতরচনার উদ্দিষ্ট এবং সমকালে জনপ্রিয় দেব-দেবী অথবা দেবতা-প্রতিম কোনও মানুষের উদ্দেশে স্তব, স্তুতি বা মাহাত্ম্য-বর্ণনার মধ্য দিয়ে একভাবে তাঁদের স্মরণ করার প্রক্রিয়া চলে। এই স্মরণের উদ্দেশ্য হল, যাঁর বা যাঁদের স্মরণ-বন্দন করা হচ্ছে, তাঁদের কৃপাধন্য ও প্রসাদপুষ্ট হওয়া, যার ফলে সংশ্লিষ্ট গীতকথাটি আসরে নির্বিঘ্নে পরিবেশিত হতে পারে।

বন্দনাভাগে সর্বাগ্রে আসে গণেশের প্রসঙ্গ। বেশিরভাগ মঙ্গলগীতের বন্দনা অংশেরই নান্দীমুখ হয়েছে গণেশকে দিয়ে। তবে ব্যতিক্রমও কিছু আছে। এর কারণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য পুরাণ-পরিসরে গণেশের প্রতিষ্ঠা এবং আদিদেব হিসেবে স্বীকৃতি। বাংলার মৌখিক পরম্পরার যে সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার মঙ্গলগীতে লক্ষ করা যায়, তা একভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যের সমকালীন ঝোঁকগুলিকে স্বীকরণের মধ্য দিয়েই এগোচ্ছিল। যেহেতু সংস্কৃত পুরাণকথায় ততদিনে গণেশের প্রথম পূজ্যতা স্বীকৃত হয়েছে, স্বভাবতই প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যকে মান্য করার এবং অঞ্চলভিত্তিক শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত করার একটা প্রবণতা ছিলই। অতএব, বন্দনা অংশের প্রারম্ভে গণেশের একচেটিয়া উপস্থিতির বিষয়টিকে ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য দেখানোর চেষ্টা বলা চলে। এখন প্রশ্ন হল, এই আনুগত্য প্রদর্শন কতদূর পর্যন্ত সফল হতে পেরেছে? অর্থাৎ সংস্কৃত পুরাণকথায় বা অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে ঠিক যেভাবে গণেশের রূপাঙ্কন, সেভাবেই কি বন্দনাংশেও গণেশ উপস্থাপিত হয়েছেন? নাকি, যাবতীয় সংশ্লেষের মধ্যেও কখনও কখনও কোথাও কোথাও সামান্য তফাত ঘটে গিয়েছে? দু’একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া বিশেষ হেরফের মিলবে না। কারণ, অধিকাংশ মঙ্গলগীতের গণেশ বন্দনায় পুরাণ-প্রসঙ্গের অবিকল পরিগ্রহণের হারটাই বেশি। বন্দনাগুলি প্রায়শই হয়ে উঠেছে পৌরাণিক শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতিলিপি। প্রসঙ্গত, বাঙালির ‘নবপুরাণ’ মঙ্গলগীতের সূচনায় শাস্ত্রবদ্ধ অংশ হিসেবে যে বন্দনাভাগ পাওয়া যায়, তার মধ্যে পুরাণানুসরণ ছাড়াও তান্ত্রিক ঐতিহ্যের অনুষঙ্গ-ও লক্ষণীয়। গণেশের পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্র বা তান্ত্রিক ধ্যানের অনুষঙ্গেই বেশিরভাগ বন্দনার ভাষ্য নির্মিত। মধ্যে মধ্যে দু’-একটি পুরাণ-প্রসঙ্গ বা পৌরাণিক আখ্যান-চূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে জুড়ে গিয়েছে কখনও। এ ছাড়া ‘দেবখণ্ড’-এ

ক্ষেত্রবিশেষে হর-গৌরীর দাম্পত্যবৃত্তের মধ্যে গণেশের জন্মকথার বর্ণনা কিংবা পারিবারিক ঘটনার মধ্যে গণেশের দ্বিপ্রাহরিক পান-ভোজনের দৃশ্য ফুটে উঠেছে।

সাধারণভাবে, মঙ্গলগীতের গণেশ-বন্দনায় গণেশের identification বা পরিচয় নির্মাণের চেষ্টা হয়েছে তিনটি মাত্রায়, যথা : এক, দেবমণ্ডলে গণেশের status বা তাঁর অবস্থান নির্ণয়। দুই, গণেশের অঙ্গসৌষ্ঠবের বর্ণনা। এক্ষেত্রে তাঁর গাত্রবর্ণ, প্রসাধনাদি অলংকারের বর্ণনা, খাদ্যাসক্তি বা রসনাপ্রিয়তা, বাহন এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। তিন, কীভাবে গণেশের জন্ম হল এবং কেন তিনি বিশ্বসংসারে প্রথম পূজ্যের সম্মান পেলেন, এই জাতীয় বৃত্তান্ত। বিচ্ছিন্নভাবে গণেশের পিতা বা মাতার উল্লেখ অথবা যুগপৎ উল্লেখ এক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রধান মঙ্গলগীতের ধারায় গণপতি :

মনসামঙ্গল

ক। মৌখিকভাবে প্রচলিত মনসামঙ্গল ধারার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সম্ভবত সবচেয়ে বড় কবি বিজয়গুপ্ত। জালালুদ্দিন ফতেহ শাহের সময়কালে ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল*-এ 'মনসার জন্ম পালা' শীর্ষক অংশে পদ্মাবতী, জরৎকারু, মহেশ্বর, 'পদ্মার তনয়' আস্তিক মুনি, ব্যাস এবং বশিষ্ঠের বন্দনার পর ক্রমানুসারে পনেরোজন দেব-দেবী বন্দিত হয়েছেন। এই তালিকার নবম স্থানে 'দেবী ভগবতী'কে বন্দনার পরে এবং 'দেবী পদ্মাবতী'-কে দ্বিতীয়বার বন্দনার আগে মাত্র একটি ছত্রে বাহনসহ 'গণেশ'-এর উল্লেখ আছে - 'মুষিক বাহনে বন্দম দেব গণপতি'।[১৩৬] 'বন্দনা' অংশে দেবতাদের সম্পূর্ণ তালিকাটি এইরকম : ১. ইন্দ্র ২. বারাহী ৩. চামুণ্ডা ৪. দেবী মহামায়া ৫. ব্রহ্মা ৬. বিষ্ণু ৭. গঙ্গা ৮. দেবী ভগবতী ৯. গণপতি ১০. পদ্মাবতী (পুনরুল্লেখ) ১১. দিবাকর ১২. ধনের ঈশ্বর বা কুবের ১৩. লক্ষ্মী ১৪. সরস্বতী ১৫. মহাদেব (পুনরুল্লেখ)

এরপর 'লখিন্দরের বিবাহ পালা' শীর্ষক অংশে বেহুলা-লখিন্দরের বিয়ে দেখতে আসা দেবতাদের মধ্যে সর্বাগ্রে গণেশের নাম পাওয়া যাচ্ছে : "মুষিক বাহনে গতি/ সবার আগে গণপতি/ সিন্দুরে মণ্ডিত স্থূলকায়া।"[১৩৭] 'সবার আগে' কথাটিকে খেয়াল করলে বোঝা যাবে কীভাবে বাংলার একাংশে *মনসামঙ্গল* তথা রয়ানী গায়কদের পুরাণ-চেতনার বিবর্তন ঘটেছে। বন্দনা গানে গণপতিকে প্রথম পূজ্যের সম্মান না দিলেও মঙ্গলগীতের আখ্যান অংশে বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ বাসরে আগত দেব-দেবীর মধ্যে গণেশই সর্বাগ্রগণ্য হয়েছেন। সম্পূর্ণ তালিকাটি

এইরকম : ১. প্রজাপতি (ব্রহ্মা) ২. গোবিন্দ ৩. শঙ্কর ৪. কার্তিক ৫. শমন (যম) ৬. কুবের ৭. পবন ৮. অগ্নি ৯. দিবাকর ১০. গণেশ ('সবার আগে') ১১. বরুণ ১২. মহামায়া ১৩. ভাগীরথী ১৪. ইন্দ্র।

এখন বিয়ে দেখতে আসা দেবতাদের তালিকার সঙ্গে বন্দনা অংশের দেবতাদের তালিকার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে প্রাধান্যের প্রশ্নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেবতার প্রথম তালিকা থেকে দ্বিতীয় তালিকায় স্থানবদল সহজেই চোখে পড়বে। এই পরিবর্তন আপতিক নয়, বরং সর্বভারতীয় পুরাণ-সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যরক্ষার আকাঙ্ক্ষা থেকে পরিকল্পিত। 'ইন্দ্র', 'বিষ্ণু'র পাশাপাশি গণেশ সম্পর্কেও দৃষ্টিভঙ্গির বদলের কারণ সম্ভবত মনসামঙ্গল গায়কদের মধ্যে পুরাণ চেতনার বৃদ্ধি। সামান্য বিশ্লেষণ করা যাক। আমাদের মনে হয়, বন্দনা তালিকা রচনার সময় গণেশের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট ছিল না। ইন্দ্র 'দেবরাজ' বলে তাঁর নাম প্রথমেই উচ্চারিত। গণেশের অধিষ্ঠান আরও পরে, নবমে। পুরাণে ক্রমশ ইন্দ্রের ক্ষমতার সরণ ঘটেছে। তাঁর স্থানাভিষিক্ত হয়েছেন বিষ্ণু। অন্যদিকে, গণেশ এসেছেন ক্ষমতার কেন্দ্রভাগে। গুপ্তযুগের ভারতে (খ্রিস্টীয় ৪র্থ/৫ম শতক) সংস্কৃত পুরাণ-পরিসরে গণেশের এই উত্তরোত্তর 'গুরুত্ববৃদ্ধি' বিবাহ বাসরে উপস্থিত দেবতাদের তালিকা প্রণয়নের সময় নিশ্চয়ই গায়কদের অবচেতনে সক্রিয় ছিল।[১৩৮] বিজয়গুপ্তের দ্বিতীয় তালিকায় 'গণপতি সবার আগে' উচ্চারণে এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ মিলছে।

খ। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল গীতের বন্দনা অংশে সর্বপ্রথম বিস্তৃতভাবে গণেশ-বন্দনার নমুনা পাওয়া যায়।[১৩৯] প্রায় আঠারো ছত্রে বর্ণিত এই গণেশ বন্দনাটিকেই কার্যত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যধারায় প্রথম নিদর্শন বলা যায়, যেখানে এত বিশদে কবি আদিদেব গণেশের বন্দনা করেছেন। পূর্ববঙ্গীয় কবি বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল*-এ গণেশ-বন্দনার কোনও পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন আমরা পাই না। আদিদেব তথা প্রথমপূজ্যরূপে তাঁর উল্লেখও কিছুটা অস্পষ্ট। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের কবি বিপ্রদাসের বন্দনায় গণেশ আদিদেবরূপে পূর্ণপ্রকাশিত। এর কারণ, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে স্মার্তহিন্দুর পঞ্চোপাসনায় গণপতির অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। চৈতন্যকালীন বাংলার মান্যতম স্মার্ত রঘুনন্দনের *আহ্নিকতত্ত্ব*-এর প্রমাণে গণপতি সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তির আদিতে প্রথমস্থানীয় হয়েছেন পঞ্চদশ শতকেই। ফলে, পঞ্চদশ শতকের শেষদশকে রচিত বিপ্রদাসের বন্দনায় গণেশের প্রথমপূজ্যতার স্পষ্ট উল্লেখ কার্যত বঙ্গীয় পুরাণ এবং স্মৃতি-প্রমাণের সমর্থনেই রচিত। বিপ্রদাস-উত্তর কবিরা প্রত্যেকেই গণেশের আদিপূজ্যতার ক্ষেত্রে দৃঢ়নিশ্চিত। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে বঙ্গদেশে রচিত ও সংকলিত পুরাণাদিতে গণেশের প্রথমপূজ্যতা স্বীকৃত হলেও স্মৃতির বিধানকে মান্যতা

দিয়ে স্মার্তহিন্দুর ধর্মসাহিত্যে এই সময় থেকেই গণপতি আদিদেবরূপে বন্দিত হয়েছেন। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলগীতেই তার সার্থক সূচনা।

ধর্মশাস্ত্রে পারঙ্গম কবি যে ভারতীয় সংস্কৃত পুরাণকথার পাশাপাশি তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত উপাদানও অবলীলায় আত্মস্থ করেছিলেন, বন্দনাটির সূত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৪০] বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, গণেশের পরিচয় প্রদানের সূত্রে প্রথমেই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর দেহ-সৌষ্ঠবের বর্ণনা। হস্তীমুখ গণেশ খর্বদেহ, স্ফীতকায়, লম্বিত উদর হলেও 'সুন্দর' এবং তিনি মূষিকবাহন। তৃতীয় লাইনে বলা হয়েছে তার ত্রিনয়ন এবং চারটি হাতের কথা। চতুর্থ লাইনে গণেশের কুন্দেন্দুসম উজ্জ্বল একদন্তের উল্লেখ আছে। সপ্তম থেকে দশম ছত্রের বর্ণনায় আছে, গণেশের মুখমণ্ডল-নিঃসৃত মদস্রাবের সৌরভে ভ্রমরেরা আকৃষ্ট হয়েছে। ঠিক যেমন প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধে ভ্রমরেরা উন্মনা হয়। মনে হয় গণেশের appearence-এ দিব্যত্ব (divinity) আরোপণের জন্যই তাঁকে এমন অলৌকিক বিভামণ্ডিত করে হাজির করা হয়েছে। তবে রূপজ সৌন্দর্যের পাশাপাশি তাঁর বলবীর্যের দিকটিও অনুচ্চারিত থাকেনি। একাদশ পঙ্‌ক্তি অনুসারে, তিনি দাঁতের আঘাতে প্রবল প্রতিপক্ষকে বিনাশ করেন এবং শত্রুর রক্তে এমনভাবে দাঁতখানি রঞ্জিত করেন যে দেখে মনে হয় সিঁদুরের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সমগ্র দেহটিও একইরকম সিঁদুররাঙা অর্থাৎ রক্তবর্ণ। তৃতীয় পঙ্‌ক্তির 'সেবকবৎসল' শব্দে এবং ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির 'সর্বকার্য সিদ্ধিবরপ্রদ' উচ্চারণে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু গণেশের দয়ার্দ্র মনের পরিচয় প্রকাশিত। তাঁর শরণাশ্রিতজনের সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে গণেশকে 'শৈলসুতাসুত' অর্থাৎ পার্বতীপুত্ররূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ। সপ্তদশ শতকের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের *মনসামঙ্গল*-এ দেবী মনসার বন্দনার পরে কামদ রাগে বিঘ্নহর্তা গণেশের বন্দনা রচিত হয়েছে।[১৪১] এক্ষেত্রে গণেশের supremacy সর্বার্থে রক্ষিত। একবারের জন্যও কবি তাঁর পিতা-মাতা হিসেবে শিব-পার্বতীর নামোল্লেখ করেননি। বোঝা যায়, কবি পারিবারিক বেষ্টনীর বাইরে পরব্রহ্মের সর্বোচ্চ প্রকাশরূপে স্বীকৃত গাণপত্য কুলদেবতার মহিমাপ্রকাশে ইচ্ছুক। অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রথামাফিক বর্ণনার (পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম, অঙ্গে 'যোগপাটা' বা যজ্ঞোপবীত, কপালে চন্দনের ফোঁটা, রাতুল চরণ ও ইঁদুরবাহন) পাশাপাশি গজানন গণেশের সর্বতত্ত্বসার মূর্তির বর্ণনাই কবির প্রতিপাদ্য। তাঁকে 'সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম', স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের 'নিস্তার-কারণ স্থল', 'ব্রহ্মরূপ সনাতন', 'সংসারের সার' প্রভৃতি বলা হয়েছে। আদিদেব একদন্ত গণেশ যে প্রকৃত পরিচয়ে পরমতত্ত্ব, আগম-পুরাণের ব্যাখ্যাতীত ('আগম পুরাণ চায়্যা/ তব তত্ত্ব নাহি পায়্যা'), এমনকী সেই অনাদি-অনন্ত

শক্তির পরত্ব যে স্বয়ং বিধাতা তথা দেবগণেরও দূরধিগম্য, কবির বর্ণনায় তার স্বীকৃতি মিলেছে। ভণিতায় কবি গণরায় গণেশের কাছে আসরে অধিষ্ঠান করে সর্ববিঘ্নহরণের প্রার্থনা জানিয়েছেন।

ঘ। সপ্তদশ শতকের শেষভাগ বা অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের কবি বিষ্ণুপালের *মনসা-মঙ্গল*-এর প্রারম্ভে গণেশ বন্দনা পাওয়া যায়।[১৪২] গণেশ এখানে 'হরের নন্দন'-রূপে আখ্যায়িত হলেও তাঁকে পার্বতী-গর্ভজাত ('পার্বতীর উদরে জন্ম') বলা হয়েছে। তিনি দিব্যবস্ত্রপরিহিত, মন্ত্রজ্ঞানী এবং সমস্ত দেবতার অগ্রপূজ্য। বর্ণনার দুটি জায়গা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এক, শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ডচ্ছেদের অংশে কবি বঙ্গদেশীয় *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর অনুসরণ করলেও ('মুণ্ডচ্ছেদ সর্ন্নি দরশনে') কবন্ধ বালকের জন্য মুণ্ড সংগ্রহের দায়িত্ব পেয়েছেন হনুমান। অম্বিকা তথা পার্বতীর দুঃখ দেখে হনুমান গজমুখ সংগ্রহ করে এনেছেন ('হনু আনে গজমুখ/ জিয়াইলে মন্তর আহব্বানে'), এমনকী মন্ত্র পড়ে সেই গজানন বালককের স্কন্ধে যুক্ত করে তাঁকে পুনর্জীবন দিয়েছেন তিনিই। ঠিক এই অংশেই কবি *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর প্রচলিত ভাষ্য থেকে কিছুটা সরে এসেছেন। *ব্রহ্মবৈবর্ত্ত*-এর 'গণেশ খণ্ড'-এ হনুমান নয়, স্বয়ং গোলোকপতি বিষ্ণু-কৃষ্ণ-ই পুষ্পভদ্রা নদীতীরে উত্তরমুখে শয়নরত এক হস্তীর মুণ্ড কেটে গণেশের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কৃষ্ণের পরিবর্তে হনুমানের মুণ্ড আনয়নের প্রসঙ্গটি এক্ষেত্রে কবিকল্পনা বলা ছাড়া অন্য উপায় নেই। কারণ, পৌরাণিক গণেশজন্মকথায় এই ধরনের উল্লেখ আমরা অন্তত এযাবৎ খুঁজে পাইনি। দুই, *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর ভাষ্যেই গণেশ বিষ্ণু ও শিবাত্মজ এবং বিশেষভাবে কৃষ্ণাবতাররূপে স্বীকৃত। ফলত, বন্দনায় কবি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর মতোই গণেশের আয়ুধসজ্জা ('শংখচক্র শুভে চারিহাতে') দেখিয়েছেন। গদা ও পদ্মের অনুল্লেখ সত্ত্বেও বুঝতে অসুবিধা হয় না কৃষ্ণসাদৃশ্যেই এখানে গণেশের বাহুভূষণ বর্ণিত হয়েছে। লক্ষণীয়, বাংলার মঙ্গলগীতের ঐতিহ্যে শঙ্খ-চক্রযুক্ত গণেশের উল্লেখ বিষ্ণুপালের রচনাতেই আমরা প্রথম পেলাম। বঙ্গদেশের ধর্ম-সংস্কৃতিতে গণেশ যে বহুলাংশেই বিষ্ণু-কৃষ্ণের সমানধর্মা, মূর্তি-সংস্থানের দিক থেকে বিষ্ণুপালের বন্দনা তার একটি উপযুক্ত সাহিত্যিক প্রমাণ হতে পারে।

ঙ। উনিশ শতকীয় কবি রাধানাথ রায়চৌধুরীর *পদ্মাপুরাণ*-এ পদ্মাবতী বন্দনার পরে গণেশ-বন্দনা পাওয়া যায়।[১৪৩] বন্দনাকার তাঁকে 'আদিদেব', 'অশুভনাশন', 'সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিদাতা', 'সর্ব্বদেব রাজা' প্রভৃতি বলে মহিমান্বিত করেছেন। বর্ণনায় তিনি 'পার্ব্বতীনন্দন' হয়েও পরব্রহ্মের প্রকাশরূপে উপস্থিত। স্থাবর-জঙ্গম সবকিছুই অসীম মহিমাধর গণেশের বিভূতিমাত্র। লক্ষনীয়, বন্দনায় তাঁকে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই-ই ('কখন পুরুষ তুমি কখন প্রকৃতি') বলা হয়েছে। বন্দনা ছাড়াও *পদ্মাপুরাণ*-এর 'দেবখণ্ড'-এর 'গণপতির জন্মকথা' অংশে *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-

এর গণেশজন্মের প্রসঙ্গ অনুসৃত হয়েছে।[১৪৪] আগেই দেখিয়েছি, গণেশজন্মের ক্ষেত্রে শিব-কৃষ্ণের যৌথতা বঙ্গীয় পুরাণ-পরম্পরায় একটি ব্যতিক্রমী discouse। *ব্রহ্মবৈবর্ত* অনুসারে, শিবের স্খলিত বীর্যের সঙ্গে নিজেকে মিশ্রিত করে বিষ্ণু-কৃষ্ণ গণেশরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। পুরাণের এই বিশেষ অংশটি রাধানাথ গণেশের জন্মবর্ণনার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে ("শুভযোগে শঙ্করের বীর্য্যপাত হয়।/ পার্ব্বতীর গর্ভে নাহি বেশীক্ষণ রয়।।/ মহাতেজবন্ত বীর্য্য গর্ভে নাহি ধরে।/ দশদণ্ড পরে বীর্য্য আসিল বাহিরে।।/ অব্যর্থ শিবের বীর্য্য বৃথা নাহি হয়।/ বিষ্ণু-তেজ আসি তাতে যুক্ত হয়ে রয়।।/ সেই তেজে বীর্য্য হতে জন্মিল তনয়।/ তাহা দেখি মহামায়া বড় তুষ্ট হয়।।") অনুসরণ করেছেন। গণেশের জন্মকাহিনির বর্ণনায় তাঁর আগে মঙ্গলগীতের অন্য কোনও কবি শিব ও কৃষ্ণের একত্বের এই পুরাণ-প্রমাণটিকে ব্যবহার করেননি। পরবর্তী পর্যায়ে শনির দৃষ্টিপাতে গণেশের মুণ্ডচ্ছেদের বৃত্তান্ত *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এর অনুসরণে বর্ণিত। তবে একটি ক্ষেত্রে তফাত লক্ষ করা যায়। রাধানাথের বর্ণনায় বিষ্ণুর ভূমিকায় বায়ুকে দেখা যায়। গণেশজন্মের পর সমস্ত দেবতাকে পুত্রজন্মের সংবাদ দেওয়া থেকে শুরু করে মুণ্ডচ্ছেদের পরে বিষ্ণুর আদেশে খড়্গের সাহায্যে ঐরাবত-হস্তীর মস্তক কেটে আনা পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে বায়ু অর্থাৎ পবনদেব। বায়ুর আনা হস্তীমুণ্ডটি স্কন্ধে সংযোজনমাত্রেই গণেশ গজাননরূপে পুনর্জীবিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে বায়ুর অংশগ্রহণের প্রসঙ্গটি কবিকল্পিত বলে মনে হয়। বিষ্ণু-কৃষ্ণের অংশাবতার হিসেবে গণেশের যে একটি বিশিষ্ট পরিচয় বঙ্গদেশে গড়ে উঠেছে, এই জাতীয় পৌরাণিক জন্মবৃত্তান্তের অনুসরণে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চণ্ডীমঙ্গল

ক। চণ্ডীমঙ্গল গীতধারার আদিকবি মানিক দত্তের *চণ্ডীমঙ্গল*-এ গণপতির জন্মকথা বিবৃত হয়েছে।[১৪৫] ভারতীয় পুরাণকথার অনুসরণে গণেশজন্মের ক্ষেত্রে পার্বতী একক অংশগ্রহণ গুরুত্ব পেয়েছে। গণেশ এখানে পার্বতীর অঙ্গমলজাতরূপে ("একদিন দুর্গা অঙ্গের মলি উঠাইল।/ মলির পুতুলি এক নির্ম্মান করিল।।") আবির্ভূত। পার্বতীনির্মিত নিশ্চেতন পুতুলে স্বয়ং শিব প্রাণদান করেছেন। যদিও জন্মের অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনা *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* ও *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ* অনুসারী। শনির দৃষ্টিপাতে পার্বতীপুত্রের মুণ্ডচ্ছেদ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অনুসারে বর্ণিত এবং ইন্দ্র-হস্তীর শির যোজনার উল্লেখটি *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এ পাওয়া যাবে। যদিও সেখানে মুণ্ড আনয়নের কাজটি নন্দী করেছিলেন, এক্ষেত্রে করেছেন শিবানুচর চণ্ড। শিবপ্রসাদে পুনর্জীবনলাভের পর গজানন গণেশ দেবমণ্ডলে অগ্রপূজ্যরূপে স্বীকৃত হয়েছেন। কবি তাঁকে মূষিকবাহনরূপে ('গণেশ মূসক পৃস্টে চড়িঞা বেড়ায়ে') অভিহিত করেছেন।

খ। ষোড়শ শতকের শেষভাগে (১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রণীত কবি দ্বিজমাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* বা *সারদাচরিত*-এ 'মল্লার রাগে গীত' গণেশ-বন্দনার নমুনা পাওয়া যায়।[১৪৬] দ্বিজমাধবের গণেশ বন্দনাতেও দেখি গণেশের রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর আচরণগত বৈশিষ্ট্যের কথাও কবি প্রকাশ করেছেন। এই উপস্থাপনা অনেকাংশেই *তন্ত্রসার*-এর বর্ণনা অনুসারী।[১৪৭] গণেশ যেমন রূপবান তেমনি তিনি বিঘ্ননাশকারীও বটে। সেকারণেই, বন্দনা গানের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে কবি গণেশের বিঘ্নহন্তারক চরিত্রটির উল্লেখ করে তাঁকে ঘটে অধিষ্ঠানের জন্য আবাহন করেছেন। *তন্ত্রসার* যেভাবে গণেশের বহিরঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছে, আলোচ্য বন্দনা গানটিতেও তদনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ভণিতায় কবি দ্বিজমাধব গণেশের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন গৌরীপুত্র গণপতি যেন তাঁর সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং তাঁর প্রতি কৃপাকণিকা বর্ষণ করেন। দ্বিজমাধবের গণেশ বন্দনার স্বাতন্ত্র্য হলো তিনি গণেশের দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনা বা তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদানের পাশাপাশি গণেশের ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মচারী মূর্তিটি অঙ্কন করেছেন অষ্টম পংক্তিতে পাওয়া যাচ্ছে ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করে সমাধিমগ্ন গণেশ একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। গণেশ যে সাক্ষাৎ 'ব্রহ্মস্বরূপ' এই ধারণাটিও তাঁর গানে যুক্ত করেছেন কবি আর এইখানেই তাঁর নিজস্বতা। *তন্ত্রসার*-উক্ত গণেশের ধ্যানমন্ত্রকে সার্থকভাবে অনুসরণের পাশাপাশি কবি গণেশের identification-এর ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন। গণেশ যে কেবল বিলাসব্যসন এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের বৃত্তে আবদ্ধ নন, তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীরে যে একধরনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অধ্যাত্ম সাধনার উপযোগী জ্ঞানমার্গীয় ভাবাবেগ যুক্ত আছে, এই ধরনের উল্লেখ সেটি প্রমাণিত হয়। সমাধিমগ্ন অবস্থায় গণেশের একনিষ্ঠ সাধনার image-টি দ্বিজমাধবের গণেশ বন্দনা যে একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গ। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বা সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে প্রাপ্ত কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর *অভয়ামঙ্গল* গীতের প্রারম্ভে গণেশ-বন্দনার নিদর্শন পাওয়া যায়।[১৪৮] গণেশ বন্দনাটি আরম্ভ হয়েছে গণেশের সঙ্গে ব্রহ্মের অভিন্নতা নিরূপণের মাধ্যমে। বেদান্ত দর্শন অনুযায়ী, ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ ত্রিজগতে 'ব্রহ্ম' ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও দেবতা নেই। ব্রহ্ম অনির্ণেয়, বাচ্যাতীত এবং তত্ত্বসারমাত্র। সর্বকর্মারম্ভে যে দেবতার বন্দনা করা হয়, তিনি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই। *গণপত্যথর্বশীর্ষ উপনিষদ* অনুসারে গণেশ ব্রহ্মেরই বাঙ্ময় মূর্তি, জনমানসে যিনি 'Lord of Beginnings' বা আরম্ভের দেবতা বলে পরিচিত। যেহেতু গণেশকে পুরাণ সহ অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে সকল দেবতার অগ্রে পূজালাভের অধিকারী বলা হয়েছে, সেই কারণেই সম্ভবত প্রথম পূজ্য গণেশ কবির কাছে হয়ে উঠেছেন ব্রহ্মের সমতুল্য। *তন্ত্রসার*-এ গণেশ স্তোত্রে বলা হচ্ছে, "ব্রহ্মেতি যং ব্রহ্মবিদো বদন্তি, তং শম্ভুসূনুং

সততং ভজামি"।[১৪৯] এ ছাড়া *গণেশপুরাণ* অনুসারেও গণেশ পরমব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, "এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষ ভূতপতি এষ ভূতালয়"[১৫০] – অর্থাৎ গণেশ-ই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, মূর্তিভেদে তিনিই সমগ্র জগৎ পালন করেন এবং তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের সর্বময় কর্তা। 'অন্যে বলে পুরুষ-প্রধান' উচ্চারণে বেদ-ব্যাখ্যাত 'পুরুষ' নামধেয় 'শ্রেষ্ঠ' দেবতাকে (পরে যাঁর মাহাত্ম্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ভাগাভাগি করে নেন অথবা সাংখ্য দর্শনের 'পুরুষ', যিনি প্রকৃতির শক্তিকে পরিপূরণ করেন এবং যাঁকে বাদ দিয়ে প্রকৃতির প্রচেষ্টা হয় না গণেশের মধ্যে তেমন কোনও পুরুষ-প্রধানের শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত আছে) বোঝানো হয়েছে। তাত্ত্বিক ধারণার আত্তীকরণের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই কবি সকলের আগে গণেশের বন্দনা করেছেন এবং শাস্ত্রানুসারেই তাঁকে 'বিশ্বের পরমগতি', জগতের হেতু অর্থাৎ পরম-কারণ, এমনকি 'অন্তরায়-পতি' অর্থাৎ বিঘ্নঘটনপটু রূপে অভিষিক্ত করেছেন। *ভবিষ্যপুরাণ*[১৫১] এবং *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি* বা *সংহিতা*[১৫২] অনুসারে, গৌতম মুনির সাধনায় বিঘ্নসৃষ্টির জন্য তাঁর বিরোধী পক্ষ গণেশকে নিযুক্ত করেছিল। এই প্রাচীন শাস্ত্রীয় সূত্রটিকে মাথায় রাখলে গণেশকে বিঘ্নরাজ হিসেবে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। উপদেবতারূপে পরিচিত গণেশের বিঘ্নকারক চরিত্রটি ক্রমশ বিবর্তিত হয়ে 'বিঘ্নবিনায়ক'-রূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা। 'বিঘ্নকর্তা' থেকে 'বিঘ্নহর্তা' হয়ে ওঠার এই যাত্রাটুকু নিশ্চয়ই মুকুন্দ বা তাঁর গায়েনদের ভাবনায় ছিল। সেকারণেই সম্ভবত 'অন্তরায়-পতি' হিসেবে গণেশের মূল্যায়ন হয়েছে। এই পরিচয়লাভ গণেশ-বন্দনার ঐতিহ্যে মুকুন্দকে অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে দেয়।

কিংবদন্তি আছে, *মহাভারত* প্রণয়নের সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস গণেশের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং গণেশের প্রত্যক্ষ সহায়তায় তাঁর অনুলিপিকরণের মধ্য দিয়েই কার্যত *মহাভারত* রচনার প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছিল। এই কিংবদন্তি স্মরণ রেখেই সম্ভবত তাঁর বন্দনা গানের চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে গণেশকে 'ব্যাস আদি যত কবি'র চরণতলাশ্রয়দাতার মর্যাদা প্রদান করেছেন। এইভাবে 'আদিদেব' গণেশের পরিচয় প্রদানের সূত্রে তাঁকে intellectual faculty বা মেধা-প্রকল্পের সঙ্গেও যুক্ত করা হয়েছে। এরপর কবি পার্বতীর অঙ্গজাত গণেশের অঙ্গশোভার বর্ণনা করেছেন *তন্ত্রসার*-উক্ত প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রের অনুসরণেই। গণেশের খর্বদেহ, স্ফীততনু, একদন্ত, হস্তিমুখ প্রভৃতি প্রসঙ্গ ক্রমান্বয়ে এসেছে কবির বন্দনায়। গণেশের স্বভাব হল তিনি 'প্রণত জনের নিঘ্ন' অর্থাৎ শুধু প্রণাম জানিয়েই তাঁকে আয়ত্ত বা আশ্রয় করা যায়। এই উচ্চারণে গণেশের accessibility-র প্রমাণ মিলবে। তিনি যে অন্যান্য দেব-দেবীদের মতো ভক্তের কাছে ততখানি দূরধিগম্য নন; বরং কত সহজেই, কী অনায়াসেই তাঁর কাছে যাওয়া যায়— এই উল্লেখের মধ্যে উপাসকের সঙ্গে উপাস্যের যে একটি 'সহজ' সম্বন্ধের ছবি ফুটে

উঠেছে, তা নিঃসন্দেহে মুকুন্দের নিজস্ব নির্মাণ। মুনিজনের মুক্তিদাতা গণেশের সাধনায় ভক্তের 'চারি পুরুষার্থ' অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফললাভ হয়। তাঁর 'বিঘ্ননাশক' চরিত্রটির কথা স্মরণ করেই কবি নিজের বিঘ্ন নিবারণের জন্য গণেশের শরণাপন্ন হয়েছেন। গণেশ যে আদপেই 'ভক্তবৎসল' দেবতা, সে কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি মুকুন্দ।

গণেশের রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর 'বন্ধুক' বা বাঁধুলী ফুলের মতো রক্তিমাভ দেহের উল্লেখ *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ* বা তন্ত্রের প্রচলিত গণেশ ধ্যানমন্ত্রের স্মরণ করায়। *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ* মতে, পার্বতীর রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র গণেশে রূপান্তরিত হয়েছিল বলে গণেশ লোহিতাঙ্গ হয়েছেন[১৫৩], অথবা গণেশের ধ্যানমন্ত্রের 'দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈ সিন্দুরশোভকরং' বা দাঁতের আঘাতে বিদীর্ণ শত্রুর শরীরের রক্তে তিনি সিঁদুরবর্ণ হয়েছেন[১৫৪]--- এই ধরনের স্মৃতিও কার্যকর থাকতে পারে। এরপর গণেশের অপূর্ব দেহকান্তির বর্ণনায় একে একে চন্দ্র-শোভিত মুকুট, সোনার নূপুর পরিহিত পাদপদ্ম, 'অঙ্গদ' বা বাজু, 'বলয়া' বা বালা প্রভৃতি অলঙ্কারের সজ্জা, কুমকুম প্রসাধিত অঙ্গ, 'মাতুলুঙ্গ' বা দাড়িম্ব (ডালিম) শোভিত শুণ্ড এবং হস্তধৃত ত্রিশূল, দণ্ড, তীর ('ইষু') ও পাশ প্রভৃতি অস্ত্রের প্রসঙ্গ যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে 'আজানুলম্বিত জটা' কিংবা ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করে 'নিরন্তর জপকর্ম' করবার প্রসঙ্গটিও। গণেশের অঙ্গশোভার বিবরণে এই দুই বিপরীত-যুগলের সহাবস্থান মুকুন্দের গণেশ-বন্দনার আর একটি বিশেষত্বের দিক। ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত জটাধারী গণেশের পুষ্পশোভিত দু'হাতে জপক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কেবলমাত্র বিলাসের বৃত্তে গণেশকে সীমাবদ্ধ রাখে না, তাঁকে নিয়ে যায় জ্ঞানমার্গের অত্যুচ্চ লোকেও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গণেশের ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানের বিষয়টি মুকুন্দ *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ* থেকে পেয়েছেন। *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এ গণেশের জন্মের পর নানা দেবতা তাঁকে নানা বস্তু উপহার দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শিব দিয়েছিলেন ব্যাঘ্রচর্ম– "ব্যাঘ্রচর্ম্ম দদৌ শিবঃ"[১৫৫]। জটাজুট গণেশের রূপটি কবি পেয়েছেন *শারদাতিলক* থেকে।[১৫৬] *শারদাতিলক*-এর টীকায় রাঘব ভট্ট যে ৫১ জন গণেশের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে আছে – "জটী মুণ্ডী তথা খড়্গী বরেণ্যো বৃষকেতনঃ"।[১৫৭] এছাড়া *স্কন্দপুরাণ*-এর 'প্রভাসখণ্ড'-এ 'কপর্দ্দী বিনায়ক' আছেন।[১৫৮] তবে গণেশের ধ্যানে বা স্তবে তাঁর 'জটা'-র উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে হয় ধ্যানমগ্ন যোগীশ্বর শিবের image-এর সঙ্গে সাযুজ্যরক্ষার প্রয়োজনেই জটাধারী গণেশের পরিকল্পনা। এমনকী তাঁর চন্দ্রকলাযুক্ত মুকুটও কার্যত শৈব cult-এর সঙ্গে গণেশের অভিন্ন-সম্পৃক্ততার চিহ্ন বহন করছে। এর পাশাপাশি আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় মুকুন্দের গণেশ বন্দনায়। সেটি হল, পূর্বোক্ত মঙ্গলগীতের কবিরা গণেশকে 'পার্বতীপুত্র' হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। এই প্রথমবার মুকুন্দের গণেশ-বন্দনায়

গণেশ একাধারে শিব এবং পার্বতী উভয়ের সন্তান হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন। তাঁকে ‘শিবসুত লম্বোদর’ যেমন বলা হয়েছে, তেমনই ‘গিরিসুতা’ পার্বতীর অঙ্গজাত এবং ‘হৈমবতীর’-র হৃদয়-নন্দন— এ’ভাবেও সম্বোধন করেছেন কবি। এরই সূত্রে বলা যায়, গণেশের উৎপত্তির ইতিহাসটিও মুকুন্দ-রচিত বন্দনায় প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান। ‘গিরিসুতা-অঙ্গ জনু’ আখ্যাটি ইঙ্গিতপূর্ণ। এর আধারে পার্বতীর গাত্রমল থেকে গণেশের জন্ম-বৃত্তান্তের একটি অতিপরিচিত পুরাণ-প্রসঙ্গ (*স্কন্দপুরাণ*-এর ‘ব্রহ্মখণ্ড’, ‘অর্বুদখণ্ড’, *মৎস্যপুরাণ, বামনপুরাণ*-এর গণেশ-জন্মের প্রসঙ্গ) সযত্নে ঠাঁই পেয়েছে। পাশাপাশি ‘শিবসুত’ হিসেবেও গণেশকে সম্বোধনের মধ্য দিয়ে তাঁকে শৈব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। এই উল্লেখের উৎসে *বরাহপুরাণ* কিংবা *লিঙ্গপুরাণ* (শিবাংশে জাত ঠিকই, তবে গণেশরূপী মহেশ্বরকে পার্বতী নিজগর্ভ থেকেই প্রসব করেছেন)-এর অভিজ্ঞতা কাজ করতে পারে। যেখানে গণেশ ‘শিবসুত’, সেখানে তিনি বলবীর্যে দৃপ্ত-ও বটে। তাঁকে স্মরণ করলে রণে জয় অবশ্যম্ভাবী। পিতৃসূত্রে গণেশ লাভ করেছেন শৌর্য-বীর্যের অধিকার। শিবের ‘পুত্র’ বলেই বোধহয় এই ধরনের উল্লেখে গণেশের মধ্যে পুরুষোচিত দার্ঢ্যের পূর্ণ উদ্ভাস লক্ষণীয়। এ ছাড়া গণেশের ‘আজানুলম্বিত জটা’ শিবের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপনের এবং তাঁর পুত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ মনে হয়।

ঘ। দ্বিজরামদেবের *অভয়ামঙ্গল*-এ (রচনা আনুমানিক ১৫৭১ শকাব্দ বা ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দ) গণেশ বন্দনা একটি নয়, দু’টি। তবে দু’টি বন্দনার কোনও একটি দিয়ে বন্দনা অংশ আরম্ভ হয়নি। ‘মঙ্গলদৈত্য-বধ ও কালকেতু-উপাখ্যান’ অংশের বন্দনাভাগ শুরু হয়েছে সূর্যবন্দনা দিয়ে। এরপর দ্বিতীয় বন্দনা হিসেবে সিন্ধুড়া রাগে আধারিত ‘আদৌ গণেশবন্দনা’ অংশটি পাওয়া যায়।[১৫৯] বন্দনাগানের শিরোনামের ‘আদৌ’ শব্দটি আদিদেব গণেশের অগ্রপূজ্যতার ইঙ্গিতবাহী। স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দনের *আহ্নিকতত্ত্ব*-এর বিধানেও বিনায়কের অগ্রগামিতা সিদ্ধ করতে ‘আদৌ বিনায়কঃ পূজ্যো ...’ — এইভাবে বলা হয়েছে। উদ্দিষ্ট বন্দনাটি গণেশের পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্র এবং *তন্ত্রসার*-এর গণেশ ধ্যানের অনুসরণে রচিত। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে গণেশ-জননীর পরিচয় উল্লিখিত। সম্ভবত কবি পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্রের ‘শৈলসুতাসুতং’-এর অনুসরণে ‘গণাধীপ’ গণেশকে ‘গৌরীপুত্র’ বলেছেন।[১৬০] এই বন্দনায় গণেশ পার্বতীর একক ভূমিকায় জাত। তিনি ‘বিঘ্নবিনাশন’ বলেই তাঁর স্মরণে অমঙ্গল দূর হয়। বন্দনা গানটিতে বাহনসহ গণেশের উল্লেখ পাওয়া যায়: ‘মূষিকবাহনে দেব ভূষণে ভূষিত’। চতুর্থ পঙ্‌ক্তির ‘বৈরিরক্তে সিক্ত দেহ সিন্দূরে রঞ্জিত’ ধ্যানমন্ত্রের ‘দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধৈরেঃ সিন্দুর-শোভকরং’ অর্থাৎ দাঁতের আঘাতে বিদীর্ণ শত্রুশরীরের রক্তে নিজদেহ রঞ্জিত করে গণেশ রক্তিমাভ হয়েছেন।[১৬১] তিনি পক্ষপাতহীনভাবে দেবতা এবং দুষ্টের দর্পচূর্ণ

করেন। বন্দনার সিংহভাগ জুড়ে আছে গণেশের গাত্রবর্ণ এবং দেহরূপের বর্ণনা। তিনি খর্বদেহ, চারুমুখ, চতুর্ভূজ এবং কল্পতরু। ধ্যানমন্ত্রেও তাঁকে সর্বসিদ্ধিপ্রদ ('সিদ্ধিপ্রদং কর্মসু') বলা হয়েছে।[১৬২] 'সেবকসদয়' হয়ে গণপতিদেব যেন তাঁর গণসহ ভক্তের অভীষ্ট সাধন করেন। গণেশের ইন্দুনিন্দিত একদন্তের উল্লেখ করে অভয়ামঙ্গলকার তাঁর কাছে নির্বিঘ্নে 'গৌরীর গীত' পরিবেশনের প্রার্থনা জানিয়েছেন। শেষ পঙ্ক্তি দুটিতে অর্থাৎ ভণিতায় মহামায়াকে চিন্তা করে দ্বিজ রামদেব গণরায়ের কাছে নায়কের কল্যাণকামনা করেছেন।

রামদেব প্রথম গণেশ বন্দনাটির পর চণ্ডীর উদ্দেশে আসোয়ারি রাগে একটি গান এবং পাঁচালি ছন্দে চণ্ডিকা বন্দনা রচনা করেছেন। এরপর কবি আরেকটি পৃথক গণেশ বন্দনা রচনা করেছেন।[১৬৩] বিষয়বস্তুর দিক থেকে দ্বিতীয় বন্দনাটিও প্রথম বন্দনার প্রায় অনুরূপ বলা চলে। গণেশের রূপবর্ণনা, তাঁর দিব্যশোভামণ্ডিত অঙ্গসৌষ্ঠব, বাহু, বাহন এবং দেবতা হিসেবে তাঁর 'গুরুত্ব' স্মরণপূর্বক ভক্তকবির প্রার্থনা বন্দনাগানের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রথম পঙ্ক্তিতে 'লম্বোদর' গণেশের রক্তবর্ণ ('সিন্দুরে সোন্দর') দেহরূপের উল্লেখ করে কবি তাঁকে ঘটে অধিষ্ঠানের প্রার্থনা জানিয়েছেন। গণেশ যেন মধুবৃষ্টি সিঞ্চন করে নায়কের সাফল্য বিধান করেন। এরপর গণেশের রূপবর্ণনা করেছেন। তাঁর গণ্ডস্থল থেকে নির্গত মধুস্রাবের আকর্ষণে মধুলোভী ভ্রমর-ভ্রমরীরা উড়ে বেড়ায়। তিনি একদন্ত এবং যোগাসনে উপবেশনরত। তাঁর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। বলদৃপ্ত এই দেবতা ('অনন্ত যে বলবান') যোগক্রিয়ায় মনোনিবিষ্ট। তিনি চতুর্ভুজ, হেরম্ব, লম্বোদর এবং মূষিকবাহন। অসীম গুণনিধি গণেশের গুণগান করা কবির সাধ্যাতীত। তিনি কৃপাময়, বিঘ্নহর্তা গণেশের কাছে *অভয়ামঙ্গল* রচনার ('ভবানীর গুণ কিছু গাই') কালে বিঘ্নবিনাশের প্রার্থনা জানিয়েছেন। শেষে ভণিতায় রামদেব কবি একাগ্র চিত্তে গণেশের পাদপদ্ম ধ্যান করেছেন।

ঙ। কবি মুক্তারাম সেন রচিত *সারদামঙ্গল* বা *অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী*-র (আনুমানিক ১৬৬৯ শকাব্দ বা ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দ) বন্দনাংশ গণেশ বন্দনা দিয়েই আরম্ভ হয়েছে।[১৬৪] মুক্তারামের গণেশ বন্দনায় তেমন কোনও বৈচিত্র্য চোখে পড়ে না। বর্ণনা মোটের ওপর পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারী। বাহনসহ গণেশের উল্লেখ এবং তাঁর অঙ্গকান্তির বিবরণ এই বন্দনার মূল অবলম্বন। গণেশের দেহরূপের বর্ণনা ছাড়া তাঁর মাতাপিতৃপরিচয় অথবা অন্যান্য কর্মকৃতিত্বের দিকগুলি বন্দনায় অনুপস্থিত। 'একদন্ত' উল্লেখে *ব্রহ্মবৈবর্ত* পুরাণোক্ত গণেশ-পরশুরাম যুদ্ধ প্রসঙ্গের প্রভাব থাকতে পারে।[১৬৫] গণেশ যোগাসনে ('যোগাসন সদা এ') উপবিষ্ট। *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এর 'গণেশ খণ্ড'-এ বিষ্ণুকৃত গণেশ স্তবে গণেশ 'প্রবরং সর্বদেবানাং সিদ্ধানাং যোগীনাং গুরুম্'-রূপে উল্লিখিত হয়েছেন।[১৬৬] যোগাসনের সূত্রে এই অনুষঙ্গটি স্মরণযোগ্য। তিনি চতুর্বাহু এবং হস্তীমুখ। পরবর্তী বর্ণনা গণেশের দেহসৌষ্ঠব-

কেন্দ্রিক। তাঁর সিঁদুর-শোভিত দেহ হর্ষোৎফুল্ল (‘অতিশয় সর্ব্ব রঙ্গ’) এবং তিনি সুগন্ধযুক্ত পুষ্পমাল্য পরিহিত। তাঁর গণ্ডদেশ থেকে নির্গত মধুস্রাবের আকর্ষণে মধুলোভী ভ্রমর-ভ্রমরী উড়ছে। কবির একান্ত প্রার্থনা গণেশ যেন ঘটে অবস্থান করে নায়কের ‘বিঘ্ন’নাশ করেন। ভণিতায় কবি মুক্তারাম মূষিকবাহন গণপতির অগম অপার মহিমার কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশে প্রণতি জানিয়েছেন।

চ। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত (আনু. ১৭৬৬ খ্রিঃ) রামানন্দ যতির *চণ্ডীমঙ্গল*-এর সূচনায় বরাড়ী রাগে গণেশ বন্দনা পাওয়া যায়।[১৬৭] প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই সিদ্ধিদাতা চতুর্ভুজ গজানন ‘ব্রহ্মস্বরূপ’ (‘‘গজানন রূপ ধরি/ ব্রহ্মময় অবতরি/ চতুর্ভুজ বিঘ্নবিনাশন’’) হয়েই বর্ণিত। তাঁকে ষড়রিপুহন্তারক, চতুর্বেদসার, ‘জগতের এক গতি’ এবং ‘চিদানন্দরূপ বিশ্বপতি’ বলা হয়েছে। গণেশের বিরাটত্বের ঘোষণায় কবি তাঁর মধ্যেই উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সূর্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রমুখ সকল দেবতার প্রকাশ দেখেছেন। রামানন্দের ভাবনাতেও গজানন-গণেশ কেবল হর-গৌরীর পুত্র পরিচয়েই আটকে থাকেননি, গাণপত্যের পূর্ণশক্তি গণপতি এখানেও আভাসিত।

ছ। ভবানীপ্রসাদ রায় *দুর্গা-মঙ্গল* গীতের সূচনায় রামচন্দ্র এবং শিবের নাম স্মরণের পর গণেশের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়েছেন।[১৬৮] কবি গণেশকে পার্বতী-পুত্ররূপে সম্বোধন করে তাঁর উদ্দেশে করজোড়ে প্রণতি নিবেদন করেছেন।

জ। দ্বিজ কমললোচনের *চণ্ডিকা-বিজয়* বা কালীযুদ্ধ গীতকথার প্রথম অধ্যায়ের সূচনায় একটি গণেশ-বন্দনা পাওয়া গেছে।[১৬৯] এখানে কবি মূষিকবাহন গজাননকে ‘শিবজাতা’ বলে সম্বোধন করলেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা বন্দনার সর্বাংশে মুদ্রিত। গণপতি এখানে ‘সম্পদ-দাতা’, আদিপূজ্য, ‘সর্ব্ব-সিদ্ধি’ ও ‘রণজয়’-দাতা, পুরাণপুরুষ, বেদপ্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব এবং চক্রধারী ‘নারায়ণ’-রূপে বর্ণিত হয়েছেন। লম্বোদর, খর্বকায়, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানকারী মঙ্গলমূর্তি গণেশের দেহরূপের বর্ণনায় প্রচলিত প্রথামাফিক তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্রের অনুষঙ্গ কাজ করেছে।

ধর্মমঙ্গল

ক। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে (আনুমানিক ১৬৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দ) প্রাপ্ত রূপরামের *ধর্ম্মমঙ্গল* গীতের বন্দনা-পালার নান্দীমুখ হয়েছে প্রথমাধিপ গণেশের মাহাত্ম্যগীতি দিয়েই।[১৭০] রূপরামের গণেশ-বন্দনাও প্রাথমিকভাবে সংস্কৃত পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের ধ্যানমন্ত্রের ধারানুসারী। বন্দনা পালার শুরুতেই গণেশের উপস্থিতি দেবমণ্ডলে তাঁর প্রথম পূজ্য হিসাবে স্বীকৃতিলাভের পৌরাণিক প্রসঙ্গটিকে স্মরণ করায়। গণেশের পায়ে প্রণতি নিবেদনের পরেই তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ-গুণ কবির বর্ণনীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। একদন্ত ‘বদনকমল’, প্রভাত-সূর্যের গৌরব ম্লানকারী ‘অতি

মনোহর তনু', পদ্মশোভিত মুকুট, পট্টবস্ত্র পরিহিত শান্ত মূর্তি, 'নখর রুচির কান্তি'র উল্লেখে গণেশ যেন সাত্ত্বিক বিভায় ভাস্বর হয়ে উঠেছেন। পাশাপাশি দ্যুলোকে এবং ভূলোকে তাঁর মর্যাদাগত গুরুত্বের দিকটিও অপ্রকাশিত থাকে নি। যোগীশ্রেষ্ঠ থেকে 'দেবতাসমাজ' সকলেরই প্রথম পূজ্য গণেশ। 'তপ জপ পূজা যাগে' তাঁরই প্রথম অধিকার। তাঁকে স্মরণ করলে বিঘ্ন 'অপসারিত' হয়। এ থেকে মনে হয় রূপরাম বা তাঁর মঙ্গলগীতের গায়কদের স্মৃতিতে ততদিনে 'বিঘ্নঘটনকারী' থেকে 'বিঘ্নদূরকারী' হিসেবে গণেশের রূপান্তর ঘটেছে। 'স্মরণ করিলে বিঘ্ননাশ' উচ্চারণে তেমন ইঙ্গিত মিলছে। ব্যাস প্রমুখ মুনিশ্রেষ্ঠ নিরন্তর তাঁর সেবাকর্মে লিপ্ত থেকে বিবিধ শাস্ত্র প্রকাশ করেছেন। *মহাভারত*-এর অনুলিপিকার গণেশের intellectual ability-র 'কিংবদন্তী' এই উল্লেখের নেপথ্যে কাজ করেছে। গণেশ-বন্দনার ঐতিহ্যে মুকুন্দের পূর্বসূরিতা এক্ষেত্রে তাঁর পথপ্রদর্শক মনে হয়। এরপর বন্দনায় এসেছে গণেশ-কার্তিক দুই ভাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বৃত্তান্ত। সবিস্তারে নয়, কিছুটা সংক্ষেপে। রূপরাম সম্ভবত *শিবপুরাণ* ও *পদ্মপুরাণ*-এর 'সৃষ্টিখণ্ড'-এর উপাখ্যান থেকে প্রসঙ্গটির বীজ সংগ্রহ করেছেন।[১৭১] তবে খোলনলচে বদলেছেন অনেকটাই। *শিবপুরাণ*-এ বিশ্বপরিক্রমাকে কেন্দ্র করে এই প্রতিযোগিতা হয়েছিল হর-পার্বতীর সামনে। গণেশ-কার্তিকের মধ্যে যে আগে পরিক্রমা শেষ করবে, তাঁর বিবাহই প্রথমে সম্পন্ন হবে। *পদ্মপুরাণ*-এর 'সৃষ্টিখণ্ড'-এ অনুরূপ প্রতিযোগিতা হয়েছিল পার্বতীর তত্ত্বাবধানে সুধারসে নির্মিত এবং 'মহাবুদ্ধি' নামধেয় এক মোদক প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে। গণেশ-কার্তিকের মধ্যে সর্বতীর্থদর্শনের পুণ্যার্জন করে যে আগে ফিরবে, মোদক তাঁরই প্রাপ্য। আলোচ্য বন্দনায় অবশ্য বিবাহে অগ্রাধিকার বা মোদক প্রাপ্তি নয়, শিবের গলার পারিজাত মালার যোগ্যতম দাবিদার কে হবে সেই নিয়ে দ্বন্দ্বের সূচনা। প্রতিযোগিতার শর্তমাফিক যে 'সপ্ত সিন্ধু স্নান' সেরে আগে ফিরবে, তাঁকেই পুরস্কার হিসেবে ওই মালা প্রদান করা হবে। কার্তিক ময়ূরে চড়ে তৎক্ষণাৎ রওনা দিলেন। গণেশ পড়লেন 'আথান্তরে'। তাঁর বাহন ইঁদুর উড়তে পারে না। ফলে তাঁর পক্ষে অল্পসময়ে 'সপ্ত সিন্ধু স্নান' সেরে ফেরা কার্যত অসম্ভব। শেষে বুদ্ধি করে সেইখানে দাঁড়িয়েই স্তব করে মহেশ্বরকে তুষ্ট করলেন তিনি। বাঞ্ছিত ফললাভও ঘটল। এই পর্যন্ত বলেই থেমেছেন রূপরাম। বন্দনার সীমিত পরিসরে বিবরণ অতিদীর্ঘ হলে চলে না। কার্তিককে হারিয়ে এই জয়লাভ গণেশের বুদ্ধির উৎকর্ষের প্রমাণ। মূষিকবাহন গণেশ 'অশেষ গুণের নিধি'। একাগ্র চিত্তে তাঁকে ডাকলে যুদ্ধে জয় অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধিমত্তার পরে এ হয়তো গণেশের বলবীর্যের পরোক্ষ প্রমাণ। এরপর তাঁর অঙ্গসজ্জা ও রূপমগুনের প্রসঙ্গ এসেছে। রাঙা পায়ের মাঝে সোনার নূপুর, কিঙ্কিণী এবং বলয়ের (বালা) ভূষণে তিনি অলংকৃত। এই বর্ণনাও মুকুন্দের বন্দনার অনুরূপ। বন্দনা-গীতের শেষের দিকে আছে প্রার্থনা। তাতে

অভিনবত্ব তেমন নেই। প্রার্থনার ভাষ্য পূর্বজদের মতোই গতানুগতিক। এখানে গণেশের কৃপাবৎসল মূর্তির প্রকাশ ঘটেছে। রূপরাম নিজেকে গণেশের 'দাস'-রূপে সম্বোধন করে তাঁর 'সর্ব্ব বিঘ্ন'-নাশের মিনতি জানিয়েছেন। আগেই বলেছি, বন্দনাগীতের ভণিতায় কবির এই ধরনের উচ্চারণে সমষ্টির স্বর প্রচ্ছন্ন থাকে। এখানে তাঁর ভূমিকা সমবেত শ্রোতাসাধারণের প্রতিনিধির। কবি 'আদিদেব' গণেশকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশের ঊর্ধ্বে সর্বোচ্চ স্থানে বসিয়েছেন। নিজেকে 'ধর্মদাস'-রূপে চিহ্নিত করে গণেশের কাছে কৃপাভিক্ষা করে নায়কের কল্যাণ কামনা করেছেন। গণেশ নিজে কেবল মঙ্গলমূর্তি নন, তাঁর মাহাত্ম্যগীতি শুনলেও ভক্ত-শ্রোতার চিত্ত আনন্দে পুলকিত হয় এবং তাদের প্রার্থিত ফললাভ ঘটে।

এবার বন্দনার দু'একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে নজর দেওয়া যাক। এক, এ পর্যন্ত প্রায় সব বন্দনাংশেই গণেশের identity তৈরির ক্ষেত্রে তাঁর পিতা বা মাতার নামোল্লেখ আছে। পরবর্তী ঘনরামের গণেশ-বন্দনাতেও দেখব প্রথম পঙ্‌ক্তিতে সমান গুরুত্বের সঙ্গে শিব-গৌরীর উল্লেখ আছে। অথচ রূপরামের বন্দনায় একবারের জন্যও গণেশের পিতা-মাতারূপে শিব বা পার্বতীর প্রসঙ্গ আসে না। গণেশের 'বাল'-রূপের বা 'পুত্র'-রূপের পরিচয় এখানে অনুপস্থিত। পরিবর্তে তিনি পূর্ণশক্তিমান ঈশ্বর। সর্বত্রই মর্যাদাশীর্ষে আসীন। এমনকী ত্রিদেবের চেয়েও মহিমান্বিত। 'কে আছে তোমার পর' বলার মধ্যে গণেশের সর্বশক্তিমত্তার চিহ্ন প্রকটিত। মনে হয়, গণেশের 'child image' সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর বালকত্বের উদ্‌যাপন কবির অভীপ্সিত ছিল না। রূপ ও গুণের বৈচিত্র্য বর্ণনার পাশাপাশি মহিমময় গণপতির বুদ্ধিমত্তা ও শক্তিমত্তার রূপাঙ্কনের মধ্যে দিয়ে কবি 'Supreme God' হিসেবেই তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। দুই, কার্তিক-গণেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপাখ্যানটি পুরাণ চুম্বিত হলেও এতে কবির নিজকৃত সংযোজনের স্পর্শ লেগেছে। রূপরামের আগে আর কোনও মঙ্গলগীতের গণেশ-বন্দনায় এই প্রসঙ্গ অনুসৃত হয় নি। মনে হয়, গণেশের শ্রেষ্ঠত্বের বিজ্ঞাপন এর উদ্দেশ্য। কেবল শক্তিতে নয়, গণেশ যে বুদ্ধিতেও দড় তার সপ্রমাণ উল্লেখের জন্যই এই অংশের অবতারণা। তাছাড়া এর অন্যতর তাৎপর্যও আছে। ভাব ও প্রকরণে মঙ্গলগীতের বন্দনাগুলি স্তোত্রকবিতার পর্যায়ভুক্ত। সাধারণভাবে স্তোত্রকবিতায় পুরাণ-নিঃসৃত কাহিনি-চূর্ণ বর্ণনার রেওয়াজ নেই। কারণ, স্তোত্রকবিতার আপাত-গম্ভীর ভাবময় শব্দমালা উদ্দিষ্ট দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-উদ্দীপক। অর্থাৎ এতে সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত পন্থায় তাঁদের রূপ-গুণ ও কর্মকৃতিত্বের উপস্থাপনা করা হয়। বন্দনার সুললিত ধ্বনিতরঙ্গের বৈচিত্র্য বা নির্গলিত ভক্তিপ্রবাহের মাঝে পুরাণোক্ত উপাখ্যানের জুতসই বর্ণনার সুযোগ একটু কম। আলোচ্য বন্দনায় সেই কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাকেও কবি অক্লেশে অতিক্রম করেছেন। তৃতীয়

বন্ধনীর [ ] আশ্রয়ে গণেশ-কার্তিকের প্রতিযোগিতার বৃত্তান্ত বন্দনার মধ্যে কিছুটা সাঁটে জুড়ে দিয়েছেন। এখানেই রূপরামের স্বকীয়তা।

খ। রামদাস আদকের *শ্রীধর্ম্মপুরাণ* বা *অনাদি-মঙ্গল* ১৫৮৪ শক অর্থাৎ ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দের রচনা। সাধারণভাবে বাংলা মঙ্গলগীতের ধারায় গণেশ বন্দনা দিয়েই বন্দনাংশের নান্দীমুখ হয়ে থাকে। যে কয়েকটি জায়গায় এই ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়, তাদের মধ্যে অন্যতম রামদাস আদকের অনাদি-মঙ্গল-এর বন্দনাংশ। কারণ এক্ষেত্রে গণেশের বন্দনা দিয়ে মঙ্গলাচরণ শুরু হয়নি। কবি শ্রীঠাকুরানীবন্দনা অর্থাৎ দুর্গাবন্দনা দিয়েই বন্দনাংশের মুখপাত করেছেন। এরপর দ্বিতীয় বন্দনাটি রচিত হয়েছে গণেশের উদ্দেশে। সাধারণভাবে বাংলা মঙ্গলগীতের ধারায় গণেশ বন্দনা দিয়েই বন্দনাংশের নান্দীমুখ হয়ে থাকে। যে কয়েকটি জায়গায় এই ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়, তাদের মধ্যে অন্যতম রামদাস আদকের *অনাদি-মঙ্গল*-এর বন্দনাংশ।[১৭২] কারণ এক্ষেত্রে গণেশের বন্দনা দিয়ে মঙ্গলাচরণ শুরু হয়নি। কবি শ্রীঠাকুরানীবন্দনা অর্থাৎ দুর্গাবন্দনা দিয়েই বন্দনাংশের মুখপাত করেছেন। এরপর দ্বিতীয় বন্দনাটি রচিত হয়েছে গণেশের উদ্দেশে। এই বন্দনার ভাষ্য কার্যত পূর্ববর্তী কবিদের প্রকাশভঙ্গি বা তাঁদের বন্দনার গতানুগতিক ধরনকেই অনুসরণ করেছে। এ ছাড়া আলাদা কোনও অভিনবত্ব বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোনও ইঙ্গিত চোখে পড়ে না। মোটের ওপর বর্ণনা পুরাণ-প্রসিদ্ধি এবং তন্ত্রসারোক্ত অনুষঙ্গগুলির ভিত্তিতেই রচিত। প্রথম পঙ্ক্তিতে কবি মঙ্গলগীতের আসরে অবতীর্ণ নায়েকের সাষ্টাঙ্গ প্রণামের মাধ্যমে ('অবনী লুঠায়ে কায়') 'গণরায়'কে অভিষিক্ত করেছেন। নায়েক জানেন তিনি দেবতাদের শিরোমণি, অগ্রপূজ্য। তাঁর মহিমা সামান্য মর্ত্যমানবের সাধারণ জ্ঞানের অগোচর। নায়েক সেই গম্ভীর গুণনিধি গণেশের স্মরণ করেছেন মাত্র। এর পরবর্তী অংশেই আরম্ভ হয়েছে গণেশের অঙ্গসৌষ্ঠবের বর্ণনা। হস্তীমুখ ('কুঞ্জরবদন') গণেশের ডানদিকের ভাঙা দাঁতের ('দক্ষিণে ভগন দন্ত') উল্লেখে *ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ*-এর গণেশ খণ্ডোক্ত গণেশ-পরশুরাম যুদ্ধের বৃত্তান্তটি প্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়বে। শিব-প্রদত্ত কুঠারের আঘাতে পরশুরাম গণেশের দক্ষিণদন্তটি উৎপাটিত করেন। ফলস্বরূপ গণেশ ভূমণ্ডলে 'একদন্ত'-এর পরিচয় লাভ করেছেন। *ব্রহ্মবৈবর্ত্ত*-এর এই পুরাণ-প্রমাণটুকু বাদ দিলে গণেশের identification–এর অন্যান্য অনুষঙ্গ মুখ্যত এসেছে সংস্কৃত গণেশ ধ্যানমন্ত্র এবং তন্ত্রসার-উক্ত গণেশ ধ্যানমন্ত্রের অবিকৃত অনুসরণে। এই বন্দনায় গণেশ গৌরীসুত অর্থাৎ মায়ের একক ভূমিকায় জাত। গণেশ ধ্যানমন্ত্রেও তিনি 'শৈলসুতাসুতং'। তাঁর গলায় পারিজাত মালা। মধুলোভী ভ্রমরকুল সেই মালা নিয়ে খেলা করছে। তিনি চতুর্ভুজ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মে চার হাত শোভিত। তাঁর রাঙাপায়ে সোনার নূপুর বাজে। সেই নূপুরধ্বনি

তালমানে সুসংগত। গণেশের পায়ের নখগুলি যেন চন্দ্রকণার (‘নখমণি বিধুখণ্ড,/ আঁধারে আলোক চণ্ড’) মতোই অন্ধকার আকাশে আলো বিকীর্ণ করছে। এমন দিব্যপ্রভ অঙ্গকান্তি সর্বদাই ‘পাপদণ্ড-প্রবণ’। পরবর্তী অংশে কবি ভক্তের বিনম্র প্রণতি জানিয়ে নিজের অপারগতা স্বীকার করেছেন। কামচঞ্চল যে চিত্ত (‘মুগ্ধ মধুব্রত চিত্ত’) পাপরসে সর্বদা মত্ত হয়ে থাকে, তার পক্ষে গণপতি-তত্ত্ব বর্ণনা করা অসম্ভব। কবি বিলক্ষণ জানেন, ‘অনাদি’ ‘অনন্ত’ ‘দেবদেব’ গণেশ সংসারের সার। তাঁর চরণাশ্রিতজনের অশেষ অমঙ্গলও নিবারিত হয়। সকল শুভকর্মে তিনিই অগ্রদূত। তাঁর জয়ধ্বনি দিয়েই পূজার সূচনা। ‘কুমতি’, ‘কুজ্ঞান’ হরণ করে ‘দয়ানিধান’ ‘বিঘ্নহর্তা’ (‘দয়া রাখ বিঘ্ন হর’) গণেশ যেন মঙ্গলপালাগীতের আসরে কবিকে আনুকূল্য প্রদান করেন। এ প্রার্থনা কখনওই কবির একক যাচনা নয়। অরণ্যে অথবা যুদ্ধে সংকটাপন্ন যে জন গণেশের শরণাগত হন, অবশ্যম্ভাবীরূপে গণপতি তাঁর বিঘ্ননাশ করেন। শেষাংশে কবি নিস্তারহেতু (‘নিস্তারিতে আছহ ঠাকুর’) গণেশের চরণ আশ্রয় করেছেন। ভণিতায় রামদাস স্বয়ং তাঁর গান গেয়েই ভবসাগর (‘এ ঘোর পাথার’) পার হতে চেয়েছেন। এইভাবে গণেশের উদ্দেশে বন্দনাগান রচনার মাধ্যমে কবি প্রকারান্তরে যেন কৃষ্ণভক্তির(‘গোবিন্দ ভজনা মাগে’) প্রার্থনা করেছেন। শেষতম পঙ্‌ক্তিতে হরিনাম উচ্চারণের মাধ্যমে (‘হরি বল জন্ম নাহি আর’) জন্মচক্রের বন্ধন থেকে মুক্তির প্রত্যাশা অভিব্যক্ত হয়েছে।

গ। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে প্রাপ্ত (১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১ খ্রিস্টাব্দ) ঘনরাম চক্রবর্তীর *শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত* বা *ধর্মমঙ্গল* গীতের ‘স্থাপনা পালা’ অংশে দীর্ঘ গণেশ-বন্দনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[১৭৩] ঘনরামের গণেশ-বন্দনার নির্যাসটুকু গৃহীত হয়েছে *তন্ত্রশাস্ত্র* বর্ণিত গণেশ-ধ্যানমন্ত্র থেকে। তবে কবি তথা গায়েনদের হস্তক্ষেপে মূল সংস্কৃত মন্ত্রের ভাষ্য অনেকাংশেই বিস্তারিত এবং পল্লবিত হয়ে একধরনের মৌলিক উপস্থাপনা হয়ে উঠেছে। এই নিজস্বতার কয়েকটি মাত্রা খেয়াল করা যেতে পারে:

১. গণেশ-ধ্যানমন্ত্রে গণপতি ‘শৈলসুতাসুতং’ অর্থাৎ ‘পার্বতীপুত্র’ হিসেবে বর্ণিত হলেও কবিকৃত বন্দনাংশে তিনি ‘হৈমবতী হরের নন্দন’। অতএব তাঁর পরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে শিব ও পার্বতীর যৌথ ভূমিকার স্বীকৃতিটুকু কবি পূর্বাগত ঐতিহ্য থেকেই আত্মসাৎ করেছেন। এক্ষেত্রে মুকুন্দের গণেশ-বন্দনার নিদর্শন ঘনরামের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকতে পারে। দুই বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তিতে আলাদা আলাদাভাবে নয়, একই পঙ্‌ক্তিতে একসঙ্গে গণেশকে ‘হৈমবতী-হরের’ সন্তান বলায় গণেশ-জন্মের নেপথ্যে শিব-পার্বতীর যৌথ অংশগ্রহণের সমাজ-আকাঙ্ক্ষিত সমীকরণটি আরও সংহত হয়েছে।

২. কুড়ি পঙ্‌ক্তির বন্দনায় প্রথম দশ পঙ্‌ক্তি জুড়ে গণেশের পরিচয়, রূপ, গুণ এবং সামর্থ্যের শাস্ত্রানুসারী বর্ণনা। পরের দশ পঙ্‌ক্তির পুরোটাই রচিত হয়েছে ভক্ত-কবির ইচ্ছাপূরণের ভাষ্য হিসেবে। গণেশের 'রাতুল কমল' আঁকড়ে ধরে কবি 'পাপরূপী তমঃ'-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, ভক্তি-বিনম্র চিত্তে নিজের দীনতা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে গানের মাধ্যমে বিঘ্ন হরণ করে নায়েকের মনস্কাম পূরণের আর্জি জানিয়েছেন। এই আত্মনিবেদনের বয়ানে নিজের ইচ্ছাপূরণের অভিপ্রায় যতটা, ততটাই গণেশের ভক্তবৎসল image–এর প্রতিষ্ঠা। কারণ, আসরে উপস্থাপিত মঙ্গলগীতের বন্দনায় ভক্ত-কবির ব্যক্তিগত 'আকাঙ্ক্ষা' আসলে 'একক' (individual) কোনও উচ্চারণ নয়। এর গভীরে সমষ্টির (এখানে 'target audience' বা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী) আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

ঘ। অষ্টাদশ শতকের কবি মানিকরাম গাঙ্গুলির *ধর্মমঙ্গল* (রচনা আনুমানিক ১৭০৩ শকাব্দ বা ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ) গীতের বন্দনাংশে গণেশ বন্দনা সংখ্যায় দু'টি। তবে তার কোনও একটি দিয়েও বন্দনাভাগ আরম্ভ হয়নি। নিরঞ্জন বা ধর্মের বন্দনার পর কবি দ্বিতীয় বন্দনা হিসেবে গণেশ বন্দনাটি রচনা করেছেন।[১৭৪] মানিকরামের গণেশ বন্দনার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে গণেশ জগপতি এবং যোগসিদ্ধ পুরুষ। কবি 'দাস'-রূপে তাঁর কাছে দুরাত্মার কলুষ অপনোদনের প্রার্থনা জানিয়েছেন। এরপর দু'একটি পঙ্‌ক্তি জুড়ে গণেশের দেহরূপের অতিসংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। তিনি হস্তীমুখ, গ্রীবাযুক্ত ('গীর্বাণপ্রধান') এবং রক্তবর্ণ দেহধারী। মানিকরামের প্রথম বন্দনায় গণেশ 'মহেশজ মহামূর্তি' অর্থাৎ শিবাংশে জাত। এখানে পার্বতীর সঙ্গে তাঁর সংস্রবের কোনও চিহ্ন নেই। পিতার একক ভূমিকায় সৃষ্ট বলেই সম্ভবত তিনি কর্মকৃতিত্বের দিক থেকে শত্রুহন্তারক মূর্তিতে বন্দিত হয়েছেন। 'সৃষ্টিদাতা' গণেশ রজোগুণে শত্রুসংহার করে শত্রুশরীরের রক্তে নিজদেহ রঞ্জিত করেছেন। সেই রক্তিমাভ দেহ যেন সূর্যের প্রকাশরূপ। গণেশ মূষিকবাহন। পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলি বৈচিত্র্য-বিরল একমাত্রিক। ভক্তিনম্র কবি প্রথাসিদ্ধভাবেই গণপতির চরণ-বন্দনা করেছেন। তাঁকে 'কৃপাময়', কল্পতরু', 'ভকতবতসল' ও 'কল্যাণদায়ক' সম্বোধন করে 'দীনহীন' কবি গণেশের 'পদছায়া' প্রার্থনা করেছেন। 'বিঘ্নরাজ' থেকেই যে গণেশ 'বিঘ্নহর্তা'রূপে উদ্বর্তিত হয়েছেন, এই পরিচয়টি কবির অজানা নয়। কাজেই, কবির বয়ানে 'হর বিঘ্ন বিঘ্নরাজ পূর মনোরথ' উচ্চারণে 'বিঘ্নেশ্বর' গণেশের কাছে বিঘ্নহরণের মাধ্যমে মনস্কামনা পূরণের আর্জি নিবেদিত হয়েছে। ভণিতায় মানিকরাম ইহজীবনের অন্তে গণেশের চরণাশ্রয় লাভের আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন।

প্রথম গণেশ বন্দনাটির পর মানিকরাম যথাক্রমে দুর্গা, গৌরাঙ্গ এবং শিবের বন্দনা করেছেন। এরপর ষষ্ঠ বন্দনা হিসেবে কবি দ্বিতীয়বারের জন্য গণেশের বন্দনা করেছেন।[১৭৫] এই দ্বিতীয় বন্দনাটির বিশেষত্ব হলো, বন্দনার প্রারম্ভে *তৈত্তিরীয় আরণ্যক*-উক্ত গণেশ গায়ত্রীমন্ত্রের ব্যবহার। মঙ্গলগীতের গণেশবন্দনার ধারায় এই ধরনের আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য মানিকরামেই প্রথম লক্ষ করা গেল। বন্দনার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে চন্দ্রসম, অবনতদেহ ('বিধুকায় অবনত') গণেশকে কবি 'শৈলসুতা-সুত'রূপে সম্বোধন করেছেন। মানিকরামের প্রথম বন্দনায় গণেশ কেবলমাত্র শিবপুত্র হলেও দ্বিতীয় বন্দনায় তিনি গৌরীপুত্র 'বিনায়ক'। 'বিনায়ক' সম্বোধনে পিতার অংশগ্রহণ ছাড়াই গণেশের আবির্ভাবের বামনপুরাণোক্ত সূত্রটিকে অনুসরণ করা হয়েছে। এরপর কবি গণেশকে 'জ্যোতির্ময়', 'যোগীশ্রেষ্ঠ', 'জপ যজ্ঞ যোগের কারণ'-স্বরূপ, 'বিশ্ববীজ ব্রহ্মময়', বেদান্তখ্যাত ব্রহ্মতত্ত্ব এবং পুরুষ-প্রধানরূপে অভিহিত করে তাঁর ভূমিকার মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছেন। বন্দনার পরবর্তী অংশে কার্যত গণেশের অঙ্গসৌষ্ঠবের বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। আগের বন্দনায় সামান্য পরিসরে গণেশের দেহাকৃতির বৈশিষ্ট্যমাত্র চিহ্নিত করেছিলেন বলেই বোধহয় বর্তমান বন্দনায় কবি গণেশের অঙ্গবর্ণনের অংশটিকে সুবিস্তৃত করেছেন। গণেশ 'যোগপাটা', 'জপমালা' ধারী। তিনি জটাজুট। তাঁর 'জবাঙ্কুশ' ভূষণ। গণ্ডস্থল মধুক্ষরা। সেই মধুস্রাবের সৌরভে ভ্রমর-ভ্রমরী আকৃষ্ট হয়। সুহৃদয়ে সুশোভিত নাগোপবীত বা যজ্ঞোপবীত, যা দর্শন করে চাঁদও লজ্জিত হয়। তিনি 'পিলু পুণ্ডরীক ছাল' পরিহিত, ত্রিনয়নবিশিষ্ট এবং মূষিকবাহন। তিনি গণপতি, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, চন্দ্রধর, হস্তীমুখ এবং বিঘ্নকর্তা। দাঁতের আঘাতে শত্রুশরীর বিদীর্ণ করে তিনি সেই রক্তে নিজদেহ রঞ্জিত করেছেন। এই সিঁদুররাঙা রক্তিমাভ দেহের সামনে সূর্যের প্রভাও ম্লান হয়ে যায়। সে'কারণেই কবির সকৌতুক জিজ্ঞাসা 'তাহে কিবা শোভে শশধর' অর্থাৎ যাঁর অপূর্ব রূপের কাছে সূর্যের ঔজ্জ্বল্য-ই নিষ্প্রভ হয়ে যায়, চন্দ্র কীভাবে তাঁর শোভাবর্ধক হতে পারে? বোঝা যায়, গণেশের দিব্যপ্রভ অঙ্গকান্তিকে আরও খানিক বাড়তি গৌরব দেওয়ার জন্যই এই অংশবিশেষ পরিকল্পনা। গণেশের মাথার মুক্তামণ্ডিত মোহন মুকুট শোভিত। স্বয়ং মদনও এই মূর্তি দেখে বিকল হয়ে যান। দেবতা-দানব, নাগ, নর সকলেই গণেশের পাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করেন। যাঁর তত্ত্ব যোগীপুরুষেরও অগম্য, তাঁর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা কবির পক্ষে আসাধ্য। তিনি নিজেকে দীনহীন, অজ্ঞানরূপে অভিহিত করে গণেশের চরণ-শরণ প্রার্থনা করেছেন। মানিকরামের বন্দনার আরেকটি বিশেষত্ব হলো, তিনি কেবল রূপবান গণেশেরই চিত্রাঙ্কন করেননি, তাঁর বৌদ্ধিক উৎকর্ষ এবং বিদ্যোৎসাহিতাকেও সমভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। মহর্ষি ব্যাসদেব যে তাঁর কৃপাকণা পেয়েই মহাকাব্য-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন— এই উল্লেখেই তার প্রমাণ স্পষ্ট। অনুরূপে কবিও সিদ্ধিদাতা গণেশের কাছে

নির্বিঘ্নে অনাদিমঙ্গল রচনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। ভণিতায় মানিকরাম গণেশের শরণাগত হয়ে আসরে অবতীর্ণ নায়কের অভীষ্টসিদ্ধির আর্জি জানিয়েছেন।

শিবায়ন

ক। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের কবি রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের *শিবায়ন* বা *শিব-মঙ্গলগীত* (রচনাকাল আনুমানিক ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দের কয়েকবছর আগে বা পরে) আরম্ভ হয়েছে গণেশ বন্দনা দিয়ে।[১৭৬] মঙ্গলগীতের অন্যান্য কবিদের মতো রামকৃষ্ণের 'শ্রীগণেশবন্দনা'-র মধ্যেও গণেশের পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্র, *শারদাতিলক* অথবা *তন্ত্রসার*-উক্ত গণেশ ধ্যান এবং ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরাণ ও উপপুরাণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য পৌরাণিক অনুষঙ্গের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুসরণ লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া কবি পূর্ব-ঐতিহ্য থেকেও গণেশ-মাহাত্ম্যসূচক শাস্ত্রীয় অনুষঙ্গগুলি আহরণ করে থাকতে পারেন। গণেশের মহিমা বা গুরুত্ব বোঝাতে দু'একটি অভিনব পুরাণ-প্রসঙ্গের ব্যবহার ছাড়া আলোচ্য বন্দনাটির তেমন কোনও বিশেষত্ব নেই। বন্দনার প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম শব্দেই গণেশ 'শিবসুত'। কবি গণেশজন্মের ক্ষেত্রে শিবের একক ভূমিকাকে মাথায় রেখেই সম্ভবত তাঁকে শিবসুত বলেছেন। আবার, দ্বিতীয় শব্দেই গণেশ অভিহিত হয়েছেন 'বিনায়ক'রূপে। অর্থাৎ নায়ক ব্যতিরেকে তাঁর আবির্ভাব। এই অভিধায় অবশ্য গণেশের মাতৃপরিচয়টি প্রচ্ছন্নভাবে রয়ে গেছে। পুরাণ মতে, গণেশ সিদ্ধি-প্রদায়ক বা সিদ্ধিদাতা। তিনি অগ্রপূজ্য বলেই কবি 'বিঘ্নরাজ'রূপে তাঁকে প্রথম প্রণাম জানিয়েছেন। পরের পঙ্‌ক্তি থেকে শুরু হয়েছে গণেশের দেহরূপের বর্ণনা। গজমুখ, রক্তমুণ্ড, 'সচল লম্বিত শুণ্ড', তিলকশোভিত কপাল, একদন্ত, নীলগ্রীবাদেশ, বন্ধুজীব বা বাঁধুলি ফুলসদৃশ রক্তিমাভ ত্রিনেত্র, কুটিল জটিল তপস্যাব্রতী, মদগন্ধ শ্রুতিমূল, গলদেশ বেষ্টনকারী মধুলোভী ভ্রমর-ভ্রমরীর চাঞ্চল্য, সাপের উত্তরীয়, পারিজাত মালা, খর্বস্থূল দেহ, চার হাতে বাজুবন্ধ ও বালার ভূষণ, অক্ষমালা এবং কুশপাশধারী, ধূম্রবর্ণ পূর্ণতেজোময়, অগ্রপূজ্য, ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত, অদ্ভুত রূপবান, গভীর কূপসম নাভিস্থল, রক্তবর্ণ পদ্মের মতো রত্নমন্ডিত অলংকার এবং মূষিকপৃষ্ঠে পদ্মাসনে উপবেশন ইত্যাদির উল্লেখে গণেশের দিব্যদেহের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর কবি গণেশের গুরুত্ব প্রতিপাদনের জন্য একটি পৌরাণিক উপাখ্যানের আশ্রয় নিয়েছেন।[১৭৭] 'পূর্ব্ব এক মন্বন্তরে' সমগ্র পৃথিবী যখন জলপ্লাবিত হয়েছিলো, এমনকী ব্রহ্মা বিষ্ণু লক্ষ্মী সরস্বতী পর্যন্ত সেই মহাপ্লাবনে জলমগ্ন হয়েছিলেন, তখন আকাশস্থিত শিব, পার্বতী, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, নাগরাজ, ধর্মরাজ, বরুণ এবং নৈঋতের সমক্ষে গণেশ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সেই বিস্তৃত জলভাগ একা পান করে ('অখিল জলধি কৈলে পান') পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন। ফলস্বরূপ প্রজাপতি ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে পুনরায়

সৃষ্টিকার্যে ব্যাপৃত হলেন। গণেশের অসীম শক্তির পরিচয় পেয়ে দশদিকপালগণ ভক্তিপ্রণত চিত্তে তাঁর পূজা করলেন। সে'কারণেই তিনি 'গণপতি' নামে খ্যাত হলেন। তাঁর স্মরণমাত্রেই ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। ভণিতায় রামকৃষ্ণ কবি তাঁর সংকল্পের (*শিবমঙ্গল-গীত* রচনা) সাফল্যের জন্য স্তুতিপূর্বক গণেশের চরণ-শরণ প্রার্থনা করেছেন।

খ। অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে (আনুমানিক ১৭১১-১২ খ্রিষ্টাব্দ) প্রণীত রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিবায়ন* বা *শিবসঙ্কীর্তন* গীতের প্রারম্ভে গণেশ বন্দনার নিদর্শন লক্ষ করা যায়।[১৭৮] রামেশ্বরের গণেশ-বন্দনার বিশিষ্টতা এইখানে যে তিনি সংস্কৃত ধ্যানমন্ত্রের ভাবানুসারী কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নি। দেবমণ্ডলে গণেশের মাহাত্ম্যজ্ঞাপন কিংবা তাঁর অঙ্গ-সৌষ্ঠবের বর্ণনা রামেশ্বরের বন্দনায় একটি secondary concern বলেই মনে হয়। বাংলা মঙ্গলগীতে গণেশ বন্দনার ঐতিহ্যে গণেশের মর্যাদা নিরূপণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শারীরিক রূপ-সৌন্দর্যের পৌনঃপুনিক বিবরণকে ততখানি গুরুত্ব না দেওয়ার প্রবণতা এই বন্দনার একটি স্বাতন্ত্র্যের দিক। গণেশের অঙ্গশোভার বিবরণের চেয়ে তাঁর জন্মবৃত্তান্তের বহুমাত্রিক আখ্যান-চূর্ণ পঙ্‌ক্তিমালায় বিশদে বিবৃত হয়েছে। বোঝা যায়, গণেশের identity construction–এর ক্ষেত্রে রামেশ্বর পূর্বজদের প্রদর্শিত পথে না হেঁটে এক ব্যতিক্রমী ভাবনাসূত্র প্রস্তাব করেছেন। বন্দনাগীতে এই নতুনত্বের ঝোঁক নিঃসন্দেহে কবির মৌলিকতার সূচক। বিশ্লেষণ করা যাক।

এক. বন্দনাগানের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে শিবভক্ত কবি গণেশের নয়, শিবের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। 'মঙ্গল-সম্ভব গান / আরম্ভি শম্ভুর গুণ' এই উল্লেখে গণেশের প্রথম নামোচ্চারণের পরিবর্তে শিবই রামেশ্বরের গুণকীর্তনের আধার হয়েছেন। শিবের পরেই এসেছে 'হেরম্ব' ওরফে গণেশের প্রসঙ্গ। কবি তাঁর প্রতি 'দণ্ডবৎ' বা প্রণত হয়ে ভূমণ্ডলে তাঁর মর্যাদার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ বয়ান উপস্থিত করেছেন। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে কবির ভাষ্যে গণেশ 'সিদ্ধিদাতা'। তাঁকে স্মরণ করলেই যাবতীয় বিঘ্নের উপশম ঘটে এবং ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ হয়। রামেশ্বরের *শিবায়ন* যে সময়ের প্রতিনিধি (আনুমানিক ১৭১১-১২ সন), ততদিনে অবিভক্ত বঙ্গদেশে গণেশের 'সর্বসিদ্ধিপ্রদ' এবং 'বিঘ্নহর্তা' পরিচয়টি জনপরিসরে বেশ সমাদৃত হয়ে উঠেছে। কাজেই, রামেশ্বরের মঙ্গলগীতে কবি অথবা তাঁর গায়েনদের সংস্কৃত পুরাণ বা তন্ত্রশাস্ত্র পাঠের অভিজ্ঞতা-সূত্রে অথবা পরম্পরাগতভাবে গণেশের এই জাতীয় 'বিশেষণ' লাভ অস্বাভাবিক কিছু নয়।

দুই. গণেশের 'পরিচয়' নির্মাণের ক্ষেত্রে রামেশ্বর তিন ধরনের জন্মবৃত্তান্তের উল্লেখ করেছেন। প্রথম মাত্রাটি অংশত পুরাণগন্ধী, দ্বিতীয় মাত্রাটি কবিকল্পনা-প্রসূত এবং অনেকাংশেই তৎকালীন সমাজ-প্রেক্ষিতের উপর নির্ভরশীল এবং তৃতীয় মাত্রাটি সরাসরি সংস্কৃত পুরাণ থেকেই কাহিনি-বীজ সংগ্রহ করেছে।

প্রথম মাত্রায় 'বিধাতা পুরুষ তুমি / বিষ্ণু নাভি জন্মভূমি' উল্লেখে গণেশ জগৎপালক 'বিষ্ণু'র নাভিপদ্ম থেকে উৎপন্ন সৃষ্টিবিধাতা 'ব্রহ্মা'র সঙ্গে একীকৃত হয়েছেন। বৈদিক দেবতা 'প্রজাপতি' বা বিধাতা-পুরুষ 'ব্রহ্মা'র সঙ্গে গণেশের এই অভিন্নতা সংস্কৃত পুরাণ-অনুষঙ্গী নয়। এই সম্বন্ধের অন্য তাৎপর্য থাকতে পারে। ভারতীয় ত্রিদেব-তত্ত্বে বিধাতা-পুরুষ ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেন। বিশ্বসৃষ্টির বিধান তাঁর হাতেই তৈরি। সৃজন-ক্রিয়ার নিয়ামক শক্তি তিনিই। ফলে বিশ্ববিধান রচনার সূত্রে intellectual faculty বা বৌদ্ধিক দক্ষতার সঙ্গে তাঁর যোগ সুবিদিত। অনুরূপে, গণেশও দেবমণ্ডলে প্রথম পূজ্যের স্থানাধিকারী। সংস্কৃত পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের অনুমোদন সাপেক্ষে তিনিও আদিদেব, আরম্ভের দেবতা। তাঁকে স্মরণ না করলে যে কোনও উপাসনা বা পূজন-ক্রিয়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গাণপত্য সম্প্রদায়ের উপাসনা গ্রন্থ *গণেশপুরাণ* অনুসারে গণেশ সাক্ষাৎ 'ব্রহ্ম'-স্বরূপ অর্থাৎ সর্বোচ্চ ঈশ্বর। এমনকী পূর্বজ মুকুন্দের বন্দনাতেও তিনি ব্রহ্মের সমতুল্যতায় অভিষিক্ত। তাছাড়া কিংবদন্তী অনুসারে, জগপতি গণেশ ভারতকথার অনুলেখক। রচনাকর্ম অথবা লিখনক্রিয়ার সঙ্গে তাঁরও দূর-সম্বন্ধ নয়। যেহেতু 'সৃষ্টি' একটি আদিতম কার্য, তাই বিশ্বব্যাপারের সৃজন-ক্রিয়ায় অধিকারের প্রশ্নে সৃষ্টিকর্তা 'ব্রহ্মা' এবং 'আদিদেব' গণেশ দুজনকেই সমন্বিত করা যেতে পারে। এই সমন্বয় কল্পনা কবির মনগড়া নয়, যুক্তিসিদ্ধ। বাংলা গণেশ-বন্দনার ধারায় 'ব্রহ্মা' এবং 'গণেশ'-এর একাত্মকরণের নজির এই প্রথম। এরপর কবি গণেশের গাত্রবর্ণ প্রসঙ্গে বলেছেন 'রজোগুণে রুধির বরণ'। এই উল্লেখে ব্রহ্মার সঙ্গে গণেশের একত্ব আরও দৃঢ় হয়। ত্রিগুণতত্ত্বের ধারণা অনুযায়ী ব্রহ্মা রজোগুণের অধিকারী। ধ্যানমন্ত্রে তাঁর গাত্রবর্ণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ' অর্থাৎ তাঁর গায়ের রং লাল গৌরবর্ণ। একইভাবে, *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এর ব্যাখ্যা অনুসারে পার্বতীর রক্তিম পট্টবস্ত্র থেকে জন্মলাভ হেতু গণেশও রক্তিমাভ। কাজেই, বর্ণের সাযুজ্য রক্ষা করেও ব্রহ্মা এবং গণেশের অভিন্ন সংযোগ হতে পারে। দ্বিতীয় মাত্রায় 'ব্রহ্মা' কীভাবে 'সাবিত্রী'-র শাপে জন্মান্তরে হর-গৌরীর পুত্র 'গণেশ'-রূপে আবির্ভূত হবেন, সেই বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। আদিতে সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মা যখন কর্মসম্পাদনায় রত, তখন ব্রহ্মাণী বা সাবিত্রী 'নিয়মকালে' অর্থাৎ ঋতুমতী ছিলেন। শুভক্ষণ অতিবাহিত হলে সৃষ্টিকার্য যদি ব্যাহত হয়, সেই আশঙ্কায় দেবতারা যুক্তি করে 'হতত্রপা' গোয়ালিনীকে ব্রহ্মার বাঁ পাশে বসিয়ে দিলেন। সেই উদ্ভিন্নযৌবনা ('যুবতী উন্নতস্তনী') 'ব্রহ্মার কাছে

ঠেসে' কিছুটা অন্তরঙ্গ হয়েই ব্রহ্মার সাহচর্য উপভোগ করছিলেন। 'বেদমাতা' ওই গোয়ালিনীকে 'সতীন' ভেবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ('দেখিয়া দারুণ সতা/কোপে কাঁপে বেদমাতা') ব্রহ্মাকে পরনারীলিপ্সা বা অন্যাসক্তির মতো জঘন্য নীচকর্মের জন্য জন্মান্তরে 'নীচপূজ্য' হওয়ার অভিশাপ দিলেন। অভিশাপের শর্ত অনুসারে, তিনি আগামী জন্মে কৌলিন্য খুইয়ে বৃন্দাবনে নন্দের ঘরে 'গোপীনাথ' ('হরি হবে গোপীনাথ') বা 'কৃষ্ণ'রূপে গোয়ালার ভাত খাবেন এবং বৃন্দাবনে 'গোধন' রাখবেন। এর পরবর্তী জন্মে ব্রহ্মা শিব-পার্বতীর পুত্র 'গণেশ'রূপে জন্মগ্রহণ করে প্রথম পূজ্যের ('দেহান্তরে পুত্র ভাবে/প্রথম অর্চনা পাবে') সম্মান লাভ করবেন।

উপরোক্ত উপাখ্যানটিতে প্রথম কল্পে যিনি 'ব্রহ্মা', দ্বিতীয় কল্পে তিনি 'গোপীনাথ' বা কৃষ্ণ এবং তৃতীয় কল্পে তিনিই হর-গৌরীর পুত্র 'গণেশ' অর্থাৎ উদ্দিষ্ট আখ্যানে 'ব্রহ্মা'-'বিষ্ণু'-'গণেশ' এই তিন দেবতা স্বরূপত এক এবং অভিন্ন। অভিশাপের ঐক্যসূত্রে এঁরা অন্বিত। এখানে একটা খটকা লাগতে পারে এইকারণে যে, ভারতীয় ত্রিদেব ভাবনার বৃত্তে আছেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু এবং প্রলয়ের দেবতা মহেশ্বর বা শিব। অথচ এই উপাখ্যানে ব্রহ্মা তৃতীয় জন্মে শিব নন, গণেশরূপে আবির্ভূত হলেন। শিবকে বাদ দিয়ে গণেশ কেন? তলিয়ে ভাবলে দেখব, গণেশ হর-গৌরীর পুত্ররূপে শৈব পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত। ফলে, কেবল বৈষ্ণব cult বা শৈব cult–কে নয়, আরও একধাপ এগিয়ে *শিবায়ন*-এর কবি গাণপত্য cult–কেও ধর্মভাবনার মৈত্রীসঙ্গমে একাধারে যুক্ত করেছেন। এই একত্রীকরণের (amalgamation) আকাঙ্ক্ষা তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। তবে *পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ* কিংবা *শিবপুরাণ*-এর 'জ্ঞানসংহিতা', *স্কন্দপুরাণ*-এর 'ব্রহ্মখণ্ড', *কালিকাপুরাণ, মৎস্যপুরাণ* এবং *মহাভাগবত পুরাণ*-এ বিধৃত 'ব্রহ্মা'-সম্পর্কিত অনুরূপ কোনও আখ্যানের সঙ্গে এর অন্তর্লীন ভাবসূত্রকে মেলানো সম্ভব। কিন্তু সেটা আখ্যানের অন্তর্কাঠামোর (inner structure) একটা সূক্ষ্ম গভীর সম্বন্ধের দিক। এর বেশি নয়। উপরিতলে (superfacial structure) এটি কবিরই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বন্দনায় এই ধরনের আখ্যান যোজনার নেপথ্যে সামাজিক-মনের (social psyche) প্রেরণা কাজ করেছে। মনে হয়, কবি সমন্বয়কামী বলেই সমাজে বিবদমান পৃথক পৃথক উপাসক-সম্প্রদায়ের (যেমন শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি) পারস্পরিক বিদ্বেষ ঘুচিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই লক্ষ্যেই সম্ভবত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-গণেশের অভিন্নতা-প্রতিপাদক জন্মকাহিনি তৈরি হয়েছে। পঞ্চদশ শতকের কবি কৃত্তিবাসের *শ্রীরাম পাঁচালি*-তেও একই ধরনের সমন্বয়ী চেতনার স্ফুরণ লক্ষ করা যায়।

তৃতীয় মাত্রায় গৌরীর ‘শিল্পতা-সম্ভব’ পুত্র রূপে অর্থাৎ তাঁর গাত্রমল থেকে গণেশের জন্ম, শনির কুদৃষ্টিপাতে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদন এবং দেবতাদের সম্মিলিত চেষ্টায় হস্তীমুণ্ড ধারণ ও পুনর্জন্মের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এর কাহিনি-বীজ সংগৃহীত হয়েছে *শিবপুরাণ*-এর ‘রুদ্রসংহিতা’ এবং *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এর ‘গণেশখণ্ড’ থেকে।

তিন. বন্দনার শেষাংশে কবি গণেশের মাহাত্ম্য বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করেছেন। দেবমণ্ডলে গণেশ সর্বাগ্রগণ্য। ধর্মানুষ্ঠানে বা পূজা-অর্চনায় তাঁর অপরিহার্যতার কথা উঠে এসেছে কবির বয়ানে। সর্বাগ্রে পূজা দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করলে অপূর্ণকামের মনস্কামনাও পূর্ণ হয়। ‘মঙ্গলমূর্তি’ গণেশের নাম স্মরণ করলে ভক্তের ভবভয় দূর হয় এবং তিনি ভুবনবিজয়ী হন। বলা বাহুল্য, এই বিবরণ মঙ্গলগীতের বন্দনার প্রথামাফিক হয়েছে। ভণিতায় কবি তাঁর আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক রাজা ‘নরনাথ’ যশোমন্ত সিংহের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। সঙ্গে যশোমন্তের পিতা রাজা রামসিংহ এবং পুত্র অজিত সিংহের নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

অন্নদামঙ্গল

অষ্টাদশ শতকে রচিত (১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ) ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এর প্রথম খণ্ড ‘অন্নদামঙ্গল’ গণেশ বন্দনা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে।[১৭৯] গণেশ বন্দনাটি নানা কারণেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অন্যান্য বন্দনা গানের মতোই এক্ষেত্রেও পুরাণ এবং তন্ত্রের অনুষঙ্গ একাধারে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে পূর্ব ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করেও ভারতচন্দ্রের বন্দনার ভাষ্য কয়েকটি জায়গায় স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথমত, বন্দনার প্রথম পঙ্ক্তিতে গণেশ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়েছেন। ‘আদি ব্রহ্ম নিরূপম’ এবং ‘পরম পুরুষ পরাৎপর’ উল্লেখে গণেশকে ব্রহ্মের একতম এবং পূর্ণতম রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি আদিভূত, জগৎ-কারণ এবং সর্বোচ্চ শক্তি। বাংলা গণেশ বন্দনার ধারায় গণেশকে এ’ভাবে ব্রহ্মবাচক এবং আদিকারণরূপে অভিষেক পূর্ববর্তী মুকুন্দের বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। অবশ্য মূলে এই উল্লেখ *গণেশ পুরাণ* এবং *তন্ত্রসার*-এর অনুবর্তী। দ্বিতীয়ত, গণেশের দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনায় ‘খর্ব্বস্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর’ হিসেবে উল্লেখে সংস্কৃত গণেশ ধ্যানমন্ত্রের প্রত্যক্ষ অনুসরণ স্পষ্ট। পরের পঙ্ক্তিতেই কবি পরমসুন্দর গণেশকে ‘মহাযোগী’ বলেছেন। এক্ষেত্রে তান্ত্রিকী যোগসাধনার অনুষঙ্গ কাজ করেছে। তবে অন্যান্য কবিদের বন্দনাগানে গণেশের দেহরূপের বর্ণনা যতটা বিস্তৃত পরিসরে হয়েছে, ভারতচন্দ্রে তা একটি-দু’টি পঙ্ক্তিতেই সীমাবদ্ধ। ফিজিক্যাল ডেসক্রিপসনের থেকেও দেবতা হিসেবে অগ্রপূজ্য গণেশের গুরুত্বের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। শাস্ত্রনির্দেশ অনুযায়ী ‘পূজা হোম যোগ যাগে’ সর্বপ্রথম গণেশের অর্চনা করা বিধেয়। তাঁর নাম প্রথমোচ্চারণ করলে সব কাজে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য। তৃতীয়ত, ‘গণপতি’-ধারণার বিবর্তনের পথরেখাটি

ভারতচন্দ্রের বন্দনার একটি-দু'টি পঙ্‌ক্তিতে অত্যন্ত স্পষ্ট। গণেশ যে আদিতে 'বিঘ্নরাজ'-ই ছিলেন, এমনকী উপদ্রব সৃষ্টির প্রয়োজনেই যে *যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ভবিষ্য পুরাণ* প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁর আবির্ভাবের পরিকল্পনা, সে সম্বন্ধে হয়তো কবির সম্যক পরিচয় ছিল। আবার 'বিঘ্নরাজ'-এর ধারণা তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারীও বটে। ধীরে ধীরে বিঘ্নঘটনপটু দেবতা সময়ের বিবর্তনে বিঘ্ননাশকারীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। কবির সানুনয় নিবেদন 'বিঘ্ননাশ কর বিঘ্নরাজ' বা 'বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর' উচ্চারণের মধ্যে বিঘ্নকর্তা থেকে বিঘ্নহর্তায় উত্তরণের ইঙ্গিতটি স্পষ্ট। চতুর্থত, ভারতচন্দ্রের গণেশ বন্দনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, গণেশের গুরুত্ব প্রতিপাদনের জন্য কবি একাধারে সামান্যীকরণ এবং অসামান্যীকরণের আশ্রয় নিয়েছেন। জন্ম-পরিচয়ে তাঁকে শিব এবং পার্বতীর পুত্ররূপে অভিহিত করার মধ্যে একভাবে তাঁর পরিচয়ের সামান্যীকরণ ঘটেছে। শিবের পুত্র হয়ে, পার্বতীকে মা ডেকে গণেশ নিশ্চিন্ত মনে খেলা করছেন। কবির বয়ানে এই উল্লেখটি একধরনের পারিবারিক প্রেক্ষাপটে গণেশের identity–কে কিছুটা হলেও সীমায়িত করে দেয়। যদিও ভারতচন্দ্র গণেশকে কেবল জনক-জননীর আবেষ্টনীতে অথবা গৃহগতকোণেই আটকে রাখেননি। একই সঙ্গে তিনি যে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের অধীশ্বর, বিশ্বের জনক এবং সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের মূল কারণস্বরূপ, সে সম্বন্ধেও কবি পূর্ণ অবগত। আর এইখানেই গণেশের অসামান্যতার প্রতিফলন। পরিবার-সীমা অতিক্রম করে তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ একেশ্বররূপে চিহ্নিত হয়েছেন। একধরনের macrocosmic নির্মাণ গণেশের দেবত্বের উদ্‌ভাসন নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্রের গণেশ বন্দনার একটা অভিনব দিক। মঙ্গলগীতের গণেশ বন্দনার ধারায় গণেশকে পারিবারিক পরিচয়ের বাইরে অগ্রপূজ্য অথবা সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করার নিদর্শন এর আগে হয়তো মুকুন্দ বা অন্যান্য কবিদের বন্দনাতেও কমবেশি পাওয়া গেছে। কিন্তু, এইভাবে মহাজাগতিক প্রেক্ষাপটে ত্রিলোকব্যাপী এক পূর্ণ বিস্ফারিত শক্তির আধাররূপে গণেশের ভূমিকার মূল্যায়ন ভারতচন্দ্রের বন্দনাতেই সর্বপ্রথম লক্ষ করা যায়। এই অপ্রতিম বিরাটত্বের স্বীকৃতি ভারতচন্দ্রের গণেশ বন্দনাকে অন্য কবিদের চেয়ে স্বতন্ত্র করে দেয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শক্তি, ত্রিভুবন, দিন-রাত্রি, এমনকী সমগ্র সংসার তিনি পুনরায় সৃষ্টি করেন। ভারতচন্দ্রের কৌতূহলী জিজ্ঞাসা বেদে স্বয়ং যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব বলে ব্যাখ্যাত, তিনি আবার কোন্ ব্রহ্মের স্বরূপ জপ করেন? যদিও কবি জানেন এর উত্তর একমাত্র গণেশরই জ্ঞাতব্য। স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যাঁকে জানতে পারেন না, তাঁকে জানা তাঁর মতো সাধারণ জনের পক্ষে দূরধিগম্য ব্যাপার। বলা বাহুল্য, গণপতি পারম্যবাদের এ এক উত্তুঙ্গ স্তর। প্রধানত *গণেশ পুরাণ* এবং *মুদ্গপুরাণ*-এর অনুসরণে পরিকল্পিত এই বন্দনাগীতে বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত কাল্টের ওপর গণপতির

বিজয় ঘোষণা গণেশের শ্রেষ্ঠত্বের এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ।[১৮০] মঙ্গলগীতের গণেশ বন্দনার পরম্পরায় ভারতচন্দ্রের আগে বা পরে এমন দৃষ্টান্ত রচনা আর কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। পঞ্চমত, বন্দনার শেষাংশ কিছুটা গতানুগতিক ধরনের। গণেশের নাম উচ্চারণ করলেই অমঙ্গল বিদূরিত হয়। তাঁর ভক্ত ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি চতুর্বর্গ ফললাভে সমর্থ হয়। কবি স্বয়ং অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচনার জন্য তাঁর কৃপাধন্য এবং প্রসাদপুষ্ট হতে চেয়েছেন। গণপতি স্বয়ং যেন আসরে অবতীর্ণ হয়ে নায়কের আশা পূরণ করেন বন্দনা গান রচনার মাধ্যমে কবি এই নিবেদনটুকু গণেশের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ভণিতায় ভারতচন্দ্র তাঁর পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের নামোল্লেখ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

অপ্রধান মঙ্গলগীতের ধারায় গণপতি

কালিকামঙ্গল

ক। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি কৃষ্ণরাম দাসের *কালিকামঙ্গল* (আনুমানিক ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দ) গীতের সূচনায় একটি গণেশ বন্দনা পাওয়া যায়।[১৮১] বন্দনার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে কবি গণেশের পিতৃপরিচয়ের উল্লেখ করেছেন। একমাত্র 'শিবপুত্র'-রূপে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পুরাণ-প্রমাণ হিসেবে *বরাহপুরাণ* এবং *লিঙ্গপুরাণ*-উক্ত জন্মকথার অনুষঙ্গ কাজ করতে পারে। এরপর কবি প্রথামাফিক গণেশের দেহ-সৌষ্ঠবের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি স্থূলদেহী, খর্বকায় এবং দেবগণশ্রেষ্ঠ গণেশের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়েছেন। করজোড়ে স্তুতি নিবেদনের মধ্য দিয়ে কবির প্রার্থনা সেই 'পতিতপাবন' বরদাতা গণেশ যেন মঙ্গলঘটে উপবেশন করেন। তাঁর মত্তগজতুল্য হস্তীমুখে ঘন ঘন শুণ্ড দোদুল্যমান। গণ্ডস্থল নির্গত মদস্রাবের সৌরভে ভ্রমরেরা আকুল। আলোচ্য বন্দনায় গণেশ শিবপুত্র বলেই তাঁর শক্তিমত্তার উচ্চকিত পরিচয় বিশেষ অর্থে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। অসীম গুণের অধিকারী গণেশ তাঁর বিষম দন্তাঘাতে শত্রুপক্ষকে নির্মূল করেন। তাঁর চারটি হাত অপরূপ সুন্দর। তিনি বরাভয় প্রদানকারী। এছাড়া হস্তে পাশ ও অঙ্কুশ শোভিত। যে কোনও শুভ কাজের প্রারম্ভে তাঁর নাম স্মরণ করলে অমঙ্গল দূরীভূত হয়। তাঁর পরিধানে বাঘছাল। এর ওপর কোমরবন্ধনীরূপে কিঙ্কিণীজালের বেষ্টনী। গলায় রত্নহার এবং যজ্ঞোপবীত ভূষিত। তাঁর রক্তবর্ণ দেহ। মাথায় প্রকাণ্ড জটা। মুকুটে চন্দ্র শোভমান। মূষিকবাহন গণেশ নিরন্তর যোগক্রিয়ায় রত। এই ধরনের মূর্তি কল্পনায় জটাজুট যোগেশ্বর মহাদেবের অনুষঙ্গ অতিস্পষ্ট। বন্দনায় 'শিবপুত্র' হিসেবে গণেশের রূপাঙ্কণ হওয়ায় এই সম্বন্ধ স্থাপন আরও বেশি যৌক্তিক হয়ে উঠেছে। ভণিতায় কবি কৃষ্ণরাম প্রার্থনা জানিয়েছেন

'অনাদিপুরুষ' গণেশ যেন মঙ্গলগীতের আসরে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর ত্রিনেত্রের শুভদৃষ্টিপাতে নায়কের মঙ্গল বিধান করেন।

খ। কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তীর *কালিকামঙ্গল* (রচনাকাল অনির্ণীত, রামপ্রসাদ এবং ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী বলে অনুমেয়।) গীতের বন্দনাংশ গণেশবন্দনা দিয়েই আরম্ভ হয়েছে।[১৮২] বন্দনার প্রথম পংক্তিতে কবি গণেশকে 'লম্বোদর'-রূপে বিশেষিত করে তাঁকে আদিদেব, পুরুষশ্রেষ্ঠ এবং 'জগত-কারণ' অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টার সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। এরপর জগপতি গণেশের পায়ে প্রণতি নিবেদন করে বলরাম 'গজেন্দ্রবদন' অর্থাৎ হস্তীমুখ দেবতার কৃপা যাচনা করেছেন। আলোচ্য বন্দনায় গণেশ পার্বতীপুত্ররূপে বন্দিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে পুরাণ-প্রমাণ হিসেবে *শিবপুরাণ*-এর 'রুদ্রসংহিতা', *স্কন্দপুরাণ*-এর 'ব্রহ্মখণ্ড', 'প্রভাসখণ্ড'-এর অন্তর্গত 'অর্ব্বুদখণ্ড', *মৎস্যপুরাণ*, *বামনপুরাণ* এবং *পদ্মপুরাণ*-এর 'সৃষ্টিখণ্ড' ('গৌরীবিবাহ বর্ণন')-এর গণেশ জন্ম-প্রসঙ্গের অনুসরণ হয়ে থাকতে পারে। এ ছাড়া কবি পূর্ববর্তী *চণ্ডীমঙ্গল* গীতধারার মানিক দত্ত, দ্বিজমাধব, দ্বিজরামদেব প্রমুখের পথ অনুসরণ করতে পারেন। যে বা যারা গণেশের পাদপদ্ম একাগ্র চিত্তে স্মরণ করেন, তিনি কৃপাবৎসল হয়ে তাদের প্রতি প্রসন্ন হন। এরপর কবি প্রথাগত ধরনে গণেশের মহিমা-কীর্তন করেছেন। তাঁর চরণে প্রণত হয়েই ব্যাসদেব প্রমুখ কবি পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এমনকী তাঁর কৃপাতেই চতুর্বেদ-ও সৃজিত হয়েছিল। নিগমাদি শাস্ত্রেও তিনি বিশিষ্ট। তাঁকে 'সকল বিদ্যার গুরু'-রূপে সম্বোধন করা হয়েছে। এই ধরনের উল্লেখের মধ্য দিয়ে বিদ্যাক্ষেত্রে তথা জ্ঞানমার্গে গণেশের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর হস্তে কুশ, পাশ এবং জপমালা শোভিত। পরবর্তী অংশে কবি গণেশ ধ্যানমন্ত্রের অনুসরণে গণেশের দেহরূপের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি প্রভাতকালীন সূর্যের মতো রক্তবর্ণ, খর্বকায়, স্থূলদেহী, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত এবং অপূর্ব রূপবান। তাঁর কুঙ্কুম প্রসাধিত অঙ্গ ও সিঁদুররাঙা গণ্ডস্থল। গণ্ডদেশ এবং ললাট-নির্গত মদজলের আকর্ষণে ভ্রমরেরা মাতোয়ারা হয়ে ঘুরে ফেরে। তিনি জটাজুটধারী। এই উল্লেখে *তন্ত্রসার*-এর অনুসরণ আছে। তন্ত্রসারোক্ত গণেশের একপঞ্চাশৎ নামের মধ্যে একজনের নাম 'জটী'। এছাড়া বাঘের ছাল পরিহিত, পাশাঙ্কুশ-জপমালাধারী, জটাজুট গণেশ প্রকৃতই তান্ত্রিক গণপতি। *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ* অনুসারে, গণেশের পুনর্জন্মলাভের পর শিব তাঁকে উপহারস্বরূপ ব্যাঘ্রচর্ম প্রদান করেছিলেন।[১৮৩] বন্দনাংশে পিতৃপরিচয় অনুল্লিখিত হলেও এই গণেশের রূপনির্মিতিতে শৈব কাল্ট-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। বিশেষত, ধ্যানী শিবের চিত্রকল্পটি এক্ষেত্রে গণেশের ভাবমূর্তিতে আভাসিত। প্রসঙ্গত, মুকুন্দ চক্রবর্তীর *অভয়ামঙ্গল*-এর গণেশবন্দনা স্মরণে আসতে পারে। শুধু তফাত একটাই, মুকুন্দ গণেশকে 'শিবসূত' বলে সরাসরি

সম্বোধন করেছেন। কিন্তু, বলরাম তা করেননি। সম্ভবত *কালিকামঙ্গল*-এর কবির কাছে 'পার্বতী'-পুত্র গণেশের পরিচয়টাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। যদিও দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনায় শিবের সঙ্গে তাঁর সংস্রবের চিহ্ন অপ্রকাশিত থাকেনি। তাঁর গভীর নাভিমূল, বাহুযুগল লম্বমান এবং গলায় পদ্মের মালা ও যজ্ঞোপবীত শোভা পায়। পায়ে নূপুর ধ্বনিত হয়। তাঁর লীলা সাধারণের জ্ঞানের অগোচরে। কবি গণেশকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিপতিরূপে বিশেষিত করেছেন। তাঁর শরণাগতজনের শত্রুহানির ভয় থাকে না। বন্দনার শেষাংশে গণেশকে 'দেবরাজ' সম্বোধন করে তাঁকে মঙ্গলগীতের আসরে অধিষ্ঠানের প্রার্থনা জানানো হয়েছে। গণেশ যেন সকল ভক্তের মৃত্যুদোষ মোচন করেন। ভণিতায় বলরাম গণেশের পায়ে ভক্তিবিনম্র চিত্তে প্রণতি অর্পণ করে তাঁর কৃপাভিক্ষা করেছেন।

গ। প্রাণরাম কবিবল্লভের *কালিকামঙ্গল*-এর গণেশবন্দনা অনুযায়ী, একদন্ত লম্বোদর গজানন 'হিমগিরি-সুতাসুত' অর্থাৎ পার্বতীপুত্ররূপে বিঘ্নবিনাশের জন্য অবতার ধারণ ('অবতার ঘটে গজানন') করেছেন।[১৮৪] বন্দনায় তাঁকে 'বিনায়ক', 'গণনাথ', 'গণরায়' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। আদিদেব চতুর্ভুজ গণেশ ভক্তের অশেষ দুর্গতিনাশ করে চতুবর্গফল অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রদান করেন। কবি গণেশের পরমতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে 'বিশ্বের পরম স্বামী', 'প্রধান পুরুষ', 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিদান' এবং 'ব্রহ্ম সনাতন' বলেছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্যন্ত ধ্যানে তাঁকে জানতে পারে না। গণেশের অঙ্গসৌষ্ঠবের বর্ণনায় গতানুগতিকভাবে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধ্যানের অনুষঙ্গ এলেও বিশেষভাবে গণেশ এখানে শিবসদৃশ। ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত ইঁদুরবাহন গণপতি শিবের মতোই সর্পবেষ্টিত জটাজুটধারী, অর্ধচন্দ্রধর এবং ত্রিনয়নযুক্ত।

গৌরীমঙ্গল

পাকুড়রাজ পৃথ্বীচন্দ্র রচিত *গৌরীমঙ্গল*-এ বন্দনাভাগের নান্দীমুখ হয়েছে গণেশকে দিয়েই।[১৮৫] গণপতি এখানে 'শিবসুত' ও 'পার্বতীনন্দন'-রূপে চিহ্নিত হলেও তাঁর বিরাটত্ব অপ্রকাশিত থাকেনি। খর্বকায়, একদন্ত গজানন গণেশ অনন্ত শক্তির অধীশ্বর। মহাপ্রলয়ের পর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন জলমগ্ন, সেই জল শুঁড়ের সাহায্যে পান করে যখন তিনি উদ্‌গার করেন, রবি-শশী-গ্রহ-তারা সহ বিশ্বসংসার যেন পুনঃসৃষ্ট হয়। পাঠস্মৃতি হিসেবে মনে পড়বে, একাদশ শতকের কোষকাব্য *সুভাষিতরত্নকোষ*-এর রাজশেখর রচিত শ্লোকের একাংশ। শুঁড়ের সাহায্যে হাতির জলধারণ এবং জল নির্গমনের ভঙ্গি অনুশীলনকারী গণেশের বর্ণনায় সেখানেও বলা হয়েছিল, তিনি পদ্মবৎ উর্ধ্বগামী শুণ্ড দিয়ে বাতাস অভ্যন্তরে ধারণ ও উদ্‌গীরণের ফলে তারামণ্ডল যেন একবার সংকুচিত, আবার উদ্‌ভাসিত হচ্ছে। কবি তাঁকে আগম, পুরাণ এবং বেদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মরূপে ('গণপতি সকল কারণ') অভিহিত

করেছেন। বিঘ্নবিনাশক গণেশ যুদ্ধসাফল্যের-ও ('রণজয়ী স্মরে যেই জন') দেবতা। তাঁর 'আনন্দমঙ্গল' নাম স্মরণমাত্রেই মনস্কামনা পূরণ এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়।

জগন্নাথ-মঙ্গল

বিশ্বম্ভর দাসের *জগন্নাথ-মঙ্গল* গীতের 'সূত্রখণ্ড'-এর সূচনায় গুরুবন্দনার পরে কবি গণেশ এবং অন্যান্য দেবতার বন্দনা করেছেন।[১৮৬] বন্দনার প্রথম পংক্তিতেই কবি গণেশের দেহরূপের ('লম্বোদর') বর্ণনার পাশাপাশি দেবমণ্ডলে তাঁর সর্বোচ্চ আসনটির ('গণেশ্বর') উল্লেখ করেছেন। দেবলোকের সকল 'গণ'-দের মধ্যে গণেশ-ই যে অগ্রমুখ্য 'গণেশ্বর' সম্বোধনে তার প্রমাণ স্পষ্ট। এরপর তাঁকে বিঘ্ননাশক সম্বোধনের মধ্য দিয়ে কবি বিঘ্নহর্তা গণেশের অমঙ্গল অথবা বিপদ বিদূরণের ক্ষমতাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। গণেশের মহিমাকীর্তন করতে গিয়ে কবি স্বভাবতই তাঁকে বেদাদি শাস্ত্রের উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। যার অসীম মহিমা এমনকি বেদ-ও ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ, কবির মতো একজন সামান্য মানুষের পক্ষে তাঁর গুণকীর্তন করা বাস্তবিক অসম্ভব। বন্দনার শেষাংশটি গণেশের দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনায় পূর্ণ। গণেশ রক্তবর্ণ, হস্তীমুখ এবং একদন্ত। তিনি চতুর্ভুজ এবং মূষিকবাহন।

কৃষ্ণমঙ্গল

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় রচিত পরশুরামের *কৃষ্ণমঙ্গল* গীতের বন্দনা অংশের প্রারম্ভে শ্রীশ্রী কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশে শ্লোক উচ্চারণের পর কবি গণেশের বন্দনা করেছেন।[১৮৭] বন্দনার প্রথম অংশে গণেশের দেহরূপের বর্ণনাই কবির উদ্দিষ্ট। এক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত গণেশ ধ্যানমন্ত্রের অনুসরণ করেছেন। তাঁকে 'স্থূলতনু', 'খর্বদেহ', 'হস্তীমুখ' এবং 'লম্বোদর' বিশেষণে চিহ্নিত করা হয়েছে। গণেশের চন্দন-চর্চিত দেহ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, মাথায় জটাজুট। তাঁর ললাট-নির্গত মদস্রাবের আকর্ষণে ভ্রমরেরা মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। বন্দনায় প্রথমে গণেশ শৈলসুতা অর্থাৎ পার্বতীর আত্মজ। শেষাংশে অবশ্য 'শিবসুত'রূপেও গণেশকে বিশেষিত করা হয়েছে। পার্বতীপুত্র গণেশ যেন ভক্তের উপর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণে বিরত না হন। বর্ণনায় গণেশের শৌর্যবীর্যের দিকটিও প্রকাশিত। তিনি শত্রু এবং বিঘ্ন-বিনাশকারী। কবির প্রার্থনা তিনি যেন ভক্তের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করে তাদের মনোবাসনা পূরণ করেন। ইন্দ্র, হরি প্রমুখ দেবতাদের পূর্বেও গণেশের আরাধনা বিধিসম্মত। ত্রিভুবনে গণেশ-ই আদিপূজ্য দেবতা। পরবর্তী অংশের বর্ণনায় গণেশের যোগীস্বরূপ উদভাসিত হয়েছে। কবিকল্পনায় মহাযোগী গণেশ মধুকাসনে উপবিষ্ট হয়ে যোগধ্যানে কৃষ্ণকথা শ্রবণে রত। পরশুরামের *কৃষ্ণমঙ্গল*

গীতের মুখ্য আলোচ্য দেবতা কৃষ্ণ হওয়ায় সম্ভবত তাঁর গণেশ-বন্দনায় যোগীশ্রেষ্ঠ গণেশের সাধন-ক্রিয়ার রূপকল্পেও কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তাঁর গলায় যজ্ঞোপবীত, মাথায় শোভিত জটা। তিনি নিবিষ্টচিত্তে কৃষ্ণনাম জপ করে চলেছেন। কবি গণেশের পায়ে প্রথম পূজা নিবেদন করে বিষ্ণুভক্তি প্রার্থনা করেছেন। শিবপুত্র গণেশ 'ভক্তের প্রধান'। তিনিই আপামর ভক্তের পরমাশ্রয়। ভক্তিমার্গে পূজকের ভক্তির দৈন্য ঘুচিয়ে তিনি যেন ভক্তকবি পরশুরামের অভীষ্ট পূরণ করেন। ভণিতায় বিপ্র পরশুরাম ভক্তি, পথ, নাম, গান গণেশের পায়ে সমর্পণ করেছেন।

তীর্থমঙ্গল

বিজয়রাম সেনের *তীর্থমঙ্গল* গীতের (আনুমানিক ১১৭৭ সন ভাদ্র মাসে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয়) দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে কবি গণেশ বন্দনা করেছেন।[১৮৮] কবি বিজয়রাম *তীর্থমঙ্গল* গীতের 'সূচনা' অংশের প্রথম পঙ্ক্তিতে নারায়ণের বন্দনা করেছেন। এরপর দ্বিতীয় স্থানে কবি গণেশের বন্দনা করেছেন। সংক্ষিপ্ত এই দুই পঙ্ক্তিতে গণেশের পিতৃ-মাতৃপরিচয় উল্লিখিত হয়েছে।

গোসানী-মঙ্গল

রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী রচিত গোসানীমঙ্গল (১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত) গীতের মঙ্গলাচরণের সূচনায় গুরু নিরঞ্জন এবং পিতা-মাতাকে প্রণাম জানানোর পর কবি গণেশের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়েছেন : 'নম দেব গণপতি'।[১৮৯]

গঙ্গা-মঙ্গল

দ্বিজমাধবের *গঙ্গামঙ্গল* গীত রচনার নির্দিষ্ট কালপর্ব অনির্ণীত। মুন্সী আবদুল করিমের অনুমান এটি ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে *চণ্ডীকাব্য* বা *জাগরণ*-গীত রচনার পরবর্তী সময়ে রচিত। *গঙ্গা-মঙ্গল*-এর সূচনায় একটি গণেশ বন্দনা পাওয়া যায়।[১৯০] বন্দনার প্রথম পঙ্ক্তিতে কবি গণেশের মাতৃপরিচয়ের উল্লেখ করেছেন। তাঁকে 'গৌরীর নন্দন' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। গণেশকে 'বিঘ্নবিনাশন'রূপে বিশেষিত করে কবি তাঁকে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু বলেছেন। তৃতীয় পঙ্ক্তি থেকে কবি গণেশ ধ্যানমন্ত্রের অনুসরণে গণেশের দেহ-সৌষ্ঠবের বর্ণনা করেছেন। তিনি খর্বকায়, স্থূলতনু, লম্বোদর এবং মনোহর হস্তীমুখ। তাঁর সিঁদুররাঙা গণ্ডস্থল এবং চার হাত অঙ্গদ-কঙ্কণে ভূষিত। গণ্ডদেশ নির্গত মদস্রাবের কারণে জলবিন্দু লক্ষ করা যায়। সেনাপতিরূপে তিনি রণাঙ্গনে দাঁতের আঘাতে শত্রু মর্দন করেন। এই উল্লেখে গণেশের শক্তিমত্তার পরিচয় প্রকাশিত। তিনি সমস্ত দেবতাদের অধিপতি ও মূষিক-বাহন।

যে কোনও মঙ্গলকার্যে তিনিই প্রথম পূজ্য। ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারাও তাঁর পদসেবা করে ধন্য হন। তাঁর আরাধনা ব্যতীত অন্য কোনও দেবতার পূজা সম্পূর্ণ হয় না। ভণিতায় কবি দ্বিজ মাধব ভক্তি-নম্র চিত্তে এবং কায়মনোবাক্যে গণেশের বন্দনাগীতি রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন।

গণেশ-বন্দনাগুলির তুলনামূলক সম্পর্ক :

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষত মঙ্গলগীতের ধারায় গণেশ বন্দনা একটি বৈশিষ্ট্যসূচক আঙ্গিক। অধিকাংশ মঙ্গলগীতের প্রারম্ভেই এই বন্দনার প্রথানুগ রেওয়াজ। আগেই দেখেছি, এর মূল কারণ নিশ্চিতভাবেই শাস্ত্রানুগত্য। পৌরাণিক স্মার্ত এবং তান্ত্রিকী ধারণার যুগপৎ আশ্রয়ে বন্দনার ভাষ্য তৈরি হয়েছে। গণপতির ভাব-শাস্ত্র-তত্ত্বকে পূর্ণরূপে আত্মস্থ করেই মধ্যযুগের মঙ্গলগীতিকারেরা তাঁর বন্দনা রচনা করেছেন। পৌরাণিক সিদ্ধিদাতা ও বিঘ্নবিনাশকের ভূমিকাতেই তিনি পঞ্চদশ শতক থেকে স্মার্তহিন্দুর পঞ্চোপাসনায় আদিদেবের আসনলাভ করেছেন। তাঁর রূপাঙ্কনের ক্ষেত্রে একধরনের দ্বিধা বা dilemma কবিমানসে প্রায়শই কাজ করেছে। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি, হর-গৌরীর পুত্র হিসেবে গণেশের বালরূপ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি গাণপত্য কুলদেবতার বিরাটত্ব সম্পর্কেও কবিরা অবগত ছিলেন। ফলে মঙ্গলগীতের বন্দনায় গণেশের এই দু'ধরনের মূর্তির অপূর্ব মিলন দেখেছি আমরা।

গণেশ বন্দনার ঐতিহ্যে গণেশের গাত্রবর্ণ তথা দেহরূপের শাস্ত্রবিহিত বর্ণনা বন্দনাগুলির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। গণেশের নামমাত্র উল্লেখ আছে এ'রকম দু'একটি প্রসঙ্গ ছাড়া এমন একটিও বন্দনা চিহ্নিত করা যাবে না যেখানে সংক্ষেপে হলেও গণেশের অত্যুজ্জ্বল অঙ্গকান্তি এবং দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনা করা হয়নি। গণেশের পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্র, তন্ত্রসার বা শারদাতিলকোক্ত ধ্যান এবং পুরাণ-বর্ণিত অঙ্গমাহাত্ম্যসূচক অনুষঙ্গগুলি কবি বা গায়েনদের এই দেহবর্ণনা অংশের বিশেষ অবলম্বন হয়ে উঠেছে। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে গণেশের প্রসঙ্গমাত্র বাদ দিলে মনসামঙ্গল গীতধারায় বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের গণেশ বন্দনাতেই সম্ভবত গণেশের দেহাকৃতি-বৈশিষ্ট্যের প্রথম সুসংবদ্ধ রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। 'প্রধান' মঙ্গলগীতগুলির গণেশ বন্দনায় গণেশের দেহরূপের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তাদের বেশিরভাগটাই কবিভেদে পৃথক নয়। কোনও কোনও বন্দনায় দু'একটি বিশেষ উল্লেখ ছাড়া অঙ্গকান্তির বিবরণ অংশটি সামগ্রিকভাবে নির্বিশেষতা লাভ করেছে। প্রায় সব বন্দনাতেই তাঁর দেহভাগ স্থূল এবং খর্বাকার, লম্বিত উদর, হস্তীমুখ, প্রসন্নবদন, তিলকশোভিত কপাল, বন্দনাবিশেষে ত্রিনয়নযুক্ত (বিপ্রদাসের বন্দনা দ্রষ্টব্য), গজমুণ্ড অথবা ললাট-নির্গত মদস্রাবের সৌরভে মধুলোভী ভ্রমর-ভ্রমরীর চাঞ্চল্য এবং মুখমণ্ডল পানে

আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। তাঁর ভগ্নদন্ত অথবা একদন্ত, কখনও দাড়িম্ব বা ডালিমশোভিত শুণ্ড (মুকুন্দের বন্দনা), রক্তরঞ্জিত দন্ত, রক্তবর্ণ বা সিঁদুররাঙা দেহ, পারিজাত মালা পরিহিত, যজ্ঞোপবীত বা সর্পোপবীতধারী, আজানুলম্বিত জটা, মস্তক মুকুটশোভিত এবং চন্দ্রকলাযুক্ত, সুগন্ধি এবং অলংকার-প্রসাধিত অঙ্গ, যথা: গ্রীবায় গজমুক্তার হার, কুঙ্কুমচর্চিত দেহ, কণ্ঠে রত্নমালা, বাজুবন্ধ ও বালা বাহুভূষণ, দুটি পায়ে স্বর্ণনূপুর (বিশেষ ক্ষেত্রে হীরা বা রত্নখচিত) এবং কনক-কিঙ্কিণীযুক্ত কটিতট। রাঙা চরণযুগল, সুচারু বা বিধুসম পদাঙ্গুল। বেশবাস ব্র্যাঘ্রচর্ম। বিশেষ ক্ষেত্রে মহাযোগীবেশে সজ্জিত। বাহুসংখ্যা এবং অস্ত্রসজ্জায় বর্ণনাভেদে স্বল্প তফাত আছে। সাধারণভাবে চতুর্বাহু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। সেক্ষেত্রে বিষ্ণুর আর্কেটাইপে গণেশমূর্তির পরিকল্পনা। এটি বঙ্গীয় গণেশ কাল্ট-এর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও বটে। এ ছাড়া বর্ণনাভেদে তিনি শূল-দণ্ড-ইক্ষু-পাশ ধারী (মুকুন্দের বন্দনা)। এই ধারণা তন্ত্রাগত। প্রমাণ *শারদাতিলক*। প্রসঙ্গান্তরে তিনি দ্বিভুজ। অক্ষমালা এবং কখনও জপকর্মকালে দুইবাহু পুষ্পশোভিত। কয়েকটি বন্দনায় বাহন অনুল্লিখিত। এ ছাড়া সর্বত্রই তিনি মূষিকবাহন। এই বর্ণনাগুলি থেকে পরোক্ষে গণেশমূর্তি নির্মাণের শাস্ত্রবিহিত নির্দেশও পাওয়া যেতে পারে।

গণেশের মাতাপিতৃপরিচয়ের উল্লেখ অধিকাংশ বন্দনাতেই লভ্য। দু'-একটি বন্দনায় পিতা-মাতার সরাসরি পরিচয় অনুপস্থিত। সেক্ষেত্রে গণেশ স্বয়ম্ভু, একেশ্বর, ব্রহ্মবাচক আইডিয়া। সংগত কারণেই তাঁর পারিবারিক পরিচয় অবান্তর হয়ে গিয়েছে। উদাহরণ রূপরামের গণেশ বন্দনা। যদিও রূপরামের বন্দনায় গণেশের মাতাপিতৃপরিচয়ের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও কার্তিক-গণেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সূত্রে পরোক্ষে শিবের পিতৃপরিচয়টুকু আভাসিত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের বন্দনায় অবশ্য মাতাপিতৃপরিচয়ের উল্লেখ সত্ত্বেও গণেশের ব্রহ্মস্বরূপত্ব অব্যাহত থেকেছে। দু'একটি ব্যতিক্রমী বন্দনায় গণেশ পিত্রাংশে জাত অর্থাৎ শিবাত্মজ। যেমন, মানিকরামের *ধর্মমঙ্গল* গীতের প্রথম বন্দনায় গণেশ 'মহেশজ'। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের *শিবায়ন*-এর বন্দনা অংশেও তিনি 'শিবসুত বিনায়ক'। পুরাণ-প্রমাণ হিসেবে *বরাহপুরাণ, দেবীপুরাণ* এবং *লিঙ্গপুরাণ*-উক্ত গণেশ জন্মকথার অনুষঙ্গ কাজ করতে পারে। অন্যত্র মায়ের একক ভূমিকায় জাত অর্থাৎ গৌরীপুত্র গণেশ। বিপ্রদাসের বন্দনায় 'শৈলসুতাসুত'। *চণ্ডীমঙ্গল* গীতধারায় মাণিক দত্তের বন্দনায় 'পার্বতী তনয়', দ্বিজ মাধবে 'শৈলসুতার সুত', দ্বিজ রামদেবে 'গৌরীর নন্দন'-রূপে গণেশের পরিচয়লাভ ঘটেছে। মুকুন্দের বন্দনার প্রথমাংশেও তিনি 'গিরিসুতা অঙ্গজনু'। আবার, মানিকরামের *ধর্মমঙ্গল* গীতের দ্বিতীয় বন্দনাটিতে গণেশ 'শৈলাসুতার সুত'। রামদাস আদকের *অনাদি-মঙ্গল*-এর বন্দনাতেও গণেশ 'গৌরীসুত'। রামেশ্বরের বন্দনায় গণেশ প্রথমে পার্বতীর 'শিল্পতা-সম্ভব' পুত্র অর্থাৎ গাত্রমল

থেকে উদ্ভূত। তাঁর একক ভূমিকায় সৃষ্ট। বলা বাহুল্য, এই পরিচয়টিই গণেশের আইডেনটিটি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ডিসকোর্স। এক্ষেত্রে সংস্কৃত গণেশ ধ্যানমন্ত্রের 'শৈলসুতাসুতং' অর্থাৎ পার্বতীপুত্রের ধারণা কাজ করেছে। এ ছাড়া পুরাণ-প্রমাণ হিসেবে যথাক্রমে *শিবপুরাণ*-এর 'রুদ্রসংহিতা', *স্কন্দপুরাণ*-এর 'ব্রহ্মখণ্ড', 'প্রভাসখণ্ড'এর অন্তর্গত 'অর্ব্বুদখণ্ড', *মৎস্যপুরাণ, বামনপুরাণ* এবং *পদ্মপুরাণ*-এর 'সৃষ্টিখণ্ড'-এর একটি ('গৌরীবিবাহ বর্ণন') অংশের গণেশ-জন্মপ্রসঙ্গের অনুসরণ থাকতে পারে। কতকগুলি ক্ষেত্রে গণেশের পিতা-মাতা হিসেবে শিব-পার্বতীর নামোল্লেখ (কখনও একত্রে, কখনও পৃথকভাবে উল্লিখিত) পাওয়া যাচ্ছে। মুকুন্দের বন্দনায় গণেশ প্রথমে 'গিরিসুতা অঙ্গজনু' হলেও পরে 'শিবসুত লম্বোদর'। পার্বতীর গাত্রমলজাত গণেশ ঘটনা-পরম্পরায় (হস্তীমুণ্ড ধারণপূর্বক পুনর্জীবনপ্রাপ্তির পর) শিবসুতরূপে গৃহীত হয়েছেন। রামেশ্বরের *শিবায়ন*-এর বন্দনাতেও তিনি প্রথমে গৌরীর 'শিল্পতা-সম্ভব' পুত্র। পরবর্তীকালে শনির দৃষ্টিপাতে মুণ্ডচ্ছেদের পর গজশিরযুক্ত হয়ে হর-গৌরীর পুত্রপরিচয়ে স্বীকৃত হয়েছেন। এই উল্লেখগুলির গভীরে গ্রহণ-বর্জন ক্রমে *শিবপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ* এবং *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এর গণেশজন্মের সূত্র থাকতে পারে। ঘনরামের *ধর্মমঙ্গল*-এর বন্দনায় সরাসরি 'হৈমবতী হরের নন্দন' গণেশ। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এর বন্দনাতেও 'শিবের তনয় হয়ে দুর্গারে জননী কয়ে' গণেশ অনুকূল মনে ক্রীড়ারত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিব-পার্বতীর ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণে গণেশজন্মের দৃষ্টান্ত সংস্কৃত পুরাণ-পরিসরে একটি অপ্রচলিত ডিসকোর্স হলেও *পদ্মপুরাণ*-এর 'সৃষ্টিখণ্ড'-এর 'গণপতি স্তোত্র কীর্ত্তন' অধ্যায়ে মহেশ্বরের ঔরসে পার্বতীর পুত্র প্রসবের উল্লেখ আছে। তবে একথা ঠিক যে, গণেশের পিতা-মাতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুরাণানুসরণ এবং তার ভিত্তিতে কবিবিশেষে পিতৃমাতৃপরিচয়ের উল্লেখে যতই ভিন্নতা থাক না কেন, বঙ্গীয় গণেশ বন্দনার ঐতিহ্যে প্রথম পরিচয়ে তিনি গৌরীপুত্ররূপেই সমাদৃত। পরে গজমুণ্ড ধারণ এবং পুনর্জন্মলাভের পাকেচক্রে গণেশ শৈব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

দেবতা হিসেবে গণেশের 'গুরুত্ব' নিরূপণ এই বন্দনাগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। মঙ্গলগীতের কবি বা গায়েনরা প্রায় সকলেই দেবমণ্ডলে আদিদেব গণেশের অপ্রতিহত প্রাধান্যকে চিহ্নিত করেছেন। এঁদের কেউ হয়তো (বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজমাধব, ঘনরাম চক্রবর্তী, মুক্তারাম সেন প্রমুখ) পরিবার-সীমায় আবদ্ধ রেখে তাঁর ক্যারিশমার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, আবার কোনও কোনও বর্ণনায় (মুকুন্দ চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী, মানিকরাম গাঙ্গুলি, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র প্রমুখ) তিনি পরিবার-বৃত্ত থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন এক অসীম অনন্ত মাত্রায়। এ'সব ক্ষেত্রে আদিব্রহ্মের প্রকাশরূপ জগপতি গণেশের শক্তির অসামান্যতা প্রকাশ পেয়েছে। এ ছাড়া পৌরাণিক

বৃত্তান্ত অথবা পুরাণ-চুম্বিত আখ্যানচূর্ণের ব্যবহার কোনও কোনও বন্দনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যদিও এর সংখ্যা বেশি নয়। রূপরামের *ধর্ম্মমঙ্গল*-এ কার্তিক-গণেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপাখ্যান সংযোজনের মধ্যে গণেশের বুদ্ধির উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে। কার্তিককে বুদ্ধিতে হারিয়ে শিবদত্ত 'পারিজাত মালা'-র অধিকারলাভের এই বৃত্তান্ত গণেশের শ্রেষ্ঠত্বের বিজ্ঞাপনও বটে। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এর বন্দনায় কবি গণেশের কর্মকৃতিত্বের নিদর্শন দিতে গিয়ে একবার শুণ্ড প্রসারিত করে সংসার-সমুদ্র পান করে 'খেলাচ্ছলে' বিশ্বকে গ্রাস করা, আবার পরক্ষণেই ফুৎকারে জল নিষ্কাশনের মধ্য দিয়ে পুনরায় বিশ্বসৃষ্টি করার দৃষ্টান্ত রেখেছেন। যদিও শাস্ত্রীয় গুরুত্ব বিচারে এ'টি আদপেই একটি তান্ত্রিকী রূপকল্প, তবু সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে এর মধ্যে হরণ-পূরণের দেবতার সর্বব্যাপী শক্তি ও মাহাত্ম্যের ঘোষণাটি স্পষ্ট বোঝা যাবে। তা ছাড়া এক অতীন্দ্রিয় মহাজাগতিক রূপকল্পে গণেশের উপস্থাপনা তাঁর বিশালতার এক অভিনব পরতকে চিনিয়ে দেয়। রামেশ্বরের *শিবায়ন*-এর বন্দনাটিও নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। একমাত্র ওই বন্দনাটিতেই গণেশ সরাসরি ত্রিদেব-ভাবনার অঙ্গীভূত হয়েছেন। শাপভ্রষ্ট ব্রহ্মার দ্বাপরে কৃষ্ণ এবং কলিতে হরগৌরীর পুত্ররূপে আবির্ভাব একদিকে যেমন গণেশকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিদেব-ধারণার সঙ্গে যুগগত পরম্পরায় একাত্ম করে দিয়েছে, তেমনই সৃষ্টিকর্তা বিধাতার সঙ্গে এই অভিন্নতার সমীকরণে গণেশের অন্তর্গত সৃষ্টিশীল সত্তা বা রচনাপটুত্বও প্রকারান্তরে সমর্থনপুষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া জন্মের পরে শনির দৃষ্টিপাতে সদ্যোজাত বালকের মুণ্ডচ্ছেদ, গজমুণ্ড ধারণ, পুনর্জন্মপ্রাপ্তি, গাণপত্যে অভিষেক এবং অগ্রপূজ্যতার স্বীকৃতি ইত্যাদি আখ্যানচূর্ণ ভূমণ্ডলে গণেশের 'গুরুত্ব'-কে মর্যাদাপূর্ণ ও বিশিষ্ট করে তুলেছে।

অপ্রধান মঙ্গলগীতের বেশ কয়েকটি ধারায় গণেশ বন্দনা সুলভ হলেও কোথাও কোথাও গণেশ বন্দনার পর্যায়টি অনুপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কৃষ্ণরামের *কালিকামঙ্গল*-এ গণেশ বন্দনা আছে। অথচ কৃষ্ণরামের-ই *রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, কমলামঙ্গল* ইত্যাদি মঙ্গলগীতে গণেশ বন্দনা পাওয়া যাবে না। দুঃখী শ্যামদাসের *গোবিন্দমঙ্গল* গীতেও গণেশের বন্দনা অনুপস্থিত। এ'সব ক্ষেত্রে মনে হয় কবিরা বাহুল্যবোধে গণেশ বন্দনার অংশটি বাদ দিয়েছেন। কোথাও কোথাও বিশেষ মঙ্গলগীতটির উদ্দিষ্ট দেবতা যিনি, তাঁর বন্দনা দিয়েই text-এর নান্দীমুখ হয়েছে। যেমন, পরশুরামের *কৃষ্ণমঙ্গল* গীতের সূচনায় কৃষ্ণচন্দ্র বা নারায়ণের উদ্দেশে শ্লোকোচ্চারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে *কৃষ্ণমঙ্গল* গীতের কেন্দ্রীয় উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ হওয়ায়, তাঁকে প্রণতি জানিয়ে গীতারম্ভ করাই কবির কাছে সঙ্গত মনে হয়েছে। এরপর তিনি গণেশের বন্দনা করেছেন। এমন উদাহরণ অন্যত্রও পাওয়া যাবে। বন্দনার মধ্যেও গণেশের রূপনির্মিতিতে কৃষ্ণকেন্দ্রিক প্রভাবের ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট। যোগাসনে উপবিষ্ট গণেশ

অবিরত কৃষ্ণনাম জপ করে চলেন। অথবা, বন্দনার শেষদিকে কবি গণেশ পূজনের মাধ্যমে ‘গোবিন্দ’ বা কৃষ্ণভক্তির প্রার্থনা জানিয়েছেন। *কৃষ্ণমঙ্গল*-এর কবি গণেশ বন্দনার মধ্যে মধ্যে কী আশ্চর্য কৌশলে গণেশ এবং কৃষ্ণের সমন্বয়ের সূত্র তৈরি করে ফেলেন! এর পেছনে বঙ্গদেশে সংকলিত *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর অনুষঙ্গ কাজ করেছে। *ব্রহ্মবৈবর্ত্ত*-এর ‘গণেশ খণ্ড’ অনুসারে গণেশ কৃষ্ণাবতার, তাঁর-ই দ্বিতীয় সত্তারূপে কল্পিত। এমনকী ওই পুরাণোক্ত বিষ্ণুকৃত ‘গণেশ স্তোত্র’-এ বলা হয়েছে, ভূমণ্ডলে যারা গণেশের পূজক তারা পরলোকপ্রাপ্তির পরে ‘বিষ্ণুপদ’ (‘অন্তে বিষ্ণুপদং লভেৎ’) লাভ করবেন। কাজেই, এই সংযোগের একটা শাস্ত্রভিত্তি রয়েছে। তাছাড়া, কৃষ্ণনাম জপকারী গণেশের রূপকল্পনার গভীরে পরোক্ষে কৃষ্ণকে গৌরবান্বিত-ও করা গেল। *কৃষ্ণমঙ্গল* রচয়িতার পক্ষে এটি প্রয়োজনানুগও বটে। এই ধরনের পক্ষপাতমূলক প্রাধান্যের চিহ্ন বন্দনাংশে বিরল নয়। তলিয়ে ভাবলে দেখা যায়, ‘গণেশ বন্দনা’র মাধ্যমে ক্যাব্যারম্ভ করাটা একটা শাস্ত্রবদ্ধ ধাঁচা ঠিকই। কিন্তু এই প্রবণতাটিও static বা আপেক্ষিক। ক্ষেত্রবিশেষে এর-ও হেরফের ঘটেছে। কোনও কোনও কবি কখনও দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানেও গণেশের নামোচ্চারণ করেছেন। প্রসঙ্গত, *তীর্থমঙ্গল, গোসানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল*-এর বন্দনাংশ স্মর্তব্য।

অনেকেই মঙ্গলগীতের বন্দনা অংশে অতি সংক্ষেপে একটি বা দু’টি পঙ্‌ক্তিতে গণেশের বন্দনা করেছেন। এই সংক্ষিপ্তকরণের প্রধান কারণ বাধ্যবাধকতা। ধর্মীয় ঐতিহ্যে আদিদেব গণেশের অগ্রমুখ্যতাই তাঁর অবস্থানকে কিছুটা সীমাবদ্ধ অথচ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। অনেকেই সাড়ম্বরে গণেশের বন্দনা করেননি। কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে এড়িয়ে গেছেন। ফলে একটি-দু’টি পঙ্‌ক্তিমাত্র রচিত হয়েছে। কখনও সেটাও হয়নি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর গুরুত্বকে একেবারে নাকচ করে দেওয়া কবিদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শাস্ত্রানুগত্যই এর কারণ বলে মনে হয়।

৩.৯

শাক্ত পদাবলীতে গণেশ প্রসঙ্গ

অষ্টাদশ শতকের বঙ্গদেশে রচিত শাক্ত সংগীত বা শক্তির মাহাত্ম্যসূচক গানগুলিতে গণেশের ‘ভূমিকা’ বা তাঁর উপস্থাপনার ‘গুরুত্ব’ এককথায় ‘গৌণ’ বলা চলে। কারণ, শাক্ত সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ দেবতা শ্রীশ্রীদুর্গা বা পার্বতীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই পদগুলির প্রধান আলোচ্য। স্বভাবতই গণেশের ‘স্বতন্ত্র’ রূপাঙ্কন এক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত। সাধারণভাবে গানের মধ্যে মধ্যে পার্বতী বা গৌরীর ‘জ্যেষ্ঠপুত্র’ হিসেবে ‘বাল-গণপতি’ বা ‘সন্তান’ রূপেই তাঁর

প্রতিবিম্বন ঘটেছে। যদিও এই উপস্থাপনা নিতান্ত উল্লেখমাত্র। সংখ্যার বিচারেও যৎকিঞ্চিৎ। অধিকাংশ পদকর্তাই ‘শক্তি’-র ভূমিকা সাপেক্ষে প্রসঙ্গক্রমে গণেশের সামান্য অবতারণা করেছেন। বস্তুত, শক্তি-মাহাত্ম্যই পদকর্তাদের প্রণিধানযোগ্য বিষয় হওয়ায় গণেশের ‘ভূমিকা’ অনেকখানিই ‘সেকেন্ডারি’ হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে তাঁর আইডেনটিটি শক্তি-কাল্ট-এর সঙ্গে বিশেষভাবে মারজ্‌ড বা অ-বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বিভিন্ন পদকর্তার রচনা সাপেক্ষে এই সংলিপ্ততার কতকগুলি প্রবণতা চিহ্নিত করা যেতে পারে।

ক। শক্তিতত্ত্বের প্রতিফলনই শাক্ত গীতিগুলির ভিত্তিমূল।[১৯১] পদের বহিরঙ্গ স্তরে পরাশক্তি মাতৃকাদেবী মানবায়িত হয়েছেন। গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকার ঘরে ‘কন্যা’রূপে তাঁর আবির্ভাব। ‘মা’ মেনকা এবং ‘কন্যা’ উমার সম্পর্কের উন্মোচন ‘আগমনী’ ও ‘বিজয়া’ পর্যায়ের শাক্ত সংগীতে পূর্ণরূপে আভাসিত।

লক্ষ করার বিষয় হল, বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের ঘেরাটোপে গড়ে ওঠা এই মানবীয় সম্পর্কের কল্পনা কেবলমাত্র মেনকা-উমার মধ্যেই আটকে থাকেনি, আরও একধাপ প্রসারিত হয়ে গৌরী-গণেশের সম্পর্ক-বিন্যাসেও গুরুত্ব পেয়েছে। পদকর্তারা যেখানেই দুর্গার মাতৃরূপের কল্পনা করেছেন, সেখানেই লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিককে পিছনে ফেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গৌরীপুত্র গণেশ অগ্রাধিকার পেয়েছেন। মাতৃকাদেবী স্বয়ং শাক্ত গীতিমালায় মুখ্যত পুত্র গণেশের পরিচয়েই চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁর ‘গণেশ-জননী’-রূপই সর্বত্র আদৃত। ক্ষেত্রবিশেষে কার্তিকের নাম দু’-একবার উচ্চারিত হলেও পরাশক্তির মাতৃমূর্তির কল্পনা প্রধানত গণেশকে অবলম্বন করেই হয়েছে। যদিও পদমধ্যে নিতান্ত নামোল্লেখেই গণেশের প্রসঙ্গ এসেছে। অধিকাংশ গীতরূপে প্রধানত পদকর্তার বয়ানে, মেনকার বাচনিকে এবং একবার মাত্র পার্বতীর স্বকণ্ঠে গণেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘আগমনী’ পর্যায়ে রামপ্রসাদ সেন রচিত ‘ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার’[১৯২] শীর্ষক গানে মাতৃকাদেবী ‘গণেশ-জননী’ রূপে সম্বোধিত হয়েছেন – ‘বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার’। যেখানে দেবী পার্বতী ‘মাতা’, সেখানেই তিনি অবশ্যম্ভাবীরূপেই ‘গণেশ-জননী।

‘আগমনী’ পর্যায়ে দাশরথি রায় রচিত ‘কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী’[১৯৩] শীর্ষক গানে মেনকার বাচনিকে পার্বতীর গিরিপুরে আগমনের অতীত স্মৃতিমন্থনের প্রেক্ষাপটে শিশু গণেশের প্রসঙ্গ এসেছে। গণেশকে কক্ষে বা কাঁখে নিয়ে পার্বতী গজেন্দ্রগমনে গিরি-গৃহাঙ্গনে উপনীত হন – ‘কক্ষে ল’য়ে গজানন গমন গজগামিনী’। গণেশ এখানে মাতৃসান্নিধ্যে লালিত ‘হস্তীমুখ’ শিশুমাত্র। মাতৃসংসর্গেই তাঁর অস্তিত্বের কল্পনা। শিশুর কাছে মা

যেমন নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, গৌরীসুত গণেশেরও ঠিক তেমনই। গণেশের এই রূপাঙ্কনের মধ্যে ‘child image’ বা সদ্যোজাত শিশুপুত্রের ধারণাটি স্পষ্ট।

দাশরথি রচিত ‘বিবিধ সঙ্গীত’ শীর্ষক গীতিগুচ্ছের ‘শ্রীশ্রীদুর্গা-বিষয়ক’[১৯৪] মাহাত্ম্য-গীতির তৃতীয় গানের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে মাতৃকাদেবী ‘হেরম্ব-জননি’ পরিচয়ে চিহ্নিত হয়েছেন। পার্বতী এখানে পুত্র গণেশের নিরিখে পরিচিত তো হয়েছেনই, উপরন্তু এই চিহ্নায়নের অন্য তাৎপর্যও আছে। উদ্দিষ্ট পঙ্‌ক্তিটি হল ‘হেরম্ব-জননি। হের মা দীনে’ অর্থাৎ পার্বতী ‘হেরম্ব-জননী’-রূপে দীনজনকে রক্ষা করুন— এই সানুনয় প্রার্থনা প্রথম পঙ্‌ক্তিতে আভসিত। তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায়, এই ‘দীনে’ শব্দটার সঙ্গে অর্থ-সংগতি রেখেই গণেশকে ‘হেরম্ব’ আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। ভারতীয় ধর্ম-পরম্পরায় ‘হেরম্ব’ ত্রিনেত্র, সিংহবাহন, দশবাহু এবং ক্ষেত্রবিশেষে পঞ্চমুখধারী ‘তান্ত্রিক গণপতি’-পদবাচ্য হলেও এই ইমেজের সঙ্গে দাশরথির বর্তমান বর্ণনার একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। কারণ, বঙ্গদেশের শাক্ত পদাবলী সূত্রে গণেশ ‘বাল’-রূপে অবতীর্ণ পার্বতী-পুত্র। তন্ত্রমার্গের ‘হেরম্ব’ গণপতির সঙ্গে একে মেলানো যাবে না।[১৯৫] অবশ্য পুরাণ-প্রমাণে গণেশের বিবিধ রূপের মধ্যে ‘হেরম্ব’ অন্যতম। *মুদ্গলপুরাণ, গণেশপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ*-এর উল্লেখ ছাড়াও বিশেষভাবে বঙ্গদেশে সংকলিত *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এর ‘মধ্যখণ্ড’-এর ‘গণেশ জন্ম বিবরণ’ অধ্যায়ে ঋষিমুখে উচ্চারিত গণেশের পঞ্চাশৎ নামের মধ্যে এবং *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এ স্বয়ং বিষ্ণু-মুখে উচ্চারিত ‘সামবেদোক্ত সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন নামাষ্টক পরমস্তোত্র’-এ ‘হেরম্ব’ গণপতির পরিচয় পাওয়া যায়।[১৯৬] মনে হয়, শেষোক্ত *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ* অনুসারে ‘হেরম্ব’ শব্দের ‘দীনজনপ্রতিপালক’ অর্থটাই বর্তমান রচনায় এই ‘হেরম্ব-জননি’ উল্লেখের মূলে কাজ করেছে।[১৯৭] আলোচ্য পঙ্‌ক্তিতে পার্বতী ‘দীনতারিণী’ বলেই ‘দীনপালক’ হেরম্বের তাঁর সন্তান রূপে উপস্থিতি অর্থের খাতিরেও মানানসই হয়েছে।

‘ভক্তের আকুতি’ পর্যায়ে পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘কর্ম্মদোষে জন্মভূমে এসে, বিষয়-বিষে অঙ্গ জরজর’[১৯৮] শীর্ষক গানে ব্রহ্মময়ী দেবীর বিবিধ রূপকল্পনার মধ্যে ‘গণেশ-জননী’ পরিচয়টি উল্লিখিত হয়েছে– ‘ও মা, গৌরীরূপা, গিরিপুত্রী, জগৎরূপা, জগদ্ধাত্রী,/ সাবিত্রী গায়ত্রী গীতা, গণেশ-জননী’। অর্থাৎ মাতৃরূপে দেবী ‘গণেশ-জননী’ অভিধাতেই সার্থকনামা।

খ। কয়েকটি শাক্ত গীতিতে অবশ্য গণেশ পার্বতীর অন্য তিন পুত্র-কন্যার সঙ্গে একত্রে উল্লিখিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে এদের রূপায়ণ শিশু হিসেবেই হয়েছে। তবে দেবীর মাতৃরূপের কল্পনা করতে গিয়ে পদকর্তারা

বেশিরভাগ সময়ই শিশুপুত্রদের নিরিখে তাঁর আইডেনটিটি নির্মাণ করেছেন। ফলত, মাতৃবেষ্টনীতে সুরক্ষিত গণেশের 'বাল'-রূপের পরিচয় এইসব ক্ষেত্রেও সমান লভ্য। যেমন,

'আগমনী' পর্যায়ে দাশরথি রায় রচিত 'গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল'[১৯৯] শীর্ষক গানে ভক্ত-কবি মেনকাকে পুত্রসহ পার্বতীর গিরিপুরে প্রবেশের দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। বর্ণনায় অবশ্য পার্বতীর কোলে একা গণেশ নেই, সঙ্গে কার্তিকও আছেন: 'ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, ''মা কৈ'' ''মা কৈ'' ব'লে'। এই পঙ্‌ক্তিতে শিশু-যুগলের প্রত্যক্ষ উল্লেখ না থাকলেও ওই যুগল সন্তান যে গণেশ এবং কার্তিক-ই, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

'আগমনী' পর্যায়ে জগন্নাথ বসু-মল্লিক রচিত 'হর, কর অনুমতি, যাই হিমালয়ে'[২০০] শীর্ষক গানে দেবী পার্বতী শিবের কাছে পুত্রাদি সহ পিত্রালয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। এই বর্ণনায় দেবীমুখে কার্তিক এবং গণেশ উভয়ের নামই উচ্চারিত হয়েছে। তবে কার্তিকের নামই প্রথমে উচ্চারিত: 'গুহ গণপতি ল'য়ে, সপ্তমী প্রবেশা হয়ে,/ আসিব কৈলাসে, হ'লে নবমী উদয়'। যদিও এর বিশেষ কোনও কারণ আছে বলে মনে হয় না। সম্ভবত অনুপ্রাস ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বর্ণসাম্য ও ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি করে এক্সপ্রেশনটিকে আকর্ষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

রাম বসু রচিত আগমনী পর্যায়ের 'গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী'[২০১] শীর্ষক গানে মেনকার জবানিতে সানুচর পার্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এ গানে কৈলাস থেকে উমাকে পিতৃগৃহে নিয়ে আসার জন্য মেনকা গিরিরাজকে অনুরোধ জানিয়েছেন। সপ্তম পঙ্‌ক্তিতে মেনকা বলেছেন: 'এনো কার্ত্তিক গণপতি, লক্ষ্মী সরস্বতী, ভগবতী/ এনো মস্তকে কোরে' অর্থাৎ গিরিরাজ যেন তাঁর কন্যাসহ নাতি-নাতনিদের মাথায় করে গিরিপুরে নিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে পার্বতীর পুত্র-কন্যাদের নামোল্লেখের তালিকায় গণেশের পরিবর্তে কার্তিকের নামই মেনকার মুখে প্রথম উচ্চারিত হয়েছে। গণেশ দ্বিতীয় স্থানে আছেন। তবে গণেশের পূর্বে কার্তিকের নামোচ্চারণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও কারণ নেই। সম্ভবত কার্তিককে প্রথমে রেখে পরে একে একে ই/ঈ কারান্ত শব্দগুলি ('গণপতি, লক্ষ্মী সরস্বতী, ভগবতী') বসিয়ে ছন্দের সমতা বা মিল রক্ষার চেষ্টা হয়েছে।

আগমনী পর্যায়ে 'উঠ মা সর্ব্বমঙ্গলে প্রভাতা হ'ল যামিনী'[২০২] শীর্ষক গানটিতে এক অজ্ঞাতনামা কবি দুর্গার চার ছেলে-ময়ের নামোল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই গণেশের নামোচ্চারণ করেছেন। 'লম্বোদর' রূপে গণেশ এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। তাঁর 'লম্বোদর' নাম-বিশেষণটি এক্ষেত্রে ধর্মীয় শাস্ত্রানুসরণে ব্যবহৃত হয়েছে ঠিকই, পাশাপাশি আলোচ্য

গীতাংশের বিষয়বস্তুর সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে : ‘‘লম্বোদর-ষড়াননে, লক্ষ্মী-সরস্বতী-সনে,/ একসঙ্গে পঞ্চজনে ভোজন কর মা ত্রিনয়নি।’’ ভক্ত-কবির ব্যবস্থাপনায় সদ্যোত্থিত দেবীকে তাঁর পুত্র-কন্যাদি সহ আহার্য গ্রহণের অনুনয় জানানো হয়েছে। বঙ্গীয়-মানসে গণেশের ভোজনাসক্তির সিদ্ধ-রূপকল্পটিকে (established image) পদে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে এর অর্থসাযুজ্য টের পাওয়া যায়। *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ* প্রমাণে ব্রহ্মা গণেশের পুনর্জীবনলাভের পর তাঁর ‘লম্বোদর’ নামকরণ করেছেন। ব্রহ্মার বচনে ‘লম্বোদর’ আখ্যাটি এক্ষেত্রে গণেশের খাদ্যাসক্তি বিষয়ে কিছুটা নিন্দনীয় অর্থেই প্রযোজ্য। এ ছাড়া *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এও বিষ্ণুকৃত গণেশ-নামাষ্টক স্তোত্রে ‘লম্বোদর’ শব্দের ব্যাখ্যায় তাঁর বহু ভোজনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[২০৩]

গ। একটি শাক্ত গীতিতে পার্বতীর সঙ্গে পার্বতী-পুত্র গণেশের সম্পর্কের ঐকান্তিকতা পরোক্ষে আভাসিত। পার্বতীর জীবনে গণেশের ভূমিকা কতখানি অনিবার্য কিংবা ‘মাতা-পুত্র’ রূপে পার্বতী এবং গণেশ কীভাবে ওতপ্রোত হয়ে আছেন, সম্পর্কের সেই ইনটেনসিটিটাই নিম্নোক্ত গানে মেনকার বয়ানের সূত্রে খেয়াল করা যায়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত আগমনী পর্যায়ের ‘বোঝাব মায়ের ব্যথা, গণেশকে তোর আট্‌কে রেখে’[২০৪] গানটির অভিমুখ সামান্য পৃথক। এই গানে মেনকার বাচনিকে গণেশের প্রসঙ্গ পরোক্ষে এসেছে। তা ছাড়া প্রেক্ষিতও ভিন্নধর্মী। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে গণেশ এবং পার্বতীর সম্পর্কের নিরিখে মেনকা নিজের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। একধরনের তুলনাত্মক অভিব্যক্তি তাঁর বয়ানে মিশেছে। মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা গৌরী যেমন গণেশের সূত্রে অনুভব (‘বোঝাব মায়ের ব্যথা, গণেশকে তোর আট্‌কে রেখে’) করেন, ঠিক তেমনই গৌরী সম্পর্কেও মেনকার মনে একইরকম অনুভূতি কাজ করে। অথচ গৌরী যেন তা টেরই পান না! ফলে গণেশের তুলনা টেনে মেনকা পার্বতীকে নিজের ব্যথার্ত মনের যন্ত্রণাটিকে চিনিয়ে (‘মায়ের প্রাণে বাজে কেমন, জানবি তখন আপনি ঠেকে’) দিতে চেয়েছেন। এই অন্তরানুভূতি, মায়াটান কার্যত বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য সম্পর্কের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান। সন্তানের প্রতি মায়ের এই অন্তর্লীন মমত্ব, একান্ত-নির্ভরতা যেন আলোচ্য গানে ‘মেনকা-পার্বতী-গণেশ’ এই ত্র্যহস্পর্শ-যোগে পরোক্ষে প্রকাশরূপ লাভ করেছে। পার্বতীর সঙ্গে ভাবী বিচ্ছেদ-কল্পনায় কাতর মেনকা গণেশের প্রসঙ্গ পেড়ে নিজের সঙ্গে পার্বতীর সমানুভূতি তৈরির চেষ্টা করেছেন। এই অবস্থানগত একত্ব তৈরির মধ্যে গণেশ কিছুটা অন্তরালবর্তী হলেও পার্বতীর সঙ্গে গণেশের সম্পর্কের একাত্মতা মেনকার উক্তিতে পরোক্ষে ধরা পড়েছে। মায়ের জীবনে সন্তানের ভূমিকা কতখানি অনিবার্য, একমাত্র গণেশের সূত্রেই গৌরী তা অনুভব করেন। তলিয়ে ভাবলে দেখবেন, মেনকা যাঁর তুলনা টেনে মেয়ের প্রতি মায়ের এই প্রগাঢ় অনুভূতিটাকে ধরিয়ে

দিতে চেয়েছেন, সেই গণেশের সঙ্গে পার্বতী যে এক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ সেটাও কী অসামান্য ভঙ্গিতে পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বস্তুত, পার্বতীর মাতৃসত্তার উদযাপনে গণেশের একটি 'ডিটারমিনিং রোল' যে শাক্ত-সংগীতে বার বার ফুটে উঠেছে, সে'কথাও এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। অন্ততপক্ষে বঙ্গীয় পরিসরে 'পার্বতী-পুত্র'-এর তকমা যে বিশেষভাবে 'গণেশ'ই লাভ করেছেন, মেনকা-মুখে মাতা-পুত্রের একাত্মতার পরোক্ষ স্বীকৃতির মধ্যে সেই সত্যই নিহিত আছে।

ঘ। অধিকাংশ শাক্ত সংগীতেই পার্বতীর জোরালো ভূমিকার সামনে পুত্র-রূপ গণেশের সামান্যীকরণ পাঠকের চোখে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে অন্তত একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের কথা বলা যায়, যেখানে কার্যত শক্তি-কাল্টই গণেশের প্রভাবাধীন থেকেছে। 'আদি-কারণ' গণেশের 'নিয়ন্তাকারী'-র ভূমিকাটিকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বন্দনাটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এক অজ্ঞাত-পরিচয় কবি-রচিত 'আগমনী' পর্যায়ের 'গিরি, গণেশ আমার শুভকারী'[২০৫] শীর্ষক গানে মেনকা পর্বতরাজ হিমালয়ের কাছে গণেশের গুরুত্ব নিরূপণ করেছেন। এ গানে কেবলমাত্র গণেশের মহিমা প্রতিষ্ঠাই নয়, গণেশ-জননী পার্বতীর সঙ্গেও তাঁর একধরনের পরিপূরক সম্পর্কের ইঙ্গিত মিলেছে। গৌরী এবং গণেশ 'মাতা-সন্তান' সম্পর্কে যুক্ত তো বটেই, তদুপরি একের সঙ্গে অন্যের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ। এই আন্তঃসংযোগই বর্তমান রচনায় আভাসিত। গণেশ 'শুভকারী' বলে তাঁর স্মরণমাত্রেই ভক্তের যাবতীয় মনস্কামনা পূর্ণ হয়। পুরাণাদি শাস্ত্র-প্রমাণে তিনি আদিপূজ্য, মঙ্গলময়, আরম্ভের দেবতা। ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু মঙ্গল, যা কিছু শুভ এবং কল্যাণকর, সবেতেই গণেশের অধিষ্ঠান। গানের তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে বলা হয়েছে: 'সে আইলে গৃহে আসেন শঙ্করী' অর্থাৎ গণেশের আবাহন না করলে জগজ্জননী দুর্গার আবির্ভাবও অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর থেকেই পার্বতী এবং গণেশের সম্পর্কের পারস্পরিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁরা একজন অন্যজনের আবির্ভাবের মূল কারণ-স্বরূপ বা চালক-শক্তি। কারণ-কার্যের এ এক আশ্চর্য সমন্বয়। প্রথমপূজ্য গণেশকে আরাধনা-পূর্বক সন্তুষ্ট করলে তবেই শক্তির প্রসাদ-সৌভাগ্য লাভ করা যায়। গণেশ রুষ্ট হলে মাতৃদেবীর আরাধনাও অসফল হতে বাধ্য। গণেশের উপাসনা করার পরেই মেনকা বিল্বমূলে চণ্ডীর বোধন সম্পন্ন করবেন বলে স্থির করেছেন। গণেশের কল্যাণেই যে গৌরীর আগমন ঘটে একথা তাঁর জ্ঞাতব্য। গিরিপুরে চণ্ডীর প্রবেশ ঘটলে তাঁরা প্রসন্নচিত্তে চণ্ডীপাঠ শুনবেন। এমনকী সেই চণ্ডীপাঠ শুনতে দণ্ডী, যোগী, জটাধারী প্রমুখ পুণ্যশ্লোক-আত্মার সমাগম ঘটবে। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, এ গানে গণেশের মহিমা সর্বোচ্চ। শাক্ত পদাবলীর প্রচলিত ধরনের সঙ্গে আলোচ্য গানটিকে মেলানো যায় না।

ব্রহ্মময়ী দেবীর সঙ্গে মাতৃসম্বন্ধে যুক্ত থেকেও গণেশ এখানে ‘ডমিনেটিং পাওয়ার’। তাঁরই ইচ্ছায় দেবী চণ্ডীর আগমন নিশ্চিত হয়। তিনিই যাবতীয় কার্য-সংঘটনের মূল। ফলত মেনকার মুখ দিয়ে গণেশের এই সর্বশক্তিমত্তার ঘোষণা প্রথমপূজ্য হিসেবে গণেশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে চিনিয়ে দেয়। তাঁর উৎকর্ষ কখনও কখনও মায়ের গুরুত্বকেও অতিক্রম করে যায়। শাক্ত পদাবলীর একটানা শক্তি-প্রাধান্যের মধ্যে একমাত্র এই গানেই দেবীমাহাত্ম্যের উর্ধ্বে উঠে গণেশের বিশিষ্টতার প্রতিফলন ঘটেছে।

দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে গণেশ প্রসঙ্গ এবং কয়েকটি ব্যতিক্রমী সম্ভাবনা

সাধারণভাবে দাশরথির রচনায় যেখানে যেখানে গৌরী-সূত্রে গণেশের নামোল্লেখ ঘটেছে, তার পরিচয় আগের অংশেই আমরা পেয়েছি। এই পর্যায়ে দাশরথির কয়েকটি নির্বাচিত রচনার সূত্রে গণেশ-প্রসঙ্গে এমন কয়েকটি দিক উন্মোচিত হবে, যেখানে গীতমধ্যে গণেশ শুধু চরিত্র হিসেবেই দৃশ্যমান নন, টেক্সট্-এর মধ্যে তাঁর একটি বিশেষ ‘ভূমিকা’-রও রূপায়ণ ঘটেছে। শাক্ত পদাবলী সূত্রে বঙ্গীয় গণেশ-কাল্ট-এর লক্ষণগুলি চিহ্নিত করতে গেলে গণেশকে যে কেবলমাত্র বালক-পুত্রেরই তকমা দেওয়া চলে না, পার্বতীর ‘সন্তান’ রূপে হাজির হয়েও যে তাঁর ইনডিভিজ্যুয়ালিটি বা স্বাতন্ত্র্যের নানা ব্যতিক্রমী চিহ্ন কোনও কোনও টেক্সট্-এর মধ্যে সঙ্গোপনে থেকে গেছে, দাশরথির বেশ কয়েকটি রচনাই তার প্রমাণ।

শক্তি-গীতিগুলি যেহেতু শাক্ত সম্প্রদায়ের সাধন-সংগীত এবং তন্ত্রসাধনার ‘দিব্যাচার’ মার্গেই যেহেতু এর অন্তঃস্বরূপটি প্রকাশমাধ্যম লাভ করেছে, ফলে এই গীতিগুলিতে উপাস্য তত্ত্ব এবং উপাসকতত্ত্বের প্রতিফলন ঘটেছে। বিশেষভাবে ‘আগমনী’ ও ‘বিজয়া’ পর্যায়ের গানগুলিতে বৎসল ভক্তিরসই মুখ্য বা কেন্দ্রীয় অবলম্বন হয়ে উঠেছে।[২০৬] মাতার তরফে কন্যার প্রতি এবং কন্যার তরফে মাতার প্রতি একধরনের বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের বিনিময়ের মধ্য দিয়েই পদগুলি এগিয়েছে। এখানে লক্ষ করার বিষয় হল, বহিরঙ্গে যে পদগুলিকে মা এবং সন্তানের সম্পর্ক-জ্ঞাপক বলে মনে হয়, অন্তরঙ্গ ভাষ্যে তার মধ্য দিয়েই উপাস্যের সঙ্গে উপাসকের সম্পর্কের অন্তঃস্রোত বয়ে চলেছে। উপাসকরূপেই মাতা মেনকা যেন উপাস্যরূপী কন্যা উমাকে বৎসল ভক্তিভাবে সাধনা করেছেন। মা এবং সন্তানের এই বহিরঙ্গিক রূপনির্মিতি কেবলমাত্র মেনকা এবং পার্বতীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আগের অংশেই দেখেছি, এই জাতীয় শাক্ত সংগীতের বহিরঙ্গ স্তরে ‘মাতা-সন্তান’ সম্পর্ক উন্মোচনের একটা সমান্তরাল pattern আছে। মেনকা থেকে পার্বতী পর্যন্ত একটা স্তর, পার্বতী থেকে গণেশ পর্যন্ত আরেকটা স্তর--- বাহ্যত ‘মাতা-সন্তান’ সম্পর্কের একটা ক্রম-পরম্পরা তৈরি হয়েছে। দাশরথির ‘আগমনী’ পর্যায়ের কয়েকটি

গানে এই প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্ট। সাধারণভাবে, শাক্ত সংগীতের 'আগমনী' পর্যায়ের গানগুলিতে মেনকা এবং পার্বতীই চরিত্র হিসেবে দৃশ্যমান বলে এবং তাঁদের সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়েই কার্যত গানগুলি উপস্থাপিত হওয়ায় গণেশের প্রত্যক্ষ ভূমিকা কিছুটা আড়ালেই থেকে গেছে। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম দাশরথি। তাঁর গানে কখনও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রে গণেশের জন্ম-প্রসঙ্গকে তুলে এনে, কখনও ভক্তসমক্ষে গণেশ-মাহাত্ম্যের উৎকর্ষ বুঝিয়ে, আবার কখনও বা মেনকা-উমার কথোপকথনের মধ্যে গণেশকে এনে, তাঁর মুখে সংলাপ বসিয়ে পাঁচালিকার গণেশের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নির্মাণ করেছেন। বিশ্লেষণ করা যাক।

১। 'আগমনী' (দ্বিতীয় খণ্ড) পালার 'মেনকার গৌরী অন্বেষণ'[২০৭] শীর্ষক গানে গণেশের প্রসঙ্গ এবং উপস্থাপনা কিছুটা ভিন্নধর্মী। মাতা মেনকা পার্বতীকে খুঁজতে পথে বেড়িয়েছেন। যাকে দেখছেন প্রায় প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করছেন পার্বতীর কথা। কেউই সদুত্তর দিতে পারছেন না। শেষে এক পথিকের মুখ থেকে পার্বতীর সন্ধান পেলেন। গানের এই অংশেই পথিকের জবানিতে গণেশের প্রসঙ্গ পরোক্ষে এসেছে। প্রসঙ্গটি কার্যত দু'দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এক, পার্বতীকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে গণেশের ভূমিকা কতখানি কার্যকর, তা পথিকের উত্তরের প্রথমভাগেই স্পষ্ট। দুই, গণেশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পাবলিক পারসেপশনের ধরনটি ঠিক কীরকম, পথিকের উত্তরের দ্বিতীয়াংশে তারও ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

প্রথম ক্ষেত্রে পথিকের বয়ানে পুত্র গণেশের নিরিখেই মাতা পার্বতী চিহ্নিত হয়েছেন। গণেশের দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনা এবং বালকোচিত আচরণের সূত্রেই বিবরণটি নির্মিত। "ছেলে একটি অগ্রে করি,/ ছেলেটির আবার মুখটি করী,/ একি অসম্ভব ছেলে ভবে!/ গাটি যেন সিঁন্দুর-ঘোটা, চারিটি হাত পেটটি মোটা,/ একবার একবার উঠছে মায়ের কোলে"। বঙ্গীয় ধর্মসাহিত্যের ঐতিহ্যে গণেশের ফিজিক্যাল অ্যাট্রিবিউট্স বা দেহরূপের এই বর্ণনা সংস্কৃত পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রাদি-বিহিত। হস্তীমুখ, স্ফীতোদর, চতুর্বাহু এবং সিঁদুরের মতো রক্তিমাভ এক ছেলেকে সামনে রেখে মাতা পার্বতী এগিয়ে চলেছেন। সামনে রেখে এগোনোর ('ছেলে একটি অগ্রে করি') এই রূপকল্পে গণেশের অগ্রপূজ্যতার ইঙ্গিতটিও কার্যত ধরা রইল। তা ছাড়া মাঝে মধ্যে সেই ছেলে আবার মায়ের কোলে উঠেছে। এর মধ্যে গণেশের শিশুত্বের উপস্থাপনার পাশাপাশি মাতা পার্বতীর বাৎসল্যেরও প্রকাশ ঘটেছে। বিচিত্রদর্শন গণেশের গজমুখ এবং দেহভাগ প্রাকৃতজনের বিস্ময় উদ্রেককারী বলেই পথিকের দৃষ্টিতে তা কিছুটা অসম্ভব ('একি অসম্ভব ছেলে ভবে') ঠেকেছে। গজমুখ গণেশকে কোলে নিয়ে গজেন্দ্রগমনে মাতা পার্বতীর এই গমনদৃশ্য মুনিজনেরও

মনোলোভা। কার্যত এই আইডেনটিফিকেশনের সর্বত্র 'গণেশ-জননী' রূপে পার্বতীর উপস্থাপনা তাঁর পরিচয় উন্মোচনে গণেশের ভূমিকার তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়।

পথিকের উত্তরের প্রথমাংশে 'অদ্ভুতদর্শন' গণেশ সম্পর্কে যে বিস্ময়বোধের প্রকাশ ঘটেছিল, দ্বিতীয়াংশে সেই ধারণাটিই ক্রম-প্রসারিত হয়ে গণেশের দেহরূপ ও তাঁর জন্ম সংক্রান্ত একটি বহুচলিত প্রশ্নকে ইঙ্গিতে উসকে দিয়েছে। অধিকাংশ সংস্কৃত পুরাণকথায় মাতা পার্বতীর একক ভূমিকায় গণেশের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সন্তানজন্মের বায়োলজিক্যাল পারসেপশন এবং নন-বায়োলজিক্যাল পাসেপশনের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব আছে, পথিকের মন্তব্যের সূত্রে তা টের পাওয়া যায়। নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ-নির্ভর সন্তান-জন্মের যে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সমীকরণ, গণেশ-জন্মের ঘটনায় তার ব্যত্যয় ঘটেছে। ভারতীয় পুরাণ-পরম্পরায় গণেশ-জন্ম সংক্রান্ত অধিকাংশ আখ্যানেই পুরুষের অংশগ্রহণকে নাকচ করে এক নারীর সন্তানলাভের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। তবে পুরুষ-দেবতার (শিব অথবা বিষ্ণু) অংশজাতরূপে গণেশের জন্ম-সংঘটন ব্যতিক্রমী হলেও কয়েকটি পুরাণকথায় লভ্য। বরং একটি-দুটি সামান্য উল্লেখ ছাড়া পুরুষ-নারীর সঙ্গমে জৈবিক প্রক্রিয়ায় সন্তান জন্মের বৃত্তান্ত গণেশ-জন্মের ক্ষেত্রে একান্তই দুর্লভ। অতএব, পথিকের মন্তব্যের প্রেক্ষিতটি সম্পূর্ণত বুঝতে হলে পুরাণ-বর্ণিত গণেশ-জন্মের সেইসব আখ্যানের দ্বারস্থ হতে হয়, যেখানে গণেশ এককভাবে মাতা পার্বতীরই জাতক। লক্ষ করলে দেখা যায়, উদ্দিষ্ট গানে গণেশের সঙ্গে পার্বতীর বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য সম্পর্কের উদ্‌যাপন পথিকের তির্যক প্রতিক্রিয়ায় সামান্য নিন্দিত হয়েছে। এই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ বা নিন্দার উৎসে রয়েছে গণেশ-জন্মের একটি অনিবার্য সূত্র। গণেশ এককভাবে পার্বতীর অংশোদ্ভূত বলেই কী সামাজিক পরিসরে পার্বতী এবং গণেশের সম্পর্ক-যাপনের প্রসঙ্গটিকে খাটো করে দেখা হচ্ছে? ঠিক যে'ভাবে নারী-প্রাধান্যের যাবতীয় এক্সপ্রেশনকে পুংলিঙ্গ-শাসিত ব্যবস্থায় প্রত্যাখ্যাত হতে হয়! এক্ষেত্রে পথিকের বয়ানে ('গাটি মানুষ মুখটি গজ,/ না জানি কার অঙ্গজ,/ মেয়ের ত গর্ভের ছেলে নয়') গণেশ জন্মের 'জৈবিক' বনাম 'অ-জৈবিক' ধারণার একটি প্রচলিত মাপকাঠি সমাজ-মানসিকতার আধারে বর্ণিত হয়েছে। পথিকের ধারণায় হস্তীমুখ গণেশ আর যাই হোক, পার্বতীর গর্ভপ্রসূত সন্তান তো নয়! কাজেই, গণেশের অত্যধিক মাতৃসংসর্গের আকাঙ্ক্ষা বা মাতার সঙ্গকামনা পথিকের দৃষ্টিতে কিছুটা অসঙ্গত ও বেমানান ("কিন্তু ছেলের সোহাগ কত?/ গর্ভের ছেলের এত কি সোহাগ হয়?") ঠেকেছে। পার্বতীর 'গর্ভজাত-সন্তান' রূপে ভূমিষ্ঠ না হওয়ার 'ব্যর্থতা'-টাই কার্যত সামাজিক ধারণায় গণেশের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। স্বামী-স্ত্রীর সংগম-যাপন ও তার ফলস্বরূপ স্বামীর ঔরসে নারীর সন্তানধারণের চিরাচরিত 'বায়োলজিক্যাল আর্কেটাইপ'-টিকে

প্রায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পুরাণকথার গণেশ-জন্মের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা সন্তান-জন্মের এক বিকল্প সম্ভাবনা, একা মেয়ের 'মা' হয়ে ওঠার স্বীকৃতি শেষপর্যন্ত যাবতীয় অলৌকিকতা অতিক্রম করেও 'গর্ভজাত সন্তানের ধারণা'-র উলটোপিঠে 'adoptive son'-এর ধারণাকেই ('বুঝি পোষাপুত্র হবে সে সুত') এক অর্থে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। যদিও অষ্টাদশ শতকের বাংলার সমাজ-কাঠামোর মূলধারায় মাতা-সন্তান সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুঝে ওঠা বোধহয় ততখানি সহজ ছিল না। সমকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে এই ধরনের দ্বিধা কিংবা অস্বস্তি হয়তো স্বাভাবিকও বটে। উল্লিখিত রচনায় উমা ও গণেশ সম্পর্কে মেনকার প্রতি পথিকের এই জাতীয় মন্তব্য আদপেই কোনও ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া নয়। একে 'সামাজিক মন্তব্য' বলেই মনে হয়। নিহিতার্থে পথিকের স্বরটিও বহুবচনান্ত। এর মধ্যে ব্যক্তির একক প্রতিক্রিয়ার গভীরে social-psyche বা সামাজিক-মনের অভিপ্রায়টিকেও পড়ে ফেলা যায়।

২। 'আগমনী' (দ্বিতীয় খণ্ড) পালার 'হিমালয়ের গৃহে গৌরী'[২০৮] শীর্ষক গীতিমালায় তিনটি পৃথক গানের সমাবেশ ঘটেছে। যদিও পরিসরে আলাদা হলেও বিষয়-নিরিখে তিনটি গানই ক্রম-অনুসারে আন্তঃসম্পর্কে যুক্ত এবং কিছুটা এপিসোডিক্যাল। গিরিপুরে একটি পারিবারিক প্রেক্ষাপটে গণেশের উপস্থিতিতে পার্বতী এবং মেনকার কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। প্রথম গানে মেনকা গণেশের সামনেই উমাকে কোলে বসিয়ে তাঁকে ক্ষীর, সর প্রভৃতি ('বাসে গিয়ে, বাসনা পুরাণ, বসাইয়ে কোলে।/ ক্ষীর সন আনিয়া দেন বদনকমলে') খাইয়েছেন, তাঁর যত্ন-আত্তি করেছেন। এই প্রেক্ষিতেই মা-মেয়ের কথোপকথনের আরম্ভ। প্রথম দু'টি গানে ক্রোড়গত উমার সঙ্গে কথা বলেছেন মূলত মেনকাই। এখানে গণেশ কার্যত শ্রোতামাত্র। কথনের উপলক্ষ্য শাক্ত গীতির পাঠকমাত্রেরই পরিচিত। পরাশক্তি আদ্যাপ্রকৃতি জগন্মাতা গিরিরাজ হিমালয় এবং মেনকার গৃহে উমা বা পার্বতীরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু, আদিশক্তির মাতৃগর্ভজাতরূপে এই মানবায়ন পার্বতীজননী কখনও কখনও বিস্মৃত হন। সমস্যা বাধে ঠিক তখনই। কন্যাস্নেহে অন্ধ মেনকা অবুঝের মতো আচরণ করেন। দ্বিতীয় গানেও উমার বিবাহিত জীবন, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন স্বামী, সাংসারিক অভাব-অনটন, অন্নহীন গার্হস্থ্যের প্রাত্যহিক দিনলিপি শুনে একজন মা যে'ভাবে সন্তানের হিতচিন্তায় কাতর হন, মেনকার অস্থিরতার মধ্যে তেমনই উদ্বেগের ছায়া পড়েছে। আসলে, স্নেহান্ধ মেনকা এক্ষেত্রে ভ্রমাচ্ছন্ন। পার্বতীর মূল স্বরূপ জেনেও স্নেহ-সর্বস্ব মায়ের বাৎসল্য যেন বাঁধ মানেনি। সর্বাবস্থায় তিনি কন্যা উমার কুশলচিন্তা করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তৃতীয় গানে আগমন ঘটেছে গণেশের। আদিশক্তির মূলস্বরূপ সম্পর্কে বিস্মৃত মেনকার বোধোদয় ঘটাতেই তাঁর অবতারণা। তত্ত্বত তাঁর মা যে গিরি এবং মেনকার

‘কন্যা’মাত্র নয়, বরং আদিভূতা সনাতনী, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী, গণেশ যেন গানের শুরু থেকেই দায়িত্ব নিয়ে মেনকাকে সেই শক্তিব্রহ্ম-তত্ত্বেরই পাঠ দিতে চেয়েছেন। ‘শক্তি’-র মূলরূপ সম্পর্কে মেনকার এই বিস্মরণই গানের প্রথমাংশে গণেশের ভূমিকাকে অনিবার্য করে তুলেছে। গঠনগতভাবে গানটি দ্বিস্তরিক। প্রথমার্ধে গণেশের গুরুত্ব মেনকার সামনে শক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা হিসেবে। ধাপে ধাপে গণেশ যেন তাঁর মাতা পার্বতীর ‘সত্যরূপ’টি মেনকাকে চিনিয়ে দিচ্ছেন। প্রথমেই মেনকাকে ‘মাতামহি’ অর্থাৎ দিদিমা সম্বোধন করে গণেশ বলছেন, ‘‘গণেশ কন মাতামহি!/ আমার ত মাতা মহী,--/ স্বর্গ পাতাল কর্ত্রী,- তা জান না।/ তুমি গর্ভে প্রসবিলে, ভ্রমেতে মনে ভাবিলে, মাতা পিতা তোমরা দুই জনা।।’’ পঙ্ক্তিগুলি থেকেই গণেশের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মেনকা যাকে কেবলমাত্র ‘কন্যা’ ভেবেছেন, প্রকৃত স্বরূপে তিনি যে পরাশক্তি বিশ্বজননী, ত্রিলোকের অধীশ্বরী--- প্রথম বাক্য থেকেই মাতৃকাদেবীর এই ‘নিত্যত্ব’ সম্বন্ধে গণেশ মেনকাকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। গণেশের বাচনিকে পদের প্রথমাংশটি কার্যত এই সুরেই বাঁধা। উমা বা পার্বতীর ‘মানবী’ পরিচয়ের আড়াল থেকে গণেশের কথাসূত্রে যেন সহসা উদ্ভাসিত হন ব্রহ্মময়ী আদ্যাপ্রকৃতি। গণেশ-জননী যে আদপেই প্রাকৃত নারীমাত্র নন, সাক্ষাৎরূপে তিনি যে ‘পরবিদ্যাতত্ত্ব’, যাঁর সন্ধান কার্যত সাধকেরও জ্ঞানের অগোচরে, শক্তিতত্ত্বের সেই দূরধিগম্যতাই গণেশের মুখে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। গিরিরাজ এবং মেনকা হয়তো ভেবেছেন যে তাঁরাই উমার পিতা-মাতা, কিন্তু এই উপলব্ধির সত্যতা কতটুকু? গণেশ নারদকে পার্বতীর প্রকৃত পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন। মেনকা আদর করে যাঁর নাম উমা রেখেছে, সে কী আদৌ মেনকার একার সন্তান? নাকি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জননী? প্রকৃত পরিচয়ে মহামায়া নিত্যরূপা সনাতনী। হিমালয়-মেনকার গৃহে উমারূপে আবির্ভাব তাঁর মায়াপ্রকাশেরই অংশ। গণেশের উক্তিতে ‘‘যার উদরে ব্রহ্মাণ্ড,/ ধরা প্রভৃতি সপ্তখণ্ড,/ বহ্নি বায়ু আদি সমস্ত হয়!/ যাঁর, মায়ায় মুগ্ধ বিশ্ব, চর্ম্ম-চক্ষের অদৃশ্য, সেও তাঁর কখন গর্ভে জন্ম লয়?’’ ইত্যাদি উচ্চারণ শক্তিপারম্যবাদের তুঙ্গবিন্দু স্পর্শ করেছে। যিনি অযোনিসম্ভূত আদিমাতা, সর্বব্যাপিনী, তাঁর কী কোনও প্রাকৃত মূর্তি থাকে, নাকি সে মূর্তিতে ধরা দেয়? এই বিশ্বের প্রকাশই তাঁর মূর্তি। দেবীর এই নিত্যত্বের বোধ একমাত্র গণেশই পূর্ণরূপে অনুধাবন করেছেন। মেনকা যেমন আদিশক্তিকে ‘কন্যা’রূপে পেয়েছেন, গণেশও তাঁকে লাভ করেছেন ‘মাতৃ’রূপে। তফাত কেবল একটাই। মেনকা প্রাকৃত নারীর মতোই ভ্রমপতিত। শক্তির মানবায়নকেই তিনি ‘সত্য’ ভেবে ভুল করেছেন। অন্যদিকে, গণেশ নিঃসন্দিগ্ধ, দোলাচলমুক্ত, সংশয়হীন। দেবীর ‘পরতত্ত্ব’ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থেকেও তিনি পুত্রজ্ঞানে মাতৃসান্নিধ্য লাভ করেছেন। যিনি সাধকেরও ধ্যানের অগম্য, সেই বাক্যমনাতীত নিত্যশক্তির নৈকট্য পেয়েও বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের

ঘেরাটোপে মেনকার মতো তিনি পথ হারাননি। বরং ভ্রমান্ধ 'মাতামহী'কে দ্বিধামুক্ত করতে তাঁরই সামনে 'শক্তিব্রহ্ম'-এর প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। গণেশের ব্যাখ্যায় শক্তিপারম্যবাদের এক অত্যুচ্চ সীমায় শৈবতত্ত্ব পর্যন্ত সাবঅর্ডিনেট হয়ে যায়। স্বয়ং নির্গুণ মহাদেবও শবরূপে নয়ন মুদ্রিত করে শক্তির 'গুণরূপ' ধ্যান করেন। এই অংশে দেবাদিদেব মহেশ্বরকে গণেশ 'পিতা'-রূপে সম্বোধন করেছেন। বেশিরভাগ পুরাণের আখ্যানে গণেশ মাতৃ-অংশজাত হলেও পরবর্তী সময়ে 'শিবপুত্র'-রূপে গৃহীত হয়েছেন। এ অংশে তাঁর পিতা-মাতারূপে হর-পার্বতীর যুগপৎ উল্লেখ লক্ষণীয়। বক্তব্যের শেষদিকে গণেশ মেনকার আচ্ছন্ন-দৃষ্টির প্রসঙ্গ তুলেছেন। জন্মদাত্রী মাতারূপে তিনি 'কন্যা' উমাকে পালন করেছেন, যথাকালে তাঁকে শিবের হাতে সমর্পণ করেছেন, কিন্তু 'শক্তিতত্ত্ব' তো কেবল এই প্রাকৃত বেষ্টনীটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মেনকা যাঁকে পার্থিব সীমায় বাঁধতে চেয়েছেন, তত্ত্বত সেই আদ্যাপ্রকৃতি যে বিশ্ব-চরাচরেরও অতীত, বন্ধন-রহিত এবং সাধারণের অ-গোচরীভূত, গণেশের ব্যাখ্যায় সেই দেবীমাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে। মেনকা যে কখনওই 'সদানন্দময়ী রানী'র শক্তির যাথার্থ্য বুঝবেন না, এমনকি তাঁর পরিচয়ের নাগালমাত্রও পাবেন না, গণেশের উক্তিতে সেই ইংগিত স্পষ্ট। গীতমধ্যে একমাত্র গণেশই 'শক্তি'র এই পরতত্ত্বকে আত্মস্থ করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে সেই অগম্য অপার তত্ত্বের প্রকাশও ঘটিয়েছেন। এখানেই শাক্ত পদাবলীর পরিচিত গণেশর একটা আলাদা উত্তরণ চোখে পড়ে। অধিকাংশ শাক্ত সংগীতেই গণপতি পুত্ররূপে শক্তি কাল্‌ট-এর মধ্যে অন্তর্লীন থেকেছেন। মেনকা, পার্বতী অথবা পদকর্তার বয়ানে কিছটা পরোক্ষে চিহ্নিত হয়েছেন। গীতমধ্যে তাঁর সশরীর উপস্থাপনা ও অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষত ঘটেনি। দাশরথির রচনাতেই এই নিষ্ক্রিয়তার মাত্রা প্রথম অতিক্রান্ত হল। তাঁর আইডেনটিটি এখানে কেবল শক্তি কাল্‌ট-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্তিকরণেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি, প্রকাশ্যে তিনি শক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও বটে। গৌরীপুত্র হয়েও এখানে তাঁর নিজত্ব চোখে পড়বে।

প্রথমার্ধের গণেশ-বচনের এখানেই ইতি ঘটেছে। যদিও মেনকার কাছে শক্তিতত্ত্বের এই পাঠ অধরাই থেকে গেছে। তখনও তাঁর ঘোর ভাঙেনি। ফলে গণেশের মুখে শক্তিতত্ত্বের এই বিশ্লেষণ তাঁর হাস্যোদ্রেক ঘটিয়েছে। এর প্রত্যুত্তর তিনি সরাসরি গণেশকে দেননি, দিয়েছেন কন্যা উমাকে। মেনকার প্রদেয় উত্তরটি কার্যত আলোচ্য গীতের দ্বিতীয়ার্ধের প্রবেশপথ: 'শুনি পাষাণী হেসে কয়, উমা! তোমার জ্যেষ্ঠ তনয়,--/ অবোধ গণেশ কি বলে ঈশানি!' মেনকার এই প্রতিক্রিয়াটিকে মাঝখানে রেখেই গানের দ্বিতীয়াংশ পার্বতী-মুখে রচিত হয়েছে। এ অংশে 'শক্তিময়ী' পার্বতী স্বয়ং তাঁর মা মেনকাকে তাঁরই পুত্র গণেশের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে একধরনের অবস্থানগত সাযুজ্য টের পাওয়া যায়। স্নেহান্ধ মাতা মেনকাকে পার্বতীর 'সত্যরূপ' যেমন ধরিয়ে

দিচ্ছেন পার্বতীরই পুত্র গণেশ, ঠিক তেমনি পার্বতীও তাঁর মাকে পুত্র গণেশের 'গুরুত্ব' বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, মাতা পার্বতী ও পুত্র গণেশ উভয়েই পরস্পরের আইডেনটটি সম্বন্ধে সমান সচেতন। পাশাপাশি ফর্মের দিক থেকেও রচনাটি চমকপ্রদ। এর তাৎপর্য কেবল বিষয়বস্তুর আকর্ষণেই নয়, situation making বা পরিস্থিতি নির্মাণের মধ্যেও সন্ধানযোগ্য। এক মা যখন তাঁর সন্তানের 'সত্যরূপ' চিনতে পারছেন না, আরেক মা তখন অবলীলায় পুত্রের 'স্বরূপ' ব্যাখ্যা করছেন। এই বৈপরীত্যের বিন্যাস মেনকা ও উমার অবস্থান সাপেক্ষে সত্য। উলটোদিকে আবার গণেশ ও পার্বতীর উপলব্ধির সমত্ব তাঁদের সম্পর্কের পারস্পরিকতাকে চিনিয়ে দেয়। গানটির মধ্যে মেনকাকে সামনে রেখে গণপতি-মুখে শক্তির স্বরূপ-নির্নয় এবং স্বয়ং শক্তি-মুখে গণপতি-তত্ত্বের সনাক্তকরণ নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

পূর্বোক্ত অংশে মেনকা গণেশকে 'অবোধ' তো বলেছেনই, উপরন্তু নাবালক গণেশের মুখে শক্তিতত্ত্বের প্রভূত উচ্চারণ শুনে হাসতে হাসতে তা উড়িয়ে দিয়েছেন। গণেশ বাহ্যত 'শিশু' বলে তাঁর বক্তব্যকে 'গুরুত্বহীন' মনে করা, তাঁকে কার্যত 'পাত্তা' না দেওয়ার ভঙ্গিটি এ অংশে মেনকার প্রতি পার্বতীর প্রত্যুত্তরে সমালোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়াংশের প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই পার্বতীর মুখে গণেশের মহিমময় গুরুত্ব আভাসিত: 'উমা কন, জ্যেষ্ঠ তনয়, মাগো! আমার অবোধ নয়,/ গণেশ আমার বড় জ্ঞানবান।' মেনকার মুখোচ্চারিত 'অবোধ' শব্দটির বিপরীতে পার্বতীর মুখে গণেশ সম্পর্কে উচ্চারিত 'জ্ঞানবান' অভিধাটি খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, মেনকা যেখানে গণেশকে একান্ত বহিরাবয়বে বিবেচনা করেছেন, তাঁর বক্তব্যকে বালকসুলভ অজ্ঞানতা ('অবোধ') ভেবেছেন, পার্বতী সেখানে প্রথম থেকেই গণেশকে স্বরূপত 'পরম জ্ঞানী'-ই ('বড় জ্ঞানবান') বলেছেন। এক্ষেত্রে স্নেহাতুরা মাতার বাৎসল্যাসক্তি পুত্রের 'প্রকৃত পরিচয়' অনুধাবনে মোটেই বাধাস্বরূপ হয়ে ওঠেনি। এর সাধনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও গুরুত্বপূর্ণ। ব্রহ্মভাবচক্রে সগুণ প্রকৃতিপ্রধান নিম্নমুখী ত্রিকোণের ওপর বাম দিকে যে 'সদানন্দ' (সদংশে শিব এবং আনন্দাংশে শক্তির মিলনবিন্দু) মিশ্রবিন্দু অবস্থিত, গণেশের অধিষ্ঠান সেখানেই। সদানন্দের সেই মিলনবিন্দুতে 'আনন্দ'–রূপিণী শুদ্ধ রজোময়ী মহাশক্তির দক্ষিণাংশের সঙ্গে ব্রহ্মসদ্ভাবময় তমোগুণাত্মক শিবের বামাংশের মিলনের ফলে 'তমোধিকরজোগুণান্বিত' (তমঃ + রজঃ) এক অভিনব ব্রহ্মজ্ঞান বা বুদ্ধিসত্তা প্রাধান্যযুক্ত হয়ে বিশ্বের নিত্য জ্ঞান-কেন্দ্র-রূপ সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্তি শ্রীভগবান 'গণপতি' রূপে বিরাজিত আছেন।[২০৯] তন্ত্রবাক্যেও গণেশ সাধকের 'জ্ঞানতত্ত্ব' রূপে বিবেচ্য।[২১০] শিব-শক্তি থেকে সম্ভূত এই 'সদানন্দরূপ জ্ঞানময় গণেশ' ব্রহ্মজ্ঞানী বলেই তাঁর দৃষ্টিতে শিব-শক্তির প্রকৃত স্বরূপ ('আমাকে আর গঙ্গাধরে,/ মানুষ ব'লে নাহি ধরে/ মাতা-পিতার তুল্য ব্রহ্মজ্ঞান')

উন্মীলিত হয়েছে। এরপরই পার্বতীর বয়ানে মেনকার প্রতি অনুযোগের সুর স্পষ্ট। হিমালয়-পত্নী মেনকা নামেই কেবল ‘পাষাণী’ নন, কাজেও বটে। ‘হিমালয়ের গৃহে গৌরী’ শীর্ষক গীতিমালার প্রথম গানেই তিনি কন্যা উমাকে কোলে বসিয়ে বহু যত্নে আদর করেছেন। অথচ পাশে দাঁড়ানো ‘পার্বতীপুত্র’ গণেশের প্রতি ‘কন্যা’-স্নেহে অন্ধ মেনকার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ (‘এ যে, মিছে আদর ওমা শিখরি!/ আমাকে বসিলে কোলে করি,/ আমার গণেশ দাঁড়িয়ে ধরাতলে’) নেই। মা মেনকা যেমন তাঁর ‘কন্যা’-র হিতাহিত চিন্তায় কাতর, আবেগপ্রবণ; ঠিক তেমনি ‘মেনকা-দুহিতা’ উমাও যেখানে ‘গণেশ-মাতা’, সেখানে তিনিও একইভাবে তাঁর পুত্রের অনাদরে ব্যথিত। আসলে দ্বন্দ্বটা এখানে প্রাধান্যের। মেনকার কাছে কন্যা উমা যতখানি prior, পার্বতীর কাছে তাঁর পুত্র গণেশও যে ঠিক ততখানিই প্রিয়পাত্র---এই স্বাভাবিক সত্যটুকু মেনকা বিস্মৃত হয়েছেন। পাঠক লক্ষ করলে দেখবেন, এই বিস্মরণ ঘোচাতেই সম্পূর্ণ গীতিমালিকাটির অবতারণা। বিশেষভাবে বর্তমান আলোচ্য তৃতীয় গানটির প্রথম অংশে গণেশ-মুখে শক্তিমাহাত্ম্য এবং দ্বিতীয়াংশে পার্বতী-মুখে গণেশ-মাহাত্ম্য পরিবেশন কার্যত ভ্রমাচ্ছন্ন মেনকার ‘অন্ধত্ব’ বিদূরণেরই নামান্তর। পরবর্তী পঙ্‌ক্তি দু’টিতে অবশ্য পার্বতী বিশেষভাবে মানবায়িত হয়েছেন। কন্যা হিসেবে যখনই মাতা মেনকাকে নিজপুত্রের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন তখনই একটা অংশের পরে পার্বতীর স্বরেও যেন সমাজ-মানসিকতার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কন্যাসর্বস্ব গিরিপুরে দৌহিত্র গণেশই একমাত্র কুলদীপ, ভবিষ্যৎ উত্তরসূরী। আগত সময়ে তাঁর জন্যই গিরি-মেনকার বংশরক্ষা হবে। এ অংশে পার্বতীর বাচনিকে ‘কন্যা ত মা বংশ নয়,/ বিধি আমাকে দিল তনয়,/ গণেশ তোমার কূল-রক্ষার মূল’ ইত্যাদি পংক্তি সমকালীন প্রেক্ষাপটে বংশরক্ষায় নারীর ভূমিকার ব্যর্থতাকে চিনিয়ে দেয়। জগন্মাতা পার্বতীর ভগবত্তা এখানে বিলুপ্ত, সামান্যায়িত। পার্থিব বন্ধন-সীমায় তিনিও আটকা। মেনকার সামনে একান্ত ‘মাতা’-রূপে পুত্র গণেশের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন, তাঁর ‘অধিকার’ সুনিশ্চিত করেছেন। এর মধ্য দিয়ে পার্বতীর ‘জগজ্জননী’ পরিচয়ের বাইরে বিশেষভাবে ‘গণেশ-জননী’ পরিচয়টাই যেন মুখ্য হয়ে উঠেছে। এর পর থেকেই মেনকার ভ্রমাচ্ছন্নতা ধীরে ধীরে কাটতে শুরু করেছে। ভ্রমান্ধ মাতামহী নিজকন্যার কাছে দৌহিত্রের অবস্থানগত মর্যাদা স্বীকার করেছেন: ‘‘রানী কন মা! বলা অধিক,/ প্রাণাধিকের প্রাণাধিক,/ গণেশ আমার তাত আমি জানি।’’ এর পাশাপাশি নিজের পক্ষপাতটুকুও (‘‘কি করিব মা! বুঝে না মন,/ গণেশে মন তোমার যেমন, তেমনি আমার গণেশ-জননি!’’) সবিনয়ে জানিয়েছেন। গণেশ যেমন পার্বতীর কাছে প্রাণপ্রিয়, কন্যা উমাও তেমনই মেনকার সর্বস্ব। সন্তান-স্নেহ যে ব্যক্তির আচরণকে, ব্যবহারকে কতখানি সীমাবদ্ধ ও একগামী করে দেয়, মেনকার উক্তিই তার প্রমাণ। যদিও এরপরই মোহমুক্ত মেনকা শঙ্করপ্রিয়া

পার্বতীকে গণেশকে কোলে নিয়ে রত্ন-সিংহাসনে উপবেশনের ('তুমি একবার শঙ্করি!/ তব গণেশকে কোলে করি,/ বস মা এই রত্ন সিংহাসনে') অনুরোধ জানিয়েছেন। এমনকী মেনকা স্বর্ণবৃক্ষ-সম পার্বতী-ক্রোড়ে হীরক-সম গণেশের অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে জন্ম সফল করার জন্য গিরিরাজকেও ডেকে আনতে ('আনিগে গিরিকে ডেকে,/ সোনার গাছে হীরে দেখে,/ জন্ম সফল করি দুই জনে') চেয়েছেন। পাঠক খেয়াল করলে দেখবেন, এখান থেকেই মেনকার জননী-সত্তা যেন কিছুটা আড়ালে চলে গিয়ে তাঁর 'উপাসক'-সত্তা বড় হয়ে উঠেছে। একইভাবে উপাস্য জগন্মাতাও আর 'উমা'রূপে 'বাল্যলীলা'য় স্থিত রইলেন না। ভক্তবাঞ্ছাপূরণের জন্য তিনিও গণেশকে কোলে নিয়ে স্তন্য-প্রদাত্রী ("শুনি মায়ের উপাসনা,/ পূর্ণ করিতে বাসনা,/ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনী তখন।/ কোলে করি করিমুখে,/ স্তন দান করিছেন মুখে,/ রানী রূপ করিছেন দরশন") জননীরূপে আবির্ভূত হলেন। গানটি কার্যত কন্যারূপিণী উমার 'বাল্যলীলা' থেকে 'মাতৃলীলা'য় উত্তরণের মুখবন্ধ রচনা করেছে। যদিও আদ্যাশক্তির এই মাতৃরূপের কল্পনা নির্বিশেষ অর্থে নয়, বরং একটি বিশেষ রূপের আধারেই তাঁর মাতৃমূর্তি প্রকটিত। সর্ববব্যাপিনী পরাশক্তি মাতৃরূপে এখানে 'গণেশ-জননী' আখ্যায় বিশেষায়িত। বলা বাহুল্য, মেনকার ভক্তিনম্র প্রার্থনাই কার্যত 'গৌরীর গণেশ-জননী রূপ' ধারণের অব্যবহিত পরবর্তী শাক্ত-সংগীতটিকে অবধারিত করে তুলেছে।

দাশরথি রচিত 'আগমনী' (দ্বিতীয় খণ্ড) পালার 'গৌরীর গণেশ-জননী রূপ'[২১১] শীর্ষক গানটি পূর্ববর্তী গীতের ধারাবাহিকতায় এসেছে। গিরিপুরে গৌরী যখন ভক্তরূপ মেনকার প্রার্থনা পূরণের জন্য পুত্র গণেশকে কোলে নিয়ে রত্ন-সিংহাসনে আসীন হলেন, তখনই প্রসঙ্গক্রমে আলোচ্য গানের উপযুক্ত প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে। পাঁচালিকার দাশরথির বর্ণনায় দেবীর গণেশ-সহ এই দিব্য-আবির্ভাবের একমাত্র ভক্তিনম্র দর্শক গিরিরানী মেনকা। তাঁর নির্বন্ধেই পার্বতী গণেশকে কোলে নিয়ে একাসনে উপবেশন করেছেন। পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী দেবী এখানে বিশেষরূপে 'গণেশ-জননী'। জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশের পরিচয়েই মাতৃকাদেবী পরিচিত হয়েছেন। দাশরথির বর্ণনায় জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশও 'বাল'-রূপে অবতীর্ণ এক স্তন্যপানোদ্যত সদ্যোজাত শিশুমাত্র। মাতা-পুত্রের বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের অপার্থিব সুষমায় সমগ্র গানটি যেন সাত্ত্বিক বিভায় ভাস্বর। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে হৈমবতী দেবীর ক্রোড়গত শিশুরূপী গণেশ 'হেরম্ব' অভিধায় ভূষিত। 'হেরম্ব' পঞ্চানন, ত্রিনয়ন, দশবাহু, সিংহারূঢ় তান্ত্রিক গণপতি।[২১২] অথচ বর্তমান বর্ণনায় মাতৃক্রোড়গত গণেশের শিশুরূপের সঙ্গে এই 'হেরম্ব'-এর সম্বন্ধ কতটুকু? তাহলে গণেশের সমার্থব্যঞ্জক অভিধা হিসেবে এর উল্লেখের কারণ কী হতে পারে? আমাদের মনে হয়, 'হেমবরণী' ও 'হেরম্ব' শব্দে অনুপ্রাসের প্রয়োগে একটা ধ্বনিসাম্য তৈরির চেষ্টা যেমন আছে, তেমনই কণকোজ্জ্বল গৌরীর

গাত্রবর্ণের সঙ্গে একটা বর্ণসাযুজ্য তৈরির চেষ্টাও এর কারণ হতে পারে। *বৃহৎ তন্ত্রসার*-এর বর্ণনা অনুসারে ‘হেরম্ব’ গণেশের গাত্রবর্ণও কাঞ্চনতুল্য অর্থাৎ স্বর্ণাভ।[২১৩] কাজেই, বর্ণসাদৃশ্যের সূত্রটাও ‘হেরম্ব’ নামোল্লেখের মূলে থাকতে পারে। এই দিব্যশোভামণ্ডিত নয়ন-বিমোহন রূপ দর্শন করে পার্বতী-জননী দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবর্ষণ (‘হেরি গণেশ-জননী-রূপ,/ রানী ভাসেন নয়ন-জলে’) করেছেন। অশ্রু সাত্ত্বিক ভাবোদ্দীপক। ‘ব্রহ্মাদি’ দেবগণ যাঁর বালক-সম, সেই আদ্যা মূলাপ্রকৃতি মহাদেবী ‘গিরি-বালিকা’-র বেশে হিমালয়-মেনকার গৃহে ‘বাল্যলীলা’ উদ্‌যাপন করেছেন। বালকরূপে সূর্য, চন্দ্রও (‘পদতলে বালক ভানু, বালক-চন্দ্রধরা’) তাঁর চরণতলাশ্রিত। সেই দিব্যকান্তির এমনই গরিমা যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই যেন তাঁর পদতলে আত্মসমর্পণ করেছে। পাঁচালিকারের বর্ণনায় পার্বতীর ক্রোড়াধিষ্ঠিত গণেশের দেহরূপ সূর্যকরোদ্দীপ্ত। পার্বতীর কোলে দোল খাওয়া বালকের অঙ্গকান্তি বালার্কের সৌন্দর্যকেও (‘বালক-ভানু, জিনি তনু, বালক কোলে দোলে’) যেন ম্লান করে দেয়। এমন আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যপটের সামনে মেনকাও আত্মহারা হয়ে যান। এক বিমূঢ়-বিহ্বল দর্শকের মতো মনে মনে ভাবেন ‘উমারে দেখি, কি উমার কুমারে দেখি,/ কোন রূপে সঁপিয়ে রাখি নয়ন-যুগলে’, অর্থাৎ মাতা এবং পুত্র দু’জনেই এত সমুজ্জ্বল, প্রদীপ্ত এবং জ্যোতির্ময় যে কাকে ছেড়ে কাকে দেখবেন মেনকা যেন কিছুতেই তা স্থির করতে পারেন না! এই অনির্ণেয়তা আখেরে গণেশ ও গণেশ-জননীরই শোভাবর্ধক। মা কিংবা ছেলে কার রূপ যে মেনকা নয়নে ধরে রাখবেন, তা নির্ধারণ করতে পারেন না। এই অক্ষমতা কার্যত গণেশ এবং গণেশ-জননীকে সম-গুরুত্বে (‘দাশরথি কহিছে রাণি! দুই তুল্য দরশন’) স্থাপন করেছে। পার্বতী এবং তাঁর ক্রোড়ে স্তন্যপানরত গণেশ বাহ্যত দু’ই পৃথক অস্তিত্ব হলেও ভক্তের দৃষ্টিতে এক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক স্তরে সেই ভেদরেখা মুছে গেছে। মাতা-পুত্রের এই অবিনাবদ্ধ মিলনেই (‘হের ব্রহ্মময়ী, আর ঐ ব্রহ্ম-রূপ গজানন,/ ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে, বসেছে মা ব’লে’) গণেশ-জননী-রূপের সর্বোত্তম সিদ্ধি। ব্রহ্মরূপ ভগবতীর কোলে ব্রহ্মরূপ গজাননের অধিষ্ঠান যেন দুই দেবতাকে ‘এক’ ব্রহ্মস্বরূপে উপস্থাপন। বর্ণনায় শক্তিমতী মাতৃদেবীর ক্রোড়াসীন শিশুপুত্র-রূপে গণেশের রূপায়ণ ঘটলেও তাঁর ব্রহ্মত্বের সামান্য অবলোপও ঘটেনি, বরং পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পার্বতী ‘ডমিন্যান্ট পাওয়ার’ হয়েও তাঁর সামনে পুত্ররূপ গণপতি একেবারেই ‘সাবঅর্ডিনেট’ হয়ে যায় নি। পার্বতী-ক্রোড়ে গণেশ হয়তো সদ্যোজাত শিশুরূপে অবতীর্ণ, কিন্তু তাতে তাঁর গুরুত্ব এতটুকুও ম্রিয়মান হয় না। শিশুপুত্র-রূপে উপস্থাপনা সত্ত্বেও দাশরথি তাঁর ইনিডিভিজ্যুয়ালিটি বা স্বাতন্ত্র্য সর্বাবস্থায় রক্ষা করেছেন। এখানেই পদটির অভিনবত্ব। তত্ত্বদৃষ্টিতে বিচার করলে দেখব, যিনি গাণপত্য সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ দেবতা, বেদপ্রতিপাদ্য পরমব্রহ্মরূপ গজানন, তিনিই প্রকারান্তরে বঙ্গীয়

শাক্ত-সংগীতে ‘বাল-রূপ’ পরিগ্রহ করে জননী-সংসর্গে অবস্থান করেছেন। এই অর্থেই গণপতি এখানে ‘পুত্র-ব্রহ্ম’ পদবাচ্য। বৎসল ভক্তিরসের আধারে পরবিদ্যাতত্ত্ব জগন্মাতাকে মেনকা যেমন ‘কন্যা’-রূপে লাভ করেছেন, ব্রহ্মময়ী শ্রীশ্রীদুর্গাও তেমনি ‘গণপতি’র সন্তান-স্বরূপের মধ্যে ব্রহ্মসন্দর্শন করেছেন। শাক্ত এবং গাণপত্য সম্প্রদায়ের এই দুই সর্বোচ্চ দেবতার একাসনে অধিষ্ঠানের মধ্যে এক অদ্বয় ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের কল্পনা অভিব্যক্ত। অন্তত একটি ক্ষেত্রে পুত্ররূপে গণেশকে স্বীকার করেও শক্তি-কাল্ট-এর সমক্ষে দাশরথি তাঁর মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

৩। দাশরথির পাঁচালির ‘মঙ্গলাচরণ’[২১৪] অংশটি গণেশ-বন্দনা দিয়েই আরম্ভ হয়েছে। স্মার্ত হিন্দু-বাঙালির ধর্মজীবনে পঞ্চোপাস্যের প্রথম উপাস্যকে সর্বাগ্রে অর্চনা করার রীতি পুরাণাদি-স্মৃতিশাস্ত্র-বিহিত। ফলত, মঙ্গলাচরণের সূচনায় গণপতি-স্মরণের মধ্যে শাস্ত্রানুসরণ চোখে পড়ে। সিদ্ধিপ্রদ হস্তীমুখ (‘সিদ্ধি করিবারে আশ,/ করি বড় অভিলাষ,/ করিবর-বদনে প্রণতি’) গণেশকে প্রণতি নিবেদন করে পাঁচালিকার দাশরথিও সিদ্ধিলাভ করতে চেয়েছেন। তিনি গণেশকে ‘অগতির গতি’-রূপে সম্বোধন করে তাঁর কাছে গতিময়তার (‘অগতির গতি গতি,/ নমামি, মানস অতি,/ শীঘ্রগতি গতির সঙ্গতি’) আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। বোঝা যায়, উদ্দিষ্ট বন্দনাটি আয়তনে কেবল সংক্ষিপ্তই নয়, এর মধ্যে তেমন কোনও বৈচিত্র্যও ফুটে ওঠেনি। পাঁচালিগান আরম্ভের পূর্বে সর্বপ্রথম সিদ্ধিদাতা গণেশের বন্দনা করার প্রথাগত রেওয়াজ এর মধ্যে অনুসৃত হয়েছে।

প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে রচিত এই প্রারম্ভিক গণেশ-বন্দনাটি বাদ দিলে দাশরথি তাঁর ‘বিবিধ সঙ্গীত’ শীর্ষক গীতিগুচ্ছের প্রথম মাহাত্ম্য-সংগীতটি গণেশের বন্দনা দিয়েই আরম্ভ করেছেন। শ্রীশ্রীগণেশ-বিষয়ক’[২১৫] শিরোনামাঙ্কিত এই মাহাত্ম্যগীতিতে দেবমণ্ডলে প্রথম-পূজ্যরূপে গণেশের অবস্থান লক্ষ করা যায়। ভারতীয় ধর্মসাহিত্যে এবং বিশেষভাবে বঙ্গদেশে সংকলিত স্মৃতি-পুরাণাদি-শাস্ত্রের নির্দেশক্রমে গণেশ পঞ্চোপাস্যের মধ্যে অগ্রগণ্য। কাজেই, তাঁকে প্রথম স্থানে রেখে যে কোনও মাহাত্ম্য-সংগীতের মুখপাত করাই বিধেয়। দাশরথিও অক্ষরে অক্ষরে সেই শাস্ত্রনির্দেশ মান্য করেছেন। তবে আলোচ্য গানটি মঙ্গল-সাহিত্যের চিরাচরিত ‘বন্দনা’গুলির মতো প্রায় স্তোত্র-কবিতাধর্মী ভাবগম্ভীর কোনও উচ্চারণ হয়ে ওঠেনি। অনুপ্রাস-যমকের সার্থক ব্যবহারে আলঙ্কারিকতাময়, ভাবরস-সমৃদ্ধ হয়েও শেষপর্যন্ত এর আবেদন অনেকখানি হৃদয়বেদ্য, আন্তরিক। পুরাণ অথবা তন্ত্রশাস্ত্রের অনুসরণে নৈর্ব্যক্তিকভাবে গণেশের দেহাবয়ব, বাহুভূষণ, আয়ুধ, কিংবা তাঁর গুরুত্বের উপস্থাপনা এখানে ধরা পড়েনি। বরং প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকেই পাঁচালিকার দাশরথি নিজেকেই যেন বর্ননাটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। গানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে রচয়িতার এই আত্ম-সংযুক্তি মধ্যযুগীয় গণেশ-বন্দনার প্রথাগত ফর্ম

থেকে উদ্দিষ্ট বর্ণনাটিকে অনেকখানিই আলাদা করে দিয়েছে। গানের অন্তর্বয়নে উপাস্যের সঙ্গে ভক্ত-কবির অনুভূতি বিনিময়ের মধ্যে একধরনের পার্সোনাল টোন চোখে পড়ে, যা পূর্ববর্তী ধারায় তেমন একটা মিলবে না। মাহাত্ম্য-গীতির ধরনে লেখা এ তো প্রায় আত্ম-সংলাপই, যার পরতে পরতে গণেশের প্রাধান্যের পরোক্ষ ঘোষণা আছে। কার্যত এ'টি স্বগত-সংলাপের ঢঙে কল্পিত গণেশের প্রতি দাশরথির ভক্তিনম্র অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনের একটা অন্যতর প্রকাশভঙ্গি, সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে একটা 'দৃষ্টান্ত'-এর নির্মাণ। এর উদ্দেশ্য একদিকে যেমন নিজের গণেশ-মাহাত্ম্য সংক্রান্ত অনুভব শ্রোতাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া, তেমনই পরোক্ষে গণেশ-পূজনের গুরুত্বটাও এক থেকে বহু-তে সঞ্চারিত করে দেওয়া। এই নতুনতর ঝোঁকটাই আলোচ্য বন্দনাটিকে স্বতন্ত্র করে দেয়। ভক্ত-কবির নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলা কথাগুলোর মধ্যে মধ্যে যাবতীয় গুরুত্ব সমেত উদভাসিত হচ্ছেন গণেশ : 'মানস! -- গণেশ ভাব না!/ ভাবিলে তব রবে না, --/ রবি-সুত-ভাবনা' অর্থাৎ ব্যক্তি-মানস গণেশের নাম স্মরণমাত্রেই 'রবি-সুত' অর্থাৎ গ্রহরাজ শনিদেবের গ্রহদোষ-জনিত অমঙ্গল থেকে মুক্ত হবে। পরবর্তী অংশে দেবায়তনে গণেশের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় : 'সানন্দে সদা সাধে সুরেন্দ্র ঝাঁকে' অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও হৃষ্টচিত্তে তাঁর আরাধনা করেন। এই হস্তীমুখ পার্বতী-পুত্র গণেশ ('গিরীন্দ্র-সুতা-সুত করীন্দ্রমুখে') সর্বপূজ্য তো নিশ্চয়ই, এমনকি সিদ্ধিপ্রদও ('যদি করিবে সিদ্ধি কামনা') বটে। তাঁর পূজা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। সেই খর্বকায় দেবতা আর্তজনের দুঃখ খর্ব করে ('ভাব,--- খর্ব্বদেহ দুঃখ খর্ব্বকারীরে,/ হবে সর্ব্ব সুখ তব লভ্য শরীরে') সর্বসুখ প্রদান করেন। তাঁকে ধ্যান করলে সাধক দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হন। সর্বগুণাধার গণেশ মোক্ষদাতা ('মুক্তি-কারণ, গুণযুক্ত হৃদয়') প্রভু। তিনি ভক্ত-বৎসল ('প্রভু,--- ভক্ত কায়-অনুরক্ত ভক্ত প্রিয়')। তাঁর গজবক্ত্রে গুণের ('ব্যক্ত গুণনিধি-বক্রে') সম্প্রকাশ। শরণাগত ভক্তের কাছে তিনিই আশ্রয়স্থল। তাঁর সাধনা করলে মুক্তিলাভ ('সতত লভে মুক্তি --- সাধে যে জনা') অবশ্যম্ভাবী।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, অষ্টাদশ শতকের শাক্ত পদাবলীর সূত্রে বাংলার গণেশ-কাল্ট-এর চারিত্র-লক্ষণগুলি সনাক্ত করার ক্ষেত্রে দু'টি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। **এক,** শাক্ত সংগীতে পার্বতী এবং গণেশ 'মাতা-পুত্র' সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত। ফলত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গণপতি শক্তি-কাল্ট-এর মধ্যে অধিগৃহীত হয়েছেন। এতে গণেশের ইনডিভিজুয়্যালিটি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে ঠিকই, তবে সন্তান-রূপেই যেখানে তাঁর প্রকাশলাভ, সেখানে মাতৃ-সন্নিধানে কিছুটা প্যাসিভ অথবা অধীন হয়ে থাকা ছাড়া তাঁর অন্য গতি নেই। গাণপত্য সম্প্রদায়ের ছয়টি

শাখার মধ্যে বঙ্গদেশীয় 'সন্তান-গণপতি'-র ধারাটিকে মাদার কাল্ট-এর সংস্রবে সবচেয়ে স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষরূপে এই সাহিত্য-প্রকরণেই চিহ্নিত করা সম্ভব।

দুই, একমাত্র দাশরথির পাঁচালির কয়েকটি গানে এবং একটি শাক্ত সংগীতে ('গিরি, গণেশ আমার শুভকারী') গণেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। দাশরথিই কার্যত শক্তি কাল্ট-এর supremacy–এর মধ্যেও গণপতিকে সম্পূর্ণ আবৃত হতে দেননি। তাঁর রচনায় শক্তির পাশে গণেশেরও একটা সমান্তরাল অধিষ্ঠান চোখে পড়বে। পার্বতীর পুত্র হয়েও এখানে তিনি পূর্ণ মর্যাদার দাবিদার। সংখ্যায় ন্যূন হলেও 'ব্রহ্মময়ী' মাতৃদেবীর সঙ্গে 'পুত্র-ব্রহ্ম'-বাচ্য গণপতির এই সহাবস্থান বঙ্গীয় গণেশ কাল্ট-এর এক অন্যতর অভিমুখকে চিনিয়ে দেয়।

৩.১০

গণেশ-কেন্দ্রিক ব্রতাচার ও পূজাপার্বণ

বঙ্গীয় ধর্ম-পরম্পরায় 'গণপতি' বা 'গণেশ' একটি বিবর্তিত ধারণার যোগফল। প্রথমত ঋগ্বেদোক্ত অনেকান্ত 'গণপতি'-এর ধারণা, দ্বিতীয়ত পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে (*মৈত্রায়ণী সংহিতা, তৈত্তিরীয় আরণ্যক* প্রভৃতি) উল্লিখিত 'হস্তীমুখ', 'দন্তী' নামধেয় একাধিক theriomorphic elephant deity–র ধারণা এবং তৃতীয়ত বেদ-পরবর্তী *মানবগৃহ্যসূত্র*-এর বিঘ্নঘটনপটু বহুবচনান্ত 'বিনায়ক' থেকে প্রাক্-মহাকাব্য যুগের *যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা*-য় রুদ্র এবং ব্রহ্মার দ্বারা এক গণাধিপত্যে নিযুক্ত হওয়া ও ধারাবাহিকভাবে malevolent থেকে benevolent স্তরে ক্রমোত্তীর্ণ 'গণপতি-বিনায়ক' খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে পুরাণের 'গণেশ'-এ সমাপতিত হয়েছেন।[২১৬] কাজেই, পৌরাণিক হস্তীমুখ, সর্বসিদ্ধিপ্রদ, অগ্রপূজ্য গণেশের মধ্যে নিঃসন্দেহে নানা পরস্পরবিরোধী মাত্রার একীকরণ ঘটেছে। এই পুরাণোক্ত বিঘ্নহর্তা গণেশের বঙ্গদেশে অনুপ্রবেশ আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকের আগে নয়। প্রথম পর্বে অবশ্য বঙ্গদেশীয় গণপতি স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাস্যের (অগ্নি-সূর্য-শিব-বিষ্ণু-শক্তি) বর্গভুক্ত ছিলেন না। মৈথিল স্মৃতিনিবন্ধ প্রমাণে তিনি দক্ষিণ দিকপাল।[২১৭] দিকবন্ধনে তাঁকে স্মরণ করে সাধনবিঘ্ন এড়াতে হয় ('দক্ষিণে গণেশায় নমঃ')। পরবর্তীকালে রঘুনন্দনের বিধানে অগ্নির পরিবর্তে গণেশ প্রথমপূজ্য রূপে পঞ্চোপাস্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ফলে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকেই বঙ্গীয় পূজাবিধানে, বিশেষত স্মার্ত হিন্দু পরম্পরায় 'আদিপূজ্য' হিসেবে গণেশ গৃহীত হয়ে যাচ্ছেন। তন্ত্রমার্গে অবশ্য গণপতির স্থায়ী আসন প্রথম থেকেই পাতা। ইসলাম-পূর্ব সময় থেকেই পূর্ববঙ্গে গাণপত্যের ছয়টি শাখার মধ্যে উচ্ছিষ্ট গণপতির সাধনা-ক্রম বামাচারী তান্ত্রিকী কৃত্য হিসেবে সুপ্রচলিত ছিল। এখানে মনে রাখতে হবে, মধ্যযুগের বঙ্গদেশে যে গণেশ বা গণপতি প্রথমপূজ্য

রূপে আদিদেবের স্থান পেলেন, তিনি অবশ্যই পৌরাণিক সিদ্ধিদাতা। যে কোনও দেবতার পূজার আগে তাঁর পূজা বিধেয়। হিন্দু বাঙালির প্রাত্যহিক ধর্মাচরণে, যে কোনও শুভারম্ভের মুহূর্তে বুদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং সাফল্য লাভের কামনায় শিব-গৌরীপুত্র বিঘ্নবিনায়কের অর্চনা অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মণের বাচনে 'গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্য নমঃ' দিয়েই হিন্দু বাঙালির পূজার্চনার শুরু। তবে গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে গণেশ এতটা অনিবার্য, বাধ্যতামূলক বলেই বোধহয় তাঁর অবস্থানও এক অর্থে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। তা ছাড়া শক্তি কাল্ট, শৈব কাল্ট এবং বৈষ্ণব কাল্ট বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতিতে প্রথম থেকেই অতিমাত্রায় সক্রিয় থাকায় গণপতির স্বাতন্ত্র্য যেমন ব্যাহত হয়েছে, তেমনি তাঁর পৃথক কোনও উপাসক গোষ্ঠী বা একভক্ত সম্প্রদায়ও গড়ে ওঠেনি। উপরন্তু, ধীরে ধীরে গণপতি ওই তিন প্রধান ধর্মধারার সঙ্গে merged বা অ-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। এই যোগবন্ধনের ফলেই তিনি কার্যত 'সহ-দেবতা'য় পরিণত। কখনও লক্ষ্মীর সঙ্গে ('লক্ষ্মী-গণেশ'), কখনও দুর্গার সঙ্গে ('গণেশ এবং গণেশ-জননী') একাসন-যুক্ত হয়েই তাঁকে অস্তিত্বরক্ষা করতে হয়েছে। প্রথমপূজ্য হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ওই 'আদিদেব' হওয়াটাই তাঁর সর্বনাশ এবং সর্বস্ব। পুরাণ-প্রমাণে তাঁর অগ্রমুখ্য হওয়াটাও নির্দিষ্ট কোনও উৎসব-পার্বণে একা একা পূজা পাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট কমিয়েছে। প্রথমে পূজা পান বলে তিনি সব পূজাতেই আছেন। ঘরে ঘরে হররোজ পূজা পাচ্ছেন। অনেক পরিবারে গণেশ কুলদেবতা বা গৃহদেবতা হিসেবেও সম্মানিত। তারা একনিষ্ঠভাবেই গণপতির সেবক। এই ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্তরগুলি ছাড়া বিশেষভাবে, আলাদা করে, একমাত্র তাঁকেই কেন্দ্র রেখে বৃহত্তর কোনও সামাজিক বা ধর্মীয় উৎসবের রেওয়াজ বঙ্গদেশে সচরাচর চোখে পড়ে না। বাঙালি জীবনের দৈনন্দিনতায়, প্রাত্যহিক পূজাবিধিতে গণেশের বাধ্যবাধকতাই হয়তো সাড়ম্বরে তাঁর একক উৎসব-যাপনকে কিছুটা ম্লান করেছে।

বাংলার সামাজিক পরিসরে গণেশ-কেন্দ্রিক ব্রতাচারের চল ততখানি পরিব্যাপ্ত অর্থে নেই। তবে বঙ্গীয় পুরাণে, তন্ত্রে, হিন্দু পঞ্জিকায় কিংবা ব্রতকথায় প্রায় সারাবছর ধরেই গণেশ-পূজার বিভিন্ন নির্দেশ, শাস্ত্রীয় খুঁটিনাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার গণেশ আদ্যন্ত পৌরাণিক দেবতা। লোকসমাজের সর্বস্তরেই তাঁর অনায়াস গতায়াত। বঙ্গদেশীয় পুরাণ-কথার ঐতিহ্যে তিনি যেমন বর্তমান, তেমনি তন্ত্রমার্গেও তাঁর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। *পুরোহিত-দর্পণ* গণেশ পূজার সময়কাল নির্দেশ করেছে : 'মাসি ভাদ্রপদে শুক্লে চতুর্থ্যাং পূজয়েন্নৃপ।/ মাসি মাঘে শ্রাবণে বা মার্গশীর্ষেহথ বা ভবেৎ।।'[২১৭] অর্থাৎ গণেশ পূজা বছরে একবার নয়; ভাদ্র, মাঘ, শ্রাবণ এবং অগ্রহায়ণ মিলিয়ে

মোট চারবার পালিত হয়। পুরাণভারতী ধনপতি হালদার লিখিত *শ্রীশ্রীগণেশাষ্টোত্তরশতনাম*-এরও সিদ্ধান্ত তাই।[২১৯] প্রথমে এইসব শাস্ত্রীয় গণেশ-ব্রতের পরিচয় দেওয়া যাক।

ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে গণেশের পূজা বিধেয়। সংস্কৃত, কন্নড়, তামিল ও তেলেগু ভাষায় এই উৎসব 'বিনায়ক চতুর্থী' বা 'বিনায়ক চবিথি' নামে পরিচিত। কোঙ্কণি ভাষায় এই উৎসবের নাম 'চবথ' এবং নেপালি ভাষায় 'চথা'। সাধারণত চতুর্থী ২০ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোনও একদিন পড়ে। দশদিনব্যাপী গণেশোৎসবের সমাপ্তি হয় অনন্ত চতুর্দশীর দিন। এই দিন গণেশের বেশিরভাগ অবতারের আবির্ভাব তিথি। ফলে গাণপত্যদের কাছে দিনটির সবিশেষ গুরুত্ব। *স্কন্দপুরাণ*-প্রমাণে এই দিনটি গণেশের জন্মদিবস রূপেও পালিত হয়। কিন্তু রচনা এবং সংকলন সূত্রে *স্কন্দপুরাণ*-এর সঙ্গে পশ্চিমভারত এবং দাক্ষিণাত্যের সংযোগ যতটা, বাংলার ততটা নয়। হিন্দু পঞ্জিকায় এই দিন 'সিদ্ধিবিনায়ক-ব্রত', 'বিনায়ক ব্রত' বা 'গণেশ চতুর্থী' ব্রত হিসেবে উল্লিখিত। এই 'গণেশ চতুর্থী' ব্রতের পরিচয় দিতে গিয়ে অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন লোকাচারমূলক কৃত্যের উল্লেখ করেছেন : 'There is a folk ritual in some parts of the country as the *Ganesa Chaturthi Vrata.* Its performance is spread over a number of days, beginning from the fourth day of the month of Bhadra (August-September). The most remarkable feature of the ritual, however, is that though its name is still associated with a male god, he has practically very little to do with the ritual itself.'[২২০] গণেশের ব্রাত্য হওয়ার কারণ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনেই তাঁর মূর্তি গৌরীর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। 'গৌরী' এখানে শস্যগুচ্ছের প্রতীকে ('bundle of plants') অবতীর্ণ।[২২১] এর মধ্যে ferility–সংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষা অনুস্যূত থাকায় অনেকে একে নারীকেন্দ্রিক লোকাচারের গোত্রভুক্ত করেছেন। *The Indian Antiquary* (Vol. 35, 1906)-তে প্রকাশিত 'Harvest Festival in Honour of Gauri and Ganesh' শীর্ষক প্রবন্ধে বি. এ. গুপ্তে এই শস্যোৎসবের সঙ্গে পার্বতী ও গণেশের সংলগ্নতা বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন।[২২২] যদিও বাঙালি ভাদ্র চতুর্থীকে 'সিদ্ধিবিনায়ক-ব্রত' হিসেবেই জানে। *পুরোহিত দর্পণ*-এ এর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।[২২৩] ভাদ্রপদ শুক্লপক্ষ চতুর্থী মধ্যাহ্নব্যাপিনী পূর্বাবিদ্ধ---এই পূজার প্রশস্ত সময়। চতুর্থী দু'দিন পড়লে আগের দিন পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এমনকি দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নের পুরোটাই যদি চতুর্থী থাকে, তবুও আগের দিন মধ্যাহ্নে এক ঘটিকা বা ২৪ মিনিট চতুর্থী থাকলে সেই দিনই গণেশ পূজা করা হয়। ভাদ্র চতুর্থীতে চন্দ্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞাও একটি স্মার্ত কৃত্য। রঘুনন্দনের *তিথিতত্ত্বম্*-

এর চতুর্থীর বিধানে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[২২৪] চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁর *হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান* গ্রন্থে এই 'নষ্টচন্দ্র' জাতীয় আচারকে ঐচ্ছিক অনুষ্ঠান এবং আঞ্চলিক উৎসবের পর্যায়ে ফেলেছেন।[২২৫] তবে একথা ঠিক, দক্ষিণায়ণের এই ভাদ্র চতুর্থী তন্ত্রকাল বলে বঙ্গদেশে এটি তান্ত্রিকী গুপ্তকৃত্য হিসেবেও প্রসিদ্ধ। প্রমাণ *শারদাতিলক* এবং মুকুন্দ চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল*। বিধান যাই থাকুক, আসল কথা হল সামাজিক পরিসরে ভাদ্র-চতুর্থীর সাড়ম্বর উদযাপন নেহাতই হালফিলের কার্যক্রম। মুষ্টিমেয় কতকগুলি পারিবারিক ক্ষেত্র ছাড়া এই চতুর্থীর রমরমা বঙ্গদেশে কোনওদিনই ছিল না।

মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থী 'বরদা চতুর্থী', 'বিনায়ক চতুর্থী' অথবা 'সৌভাগ্য চতুর্থী' নামে পরিচিত। *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ* অনুসারে এই মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীকেই বঙ্গদেশে গণেশের আবির্ভাব তিথি ধরা হয়। ফলে পৌরাণিক কৃত্য হিসেবে শ্রীপঞ্চমীর পূর্বদিনটিকে অনেকেই গণেশের জন্মতিথি হিসেবে পালন করে থাকেন। এই দিন চিনির নাড়ু বানিয়ে গণেশকে ভোগ নিবেদন করা হয়। এ ছাড়া বাংলার তান্ত্রিকী পরম্পরায় মাতঙ্গী বা নীল সরস্বতীর সঙ্গে উচ্ছিষ্ট গণপতির বিবাহদিবস হিসেবে এই দিনটি (মতান্তরে চৈত্র শুক্লা ষষ্ঠী) 'গণপতিরাত্রি' নামেও পালিত হয়। তবে বাংলার বাইরে গাণপত্যদের কাছে এই দিন গণপতি-কুলের আদিশক্তি 'বৈনায়কী'র আবির্ভাব তিথি। এ ছাড়া অদিতি-গর্ভজাত কাশ্যপেয় মহোৎকট গণপতি, দিতি-গর্ভজাত চতুর্ভুর্জ অসুর বিনায়ক প্রমুখ মুখ্য গণেশাবতারগণ এই দিনেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। কাশীস্থিত ঢুণ্ঢিরাজ বিনায়কের বাৎসরিক উৎসবও এই দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

ভাদ্র এবং মাঘ চতুর্থী বাদ দিলে শ্রাবণ চতুর্থীতে গাণপত্যরা 'দুর্বা গণপতি'-র পূজা করেন। অনেক বাঙালি বাড়িতে অগ্রহায়ণ চতুর্থীতে নতুন চালের ভোগ দিয়ে লক্ষ্মী-গণেশের আরাধনা করা হয়। যদিও এই দিনটি গাণপত্য পরম্পরায় পুষ্টিলক্ষ্মী ও অন্নলক্ষ্মীর স্বামী 'অন্ন বিনায়ক'-এর পূজা দিবস হিসেবে প্রসিদ্ধ।[২২৬]

এর পাশাপাশি বঙ্গদেশে রচিত *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এর 'উত্তরখণ্ড'-এর নবম অধ্যায়ে গণপতি-কেন্দ্রিক দুটি ব্রতাচারের উল্লেখ করা যায়।[২২৭] যেমন,

ফাল্গুন মাসের ব্রত : এই ব্রত 'অবিঘ্নব্রত' বা 'গণেশব্রত' নামে পরিচিত। ফাল্গুনী চতুর্থীতে এই ব্রত গ্রহণের বিধি প্রচলিত। ব্রতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচারগুলি হল – নক্তভোজন, তিলান্ন দ্বারা পারণ, তিলান্ন দ্বারা অষ্ট আহুতি এবং ব্রাহ্মণকে তিলান্ন দান। এই ব্রত কেবলমাত্র একদিবস-কেন্দ্রিক উদযাপন নয়। এর একটি সম্প্রসারিত অংশও

আছে। ফাল্গুনী চতুর্থী পালনের পর একাদিক্রমে চার মাস চতুর্থী ব্রত সম্পন্ন করতে হয়। পঞ্চম মাসে গণেশের সুবর্ণ প্রতিমা নির্মাণ করে তিল পায়েসের পঞ্চপাত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়। ফলস্বরূপ ব্রত পালনকারীর যাবতীয় বিঘ্ন বিঘ্নহর্তা গণেশ দূর করেন। এই ব্রতের স্তববাক্যটি হল : "হে পার্ব্বতীনন্দন! তুমি দিব্যশূর, লম্বোদর, গজানন, একদন্ত, কুঠারপাণি ও শ্রেষ্ঠ, তোমায় নমস্কার"। এই স্তব পাঠ করে ব্রত সম্পন্ন করলে ভক্তের বিঘ্ন দূরীভূত হয়।

আষাঢ় মাসের ব্রত : আষাঢ় মাসের চতুর্থীতেও গণেশের পূজা বিধেয়। তিলদান এবং তিলভক্ষণের মধ্য দিয়ে একটানা দুই বছর ধরে এই ব্রত পালন করতে হয়। তিলমিশ্রিত জল এবং তিলান্ন আহার্যরূপে গ্রহণই এই ব্রতের প্রধান অঙ্গ। ব্রত সুসম্পন্ন হলে হেরম্ব গণেশ প্রসন্ন হয়ে ব্রতপালনকারীর মনস্কামনা পূরণ করেন।

মান্য আলোচক অধ্যাপক রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা এবং কুণাল চক্রবর্তী ত্রয়োদশ শতকের পরবর্তী সময়কেই ('latter half of the thirteenth century') *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এর রচনা এবং সংকলন কাল বলে মনে করেছেন।[২২৮] কাজেই, পুরাণোক্ত গণেশ-ব্রতের বিধান থেকে মনে হয় সমকালীন বঙ্গদেশে নিশ্চিতভাবেই গণেশ-পূজন পরম্পরা বেশ সক্রিয় ছিল। যদিও ব্রতাচারের কয়েকটি বিধান (যেমন, গণেশের স্বর্ণ প্রতিমা নির্মাণ) খেয়াল করলে মনে হয় মুখ্যত সমাজের উচ্চকোটি ও বিত্তশালী অংশের মধ্যেই এই ব্রত সীমাবদ্ধ ছিল।

পুরাণ-বর্ণিত গণেশ-জন্মের আখ্যানগুলির মধ্যে গৌরীর গাত্রমলজাত গণেশের আবির্ভাবই বঙ্গীয়-মানসে সবচেয়ে পপুলার ডিসকোর্স। এই জন্মতিথিকে বাঙালি স্মরণ করে শারদোৎসবের ষষ্ঠীর পুণ্য তিথিতে। একে 'দুর্গা ষষ্ঠীর ব্রত' বলা হয়। বাংলার গৃহস্থ নারীরা সকলেই প্রায় এই ব্রত উদযাপন করে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সংকলিত *মেয়েদের ব্রতকথা*-য় এর সম্পূর্ণ বিবরণ আছে। *মহাভাগবত* এবং *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর আখ্যান-চূর্ণ ভেঙে তৈরি হওয়া এই ব্রতের আখ্যান অংশটি অনুসরণ করলেই বোঝা যাবে আশ্বিন মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে দুর্গা গায়ের ধুলো মিশিয়ে যে পুতুল গড়েছিলেন, যার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে তিনি গণেশকে সৃষ্টি করেছেন, প্রকৃত পরিচয়ে তিনি নারায়ণ। ভগবতীর স্তনপানে ইচ্ছুক বিষ্ণুই ওই নির্মীয়মান পুত্তলিকায় আত্মগোপন করেছিলেন। ফলে দুর্গা ষষ্ঠীর ব্রতকথায় গণেশ স্বরূপত নারায়ণেরই বিকল্পমূর্তি। পরে ঘটনা-পরম্পরায় শনির দৃষ্টিপাতে গণেশের মুণ্ডচ্ছেদ এবং হস্তীমুণ্ড ধারণের বৃত্তান্ত শুনিয়ে কথাটি সমাপ্ত হয়েছে। কথাশেষে সমবেত দেবতাগণ এবং মহাদেবের মুখে গণেশের মাহাত্ম্য উচ্চারিত হয়েছে এইভাবে: " '... সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম করে যাত্রা করলে কারো কোনও বিপদ ঘটবে না। আর আগে তোমার গণেশের পূজা না হলে কোনো দেবতার পূজা হবে না। ... দুর্গা কার্তিক ও

গণেশকে নিয়ে মর্ত্যে এলেন। মেনকাকে বললেন, 'মা! আমি এই ষষ্ঠীর দিন এই দুইটি ছেলে পেয়েছি। যে কোনো স্ত্রীলোক আমার এই কথা শুনে ষষ্ঠীর পালনী করবে, সে আমার মতো পুত্র লাভ করবে।' মা বললেন, 'তাই হবে মা।' সেই থেকে সকলে দুর্গা ষষ্ঠী করে।"[২২৯] অর্থাৎ এই ব্রতের যাথার্থ্য হল মেয়েরা এটি পালন করলে গণেশ-কার্তিকের মতো সন্তান লাভ করবেন। অবশ্য বাংলার বাইরে গাণপত্য পরম্পরায় গৌরীমলজাত বিনায়কের আবির্ভাব তিথি হিসেবে কার্তিক মাসের চতুর্থীকেই গণ্য করা হয়। ওই দিন তারা প্রদীপ জ্বালিয়ে মন্দির সুসজ্জিত করে নারকেল বলি সহকারে পূজা দিয়ে গণেশকে তুষ্ট করেন। উপরোক্ত দুর্গা ষষ্ঠীর কথাটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে অপরাপর ধর্ম-কাল্‌টগুলির দ্বারা বাংলার গণেশ কতখানি suppressed হয়েছেন। শক্তি কাল্‌ট এবং বৈষ্ণব কাল্‌ট-এর নিরন্তর নিষ্পেষণে গণেশের individuality তো ব্যাহত হয়েছেই, উপরন্তু তাঁকে বারবার ওই প্রবল প্রতিস্পর্ধী ধর্ম-কাল্‌টগুলির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে অস্তিত্বরক্ষা করতে হয়েছে। বেদপ্রতিপাদ্য পরমব্রহ্মরূপ গাণপত্য কুলদেবতার কখনও শিব-পার্বতীর পুত্ররূপে, কখনও বা বিষ্ণুর রূপভেদ হিসেবে এই subordination-এর মধ্যেই গণেশের non-sect দেবতা হয়ে ওঠার কারণ নিহিত আছে।

তিন.

বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতিতে গণেশ-কেন্দ্রিক ব্রতাচারের পরিচয় তো পাওয়া গেল, এবার দেখা যাক বঙ্গীয় পূজা-পার্বণে আদিদেব গণেশের ভূমিকা। আগেই বলেছি, বঙ্গদেশে গণেশের একভক্ত-সম্প্রদায় গড়ে ওঠেনি। এই গৌণতার কারণেই তাঁর আত্মপ্রকাশ কিছুটা সীমিত। তবে শক্তি-ক্ষেত্রে দুর্গার সঙ্গে এবং বিদ্যা-ক্ষেত্রে সরস্বতীর সঙ্গে সে'ভাবে পাল্লা দিতে না পারলেও ধনাদি বিষয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে গণেশের সমাসন লাভ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিশেষত অর্থাগম, ধনস্ফীতি, কিংবা সম্পদ-সঞ্চয়ের প্রশ্নে বঙ্গীয় গণেশের একাধিপত্য কুবেরকেও হার মানায়। ফলে ব্যবসাক্ষেত্রে অর্থাৎ বণিক সমাজে তাঁর চিরকালই সমাদর। বাংলার বণিককুলে নববর্ষোৎসবে গণেশের বিশিষ্ট ভূমিকার প্রাসঙ্গিকতা টের পাওয়া যায়। পয়লা বৈশাখ নববর্ষের দিন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব ব্যবসায়ী বিগত বছরের লাভ ক্ষতির হিসাবকে তালাবন্ধ রেখে আবার নতুন করে হিসাবের খতিয়ান নেওয়া শুরু করেন। ফলে গণেশ অথবা লক্ষ্মী-গণেশের মূর্তি বসিয়ে সেই নতুন হিসাবের খাতাগুলিকে পূজা করা হয়। এই খাতা-পূজারও একটি বিধি আছে। ব্রাহ্মণ প্রথমে বসে আচমনাদি সম্পন্ন করে – বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য বৈশাখে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ শুভনববর্ষস্য প্রথম বাসরে অমুক গোত্র অমুক দেবশর্মা অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্মণঃ/ দাসস্য 'গণপতে কৃপয়া বাণিজ্যে সাফল্যং ক্রমোন্নতিঞ্চ কামঃ গণেশস্য পূজনং মহং করিষ্যামি।'[২৩০] —এ'ভাবে বলে সংকল্প

করে ঘটে, খাতায় বা শালগ্রামে বা জলে গণেশ, লক্ষ্মী, সিদ্ধি, বুদ্ধি, লক্ষ্য ও লাভের পূজা করেন। এরপর নতুন খাতা খুলে প্রথম পাতার মাঝখানে সিঁদুর দিয়ে পুত্তলি এঁকে তার দু'পাশে দুটি স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে তার পাশে বা তলায় দুটি টাকা নিয়ে একটি চন্দন দিয়ে ও অন্যটি সিঁদুর দিয়ে ছাপ দিয়ে তার ওপর দুটি সিদ্ধি ছড়িয়ে একটি বেলপাতা ও ফুল দেওয়া হয়। তার তলায় 'ওঁ সিদ্ধিদাত্রে গণেশায় নমঃ' লিখে তার নিচে নিজের ইষ্টদেবতার নাম লিখে খাতা বন্ধ করা হয়। খাতাতে গণেশকে স্মরণ করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করে দক্ষিণান্ত করা হয়। তবে এটি শুধু খাতা পূজার নিয়ম। মূর্তি থাকলে মূর্তিতেই পূজা করা হয় এবং যারা ঘট বসিয়ে পূজা করেন তাদের মণ্ডল করে যথারীতি পঞ্চপল্লব, ডাব, গামছা দিয়ে বসিয়ে তীর কাঠি বেষ্টন করতে হয়। এরপর মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ঘট স্থাপন করে যথানিয়মে পূজা ও আরতি এবং হোমের আয়োজন থাকলে হোমও করা হয়। এ'ভাবেই বাংলা বছরের শুরুর দিনটিতে শ্রীবৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের কামনায় সিদ্ধিদাতা গণেশ পূজা বাংলার ব্যবসায়ী মহলে সমাদৃত হয়ে আসছে। অর্থনৈতিক লাভালাভের প্রশ্নে গণেশের পূজা যে কতখানি অনিবার্য এই জাতীয় অনুষ্ঠানই তার প্রমাণ। সাম্প্রতিককালে কিছুক্ষেত্রে উদ্‌যাপনের আড়ম্বর একটু কমলেও নিয়ম পালনের আবশ্যকতাটুকু প্রায় ছেদবিহীন পরম্পরায় চলে আসছে।

গবেষক কল্পনা চট্টোপাধ্যায় তাঁর *Minor Religious Cults and Sects in Bengal (From C.4th Century to 12th Century A.D.)* শীর্ষক অভিসন্দর্ভে বাংলার গণেশ কাল্‌ট বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে একজায়গায় বলেছেন, 'No temple dedicated to the god Ganesa is yet known to have been discovered in Bengal. It seems to indicate that Ganesa, inspite of his popularity, has not been accorded the position of major deity.'[২৩১] একথা ঠিকই যে বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতকের মধ্যে এককভাবে গণেশের জন্য উৎসর্গীকৃত কোনও মন্দিরের সন্ধান পাওয়া খুবই কঠিন। কারণ, তখনও পর্যন্ত গণেশ স্মার্ত হিন্দুর অভীষ্ট দেবতা-পঞ্চকের 'আদিদেব' রূপে স্বীকৃতই হননি। তবে পরবর্তীকালের বঙ্গদেশে যে গণেশের এই খামতিটুকু ঘুচেছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শান্তিপুরের সূত্রাগড়ে কে. বি. সাহা রোডে অবস্থিত বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী গণেশ মন্দির।[২৩২] এটিই সম্ভবত বাংলার একমাত্র গণেশ মন্দির যেখানে গণপতিই মূল বা কেন্দ্রীয় দেবতা। তখনকার বিশিষ্ট সমাজসেবী কার্তিকচন্দ্র দাস (সাধারণ্যে কে. সি. দাস নামেই তিনি পরিচিত) এক সাধুর নির্দেশে কাশী থেকে শ্বেতপাথরের তৈরি গণেশমূর্তি এনে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। চতুর্ভুজ গণেশের বাঁ-দিকের ওপরের হাতে ত্রিশূল ও নিচের হাতে পদ্ম এবং ডান দিকের ওপরের হাতে সর্প ও নিচের হাতে

অক্ষমালা বিদ্যমান। আয়ুধসজ্জায় শৈব প্রভাবের লক্ষণ স্পষ্ট। আসনমূর্তিতে গজানন উপবিষ্ট। পার্শ্ববর্তী বেদিকায় বাহন ইঁদুর জোড়হাতে দণ্ডায়মান। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মন্দিরের জৌলুস আগের চেয়ে অনেকটা কমলেও এখনও নিয়মিত পূজা এবং বিশেষ তিথিতে গণেশের স্নান, নতুন বস্ত্র পরিধান, ষোড়শপচারে পূজা, হোম এবং ভোগের ব্যবস্থা হয়। মন্দির প্রতিষ্ঠাতা কে. সি. দাস মহাশয়ের পরিবার বর্তমানে শান্তিপুরের বসতবাড়ি বিক্রি করে চলে গেলেও মন্দিরটি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে পারিবারিক পুরোহিতের তত্ত্বাবধানেই রয়ে গেছে। বর্তমানে এখানে বংশানুক্রমে শঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে গণেশ পূজিত হচ্ছেন। শঙ্করবাবুর কথা থেকে জানা গেছে, এই মন্দিরে ভাদ্র চতুর্থী এবং আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে গণেশের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত স্থানীয় ভক্তদের সমাগমে মন্দিরটি আজও অস্তিত্বরক্ষা করে চলেছে। (চিত্র ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭)

এবার একটু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। অনেকেই জানেন, বঙ্গদেশ শক্তি উপাসনা এবং শাক্ত সংস্কৃতির আদিকেন্দ্র। ফলে বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতির বহু ক্ষেত্রে গণেশের উপস্থাপনা হয়েছে শক্তি-সাপেক্ষে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঙ্গীয় গণেশ দুর্গা তথা পার্বতীর পুত্ররূপে এক চালচিত্রে পূজিত হন। বিভিন্ন জেলায় জেলায় পারিবারিক অথবা সামাজিক উৎসবে গণেশ-জননীর মূর্তিটি অত্যন্ত সমাদৃত। অনেক বাড়িতে দুর্গাপূজার সময়ে দশভুজা রণংদেহী মূর্তির বিকল্প হিসেবে এই 'গণেশ-জননী'-র পূজা করা হয়ে থাকে। কখনও স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে, কখনও বা সন্তান কামনায় ভক্তরা গণেশ-জননীর শরণাগত হন। বাংলার দুর্গা যেখানেই মাতৃরূপে প্রকাশিত, সেখানেই তিনি গণেশ-জননী রূপে সার্থকনামা। গণেশও এ'সব ক্ষেত্রে 'বাল'-রূপেই সাধারণ্যে গৃহীত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

পুরুলিয়ার কাশীপুরের পঞ্চকোট রাজপরিবারের রাজকর্মচারী অকিঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাসভূমি মনিহারায় তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে পুরুষানুক্রমে গণেশ-জননী পূজিত হচ্ছেন।[২৩৩] এই পূজার উৎসে আছে একটি স্বপ্নাদেশের প্রসঙ্গ। অকিঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতি ও তাঁদের গুরুদেব যোগেন্দ্র ভট্টাচার্যকে মা দুর্গা কাশী যাওয়ার স্বপ্নাদেশ দিলে তাঁরা কাশী গিয়ে গণেশ-জননীর দর্শন লাভ করেন। এরপর গ্রামে ফিরে এসে তাঁরা এই পূজার প্রচলন করেন। গণেশ এখানে দেবী পার্বতীর ক্রোড়মধ্যে সদ্যোজাত 'বাল'রূপে বিরাজমান। পার্বতী এখানে মহাদেব সহ অবস্থান করেছেন। শিবের পাশে যথাক্রমে নন্দী এবং পার্বতীর পাশে জয়া দণ্ডায়মান। ঠিক যেন সুখী গৃহকোণের আদর্শে নির্মিত একটি সম্পূর্ণ চালচিত্র। তবে মাতৃপ্রতিমা থাকলেও গণেশ-জননীর পাশের বেদীতে ঘট ও পটে আঁকা দুর্গাপূজা হয়। কার্যত এটাই এই রাজকর্মচারী পরিবারের আদি দুর্গাপূজা। পরিবারের সদস্য আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'এই গণেশ-জননী আমাদের গ্রাম মনিহারা ও কাশী ছাড়া আর কোথাও

নেই। এখনও ঐতিহ্য মেনে এই পুজো আমরা করে আসছি।'' পারিবারিক পূজা হলেও সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলের মানুষ এই পূজায় আগ্রহভরে সামিল হন। একসময় অকিঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এই মনিহারার পত্তন করেছিলেন। ফলে পূজার সমস্ত খরচ আজও দেবোত্তর সম্পত্তি থেকেই নির্বাহ হয়। রাজপরিবারের সঙ্গে সংস্রব থাকায় আয়োজনেও বিশেষ রাজকীয়তা চোখে পড়ে। একসময় পঞ্চকোট রাজবাড়ি থেকে তোপ দেগে এই পূজার সন্ধিক্ষণ ঘোষণা করা হত। বর্তমানে অবশ্য একটি মাটির জল ভরা পাত্রে ছিদ্র যুক্ত তামার বাটি ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সেই বাটি জল ভর্তি হয়ে ডুবে গেলেই পূজার ক্ষণ নির্ধারিত হয়। অতীতে পূজার সময় শিবের গান, ছাগবলি এবং বিজয়ার পরে লাঠিখেলা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এ'সবের অভাব ঘটলেও ঐতিহ্যে ভর করে গণেশ-জননীর পূজা আজও অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। (চিত্র ৩৮)

শান্তিপুরের কাঁসারি পাড়া এলাকার গণেশ-জননী পূজাও বেশ জনপ্রিয়। শান্তিপুরের ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায় আজ থেকে প্রায় একশো পঁয়ষট্টি বছর আগে নদীয়ার শান্তিপুর বড়বাজার সংলগ্ন এলাকায় এই পূজা অন্নপূর্ণা পূজা হিসেবেই বিখ্যাত ছিল।[২৩৪] সুবর্ণবণিক (স্বর্ণশিল্পী) এবং কংসবণিক (কাঁসা-পিতল শিল্পী) সম্প্রদায় অল্প কিছু সংখ্যক অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে এই পূজার প্রচলন করেছিলেন। কোনও এক বছর অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত যাত্রাপালাকে কেন্দ্র করে কংসবণিক এবং স্বর্ণবণিক সমাজের মধ্যে মতভেদ ঘটলে কংসবণিকরা পৃথক হয়ে কাঁসারি পাড়ায় গণেশ-জননী পূজা শুরু করে। আনুমানিক ১৩১৬ বঙ্গাব্দ থেকে নিমু দত্ত, ইন্দু দত্ত, মুরারী দত্ত, গণেশ নাথ প্রমুখের নেতৃত্বে এই পূজার শুভ সূচনা ঘটে। তবে জনশ্রুতি আছে কংসবণিক সম্প্রদায়ের দুই ভাই গোকুল নাথ ও যদু নাথ একবার কৃষ্ণনগরের রাজার আমন্ত্রণে রাজার পালোয়ানদের সঙ্গে রাজদরবারে শক্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং রাজার দুই পালোয়ানকে পরাজিত করেন। ফলস্বরূপ মহারাজ খুশি হয়ে কাঁসারি পুকুর, বিলের মাঠ, পুকুরপাড় লেন এবং বড়বাজারের মুখ পর্যন্ত রাস্তা তাদের দান করেন। আবার গোকুল ও যদু নিঃসন্তান হওয়ায় তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পত্তির অধিকার চলে আসে কংসবণিক সমাজের হাতে, পরবর্তীকালে যা গণেশ-জননীর সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়। বহু ক্ষেত্রে অন্নপূর্ণার সঙ্গে গণেশ-জননী মূর্তির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। মাতৃমূর্তির ডানপাশে মহাদেব, বাঁ পাশে দেবর্ষি নারদ এবং মধ্যে ভগবতী দুর্গার ক্রোড়াধিষ্ঠিত 'বাল'-গণেশ। পাঁচদিন ধরে সাড়ম্বরে গণেশ-জননীর আরাধনা করা হয়। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পূজার শেষে সন্তান কামনায় গণেশ-জননীর ক্রোড়গত বাল-গণেশকে কোলে নেওয়ার

রীতি প্রচলিত আছে। অনেক নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভের বাসনায় এই প্রথা পালন করেন। বিসর্জনের সময়েও বিশেষ আলোকসজ্জা ও শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। (চিত্র ৩৯)

চাকদহের ঐতিহ্যবাহী গণেশ-জননী পূজা প্রায় তিনশো ষাট বছরের পুরনো। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে চারদিনব্যাপী এই পূজা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পূজানুষ্ঠানের জন্য ভুবনমোহিনী বিদ্যাপীঠে একটি মণ্ডপ আছে। অতীতে এই পূজায় ছাগবলি হত। বর্তমানে চিনি-সন্দেশ এবং কাঁচা খিচুড়ি ভোগ নিবেদন করা হয়। এই পূজার আকর্ষণ একটি প্রাচীন মেলা। অনেকেই একে গণেশ-জননী মেলা বলে জানেন। এই স্থানটি পূর্বে বিখ্যাত গঞ্জ ছিল। সে সময় গঙ্গা এখান দিয়েই প্রবাহিত হত। গণেশ-জননী মূর্তির পরিকল্পনা ও পূজার উদ্ভবের মূলে অনেকেই এই অঞ্চলে গঙ্গায় সন্তান বিসর্জনের প্রাচীন প্রথাটির কথা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন। পূজার উদ্ভব সংক্রান্ত অনেক কাহিনি লোকমুখে প্রচলিত। অনেকে মনে করেন প্রতাপাদিত্য এই পূজার সূচনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চাকদার আনন্দগঞ্জ প্রতাপাদিত্যের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। একদা দেবী সন্তান কোলে প্রতাপাদিত্যকে রাত্রে স্বপ্নে দেখা দিয়ে গঙ্গায় সন্তান বিসর্জনের জন্য তাঁর মনোবেদনা ব্যক্ত করেন। এই স্বপ্নদর্শনের ফলেই এখানে গণেশ-জননীর পূজা শুরু হয়। ১৮৪৫ সালের ৩১ শে মার্চ *সমাচার চন্দ্রিকা*-য় প্রকাশিত একটি পত্রে চাকদহের গণেশ-জননী পূজার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। আবার, ড. পবিত্র চক্রবর্তীর *চাকদহ : ইতিহাস ও সংস্কৃতি* বইতে লিখেছেন কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণচন্দ্র ও চাকদার যশরা অঞ্চলের কুম্ভকার পূর্ণচন্দ্র পাল এই তিনজন একইসঙ্গে একরাতে স্বপ্নে গণেশ-জননীর দর্শন পান এবং উক্ত মূর্তি প্রচলনের জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হন। এই আদেশপ্রাপ্তির পরই চাকদহের গণেশ-জননী পূজা প্রচলিত হয়।[২৩৫] (চিত্র ৪০)

এ ছাড়া নবদ্বীপের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, বিখ্যাত পোড়ামা তলার ভবতারিণী মূর্তিটিও আদিতে গণেশ মূর্তিই ছিল।[২৩৬] ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে নদীয়ার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পুত্র রাঘব নবদ্বীপের গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড এক গণেশ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর রাঘবের মৃত্যুর প্রায় একশো বছর পরে বন্যাপ্রবণ নবদ্বীপ ভাঙনের কবলীভূত হলে তৎকালীন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহটিকে নগরের মধ্যে সরিয়ে আনেন। কিন্তু বিগ্রহ স্থানান্তরের সময় বহু মানুষের স্পর্শ লাগায় নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ বিগ্রহটিকে বারো বছর মাটির তলায় রাখার বিধান দেন। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্রের আমলে সেই বিগ্রহটিকে মাটি থেকে তোলার সময় গণেশের শুঁড়টি ভেঙে যায়। ফলে রাজার আদেশে কোনও এক অজ্ঞাতপরিচয় শিল্পী ওই ঈষৎ ভগ্ন গণেশ মূর্তি থেকেই গিরিশচন্দ্রের আরাধ্যা দেবী আনন্দময়ীর মূর্তি তৈরি করেন এবং ভবতারিণী মাতা নামকরণ করেন। এই কারণে

তথাকথিত কালী মূর্তি থেকে এই প্রাচীন মূর্তিটি সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে দেবী জোড়াসনে উপবিষ্ট এবং স্থূলোদরা অর্থাৎ গণেশের মতো তাঁর ভুঁড়িও দেখা যায়। দেবীমূর্তির কান ও জিভের কাছটা লক্ষ করলে পুরনো গণেশ মূর্তির আদলটা টের পাওয়া যায়। শায়িত শিবের মূর্তিটিও সাধারণের থেকে কিছুটা আলাদা ধরনের। (চিত্র ৪১)

আঞ্চলিক ইতিহাসের অলি-গলি খুঁজলে হয়তো এমন দেবস্থান অথবা প্রত্ন-মূর্তির হদিশ আরও মিলবে সন্দেহ নেই। ইতিহাসের সেইসব ধূলিধূসরিত পথে-প্রান্তে দেবতার জন্ম হয়েই চলেছে। ব্রতাচার কিংবা পূজা-পার্বণের সংখ্যাধিক্যে নয়, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবৃত্তে আসন দখলের প্রতিযোগিতাতেও নয়, ঐতিহ্যের বিস্তারে এই জায়মানতার অন্য তাৎপর্য আছে। বঙ্গদেশে গণেশ কাল্‌ট-এর চেহারা যাই হোক না কেন, আজও হিন্দু বাঙালির ধর্মজীবনের সবটুকু জুড়েই তাঁর অধিষ্ঠান। একক প্রভুত্বে হয়তো একটু পিছিয়ে, কিন্তু সামগ্রিক ধর্মচর্যায় তিনি বাধ্যতামূলক বলেই অনতিক্রম্য।

উল্লেখসূচি :

১। Kane, P. V. *History of Dharmasastra.* Vol. II, Part I, Bhandarkar Oriental Research Institute, 1941, p. 216

২। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, সংকলক, 'ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন' (শাসনের পাঠ, প্রথম ফলক, ১১ নং শ্লোক), *কামরূপশাসনাবলী,* রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ, ১৩৩৮ ব., পৃ. ১৩

৩। ওই, পৃ. ২৯

৪। Sircar, D. C. 'Lucknow Museum Copper-plate Inscription of Surapala I, Regnal Year 3'. *Epigraphia Indica.* Edited by K. G. & Sircar, D. C. Vol. XL, Pt. I, Archaeological Survey of India, April 1973, p. 13

৫। অভিলেখের বঙ্গানুবাদটি হল- "ইনি ছিলেন লক্ষ্মীপতি পুরাণপুরুষ বিষ্ণু, বরাহ ও বামনের মত—নিত্য উদ্দাত গদাধারী গণেশের মত। দিব্য রমনীরা এঁর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এতে বহুজনের মনে ঈর্ষা এসেছিল যে দেবী লক্ষ্মী কি নারায়ণকে বিরাগভরে পরিত্যাগ করে এঁর রূপ, যৌবন ও সদগুণে ভূষিত হয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছেন?" অশোক চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী, 'অভিলেখের বঙ্গানুবাদ', *পাল অভিলেখ সংগ্রহ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগষ্ট ১৯৯২, পৃ. ১২৭

৬। দীনেশচন্দ্র সরকার, "মহীপালের চতুর্থ বর্ষের নারায়ণপুর মূর্তিলেখ", *শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ,* সাহিত্যলোক, মে ২০১৯, পৃ. ৯৩

৭। ওই, পৃ. ৯৪

৮। ওই, 'সিয়ান গ্রামের শিলালেখ', পৃ. ১১৯, ১২৬।

৯। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 'বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন', *গৌড়লেখমালা,* রাজসাহী : বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি থেকে সুরেশ্বর বিদ্যাবিনোদ প্রকাশিত, ১৩১৯ ব., পৃ. ১২৭

১০। ওই, পৃ. ১২৭

১১। Banerji, R. D. 'Barrackpur Grant of Vijayasena: the 32nd year'. *Epigraphia Indica.* Edited by Thomas F. W. Vol. XV, Pt. I, Archaeological Survey of India, 1925, p. 282

১২। R.C. Hazra. *Studies in the Upapuranas* (Vol. II). Kolkata : Sanskrit College, 1963, p. 461; Kunal Chakrabarti. "Text and Traditions : The Bengal Puranas". *Religious Process : The Puranas and the making of a Regional Tradition*, New Delhi : Oxford Univery Press, 2001, p. 50

১৩। পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), 'গণেশোৎপত্তি' (১১৬ নং অধ্যায়), *দেবীপুরাণ*, পৃ. ৬২২-৬২৮

১৪। ওই, ১১২-১১৫ নং অধ্যায়, পৃ. ৬১২-৬২১

১৫। "বিষ্ণোস্তবার্থমিদং শৈলবরং হরেণ/ সংপ্রেষিতো রিপুহরায় পুরন্দরস্য।।/ ময়োচ্যতাং বদ ভবান্ কিমহং করোমি/ ত্রৈলোক্যনির্জ্জিতরিপুং ত্বহং দদামি।।"(১২-১৩) ওই, 'গণেশ-স্তব' (১১৩ নং অধ্যায়), পৃ. ৬১৬-১৭

১৬। 'গণেশখণ্ড', *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০ ব, পৃ. ২১০

১৭। গণেশ-জন্মোৎপত্তি সবিস্তারে পড়ার জন্য *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর 'গণেশ খণ্ড' অংশের প্রথম অধ্যায় ('তত্র হর-পার্ব্বতীসম্ভোগ- ভঙ্গঃ') থেকে নবম অধ্যায় ('হরপার্ব্বত্যোর্গণেশসন্দর্শনম্') পর্যন্ত দ্রষ্টব্য। এই অধ্যায়সমূহে বর্ণিত ঘটনাপুঞ্জই বর্তমান প্রবন্ধের Primary Source বা প্রাথমিক উৎসরূপে বিবেচ্য। দ্র: ওই, 'গণেশখণ্ড', পৃ. ২০৮-২২৬

১৮। 'পতেৎ তু শম্ভোবীর্য্যং তৎ পার্ব্বত্যা উদরে যদি।/ ততোহপত্যঞ্চ ভবিতা সুরাসুরবিমর্দ্দকম্।।' দ্র: ঐ (প্রথম অধ্যায়, ২৫ নং শ্লোক), পৃ. ২০৯

১৯। 'অদ্যপ্রভৃতি তে দেবা ব্যর্থবীর্য্যা ভবন্তিতি। / শশাপ দেবী তান্ দেবানতিরুষ্টা বভূব হ।।' দ্রষ্টব্য : ঐ (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪ নং শ্লোক), পৃ. ২০৯

২০। আলোচনায় ব্যবহৃত *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর বাংলা পদ্যানুবাদগুলির জন্য দ্রষ্টব্য: 'গণেশখণ্ড' (প্রথম অধ্যায়) *ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ*, সুবোধচন্দ্র মজুমদার (অনূদিত), কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৬০ ব, পৃ. ১৯৮। এ ছাড়া

পুরাণোক্ত মূল শ্লোকগুলিও দেখে নেওয়া যেতে পারে : "তদ্ভঙ্গেন চ যদ্দুঃখং তৎসমং নাস্তি চ স্ত্রিয়াঃ। / কান্তানাং কান্তবিচ্ছেদঃ শোকঃ পরমদারুণঃ।।/ কৃষ্ণপক্ষে যথা চন্দ্র ক্ষীয়মাণো দিনে দিনে।/ তথা কান্তং বিনা কান্তা ক্ষীণকান্তিঃ ক্ষণে ক্ষণে।।" দ্র: প্রাগুক্ত (দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৮ ও ১৯ নং শ্লোক), পৃ. ২১০

২১। ওই, পৃ. ১৯৮। মূল শ্লোক : "চিন্তাজরশ্চ সর্ব্বেষা-মুপতাপশ্চ বাসসাম্।/ সাধ্বীনাং কান্তবিচ্ছেদস্তুরগাণাঞ্চ মৈথুনম্।।/ রতিভঙ্গো দুঃখমেকং দ্বিতীয়ং বীর্য্যপাতনম্।/ দুঃখাতিরেকদুঃখঞ্চ তৃতীয়মনপত্যতা।।/ ত্রৈলোক্যকান্তঃ কান্তস্ত্বং ন চ লব্ধো ময়া সুতঃ।/ যা স্ত্রী পুত্রবিহীনা চ জীবনং তদসার্থকম্।।" দ্র: ঐ (দ্বিতীয় অধ্যায়, ২১ ও ২২ নং শ্লোক), পৃ. ২১০

২২। *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-প্রমাণেও পার্বতী শিবের ঔরসে সন্তানধারণ করতে চেয়েছেন। যদিও শিব সেখানে যুক্তিজাল বিস্তার করে পার্বতীর সংগম-বাসনা নিবৃত্ত করেছেন। পরে শিব পার্বতীর রক্তবর্ণ বস্ত্রকে ('মদীয় বসনঞ্চেদং রক্তবর্ণং মহেশ্বর') পুত্রজ্ঞানে চুম্বন করতে বললে সেই রক্তবস্ত্র থেকেই গণেশের আবির্ভাব ঘটে। দ্র: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-২৮২

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

২৪। প্রাগুক্ত (তৃতীয় অধ্যায়, ৩ নং শ্লোক), পৃ. ২১০

২৫। 'ব্রহ্মণা প্রেরিতো যুক্তং ব্রতকর্ত্তব্যমীপ্সিতম্' - দ্র: ঐ (ষষ্ঠ অধ্যায়, ৪৬ নং শ্লোক, দ্বিতীয় পংক্তি), পৃ. ২১৬

২৬। মূল সংস্কৃত শ্লোকটির জন্য দ্রষ্টব্য : ঐ (ষষ্ঠ অধ্যায়, ৯৩ নং শ্লোক), পৃ. ২১৮। এ ছাড়া শ্লোকের বাংলা গদ্য-অনুবাদটির জন্য দ্রষ্টব্য : ঐ (ষষ্ঠ অধ্যায়, ৯৩ ও ৯৪ নং শ্লোক), পৃ. ২২৮

২৭। পরবর্তী অংশে পাঠক দেখবেন, *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর গণেশ-জন্মের আখ্যানে বিষ্ণু অংশত প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করেছেন। ব্রতানুষ্ঠানের পূর্বেই বিষ্ণুর শিবকে দেওয়া আশ্বাসবাণী (বিষ্ণু স্বয়ং পার্বতী-গর্ভজাতরূপে প্রকট হবেন) পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরায় ব্যর্থ প্রমাণ হয়েছে। গণেশ 'পার্বতীপুত্র' হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছেন ঠিকই, কিন্তু পার্বতীর স্বামীর বীর্যে গর্ভবতী হওয়ার বাসনাটি অপূর্ণ থেকে গেছে।

২৮। ঐ (সপ্তম অধ্যায়, ১৬ নং শ্লোক), পৃ. ২১৯

২৯। ''তরুহীন ফলে বল কিবা সুখোদয়।/ স্বামীর বিহনে কিসে হবে পুত্রোদয়।।/ সকলের মূল স্বামী কি কহিব আর।/ স্বামী বিনা ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি অসার।।'' দ্র: প্রাগুক্ত, 'গণেশখণ্ড', চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ২০৬

৩০। ঐ, পৃ. ২০৬-২০৮

৩১। দেবীমুখে দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'পতিই সতীর গতি, পতি প্রভু তার।/ পতি ছাড়া রমণীর কেহ নাহি আর' কিংবা 'কুমারী নারীরে পিতা করেন রক্ষণ।/ যৌবনকালেতে পতি করেন পালন।।/ বার্দ্ধক্যে নারীরে রক্ষা করে পুত্রগণ।/ চিরপরাধীনা নারী শাস্ত্রের বচন' (ঐ, পৃ. ১৯৯) এবং চতুর্থ অধ্যায়ে দেবতাগণের প্রত্যুত্তর-রূপে 'পতি ছাড়া গতি নাই জানি অনুক্ষণ', 'নারী হতে শ্রেষ্ঠ নর জানি নিশিদিন', 'বুদ্ধিতে রমণী আমি কি কহিব আর।/ কিরূপে করিব ত্যাগ স্বামীরে আমার।।', 'প্রকৃতি পুরুষ হ'তে শ্রেষ্ঠ কভু নয়।/ প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ নিশ্চয়।।'(ঐ, পৃ. ২০৭)--- ইত্যাদি উচ্চারণ পার্বতীর অবস্থানকে 'সাধারণ' নারীতুল্য করে দেয়।

৩২। ''ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং প্রাকৃতিকং জগৎ।/ সত্যং সত্যং বিনা মাঞ্চ মায়াশক্তিঃ প্রকাশিতা।।/ আবির্ভূতা চ সা মত্তঃ সৃষ্টৌ দেবী মদিচ্ছয়া।/ তিরোহিতা চ সা শেষে সৃষ্টিসংহারণে ময়ি।।/ সৃষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতি সর্ব্বেষাং জননী পরা।/ মম তুল্যা চ মন্মায়া তেন নারায়ণী স্মৃতা।।'' দ্র: প্রাগুক্ত (সপ্তম অধ্যায়, ৬৪-৬৬ নং শ্লোক), পৃ. ২০৮

৩৩। ''প্রকৃতি আমার মায়া আমার সমান।/ নারায়ণী নাম তাঁর দিলা জ্ঞানবান্।।/ আমার তপস্যা করে দেব মহেশ্বরে।/ এ কারণে মায়া দান করিনু শঙ্করে।।'' দ্র: প্রাগুক্ত, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ২০৮

৩৪। ''শুন শুন মহেশ্বরী, কহি অবিরত।/ শঙ্করে দক্ষিণা দিয়া পূর্ণ কর ব্রত।।/ সমচিত মূল্য দান করি তারপরে।/ আবার গ্রহণ তুমি কর মহেশ্বরে।।/ গাভীদেহে বিষ্ণুদেহে ভেদ কিছু নাই।/ শিবও বিষ্ণুর দেহ জেন সর্ব্বদাই।।/ ব্রাহ্মণেরে গাভীমূল্য করি সমর্পণ।/ স্বামীরে আবার তুমি করহ গ্রহণ।।'' দ্র: ঐ, পৃ. ২০৮

৩৫। ''সনৎকুমার বলিলেন, হে দেবি! আমি ব্রাহ্মণ, লক্ষ গরু লইয়া কি করিব? কোন্ ব্যক্তি কতকগুলি গরু লইয়া অমূল্যধন রত্ন প্রত্যর্পণ করে? এই ত্রিজগতে সকল ব্যক্তিই আপনার আপনার উপর কর্ত্তা। কর্ত্তা যা কর্ম্ম ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়; পরের ইচ্ছায় কি হইয়া থাকে?'' দ্র: প্রাগুক্ত (সপ্তম অধ্যায়, ৮৮ ও ৮৯ নং শ্লোকের গদ্য-অনুবাদ), পৃ. ২৩১

৩৬। ''মহাদেবকে সনৎকুমার কর্ত্তৃক গৃহীত দেখিয়া পার্ব্বতীর কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইল। তখন সেই সাধ্বী, না অভীষ্টদেবের দর্শন হইল, না ব্রতের ফল লাভ হইল, এইরূপ দুর্গতির বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যতা হইলেন। পরবর্তী অংশে বিষ্ণু পার্বতীকে তদনুরূপ পুত্রলাভের বর দিয়েছেন। দ্র: ঐ (সপ্তম অধ্যায়, ৯২ ও ৯৩ নং শ্লোকের গদ্য-অনুবাদ), পৃ. ২৩২

৩৭। 'অনন্তর দেবগণ, সনৎকুমারকে বুঝাইয়া সানন্দচিত্তে প্রহৃষ্টা পার্ব্বতী দেবীকে নিরুপম দিগম্বরকে প্রত্যর্পণ করিলেন।' দ্র: ঐ (অষ্টম অধ্যায়, ১০ নং শ্লোকের গদ্য-অনুবাদ), পৃ. ২৩৩

৩৮। 'হেনকালে নারায়ণ ভাবে মনে মন।/ পার্ব্বতীর গর্ভে বীর্য্য হইলে পতন।।/ জনমিবে মহাকায় তনয় তাঁহার।/ সুরগণে কষ্ট সেই দিবে অনিবার।।/ মনে মনে এত ভাবি প্রভু জনার্দ্দন।/ স্থির করে পন্থা এক ইহার বারণ।।/ হেন কালে দ্বিজ মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।/ প্রবেশ করিলা তথা দেব নারায়ণ।।' দ্র: প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

৩৯। ঐ, পৃ. ২১২। এ ছাড়া মূল শ্লোকটির ('পপাত বীর্য্যং শয্যায়াং ন যোনৌ প্রকৃতেস্তদা') জন্য দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত (অষ্টম অধ্যায়, ২৭ নং শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি), পৃ. ২২৩

৪০। ''জনম সফল আজি অতি শুভক্ষণ।/ মোর গৃহে সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণ।।/ অতিথির সমাদর যেই জন করে।/ বহুপুণ্য হয় তার পৃথিবী ভিতরে।।'' দ্র: প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

৪১। ঐ, পৃ. ২১৪। এ ছাড়া মূল শ্লোকটির ('তল্পস্থে শিববীর্য্যে চ মিশ্রিতঃ স বভূব হ।/ দদর্শ গেহশিখরং প্রসূতো বালকো যথা') জন্য দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত ('গণেশোৎপত্তি', অষ্টম অধ্যায়, ৮৪ নং শ্লোক), পৃ. ২২৫

৪২। ''ইত্যবসরে সেই স্থানে আকাশবাণী হইল। বৈক্লব্যযুক্তা শোকাতুরা দুর্গা সেই আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন, সেই আকাশবাণী এইরূপ হইল,-- ''হে জগন্মাতঃ! শান্তা হউন। যে নিত্য তেজোময় পুরুষকে যোগিগণ সর্ব্বদা আনন্দসহকারে ধ্যান করেন, আপনার গৃহে সেই পরিপূর্ণতম পরাৎপর সনাতন গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে পুণ্যক ব্রতের ফলের স্বরূপ নিজ পুত্ররূপে দর্শন করুন।...'' '' এই বাংলা গদ্য-অনুবাদটির জন্য দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত (নবম অধ্যায়, ৭ ও ৮ নং শ্লোক), পৃ. ২৩৬

৪৩। *ব্রহ্মবৈবর্ত*-এর গণেশ-জন্ম বিবরণ অংশ খুঁটিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে এই আখ্যানে গণেশ পার্বতীর গর্ভসম্ভূত নন। তিনি শিব ও কৃষ্ণাংশে জাত এবং ঘটনা-পরম্পরায় শিব-শক্তি পরিবারে অধিভুক্ত হয়েছেন

৪৪। "তস্মান্নারায়ণে ভক্তিং দেহি নারায়ণাম্বিকে।/ ন ভবেদ্বিষ্ণুভক্তিশ্চ বিষ্ণুমায়ে ত্বয়া বিনা।।/ ত্বদব্রতং লোকশিক্ষার্থং ত্বত্তপস্তব পূজনম্।/ সর্ব্বেষাং ফলদাত্রী ত্বং নিত্যরূপা সনাতনী।।" দ্র: প্রাগুক্ত (অষ্টম অধ্যায়, ৭৯ ও ৮০ নং শ্লোক), পৃ. ২২৫

৪৫। ঐ (নবম অধ্যায়, ৮১ নং শ্লোক) পৃ. ২২৫

৪৬। ঐ (নবম অধ্যায়, ৮৩ ও ৮৪ নং শ্লোক), পৃ. ২২৫

৪৭। প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়, 'হরপার্ব্বতীর গণেশ-দর্শন', পৃ. ২১৫

৪৮। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (সংকলিত), *মেয়েদের ব্রতকথা,* অমিত ভট্টাচার্য (সম্পা.), কলকাতা : পারুল, ২০১৬, পৃ. ৯১-৯৩।

৪৯। ওই, 'দুর্গা ষষ্ঠীর কথা', পৃ. ৯২

৫০। 'Stories of the female Vishnu in connection with Siva seem to have been popular in the Indian South.' See - Goudriaan, Teun. 'The Maya of the Gods : Mohini'. *Maya Divine and Human.* Delhi: Motilal Banarasidass Publishing House, 1978, p. 43

৫১। "... the Bhagavata now has the "bull-bannered god," Siva, ask Visnu to reveal the form of Mohini to him. The minute Siva spies her, her abandons his own consort, the goddess Parvati, even as she watches, and run after the enchantress, "agitated by love", "bereft of shame and robbed by her in good sense." As he chases Mohini, his "unfailing seed escapes, like that of a "a love-maddened elephant chasing a desiring female," and turns into ores of gold and silver." See - Jarow, E. H. Rick. 'Stri Naraka Dvara--Woman as the Gateway to Hell'. *Tales for the Dying: The Death Narrative of the Bhagavata-Purana.* New York: State University of New York Press, March 2003, p. 80

৫২। ibid. p. 80

৫৩। 'On the walls of the mattencheri palace in kerala is a mural of Shiva embracing Mohini passionately while Parvati, Shiva's consort, watches their interaction with a resigned smirk.' See - Pattanaik, Devdutt. 'Cross-Dressing Tricksters'. *The Man Who was a Woman and Other Queer Tales of Hindu Lore*. UK: Routledge, 2012, p. 73

৫৪। 'In the Ayyappa legend Vishnu as Mohini becomes pregnant from intercourse with Shiva, and produces a Child.' See - Vanita, Ruth. 'Ayyappa and Vavar: Celibate Friends'. *Same-Sex Love in India: Readings from Literature and History*. Vanita, Ruth. Kidwai, Saleem(ed.). UK: Palgrave Macmillan, Sept. 2001, p. 94. & 'The stories suggest the fluidity of gender in sexual interaction.' See - Vanita, Ruth (Introduced by). 'Bhagvata Purana: The Embrace of Shiva and Vishnu (Sanskrit)'. ibid, pp. 69-70

৫৫। "Mohini personifies yet another attempt to make Shiva worldly... the goal is reached and Shiva enters the cycle of life. Of course, only Vishnu has the power to enchant Shiva, by becoming a woman." See - Pattanaik, Devdutt. ibid, p. 73

৫৬। Krishan, Yuvraj. "Pauranic Ganesa". Ganesa: *Unravelling an Enigma*. Motilal Benarasidas Publishers Private Limited, 1999, p. 40

৫৭। রাধানাথ রায়চৌধুরী, 'গণপতির জন্মকথা', *পদ্মাপুরাণ*, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৬৩

৫৮। Nani Gopal Majumdar. 'Deopara Inscription of Vijayasena'. *Inscriptions of Bengal*. Rajshahi: The Varendra Research Society. 1929, p. 46 & 51]

৫৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

৬০। ওই, পৃ. ২৭৭-২৮৪

৬১। ওই, ৪৩ নং অধ্যায়, ১১ নং শ্লোক, পৃ. ২৮১

৬২। এ প্রসঙ্গে পুরাণ বিশেষজ্ঞ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে ১৫ নভেম্বর, ২০২২-এ প্রদর্শিত 'গণেশ, পরশুরাম ও ভীষ্মের কাহিনী' শীর্ষক পর্বের আলোচনায় উপকৃত হয়েছি। accessed on 17. 11. 2022

৬৩। প্রাগুক্ত, ৪৪ নং অধ্যায়, ৮৩-৮৫ নং শ্লোক, পৃ. ২৮৪

৬৪। পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত), 'গণেশের জন্ম' (৩৫ নং অধ্যায়), *শ্রীমহাভাগবতম্,* পৃ. ১৪৭-১৪৯

৬৫। পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত), 'মধ্যখন্ড' (৩০ নং অধ্যায়, ৮ নং শ্লোক), *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্,* পৃ. ১৬৮

৬৬। ওই, ৩০ নং অধ্যায় (১১ নং শ্লোক), পৃ. ২৮১

৬৭। ওই, পৃ. ২৮১

৬৮। যশোধরা বাগচী, 'যৌনতা: নারীবাদের আলোয়', *নারী ও নারীর সমস্যা,* অনুষ্টুপ, মার্চ ২০১২, পৃ. ১২১-২২

৬৯। সুকুমারী ভট্টাচার্য, '৫' শীর্ষক উপপ্রবন্ধ, *বিবাহপ্রসঙ্গে,* ক্যাম্প, জুলাই ২০১৫, পৃ. ৪০

৭০। প্রাগুক্ত, অধ্যায় ৩০, ১০০-১০৮ নং শ্লোক, পৃ. ২৮৭-২৮৮

৭১। স্বামী নির্মলানন্দ, 'গণেশ', *দেবদেবী ও তাঁদের বাহন,* পৃ. ২৫১

৭২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৫

৭৩। Bandyopadhyay, Ray Sudipa. ' "Bengal School" Siva-Nataraja Images from Tripura, Bihar, Nepal and Vietnam'. *Nataraja Images of Bengal.* University of Calcutta, 2017, P. 41

৭৪। Woyeyar, Krsnaraja Mummadi. 'Sivanidhi' (vol. 3). *Sritattvanidhi.* Edited by Ramesh, K. V. Oriental Research Institute, 2004, p. 59

৭৫। Haque. Enamul. 'Miscellancous Gods'. *Bengal Sculptures: Hindu Inconography upto c. 1250 A. D.* . Bangladesh National Museum. 1992, p. 314

৭৬। Sharma, Brijendra Nath. 'Unpublished Pala and Sena Sculptures in the National Museum, New Delhi.' *East and West*, vol. 19, no. 3 / 4, 1969, p. 415

৭৭। অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় নতুন গণেশ মূর্তির সন্ধান', টেরাকোটা বিশেষ গণেশ সংখ্যা, আগষ্ট ২০২১, পৃ. ১৪৪

৭৮। Bhattasali, Nalini Kanta. *Iconography of Buddhist and Brahminical Sculptures in the Dacca Museum.* Dacca, 1929, p. 147

৭৯। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, *প্রতিমাশিল্পে হিন্দু দেবদেবী,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৬৫

৮০। সুভাষ রায়, *মন্দিরনগরী তেলকূপি: সেকাল একাল,* টেরাকোটা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ. ৫৯, ৬৭

৮১। ওই, পৃ. ৭৬-১০০

৮২। দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ* (১ম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯, পৃ. ৪৮৩-৮৪

৮৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৮৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৮৫। Vidyakara. *Subhasitaratnakosa. The Subhasitaratnakosa.* D. D. Kosambi and V. V. Gokhale (ed.). Cambridge: Harvard University Press, 1957, p. 16

৮৬। ওই, পৃ. ১৭

৮৭। ওই, পৃ. ১৭

৮৮। ওই, পৃ. ১৮

৮৯। ওই, পৃ. ১৮

৯০। Sridhardasa. *Sadukti-Karnamrta. Sadukti-Karnamrta of Sridhardasa.* Banerjee, Sures Chandra (ed.). Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, January 1965, p. 40

৯১। ওই, পৃ. ৪০

৯২। ওই, পৃ. ৪০

৯৩। Govardhanacharya. *Aryasaptasati. The Aryasaptasati of Govardhanacharya with The Commentary (Rasapradipika).* Mishra, Sachal (ed.). published by Keshi Mishra, 1931, p. 12

৯৪। ওই, পৃ. ১৫

৯৫। ওই, পৃ. ১৫

৯৬। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ*, প্রকাশক : রবীন্দ্রনাথ সান্যাল, ১৩৬৭ ব., পৃ. ১৪০

৯৭। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ‘পৌরাণিক ধর্ম, গৌণদেবতা ও সম্প্রদায়’ (দশম অধ্যায়), *ধর্ম ও সংস্কৃতি: প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট*, কলকাতা: আনন্দ, নভেম্বর ২০১৩, পৃ. ১৭৫

৯৮। ওই, পৃ. ১৭৫-৭৬

৯৯। A. K. Narain. ‘Ganesa: A Protohistory of the Idea and the Icon’. *Ganesh: Studies of an Asian God.* Robert L. Brown (ed.), Delhi: Sri Satguru Publication, 1997, pp. 21-24

১০০। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত মিত্রমিশ্র রচিত *বীরমিত্রোদয়* [মিত্রমিশ্র, *বীরমিত্রোদয় সময়প্রকাশ*, বিষ্ণুপ্রসাদ ভাণ্ডারী (সম্পা.), বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৮৫ খ্রি.] এবং মদনপাল রচিত *মদনপারিজাত* [মদনপাল, *মদনপারিজাত স্মৃতিসংগ্রহ*, মুধুসূদন স্মৃতিরত্ন (অনূ.), কলকাতা : আসিয়িক সমিতি দ্বারা বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৯৬ খ্রি.] শীর্ষক স্মৃতি-নিবন্ধ গ্রন্থ দেখা যাতে পারে।

১০১। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘গণপতি-গাণপত্য’, *পঞ্চোপাসনা*, কলকাতা: কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০, পৃ. ১৬-২০

১০২। গোলাম মুরশিদ, ‘বাংলার সমাজ ও ধর্ম’, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ঢাকা: অবসর, জুলাই ২০১৪, পৃ. ৫২

১০৩। দীনেশচন্দ্র সরকার, *শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ*, কলকাতা: সাহিত্যলোক, মার্চ ২০০৯, পৃ. ৯৫

১০৪। অর্জুনদেব সেনশর্মা, ‘স্মার্ত হিন্দুধর্মের অন্তর্গঠনের স্বরূপ’, *হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ: আদি-মধ্যযুগ* , ভারবি, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৩৬

১০৫। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, *রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, নবদ্বীপ: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ডিসেম্বর ২০০৮

১০৬। A figure like Agni enables us to understand the many-sided, inconsistent presentment of Shiva and Vishnu in later times. ... Even a deity like Ganesa who seems at first sight modern and definite illustrates these ancient characteristics." Eliot, Charles. *Hinduism and Buddhism: An Historical Sketch* (Vol. I). London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1962, p. 58

১০৭। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, 'রুদ্রগণ ও গণেশ', *হিন্দুদের দেবদেবী: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* (দ্বিতীয় পর্ব), কলকাতা: ফার্মা কেএলএম (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৯৬০, পৃ. ১৬১

১০৮। রঘুনন্দন, *আহ্নিকতত্ত্ব*, ত্রৈলোক্যনাথ ভাগবতভূষণ অনূদিত, কলকাতা: বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেশিন প্রসে বিহারীলাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৪ ব., পৃ. ৩৫

'বিনায়ক' শীর্ষক টীকা, *বিশ্বকোষ* (অষ্টাদশ খণ্ড), নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), কলকাতা: বিশ্বকোষ কার্য্যালয়, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে ইউ, সি, বসু এন্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত, ১৩০১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬২০

১০৯। Govindananda. *Varsa Kriya Kaumudi.* Edited by Kamala Krishna Smritibhusana, Asiatic Society, 1902, pp. 30-34

১১০। সচ্চিদানন্দ সরস্বতী, *পূজা-প্রদীপ*, সৌম্যানন্দ নাথ (সম্পা.), কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০ ব., পৃ. ১৫৪

১১১। রাধানাথ রায়চৌধুরী, 'পঞ্চদেব-বন্দনা', *পদ্মাপুরাণ*, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৩৪

১১২। রামেশ্বর ভট্টাচার্য, 'গণেশ্বর-বন্দনা', *রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন*, যোগীলাল হালদার (সম্পা.), কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ. ১-৪

১১৩। সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর *পূজা-প্রদীপ* গ্রন্থের অনুসরণে বর্তমান রেখাচিত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে। পৃ. ১৪৪

১১৪। গাণপত্য ধর্মপ্রচারক সুরজ কুমার দাস পরিচালিত 'Shree Ganesha'/ 'স্বানন্দাদ্বৈত' পেজে ২৩ জুলাই, ২০১৮-য় গণপতি এবং শক্তি প্রসঙ্গে যে আলোচনা করা হয়েছিল, তার নির্যাসটুকু এখানে গ্রহণ করা হয়েছে।

১১৫। *গণেশপুরাণ,* 'ভূমিকা', মহেশচন্দ্র যোশী অনূদিত ও সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ২০১৪, পৃ. ৪৯

১১৬। ওই, পৃ. ৫০

১১৭। বর্তমান অংশটির রচনায় গাণপত্য সুরজ কুমার দাসের 'স্বানন্দাদ্বৈত' পেজে ২৭ মার্চ, ২০২১-এ প্রকাশিত আলোচনাটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১১৮। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, *বৃহৎ তন্ত্রসার,* রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার অনূদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ২০১০, পৃ. ৪৪৯

১১৯। অমরনাথ চক্রবর্তী, সংকলক, *অঘোর সদন,* মঞ্জু চক্রবর্তী প্রকাশিত (লালকুঠি, কলকাতা), ১৪২৬, পৃ. ৭০-৭১

১২০। হরিহরানন্দ ভারতী, *মহানির্বাণতন্ত্র,* জগন্মোহন তর্কালঙ্কার অনূদিত ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪০৯, পৃ. ১০৩

১২১। *শারদাতিলকতন্ত্র,* পঞ্চানন শাস্ত্রী, অনূদিত ও সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪১৮, পৃ. ৩৪১

১২২। *প্রাণতোষণী তন্ত্র,* রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার সংকলিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯২৮, পৃ. ৩০৮-১৯

১২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

১২৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২-৪৩

১২৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

১২৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫-৬১

১২৭। *পুরশ্চরণরত্নাকর,* জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তন্ত্ররত্নের পদ্ধতি অবলম্বিত, মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য সংকলিত, নবভারত পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ২২৭-২৯

১২৮। পঞ্চানন শাস্ত্রী, সম্পাদক ও অনুবাদক, *আগম-তত্ত্ব-বিলাস,* নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৫, পৃ. ৭৪১-৫৭

১২৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-১২, ৪৫৩-৫৬

১৩০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫-৬৯

১৩১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০

১৩২। *শ্রীশ্রীনারদপঞ্চরাত্র* ('জ্ঞানামৃতসারসংহিতা'), রাম শাস্ত্রী ও নির্মলানন্দ সরস্বতী অনূদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৭ ব., পৃ. ৭৬-৭৭

১৩৩। পূজা-প্রদীপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১-০২

১৩৪। *কৃত্তিবাস-বিরচিত রামায়ণ,* 'আদিকাণ্ড', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, আগস্ট ২০১১, পৃ. ৩৫

১৩৫। কাশীরাম দাস, 'আদিপর্ব্ব', *সচিত্র কাশীদাসী অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত,* সুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত, প্রকাশক : পূর্ণচন্দ্র শীল, ১৩৩২, পৃ. ১

১৩৬। 'মনসার জন্ম পালা', বিজয়গুপ্ত, *বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল,* অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৭৯

১৩৭। 'লখিন্দর বিবাহ পালা (১৮.১১)', ওই, পৃ. ২৬৮

১৩৮। বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস 'বন্দনা' অংশে দেবতাদের তালিকার সঙ্গে বেহুলা লখিন্দরের বিয়ে দেখতে আসা দেবতাদের তালিকার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে 'ইন্দ্র' সম্পর্কে মনসামঙ্গল গায়কদের দৃষ্টিভঙ্গির বদলের প্রসঙ্গটি চিহ্নিত করেছেন। 'গণেশ' সম্পর্কে আমাদের বর্তমান বিবেচনাটিও তাঁরই চিন্তাসূত্র থেকে পাওয়া। দ্রষ্টব্য: 'ভূমিকা', ওই, পৃ. ১৭ এবং ২০

১৩৯। 'প্রথম পালা', বিপ্রদাস পিপিলাই, *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল,* অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা: রত্নাবলী, এপ্রিল ২০০২, পৃ. ৩

১৪০। 'বহু দেবতার ধ্যান ও প্রণাম', *পুরোহিত-দর্পণ* (প্রথম খণ্ড), সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য (সম্পা.) কলকাতা: হরিদাস বসাক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, পৃ ৫৩; এছাড়া স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত *স্তব কুসুমাঞ্জলি* গ্রন্থ থেকেও গণেশের প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রটি দেখে নেওয়া যেতে পারে। দ্রষ্টব্য: 'গণেশ ধ্যান', *স্তব কুসুমাঞ্জলি,* স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কার্তিক ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৫০

১৪১। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, 'গণেশ-বন্দনা', *মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, ১৩৮৪ ব., পৃ. ১-২

১৪২। বিষ্ণুপাল, 'শ্রী শ্রী সিদ্ধিদাতা গণেশ', *Visnu Pala's Manasa-Mangala.* Edited by Sukumar Sen, The Asiatic Society, 2002, p. not found

১৪৩। রাধানাথ রায়চৌধুরী, 'গণেশ-বন্দনা', *পদ্মাপুরাণ,* দেব সাহিত্য কুটীর, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৩৫

১৪৪। 'গণপতির জন্মকথা', ওই, পৃ. ৬৩-৬৪

১৪৫। 'মানিকদত্তের মূলপুথি', *মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল,* সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত, পি-এইচ, ডি, (কলা-শাখা) ডিগ্রিলাভের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত, মার্চ ২৮, ১৯৮১, পৃ. ১৫-১৬

১৪৬। 'প্রথম পালা' (বন্দনা), দ্বিজমাধব, *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত,* সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর ১৯৬৫, পৃ. ২

১৪৭। *বৃহৎ তন্ত্রসার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

১৪৮। 'প্রথম দিবস' (স্থাপনা), মুকুন্দ চক্রবর্তী, *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল,* সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৭, পৃ. ১

১৪৯। *বৃহৎ তন্ত্রসার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮১

১৫০। 'উপাসনাখণ্ড' (১৩ অধ্যায়), *গণেশপুরাণ* (হিন্দি টীকা-টিপ্পনী তথা বিস্তৃত ভূমিকা এবং শ্লোকানুক্রমিকা সহ), মহেশচন্দ্র যোশী সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ২০১৪, পৃ. ৪৯

১৫১। 'বিনায়ক চতুর্থী ব্রত মাহাত্ম্য ও বিধান' (উত্তর পর্ব, ১৭ অধ্যায়), *ভবিষ্যপুরাণ,* পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮২০-৮২৫

১৫২। 'Ganapatikalpaprakaranam' (Achar Adhyay, chapter 11). *Yajnavalkya Smriti* (With Mitakshara Commentary, Subodhini and Balambhatta's Gloss). S.S.Setlur (ed.). Chennai: Brahmavadin Press. 1912. p. 180-188

১৫৩। *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ* অনুসারে শিব পার্বতীর রক্তবর্ণ বস্ত্রকে ('মদীয় বসনঞ্চেদং রক্তবর্ণং মহেশ্বর') পুত্রজ্ঞানে চুম্বন করতে বললে সেই রক্তবস্ত্র থেকেই গণেশের আবির্ভাব ঘটে। এই বর্ণসাযুজ্যের কারণেও তাঁর দেহ রক্তিমাভ হয়ে থাকতে পারে। দ্রষ্টব্য : 'গণেশ জন্ম বিবরণ', *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ,* পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮০-২৮৮

১৫৪। 'বহু দেবতার ধ্যান ও প্রণাম', *পুরোহিত-দর্পণ* (প্রথম খণ্ড), সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, কলকাতা: হরিদাস বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৩

১৫৫। 'গণেশ জন্ম বিবরণ', *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ,* পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮০-২৮৮

১৫৬। 'গণপতিপ্রকরণ' (ত্রয়োদশ পটল), *শারদাতিলকতন্ত্র,* পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬২৮

১৫৭। 'গণেশ' শীর্ষক টীকা, *বিশ্বকোষ* (পঞ্চম ভাগ), নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, কলকাতা : বিশ্বকোষ কার্য্যালয়, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে ইউ, সি, বসু এন্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত, ১৩০১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০৩

১৫৮। 'প্রভাসখণ্ড' (কপর্দ্দী বিনায়কের মাহাত্ম্য বিধি কথন, ৩৮ অধ্যায়), *স্কন্দপুরাণ,* পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৬৯৪; 'গণেশখণ্ড', *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ,* পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২৫

১৫৯। 'আদৌ গণেশবন্দনা', দ্বিজরামদেব, *দ্বিজ রামদেব-বিরচিত অভয়ামঙ্গল,* আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ. ১-২

১৬০। ১৪০ নং তথ্যসূত্র

১৬১। ওই, পৃ. ৫৩

১৬২। ওই, পৃ. ৫৩

১৬৩। 'প্রথম গণেশবন্দনা', দ্বিজরামদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১৬৪। মুক্তারাম সেন, *সারদা-মঙ্গল বা অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী,* আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১

১৬৫। 'গণেশখণ্ড' (৩৩ অধ্যায়), *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ,* পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮০-২৮২

১৬৬। 'গণেশখণ্ড' (বিষ্ণুকৃত গণেশস্তোত্র, ১৩ অধ্যায়), ওই, পৃ. ২৩২

১৬৭। *চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রামানন্দ যতি বিরচিত,* অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১

১৬৮। ভবানীপ্রসাদ রায়, *দুর্গামঙ্গল,* ব্যোমকেশ মুস্তাফী সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১

১৬৯। দ্বিজকমললোচন, 'গণেশবন্দনা' (প্রথম অধ্যায়), *চণ্ডিকা-বিজয়,* পঞ্চানন সরকার সম্পাদিত, রঙ্গপুর-শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রকাশিত, আশ্বিন ১৩১৬, পৃ. ১-২

১৭০। 'বন্দনা পালা' ('গণেশ-বন্দনা'), রূপরাম চক্রবর্তী, *রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল* (প্রথম খণ্ড), সুকুমার সেন সম্পাদিত, কলকাতা: সাহিত্য-সভা বর্দ্ধমান, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২

১৭১। 'কার্ত্তিক-গণেশের বিবাদ ও গণেশের জয়লাভ' (৩৫ অধ্যায়), *শিবপুরাণ,* পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৭-১৪০; 'সৃষ্টিখণ্ড' (৬-১৬ নং শ্লোক, ৬৩ অধ্যায়), *পদ্মপুরাণ,* পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৪৩-৪৪

১৭২। 'মঙ্গলাচরণ' (গণেশ-বন্দনা), রামদাস আদক, *অনাদি-মঙ্গল বা শ্রীধর্ম্মপুরাণ,* বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃ. ২

১৭৩। 'প্রথম সর্গ-স্থাপন পালা' (গণেশবন্দনা), ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,* যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, কলকাতা: 'বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন'-প্রেসে শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১-২

১৭৪। 'বন্দনা' (ওঁ নমো গণেশায়), *মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত ধর্মমঙ্গল,* বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ৩

১৭৫। 'বন্দনা' (গণেশায় নমঃ), ঐ, পৃ. ৮-১০

১৭৬। 'শ্রীগণেশবন্দনা', রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র, *শিবায়ন,* দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, আষাঢ় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১

১৭৭। 'উপাসনাখণ্ড' (১২ অধ্যায়), *গণেশপুরাণ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১৭৮। 'গণেশ্বর-বন্দনা', রামেশ্বর ভট্টাচার্য, *রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন,* যোগীলাল হালদার সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ ১-৪

১৭৯। 'গণেশ বন্দনা', *রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল,* সুনীলকুমার ওঝা (সম্পা.), কলকাতা: সাহিত্যলোক, এপ্রিল ২০০২, পৃ. ৩৫

১৮০। 'উপাসনাখণ্ড' (৪-৬ নং শ্লোক, ১৩ অধ্যায়), *গণেশপুরাণ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

১৮১। কৃষ্ণরাম দাস, 'কালিকামঙ্গল', *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী,* সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, পৃ. ১

১৮২। বলরাম কবিশেখর, *কালিকামঙ্গল,* চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫০ ব., পৃ. ১

১৮৩। 'গণেশ জন্ম বিবরণ', *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০-২৮৮

১৮৪। প্রাণরাম কবিবল্লভ, *কালিকামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, নভেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৩

১৮৫। পৃথ্বীচন্দ্র, *গৌরীমঙ্গল,* বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১, পৃ. ৬-৭

১৮৬। বিশ্বম্ভর দাস, 'গণেশাদি বন্দনা', *জগন্নাথ-মঙ্গল,* পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা: গুপ্তপ্রেশ, ১৩১২ শ্রাবণ, পৃ. ২

১৮৭। পরশুরাম, 'বন্দনা', *কৃষ্ণমঙ্গল,* নলিনীনাথ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৬, পৃ. ১-২

১৮৮। বিজয়রাম সেন, 'সূচনা', *তীর্থ-মঙ্গল,* নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির, ১৩২২ ব., পৃ. ১

১৮৯। রাধাকৃষ্ণ দাস, *গোসানী-মঙ্গল,* ব্রজচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, কলকাতা: ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১

১৯০। দ্বিজ মাধব, 'ওঁ নমো গণেশায়', *গঙ্গা-মঙ্গল,* মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১

১৯১। "... শাক্ত-পদাবলীগুলি মুখ্যত সাধন-সঙ্গীত। অবশ্য কিছু কিছু গান কবিওয়ালা বা পাঁচালিওয়ালা এবং পরবর্তী কালের কবি-নাট্যকারগণ-কর্তৃকও রচিত হইয়াছে--সে ক্ষেত্রে সাধারণ ভক্তি-আকুতি-প্রকাশের প্রথাবদ্ধতা প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সঙ্গীতগুলি সাধন-প্রেরণা-প্রসূত।" শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'বাঙলা শাক্ত-সাহিত্য', *ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য,* কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৮৭, পৃ. ২২৭-২২৮

১৯২। রামপ্রসাদ সেন, 'বিজয়া', *শাক্ত পদাবলী (চয়ন)*, অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৪৬

১৯৩। দাশরথি রায়, 'আগমনী', ঐ, পৃ. ১৯।

১৯৪। দাশরথি রায়, 'বিবিধ সঙ্গীত' ('শ্রীশ্রীদুর্গা-বিষয়ক'), *দাশরথি রায়ের পাঁচালি,* অর্দ্ধেন্দুশেখর রায় সম্পাদিত, মহেশ লাইব্রেরী, প্রথম সংস্করণ, মে ১৯৬০, পৃ. ৬৪৪

১৯৫। *বৃহৎ তন্ত্রসার*-এ উল্লিখিত 'হেরম্ব মন্ত্র'-এ হেরম্ব গণেশের তান্ত্রিকী পূজাবিধান বর্ণিত হয়েছে। তন্ত্রে চতুরক্ষর মন্ত্রে হেরম্বের পূজা করার নির্দেশ আছে। মন্ত্রটি হল 'ওঁ গূং নমঃ'। তাঁর আকার সম্বন্ধে ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে --- 'মুক্তা কাঞ্চননীলকুন্দঘৃসৃণচ্ছায়ৈস্ত্রিনেত্রান্বিতৈর্নাগাস্যৈর্হরিবাহনং শশিধরং হেরম্বমর্কপ্রভং', অর্থাৎ মুক্তা ও কাঞ্চনের মতো দেহকান্তি, ত্রিনয়ন, সিংহবাহন ও হস্তীমুখ, কপালে চন্দ্র, সূর্যের মতো তেজস্বী এবং মদগর্ব প্রমত্ত (*বৃহৎ তন্ত্রসার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯)। খেয়াল করলেই দেখা যাবে, হেরম্ব গণেশের এই তন্ত্রোক্ত বর্ণনার সঙ্গে আলোচ্য গানে ব্যবহৃত 'হেরম্ব-জননি'-র 'হেরম্ব' শব্দের কোনও ভাবসাদৃশ্য নেই। শাক্ত পদাবলীর 'বাল'-রূপী গণপতির ধারণার সঙ্গে হেরম্বের তান্ত্রিক রূপকল্পনাটি একেবারেই আলাদা। কাজেই, দাশরথির রচনায় 'হেরম্ব' নিশ্চিতরূপেই তন্ত্র-সূত্রে প্রাপ্ত নয়।

১৯৬। *মুদ্গপুরাণ*-এ গণেশের বত্রিশটি রূপের মধ্যে 'হেরম্ব' অন্যতম। *গণেশপুরাণ*-এ গণেশকে 'হেরম্ব' অভিধায় বিশেষিত করা হয়েছে। *স্কন্দ-পুরাণ*-এর 'কাশীখণ্ড'-এ (উত্তরার্দ্ধখণ্ড, ৫৭ নং অধ্যায়) বারাণসীস্থিত ছাপান্নজন বিনায়কের মধ্যে 'মুণ্ড' বিনায়কের অগ্নিকোণে অবস্থিত 'হেরম্ব' গণেশ ('হেরম্বাখ্যঃ সদাগ্নেয্যাং পূজ্যো মুণ্ডোবিনায়কাৎ') সতত পূজনীয়। *পদ্মপুরাণ*-এর 'সৃষ্টিখণ্ড'-এর (৬৩ নং অধ্যায়) 'গণপতি স্তোত্র কীর্ত্তন' অধ্যায়ে গণেশ-নামাষ্টকের মধ্যে 'হেরম্ব' গণেশের ('দ্বৈমাতুরশ্চ হেরম্বো একদন্ত গণাধিপঃ') উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া

বঙ্গীয় পুরাণসমূহের মধ্যে *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এর 'মধ্যখণ্ড'-এ ব্রহ্মার মুখে গণেশের বীজরূপে ('হেরম্ব ইতি নামাস্য বীজরূপং সদাস্তু চ') এবং ঋষিগণের মুখোচ্চারিত গণেশের পঞ্চাশৎ নামের মধ্যে হেরম্ব ('গণেশ গণনাথশ্চ হেরম্বো গিরিশাত্মজ') অভিধাটি পাওয়া যায়। এ ছাড়া *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর 'গণেশখণ্ড'-এ বিষ্ণুকৃত সামবেদোক্ত অর্থযুক্ত নামাষ্টক স্তোত্রে গণেশের 'হেরম্ব' রূপের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৯৭। *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর ৪৪ নং অধ্যায়ে বিষ্ণুবচনে 'হেরম্ব' শব্দের 'হে' অর্থ দীন এবং 'রম্ব' অর্থ পালক। অতএব 'হেরম্ব' শব্দটি 'দীনজনপ্রতিপালক' ("দীনার্থবাচকো হেশ্চ রম্বঃ পালকবাচকঃ!/ পরিপালকং দীনানাং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্।।") অর্থে প্রযোজ্য। (পৃ. ২৮৪)

১৯৮। পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভক্তের আকুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

১৯৯। দাশরথি রায়, 'আগমনী', ঐ, পৃ. ২২

২০০। জগন্নাথ বসু-মল্লিক, 'আগমনী', ঐ, পৃ. ১৭

২০১। রাম বসু, 'আগমনী', ঐ, পৃ. ৬-৭

২০২। অজ্ঞাতনামা জনৈক কবি, 'আগমনী', ঐ, পৃ. ৩৮

২০৩। *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এর 'গণেশ জন্ম বিবরণ' অধ্যায়ে ব্রহ্মার বচনে (৮৭ নং শ্লোক) 'লম্বোদর' শব্দটি নিন্দনীয় ('লম্বোদরস্তু নিন্দ্যত্বান্নাম্না পুত্রোহস্তু তে শিব') অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ['গণেশ জন্ম বিবরণ', *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬] পাশাপাশি *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর 'গণেশখণ্ড'-এ বিষ্ণুকৃত গণেশ-নামাষ্টক স্তোত্রে (৯১ নং শ্লোক) 'লম্বোদর'-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'বিষ্ণুদত্তৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্যস্য লম্বোদরং পুরা।/ পিত্রা দত্তৈশ্চ বিধিধৈর্বন্দে লম্বোদরঞ্চ তম্।।' অর্থাৎ 'পূর্বে বিষ্ণুপ্রদত্ত নৈবেদ্য ও পিতৃদত্ত নানাবিধ ভোগে যাঁহার উদর লম্বমান হইয়াছে, সেই লম্বোদরকে বন্দনা করি'। ['গণেশখণ্ড', *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪, ৩০০]

২০৪। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'আগমনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯

২০৫। অজ্ঞাতনামা জনৈক কবি, 'আগমনী', ঐ, পৃ. ৩

২০৬। "... শাক্তপদাবলীর আগমনী-বিজয়ার অংশে মাতৃস্নেহের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির পরিপূর্ণ আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে। মেনকা সেই অপার বাৎসল্যের আধার--- মাতৃলীলাকীর্তনের প্রধান নায়িকা।... কন্যার আগমন

লাগিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা-ব্যাকুলতা, কন্যাকে কাছে পাইয়া আনন্দ-বিহ্বলতা এবং তাঁহাকে বিদায় দিতে গিয়া মর্মান্তিক বেদনার মধ্যে বাৎসল্যের অত্যাশ্চর্য পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে।" জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, 'লীলাপর্ব', *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা,* কলকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরী, কার্তিক ১৪১৩, পৃ. ৮২-৮৩

২০৭। দাশরথি রায়, 'আগমনী' (খ) ('মেনকার গৌরী অন্বেষণ'), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৪-৫০৫

২০৮। ওই 'হিমালয়ের গৃহে গৌরী', পৃ. ৫০৬-৫০৭

২০৯। সগুণ ব্রহ্মভেদ-বিজ্ঞান অনুসারে ষট্‌কোণবিশিষ্ট ব্রহ্মভাবচক্রে নিম্নমুখী ত্রিকোণের 'সদানন্দ মিশ্রবিন্দু'-তে 'জ্ঞানমূর্তি' গণপতির অধিষ্ঠান সংক্রান্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য। স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী, 'উপাস্য ভেদ' (দ্বিতীয় উল্লাস), *পূজা-প্রদীপ (সচিত্র),* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

২১০। তন্ত্রবাক্য অনুসারে গণেশ উপাসকের 'জ্ঞানতত্ত্ব'-রূপে স্বীকৃত : 'শিবো মমাত্মা মম শক্তিরাদ্যা জ্ঞানং গণেশো মম চক্ষুরর্ক' অর্থাৎ শিব উপাসকের আত্মাতত্ত্ব, আদ্যাপ্রকৃতি শক্তিতত্ত্ব, গণেশ জ্ঞানতত্ত্ব এবং সূর্য চক্ষুতত্ত্ব। জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, 'ষষ্ঠ অধ্যায়', *পঞ্চ তত্ত্ব-বিচার,* কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ ব., পৃ. ১০৭

২১১। প্রাগুক্ত, 'গৌরীর গণেশ-জননী রূপ', পৃ. ৫০৭

২১২। প্রাগুক্ত *বৃহৎ তন্ত্রসার*-এর বর্ণনা দ্রষ্টব্য, পৃ. ২০৯

২১৩। *বৃহৎ তন্ত্রসার*-এর মন্ত্র-বর্ণনা অনুযায়ী 'হেরম্ব' গণেশের গাত্রবর্ণ 'কাঞ্চন'-সম অর্থাৎ হলুদ অথবা 'মুক্তা'-সম অর্থাৎ সাদা। এ ছাড়া মন্ত্রান্তরে তিনি রক্তবর্ণ। ঐ, পৃ. ২০৯-২১০

২১৪। দাশরথি রায়, 'মঙ্গলাচরণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১

২১৫। ঐ, 'বিবিধ সঙ্গীত' ('শ্রীশ্রীগণেশ-বিষয়ক'), পৃ. ৬৪৩

২১৬। A. K. Narain. 'Ganesa: A Protohistory of the Idea and the Icon'. *Ganesh: Studies of an Asian God.* Robert L. Brown (ed.), Delhi: Sri Satguru Publication, 1997, pp. 21-24

২১৭। এ প্রসঙ্গে মৈথিল স্মৃতিনিবন্ধ বীরমিত্রোদয় ও মদনপারিজাত দেখা যাতে পারে।

২১৮। 'সিদ্ধিবিনায়ক-ব্রত', *পুরোহিত-দর্পণ* (পঞ্চম খণ্ড), সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য (সম্পা.) কলকাতা : হরিদাস বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩১১ ব., পৃ. ৯১১

২১৯। পুরাণভারতী ধনপতি হালদার সংকলিত শ্রীশ্রীগণেশের অষ্টোত্তর শতনাম শীর্ষক রচনাটি দেখা যেতে পারে। 'ভাদ্রপদ মাঘ আর অগ্রহায়ণেতে। কিংবা শ্রাবণ মাসে শুক্লা চতুর্থীতে।।' (http://www.milansagar.com)

২২০। Debiprasad Chattopadhyaya. 'Gauri : Studies in Indian Mother-Right', *Lokayata : A study in Ancient Indian Materialism.* New Delhi : People's Publishing House, July 1959, pp. 232-233

২২১। ঐ, পৃ. ২৩৩

২২২। B. A. Gupte. 'Harvest Festivals in Honour of Gauri and Ganesh'. *The Indian Antiquary.* (Vol. XXXV). Richard Carnac Temple, 2nd Baronet (ed.), Bombay : Bombay Education Society's Press, July 1906, pp. 60-64

২২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৮-৯১৩

২২৪। রঘুনন্দন, 'অথ চতুর্থী' (ভাদ্রচতুর্থ্যাং চন্দ্রদর্শননিষেধঃ), *তিথিতত্ত্বম্,* নলিনীকান্ত মিশ্র ও অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা : সদেশ, ১৪১৭ ব., পৃ. ৯৮-৯৯

২২৫। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'নষ্টচন্দ্র', *হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান,* কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ১০৪-১০৫

২২৬। অন্ন বিনায়কের পত্নী 'পুষ্টিলক্ষ্মী' বরাহ ও ধরিত্রীর কন্যা এবং 'অন্নলক্ষ্মী' মহালক্ষ্মী দেবীর নয়নকমলজাত বসুমতীলক্ষ্মী।

২২৭। 'উত্তরখণ্ড' (নবম অধ্যায়, ৬-১২ নং শ্লোক), *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ,* পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০ ব., পৃ. ৩১৮

২২৮। R.C. Hazra. *Studies in the Upapuranas* (Vol. II). Kolkata : Sanskrit College, 1963, p. 461 & Kunal Chakrabarti. 'Text and Traditions : The Bengal Puranas'. *Religious Process :*

The Puranas and the making of a Regional Tradition, New Delhi : Oxford Univery Press, 2001, p. 50

২২৯। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 'দুর্গা ষষ্ঠীর ব্রত', *মেয়েদের ব্রতকথা,* অমিত ভট্টাচার্য (সম্পা.), কলকাতা : পারুল, ২০১৩ খ্রি., পৃ. ৯১-৯৩

২৩০। অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নূতন খাতা মহরৎ', *আদর্শ শ্রীশ্রীগণেশ পূজা পদ্ধতি,* শ্রী প্রকাশনী, ১৪২৮ ব., পৃ. ১৪৩-১৪৪

২৩১। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে পিএইচ. ডি ডিগ্রি লাভের জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ। Kalpana Chattopadhyay. *Minor Religious Cults and Sects in Bengal (From C.4th Century to 12th Century A. D.),* 1986, p. 112. লিংক: http://hdl.handle.net/10603/68499, accessed 10. 07. 2019

২৩২। সত্যনারায়ণ গোস্বামী সম্পাদিত 'প্রতিচ্ছবি' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি এ প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে।

২৩৩। এ প্রসঙ্গে ২ অক্টোবর, ২০১৯-এ *সংবাদ প্রতিদিন* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন দেখে নেওয়া যেতে পারে। লিংক: https://www.sangbadpratidin.in/pujo/pujo2019/durga-with-ganesha-on-her-lap-kashipur-family-worships-devi-as-eternal-mother/, accessed 11. 07. 2020

২৩৪। এ প্রসঙ্গে ২ মার্চ, ২০২১-এ শান্তিপুরের গণেশ-জননী মাতার পূজা বিষয়ে (https://socialbarta.in) প্রকাশিত প্রতিবেদনটি দেখে নেওয়া যেতে পারে, accessed 11. 07. 2020

২৩৫। পবিত্র চক্রবর্তী, *চাকদহ : ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* নবপত্র প্রকাশন, পৃ. ১৫৬

২৩৬। মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, *নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত,* নবদ্বীপ : নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৩৩৪

চতুর্থ অধ্যায়

বিবর্তনের ধারায় গণপতি এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পরিগ্রহণ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গণেশের উপস্থাপনা বহুমাত্রাযুক্ত। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের প্রথমভাগ জুড়ে যে শাক্তগীতির ঐতিহ্য বঙ্গদেশে বহমান ছিল, সেখানে বিভিন্ন পদকর্তাদের রচনা-সূত্রে স্থানে স্থানে পার্বতী বা গৌরীর পাশাপাশি গণেশের নামোল্লেখ এবং তদুচিত উপস্থাপনা আগের অংশেই লক্ষ করা গেছে। এমনকি দাশু রায়ের পাঁচালিতেও 'আগমনী' পালার কয়েকটি গানে গণেশের প্রসঙ্গ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ধারণ করেছে। সেখানে দেবতার রূপায়ণে শুধু প্রথামাফিক অনুবর্তনই নয়, target audience-এর ভাবনাসূত্রে ঘনিয়ে ওঠা নানাবিধ সমাজ-প্রশ্নও সমানতালে ঠাঁই করে নিয়েছে। শাস্ত্রবদ্ধ ধাঁচা মেনে গণেশের রূপনির্মিতির পাশাপাশি কখনও কখনও সামান্য পরিহাস-রসিকতা, কৌতুক কিংবা তির্যক কোনও ইংগিতও গণেশকে ঘিরে উঠে এসেছে। আঠারো হয়ে উনিশের এই বঙ্গদেশে গণেশ-কেন্দ্রিক সাহিত্য পৃথকভাবে পাওয়া একটু দুষ্কর ঠিকই, তবে এই সময়পর্ব থেকেই সাহিত্যে মুখ্যত দেবতার রূপায়ণ বা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্পষ্ট দুটো category চোখে পড়ে।

প্রথমত, পূর্বতন ধর্মসাহিত্যের ঐতিহ্য মেনেই সংশ্লিষ্ট দেবতার প্রথামাফিক উপস্থাপনা। এক্ষেত্রে ভারতীয় পুরাণ অথবা ধর্ম-শাস্ত্রের ঐতিহ্যগত পরিসরের সঙ্গে সংস্রব রক্ষা করেই সাহিত্যক্ষেত্রে গণেশের রূপাঙ্কন ঘটেছে। ফলত, তাঁর divinity বা দেবত্ব সর্বার্থেই রক্ষিত হয়েছে। তবে উনিশ শতকীয় 'আধুনিক' প্রকল্পের দাবি মেনে কোনও কোনও সংরূপের (যেমন, গীতিকবিতার ক্ষেত্রে লক্ষণীয়) বিশিষ্ট প্রবণতা অনুযায়ী কখনও কখনও রচয়িতা অথবা ব্যক্তি-কবির personal tone কাব্যের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। সেক্ষেত্রে অবশ্য রচনাকারের আত্মগত অনুভবের অন্তর্ভুক্তিতে দেবতা-কেন্দ্রিক রচনাটি কেবলমাত্র দেবতার objective চিত্রণ হয়েই থাকেনি, অনেকখানি subjective হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট দেবতা এবং তদ্বিষয়ক মোটিফগুলি সাহিত্যে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একধরনের reconstruction বা পুনর্নির্মাণ ও নবরূপায়ণ সংক্রান্ত ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া। এক্ষেত্রে কোনও কোনও জায়গায় মিথ-পুরাণের ভাঙা-গড়ার মাধ্যমে দেবতার মানবায়ন যেমন ঘটেছে, তেমনি দেবতার 'আধুনিক' রূপ তৈরির ক্ষেত্রে পরিবর্তিত সময়ের দাবি মেনে অনেক জটিল-গভীর সমাজ-জিজ্ঞাসাও সমান্তরালভাবে উঠে এসেছে। ফলে অধ্যাত্ম-মার্গের নির্ধারিত পরিসরটুকুর বাইরে গিয়ে একধরনের de-divinization এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষ ক্ষেত্রে 'দেবত্ব' খুইয়ে গণেশের এই মর্ত্যলগ্নতা, মানব-প্রবৃত্তির বিবিধ রকমফেরের সঙ্গে তাঁর সমত্ব তৈরি, এমনকি

মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব, আচরণ অথবা গুণাগুণের সঙ্গে গণেশের গভীর সমন্বয় দেবতাকে পারমার্থিক স্তরে সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁকে জঙ্গম জীবনময় প্রবাহের অংশীদার করে তুলেছে।

৪.১

কাব্য-কবিতায় গণেশ-প্রসঙ্গ

মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও *কোমল কবিতা* (প্রথম ভাগ) :

বিশ শতকের প্রথম দশকের একেবারে অন্তিম পর্যায়ে কাটোয়ার এড্‌ওয়ার্ড প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের *কোমল-কবিতা* (প্রথম ভাগ)।[১] ১৩১৭ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯১০ খ্রিঃ) প্রকাশিত এই কবিতা সংকলনের অন্তর্গত দ্বিতীয় কবিতা 'গণেশ বন্দনা' একান্তভাবেই গণপতির মাহাত্ম্যজ্ঞাপক 'বন্দনা' পর্যায়ের রচনা। চোদ্দো (৮+৬) মাত্রার মিশ্র কলাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এই কবিতায় গণেশের চিত্রণ পৌরাণিক ঐতিহ্যের ধারানুসারী। শিরোনামের 'গণেশ বন্দনা' শব্দ পূর্বতন 'মঙ্গলগীত'-ধারার পরম্পরিত উত্তরাধিকারকে স্মরণ করায়। কেবল আক্ষরিকভাবেই এটি সত্য নয়, বিষয়বস্তুর নিরিখেও প্রমাণিত। গণেশকে কেন্দ্র করে ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্য এবং বিবিধ ধর্মবিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থে যে যে অনুষঙ্গ এযাবৎ গড়ে উঠেছে, বর্তমান কবিতায় গণেশের রূপায়ণে তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। কবি গণেশকে 'গজানন', 'বাঞ্ছা কল্পতরু' এবং 'বিঘ্ন-নাশন' রূপে অভিহিত করেছেন। দেবমণ্ডলে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁকে ব্যাস আদি পুণ্যশ্লোক ঋষিবর্গের 'গুরু' স্থানে অভিষিক্ত করা হয়েছে। কবির বর্ণনায় ব্যাস-উক্ত *মহাভারত*-এর অনুলিপিকার গণেশের জিহ্বাগ্রে সারদা বা সরস্বতীর অধিষ্ঠান। তিনি 'শক্তির হৃদয় ধন' অর্থাৎ পার্বতী বা গৌরীর ঐকান্তিক সংসর্গধন্য। মাতৃ-অংশজাত গণেশের সঙ্গে গৌরীর নৈকট্যের পৌরাণিক প্রসঙ্গটি এই অংশে আভাসিত। শেষাংশে কবি মূষিকবাহন গণপতির কাছে তাঁর অজ্ঞানতার জন্য দয়া ভিক্ষা করে সংসার-সমুদ্র উত্তরণের কৃপাভিক্ষা করেছেন। সমগ্র কবিতাটি মহেন্দ্রনাথের ভক্তিভাবাপ্লুত হৃদয় থেকে উৎসারিত হলেও বিষয়বস্তুতে কোনও নতুনত্বের ছোঁয়া নেই। কবিতা সংকলনের প্রারম্ভে দেবী সরস্বতীর বন্দনা করে পরবর্তী অংশে গণেশ বন্দনার পর মূল পর্যায়ের কবিতাগুলি শুরু হয়েছে। সম্ভবত নির্বিঘ্নে কাব্যরচনা অথবা সামূহিক বিঘ্ননাশের উদ্দেশ্যে গণেশের অর্চনা করা শাস্ত্রবিহিত বলেই কবি গ্রন্থের প্রথমভাগে গণেশ বন্দনামূলক কবিতা রচনা করেছেন। যদিও পূর্ববর্তী মঙ্গলগীতের গণেশ-বন্দনার মতোই এটি আবেদনে গতানুগতিক এবং শাস্ত্রবদ্ধ উপস্থাপনা বলেই মনে হয়।

দেবেন্দ্রনাথ সেন ও *গণেশ-মঙ্গল* :

দেবেন্দ্রনাথ সেনের *গণেশ-মঙ্গল* শীর্ষক গীতিকাব্যটি ১৩১৯ বঙ্গাব্দের (ইং ১৯১২ খ্রি.) ২৮শে কার্তিক তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা থেকে প্রকাশিত হয়।[২] উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল : "যিনি ইংল্যাণ্ডের মহিলাদিগের মধ্যে আদর্শ নারী, হিন্দুজাতির সহিত যাঁহার অপূর্ব্ব সহানুভূতি, যিনি ধর্ম্মপ্রাণা ও সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষশূন্যা, সেই মিসেস্ ইউল মহোদয়ার কর-কমলে এই ক্ষুদ্র "গণেশ-মঙ্গল" আন্তরিক ভক্তির সহিত অর্পিত হইল"। উৎসর্গপত্র-ধৃত এই বয়ানটির সূত্রেই কার্যত *গণেশ-মঙ্গল* গীতিকাব্যের একটি অবয়বগত বিশেষত্ব অনুধাবন করা যায়। একটিমাত্র গ্রন্থ-কলেবরে গীতিকাব্যের মূল বঙ্গীয় রূপটির পাশাপাশি কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদটিও সযত্নে ঠাঁই পেয়েছে। এর নিশ্চিত কারণ, পাশ্চাত্যের বরেণ্য সম্মাননীয়া 'আদর্শ নারী' মিসেস্ ইউল, *গণেশ-মঙ্গল* কাব্যটি যাঁর 'কর-কমলে' উৎসর্গীকৃত, তাঁর বোধগম্যতার প্রশ্নটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েই দেবেন্দ্রনাথ কাব্যের স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদটিকেও একাধারে প্রকাশ করেছেন। বিশ শতকীয় বাংলা কাব্যধারায় মূল বাংলা রচনাটির সঙ্গে তার অনূদিত রূপটিকেও এ'ভাবে একই কলেবরে ধারণ করার দৃষ্টান্ত খুব বেশি মিলবে না। কাজেই, author এবং translator এ কাব্যে একযোগে উপস্থিত।

বিষয়বস্তুর বিচারে দেবেন্দ্রনাথের *গণেশ-মঙ্গল* গণেশের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক গীতিকাব্য। কাব্যনামে 'মঙ্গল' শব্দের উল্লেখে পূর্বতন 'মঙ্গলগীত'-ধারার অনুবৃত্তি আপাতভাবে চোখে পড়লেও সংরূপের নিরিখে *গণেশ-মঙ্গল* একান্তভাবেই গণেশ-কেন্দ্রিক 'গীতিকাব্য'। উনিশ-বিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মুখর এক পরিমণ্ডলে এর জন্ম। কাজেই, মধ্যযুগীয় কাব্যধারার বাঁধাগতে শুধুমাত্র দেববাদ-নির্ভরতা অর্থাৎ ভক্ত-কবির গণেশে আত্মসমর্পণটুকুই এর একমাত্র অন্বিষ্ট নয়। মঙ্গলগীতের কবিরা ছিলেন যূথমনস্তত্ত্বের রূপকার। বন্দনাংশের ভণিতায় তাঁদের আবির্ভাব সমষ্টির প্রতিনিধি হিসেবে, 'একক' হিসেবে নয়। অথচ গীতিকাব্যের কবি কাব্যের পরিসরে তাঁর individuality বা স্বাতন্ত্র্য সমেত পূর্ণভাবে উপস্থিত থাকেন। ফলে উপাস্য দেবতার রূপাঙ্কনের সমান্তরালে কবির ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি তাঁর ভক্তিনম্র হৃদয়ের স্বতোৎসারিত অভিব্যক্তিরূপে প্রকাশিত হয়েছে। কবি দেবেন্দ্রের আত্মগত উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার নির্যাস গণেশ-মাহাত্ম্য বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গীতিকাব্যের ডৌলটি সম্পূর্ণ করেছে। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার দেবেন্দ্রনাথের অন্তিম পর্যায়ের কাব্যগুলির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এই কাব্যগুলিতে কবির শেষ-বয়সের কল্পনা ভক্তিতে সমাহিত। প্রাণ এখন অন্তরে আনন্দ চায় না, চায় সান্ত্বনা।'[৩] *গণেশ-মঙ্গল* কাব্যের অন্তঃস্থলেও এই আকুতি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

গণেশ-মঙ্গল গীতিকাব্যটি স্পষ্টত দুটি অংশে বিভাজিত। প্রথমার্ধে আছে গণেশের শাস্ত্রবদ্ধ উপস্থাপনা। দ্বিতীয়ার্ধে গণেশের উদ্দেশে কবির ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির উন্মোচন ঘটেছে। প্রথমাংশের বর্ণনায় ভারতীয় ধর্ম-পরম্পরাবাহিত শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে গণেশ প্রসঙ্গের সরাসরি আত্তীকরণ চোখে পড়ে। বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে গণেশ সম্বন্ধে প্রযুক্ত epithet বা মহিমময় অভিধাগুলি হল যথাক্রমে ‘বিঘ্নবিনাশন’, ‘লম্বোদর’, ‘সর্ব্বসিদ্ধিদাতা’, ‘গজানন’, ‘বিনায়ক’, এবং ‘গণপতি’। প্রথম ভাগের গণেশ মাহাত্ম্য বর্ণনা মুখ্যত আবাহনমূলক। গণেশ-কেন্দ্রিক ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গগুলি কবির বর্ণনায় প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। তবে গণেশের গুরুত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে কবি তাঁকে ত্রিদেবাতীত মর্যাদায় আসীন করেছেন। যতই তিনি আনন্দরূপী প্রকৃতির ক্রোড়ে হস্তীশুণ্ড দুলিয়ে ত্রিভুবন মাতিয়ে বেড়ান না কেন, প্রকৃত পরিচয়ে তিনি গাণপত্য কুলদেবতা ‘স্বানন্দনাথ’, তিনি আপনাতে আপনিই পূর্ণ। কাজেই, শিব বা গৌরীপুত্র রূপে গণেশের রূপাঙ্কন কবি করেননি। তাঁর বর্ণনায় সর্বগুণধর গণেশ অনন্ত শক্তির উৎস, সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাচক ধারণা। স্বরূপত তিনি ব্রহ্মসদৃশ নিরাকার, নির্গুণ, নিরূপাধি। তবে সৃষ্টিবিধান রচনা ও রক্ষণের জন্য তাঁকে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মক হতে হয়েছে। তিনিই জগৎকারণ পূর্ণশক্তি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তাঁর থেকেই সৃষ্ট। মুখ্য ত্রিদেব ছাড়াও ইন্দ্র, বরুণ, অসুর, গন্ধর্ব, নর সকলেই তাঁর রচনা। কেবলমাত্র দেবকুল বা নরকুল নয়, মনুষ্যবৃত্তিগুলিরও তিনিই অধীশ্বর। এমনকি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে চরাচরব্যাপী প্রকৃতির যে লীলা প্রসারিত, সে’সবই তাঁরই অঙ্গুলিহেলনে নিয়ন্ত্রিত হয়। কাল-ফণীরূপ গর্জনশীল ‘গুণময়ীর মায়া’-র শিরে গণেশ যেন ‘দীপ্ত পদ্মরাগ-মণি’র মতো ‘অপূর্ব্ব ভাস্বর’। আবার, কৃষ্ণ ও ভীষণ শ্রাবণের মেঘমালার মধ্যে গণেশ যেন ‘চির-সুন্দর’, ‘লাবণ্য-নির্ঝর’ বিদ্যুতের ছটারূপে (‘সৌদামিনী হাসি’) বিরাজিত। শ্মশানের ‘দিগম্বর’ বা শিবের মধ্যে যে চিররহস্যের মহাব্যাপ্তি উদ্‌ভাসিত হয়, গণেশ যেন ‘গৌরীরূপে’ তাঁর সর্বাঙ্গকে সুন্দর করে তোলেন। গণপতি এখানে সর্বত্রব্যাপী, নির্বিশেষ, লিঙ্গপরিচয়হীন এক চরম নিরপেক্ষ সত্তা। যাবতীয় পার্থিব অথবা অপার্থিব আধার সমূহের মূল নিয়ন্তাশক্তি। সৌন্দর্য, মাধুর্য, কোমলতা, সারল্য, ‘সতীর সতীত্ব’, ‘ভক্তের ভক্তি’, ‘প্রেমিকের মহা-প্রেম’--- গণপতি কার্যত সমস্ত ধারণাতেই বিদ্যমান। তিনি জগৎ এবং জীবনের অবিকল্প, অনিবার্য মূর্তি। ভক্তি-স্তুতি-দ্রব্য-ঋদ্ধিহীন কবি প্রথমার্ধের শেষে গণেশের কাছে দয়াভিক্ষা করেছেন। কারণ, গণেশ যদি শুণ্ডের সংকেতে কবির প্রতি দয়াপরবশ হন, একমাত্র তবেই তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটবে। প্রথম অংশের বর্ণনাটি কবি দেবেন্দ্রের ভক্তি-উচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ের নির্গলিত অভিব্যক্তি। কিছুটা পরম্পরাগত, পূর্বানুগ, মুখ্যত মধ্যযুগের দেব-বন্দনাগীতের ধারানুসারী।

দ্বিতীয়ভাগে দেবেন্দ্রনাথ গণেশের চরণ-শরণ প্রার্থনা করে তাঁর পূর্বকৃত 'অপরাধের' প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন। এখানে গণেশে কবির আত্মসমর্পণ প্রধানত স্বীকারোক্তিমূলক। 'আদিতে হে দেব কর্ম্মের প্রসঙ্গে/ করিয়াছি পাপ কত'--- শীর্ষক পঙ্‌ক্তি থেকেই কবিতার ভাষ্য বদলেছে। গণেশের মহিমা-জ্ঞাপনের বস্তুনিষ্ঠ পরিসর ছেড়ে এখান থেকেই কার্যত কবির স্বরে আত্মগত উপলব্ধির প্রলেপ লেগেছে। গণেশের সমক্ষে আত্মবোধের প্রতিফলনেই কাব্যের দ্বিতীয়াংশ উজ্জ্বল। কবির মনে হয়েছে তাঁর পূর্বজন্মের পাপের ফলে তিনি মাতৃজঠরে বাসকালেও অবিরত ক্লেশ সহ্য করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর সারাজীবনের কৃতকর্মের জন্যও গভীরভাবে অনুতপ্ত। শৈশব থেকে যৌবন হয়ে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত তাঁর পাপ বা অপরাধের সীমা বিস্তৃত। কবি-জীবনের প্রথমভাগে তিনি ইন্দ্রিয়প্রীতি, রূপতৃষ্ণা এবং সৌন্দর্যপিপাসার জগতে নিত্য নিমজ্জিত ছিলেন। অত্যধিক নারী-সংসর্গ, পরস্ত্রী-তে আসক্তি, সুতীব্র কামুকতা ব্যক্তি-দেবেন্দ্রের জীবনযাপনের অঙ্গ ছিল। নারী-রূপ-তৃষ্ণায় এমনই বিভোর ছিলেন যে পার্থিব সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের উদগ্র পিপাসা তিনি পরিহার করতে পারেননি। গভীর জীবনাসক্তি এবং নারীসম্ভোগ-বাসনায় তাঁর জীবন আচ্ছন্ন হয়েছিল। কাব্যাঙ্গনেও তিনি দেহ-দীপ জ্বেলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আরতি করেছেন। বিশেষত নারীরূপের মোহনীয় সৌন্দর্য ব্যক্তি-দেবেন্দ্রের আসঙ্গলিপ্সু চিত্তলোকে এমন এক মদিরতা তৈরি করেছিল যে সেই কাম-পঙ্কিলতার বৃত্ত থেকে তাঁর নিষ্কৃতি মিলছিল না। দেবপূজার জন্য আসনে বসেও অশান্ত অন্তরে কামনার শিখা নিত্য প্রজ্জ্বলিত ছিল। তাঁর চিত্তের অসংযম, চাঞ্চল্য, ভোগ-লালসা, এমনকি হিংসা-দ্বেষ-পরনিন্দায় উন্মত্ত অন্তর পরিশেষে বার্ধক্যকালে গণেশের চরণে আত্মনিবেদনের সংকল্প গ্রহণ করে। নিজেকে বৃত্রাসুরের সঙ্গে তুলনা করে কবি তাঁর জঘন্য পাশব-বৃত্তির জন্য গণেশের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। তাঁর একান্ত প্রার্থনা, সিদ্ধিদাতা মঙ্গলমূর্তি গণপতি যেন তাঁর ইহজীবনের পূর্বকৃত অপরাধগুলি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে তাঁকে অনন্ত পুণ্যের পথে চালিত করেন। বহুজন্মের কর্মভোগ সাঙ্গ করে কবি যেন লোকান্তরের পর সিদ্ধিদাতার কৃপায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। কৃষ্ণ অবতারের রূপে দীন বিদুরের উপহার গ্রহণ করে তাঁকে যেমন কৃতার্থ করেছিলেন, *গণেশ-মঙ্গল* রচয়িতা দেবেন্দ্র-ও তেমনি তাঁর এই ভক্তিগীতিকাব্য রচনার মধ্য দিয়ে গণেশকে প্রসন্ন করতে চেয়েছেন। কৃপাসিন্ধু গণপতির চরণতলাশ্রয় লাভেই তাঁর কবিজীবনের পরম সার্থকতা।

গবেষক অধীশ চন্দ্র সাহা *দেবেন্দ্রনাথ সেন : জীবনী ও কাব্যবিচার* শীর্ষক গবেষণা-অভিসন্দর্ভে দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-ভাবমূলক কবিতাগুলির মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, "বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে লিখিত দেবেন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত কবিতাই অধ্যাত্ম বিষয়ক কবিতা। ভক্তি এই কালে রচিত কবিতাগুলির মূল সুর। এই

কারণে দেবেন্দ্রনাথ সাধারণ পাঠক ও কাব্যানুরাগীদের কাছে ভক্ত কবি নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। প্রথমদিকে তাঁর ভক্তিরসাশ্রয়ী কবিতাগুলি পাঠকমহলে সমাদৃতও হয়েছিল।... কিন্তু পরবর্তীকালে একই ভাবের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি, সর্ববস্তুতে আধ্যাত্মিকতা আরোপ এবং তরল ভক্তি-রসোচ্ছ্বাসের ফলে এই কবিতাগুলি বিরূপ সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে পড়ে।"[৪] বর্তমান *গণেশ-মঙ্গল* কাব্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেও শেষের মন্তব্যটি খাটবে। দেবেন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় কবি-খ্যাতি লাভের জন্য শেষজীবনে ইংরেজি ভাষায় অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের শরৎকালে তাঁর দক্ষিণভারত ভ্রমণ এই পর্বের রচনাকৃতিগুলির প্রেক্ষাপট হিসেবে স্মরণীয়। এইসব ইংরেজি কবিতার সাহিত্যমূল্য অকিঞ্চিৎকর হলেও প্রবল আধ্যাত্মিকতা এবং অতি-উচ্ছ্বাসময় ভাষায় পরিচিত সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের মহত্ত্বকীর্তন এর প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। এই অভিজ্ঞতার প্রায় বছর চারেক পরে রচিত *গণেশ-মঙ্গল* কাব্যেও প্রগাঢ় ভক্তিভাবুকতার স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। তবে ভক্তি-প্রকাশের আতিশয্যে এবং একই বক্তব্যের ক্লান্তিকর পৌনঃপুনিকতায় বর্তমান কাব্যটিও তেমন আস্বাদ্য হতে পারেনি। এর একঘেঁয়ে পুনরাবৃত্তিমূলকতাটুকু বাদ দিলে বিশ শতকীয় বাংলা কাব্যধারায় দেবেন্দ্রনাথের *গণেশ-মঙ্গল*-ই গণেশ-কেন্দ্রিক একমাত্র গীতিকাব্য। অবিভক্ত বঙ্গদেশে, এমনকি অনুবাদকৃতির মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডের সমাজেও গণেশ-ভক্তির প্রসারতা এবং জনপ্রিয়তার দিক থেকে এই কাব্যের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। তা ছাড়া একরৈখিকভাবে দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্তনের বদলে কাব্যবিষয়ের মধ্যে কবি নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন এবং উদ্দিষ্ট দেবতার সঙ্গে অবিরত সংলাপ আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে একধরনের confession-এর সুরও কাব্যের মধ্যে উঠে এসেছে। দেবতার গৌরব-ঘোষণার সমান্তরালে মানব-ব্যক্তিত্বের এই অকপট উন্মোচন বিশ শতকের প্রথম পর্বের বাংলা কাব্যধারায় নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য চিহ্ন বহন করছে।

জয় গোস্বামীর কবিতায় গণেশ প্রসঙ্গ :

জয় গোস্বামীর *ওঃ স্বপ্ন!* কাব্যগ্রন্থটি ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের ৩২ সংখ্যক কবিতা '৯৬ বছরের পুরোহিত জ্যাঠামশাই যে-সব গল্প বলতেন তার একটি'-তে গণেশ প্রসঙ্গ এবং তদ্বিষয়ক উপস্থাপনা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।[৫] সম্পূর্ণ কবিতাটি আপাতভাবে পারিবারিক প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এর অন্তর্বয়নে সমাজ-ধর্মের অনেক সূক্ষ্ম-জটিল দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটেছে। কবিতায় বর্ণিত পারিবারিক আবহটি দুর্গা-পরিবারের একটি সম্পূর্ণ চালচিত্র। মর্ত্যে দুর্গাপূজার শেষে অসুরসহ সবাহন দুর্গা তাঁর চার ছেলে-মেয়ে নিয়ে কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে কার্তিক-গণেশের পুরাণ-বর্ণিত বিরোধের প্রচ্ছায়া লক্ষ করা যায়। যদিও পুরাণে গণেশ-

কার্তিকের প্রতিযোগিতার ভিত্তি ছিল ত্রিভুবন পরিক্রমা করে অগ্রে বিবাহ করবার অধিকার অর্জন অথবা পিতৃমাতৃদত্ত মোদক বা আশীর্বাদস্বরূপ কোনও পরমতত্ত্ব-প্রদায়ক দুর্লভ বস্তুর অধিকার লাভ। সেই পৌরাণিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বুদ্ধিবলে গণেশ জয়ী হয়েছিলেন এবং শক্তিমান কার্তিক অহঙ্কারবশত পরাভূত হয়েছিলেন। বুদ্ধির কাছে শক্তিকে হারতে হয়েছিল। আলোচ্য কবিতায় গণেশ-কার্তিকের তেমন কোনও প্রকাশ্য বিরোধের বিবরণ নেই, তবে দুর্গা-পরিবারের সন্তানদের মধ্যে স্পষ্ট দুটো পক্ষ বা শিবির-বিভাজন চোখে পড়ে। একপক্ষে কার্তিক-লক্ষ্মী-সরস্বতী এবং অন্যপক্ষে একা গণেশ। তবে গণেশ একা হয়েও ঠিক একা নন। তাঁর প্রশংসকারীর তালিকায় ইঁদুর এবং অসুরও আছে। দুর্গার অবস্থান এই দুই শিবিরের মধ্যসীমায়। কবিতায় 'মাসিমা' সম্বোধনে তিনি উল্লিখিত। প্রায় কথকতার ঢঙে বোনা এ কবিতায় একটা আশ্চর্য আটপৌরে মেজাজ আছে, যা প্রাকৃত বা লৌকিক জীবনের সঙ্গে দেব-দেবীদের এক সহজ সম্পর্ক-সূত্র রচনা করেছে। কবিতায় দেব-দেবীরা কেউই স্বনামে উপস্থিত নন, বাহনাদির মাধ্যমেই তাঁদের চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করা যাক।

কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি : 'মাসিমার দুই ছেলেরই গলায় খুব সুর' অর্থাৎ, দুর্গার দুই ছেলে কার্তিক এবং গণেশ দু'জনেই সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী। যদিও গণেশের ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি ক্ষণিকের, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি থেকেই ('অন্তত একজনের। অন্তত ময়ূর তাই বলে।') এককভাবে কার্তিকের গুণপনা প্রকাশিত। একে 'politics of specification' বা 'নির্দিষ্টকরণের রাজনীতি' বলা যেতে পারে। প্রথম স্তবকের পুরোটা জুড়েই কার্তিকের ক্ষমতা এবং গুণের উচ্চকিত বিবরণ। ময়ূরবাহন কার্তিক সুপুরুষ, উন্নতযুবা, এমনকি তাঁর কণ্ঠও সুরময়। ময়ূরের পিঠে চড়ে উড়তে উড়তে সে যখন গান ধরে 'চোখে জল এসে পড়ে অল্পবয়সিনী মেয়েদের'। কার্তিকের ভাবমূর্তিতে এমন একটা আকর্ষণ উদ্রেককারী ভঙ্গি, একটা sensuous effect আছে ('সে-ছেলে ধনুক পিঠে, সে-ছেলের কোঁকড়া-পানা চুল, বাঁকা গোঁফ), যার মধ্যে পুরুষের বাহুবল এবং যৌবনের যুগপৎ স্ফূর্তি লক্ষ করা যায়। তাঁর সুরক্ষেপণের মধ্যেও আছে একটা প্রদর্শনের ভাব। পেশিশক্তি এবং উচ্ছলিত তারুণ্যের মিশেলে গড়ে ওঠা কার্তিক দেব-সেনাপতি, এক আকর্ষক রমণীমোহন ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে গণেশের আধা মানুষ-আধা পশুসদৃশ স্থূল স্ফীতকায় দেহাবয়বে পুরুষোচিত দার্ঢ্য এবং যৌবনোচিত বিভা কোথায়? রূপজ আকর্ষণে কিংবা দেহসৌষ্ঠবের নিক্তিতে মাপলে তিনি মোটেই কার্তিকের সমকক্ষ নন। তবে তাঁর অন্যতর বিশিষ্টতা আছে। কার্তিকের পরে গণেশের প্রসঙ্গ পেড়ে কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের সূচনা। গণেশ কার্তিকের মতো বহির্মুখী নন, তিনি স্বভাবত অন্তর্মুখী। বিবাহিত জীবনেও অসুখী। হিসেব-নিকেশ করেই সময় কাটান। তিনি গজানন, কাজেই 'মুখের জায়গায় শুঁড়,

গলার জায়গায় ঘোঁতঘোঁত'। এই ধরনের দৈহিক বৈশিষ্ট্য গান গাইবার অন্তরায়। তবে তাতে তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই। কেননা, তাঁর সুরবিহার ইন্দ্রিয়বেদ্য নয়, অন্তর্লীন, সত্তার অন্তর্গত এক প্রক্রিয়া : "সে মনে-মনে সুর ধরতে জানে।/ মনে-মনে সা লাগায়, মনে-মনে দাঁড়ায় পঞ্চমে,/ সপ্তক ছাড়িয়ে চলে যায়"। এই সুরসাধনা অভ্যন্তরীণ বলেই সকলের সামনে প্রকাশযোগ্য নয়। সেই 'অশ্রুত নাদ' কেবলমাত্র ইঁদুর এবং অসুর শুনতে পায়। তারা প্রশংসাও করে। এরপর চারদিনের দুর্গাপূজার শেষে বাড়ি ফিরে দুর্গা যখন দাওয়ায় বসে হাত-পাখা হাতে জিরোচ্ছেন, তখন পায়ের কাছে বসে গল্প করতে করতে অসুর গণেশের সেই অন্তর্লীন সুরবিহারের প্রসঙ্গ তুলে ধরে। দুর্গাও যারপরনাই বিস্মিত হয়ে দুই মেয়ে লক্ষ্মী-সরস্বতীকে গণেশের গানের খবর শোনাতে যান। শোনামাত্রেই দুই বোন কোনওপ্রকার গুরুত্ব না দিয়ে 'মার আবার বেশি বেশি' বলে বাহনদের নিয়ে যে যার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। এই আচরণ থেকে মনে হয় গণেশের প্রতি দুর্গার মুগ্ধতা দেখে দুই দেবীই যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। হয়তো সামান্য ঈর্ষাকাতরও বটে। তাই বিরক্তিভরে তাঁরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছেন। এই চিত্রাঙ্কনে দুর্গা-পরিবারের চার সন্তানের মধ্যে যেমন একটি প্রচ্ছন্ন প্রতিপক্ষতার আঁচ পাওয়া যায়, তেমনি দুই বোনের ভর্ৎসনামূলক আচরণে গণেশের অবস্থানের প্রান্তিকতাও চোখ এড়ায় না। মনুষ্যসদৃশ দেহাবয়ব-বিশিষ্ট দেবতাদের অন্তঃপুরে গণেশ একা 'theriomorphic' অর্থাৎ অর্ধেক মানুষ-অর্ধেক পশুদেহযুক্ত বলেই কী তাঁর বিষয়ে দুর্গার সস্নেহ প্রশংসা অন্য দুই মেয়ে লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর কাছে এতখানি অসহ্য ঠেকেছে? নাকি হস্তীমুখ গণেশের শারীরিক সীমাবদ্ধতার জন্য বাকিরা তাঁকে সুরক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়েই রাখতে চেয়েছে। সম্ভবত এর মধ্যে অধিকারবোধেরও একটি প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব থেকে গেছে।

আক্ষরিকতা কখনও কখনও কবিতার নিহিতার্থকে স্পষ্ট করে দেয়। শব্দ বাচ্যার্থের সীমা টপকে মুহূর্তে অন্যতর ব্যঞ্জনা ঘনিয়ে তোলে অথবা কবিতার অভিপ্রায়টিকে সামনে এনে দেয়। একটা প্রসারিত, পরিব্যাপ্ত অর্থবোধ তৈরি হয় তখন। এ কবিতাতেও ঠিক তেমনিই হয়েছে। 'মরতে মরতে অসুরজীও তারিফ জানায়' শীর্ষক পঙ্‌ক্তির 'অসুর' শব্দ কী শুধুমাত্র দেবতাদের বিপরীত, অপকারী, অমঙ্গলকারী, ক্রুর, খল, নঞর্থক শক্তির-এর প্রতিনিধিকেই ইংগিত করে? নাকি 'অসুর' যে 'অ-সুর' অর্থাৎ 'সুরহীনও বটে, সেই সম্ভাবনাটিও পরোক্ষে আভাসিত হয়। আসলে এই কবিতার প্রকৃত দ্বন্দ্বটা 'সুর' বনাম 'অ-সুরের'। এই দুটি শব্দের বাচ্যরূপ থেকেই কার্যত একটি গভীরতর অর্থের দ্যোতনা তৈরি হয়েছে। কার্তিক-গণেশের সংঘাতটাও এখানে সুরক্ষেত্রের অধিকার সংক্রান্ত। যদিও তাদের মধ্যে সম্মুখ কোনও প্রতিযোগিতা হয়নি। কবিতার বিবরণের সূত্রেই সেই দ্বৈরথের

উন্মোচন ঘটেছে। এই বিরোধ-ব্যাপার কেবল 'সুর' বনাম 'অ-সুরেই' থেমে থাকেনি। সুরের সমঝদার যে বা যাঁরা, তাঁদের reaction বা প্রতিক্রিয়াও এ কবিতার অন্তর্বস্তু অনুধাবনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কার্তিকের সুরক্ষেপ প্রদর্শনযোগ্য, হাজারো audience তার। অন্যদিকে গণেশের সুরবিহার অভ্যন্তরীণ বলেই 'অশ্রুত', সবাই শুনতে পায় না। সেই অন্তর্লোকীয় সুর-সঞ্চালনের শ্রোতা মাত্র দু'জন, গণেশের বাহন ইঁদুর এবং মরণাপন্ন অসুর। প্রথমজন দেবতার বাহন হলেও এক অতিক্ষুদ্র মানবেতর প্রাণী। দ্বিতীয়জনের অবস্থান দেবকুলের একেবারে বিপরীত কোটিতে, তিনি দেবায়তনে ব্রাত্য, অপশক্তির প্রতিভূ। অথচ তারাই গণেশের সেই অন্তর্গত সুরবিহারের যোগ্য সমঝদার। এখানেই 'অসুর' তার যাবতীয় 'আসুরিকতা'-র উর্ধ্বে উঠে গণেশের অন্তর্মুখী 'সুর' শ্রবণে সক্ষম হয়েছে। বাহ্যত যিনি 'অসুর' এবং সুরহীনও বটে, গণেশের 'অশ্রুত নাদ' তাঁরই কর্ণগোচর হয়েছে। অথচ লক্ষ্মী এবং সরস্বতী, যাঁরা প্রকৃত পরিচয়ে 'সুর' অর্থাৎ 'দেবী'-পদবাচ্য, তাঁরা 'সুর'লোকের অন্তর্গত হয়েও গণেশের গানের সমঝদার হতে পারেননি। উলটে অসুরের মুখে গণেশের গানের কথা শুনে দুর্গার সপ্রশংস প্রতিক্রিয়ার ('মাসিমার গালে হাত : তাই নাকি! ও মেয়েরা, শিগগির শোন্!') প্রত্যুত্তরে ("মেয়েদের বয়ে গেছে!/ মুখ বেঁকিয়ে 'মার আবার বেশি বেশি' ব'লে হাঁস আর পেঁচা নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা দিচ্ছে বিখ্যাত দু-বোন") তাঁদের ঈর্ষাকাতর মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। সুরলোকের বাসিন্দাদের এই ধরনের বহিঃপ্রকাশ কী আদৌ সুরজনোচিত আচরণ? এই প্রেক্ষিতে 'সুর' বনাম 'অসুর'-এর প্রথাগত সমীকরণটিও কবিতায় প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। যাঁরা তথাকথিত 'সুর'-বর্গের অন্তর্গত, গণেশের অন্তরে উদ্‌ভাসিত 'সুর' তাঁদের শ্রবণসীমায় ধরা পড়েনি। পরিবর্তে যে 'অসুর', সুরমণ্ডলে ব্রাত্য, লাঞ্ছিত; গণেশের অন্তর্লীন, নিরুচ্চারিত সুরধারা তারই কর্ণমূলে পৌঁছেছে। এই বিপরীতের বিন্যাস কবিতাটির ভরকেন্দ্রে যুক্ত থেকে দুর্গা-পরিবারে গণেশের গুরুত্ব নির্ণয়ে অন্য মাত্রা যোগ করেছে। বৃহত্তর প্রেক্ষিতে ভাবলে দেখা যাবে, বঙ্গদেশের ধর্ম-সংস্কৃতিতে গণেশ আদিদেবের স্বীকৃতি পেলেও তাঁকে নিরন্তর প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে অস্তিত্বরক্ষা করতে হয়েছে। বিদ্যাক্ষেত্রে ও সংগীতাদি ললিতকলা চর্চায় একদিকে সরস্বতী এবং অপরদিকে অর্থক্ষেত্রে শ্রী বা লক্ষ্মী তাঁর দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। স্মার্ত হিন্দু বাঙালির অর্থনৈতিক লাভালাভের প্রশ্নে, বিশেষত ব্যবসাক্ষেত্রে গণেশের কিঞ্চিৎ প্রাসঙ্গিকতা থাকলেও সেখানেও তিনি লক্ষ্মীর সহ-দেবতায় পরিণত। অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে কোনও ক্ষেত্রেই তাঁর একচ্ছত্র অধিকার নেই। বর্তমান কবিতার শেষাংশে জাঁদরেল দুই বোনের প্রতিক্রিয়া সূত্রে বঙ্গীয় ধর্ম তথা সমাজ-মানসে গণেশের সঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতীর এক

বিবদমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মুখর সম্পর্কের বিন্যাসও হয়তো প্রচ্ছন্নভাবে টের পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা কবিতায় গণেশ প্রসঙ্গের নবরূপায়ণের ক্ষেত্রেও এই অভিমুখটি বিশেষভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে হয়।

রূপক চক্রবর্তী, *যখন মহাভারত লিখছিলাম*:

২০০৩ সালে প্রকাশিত বিশিষ্ট কবি রূপক চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ *যখন মহাভারত লিখছিলাম*-এর নাম-কবিতা 'যখন মহাভারত লিখছিলাম'-এ গণেশ প্রসঙ্গ ঐতিহ্যানুগ হলেও উপস্থাপনার দিক থেকে গণেশ বিষয়ক ধারণার নবরূপায়ণ ঘটেছে।[৬] মহাভারতের অনুলিপিকার গণেশের ঐতিহাসিকতা নিয়ে গবেষক মহলে যতই সংশয় থাক, ব্যাসদেবের নির্বন্ধে গণেশই যে মহাভারতের লিপিকার্য সম্পন্ন করেছিলেন, সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এটা প্রায় একটা প্রতিষ্ঠিত কিংবদন্তী। উদ্দিষ্ট কবিতাটি এরই সূত্র ধরে পরিকল্পিত। তবে প্রকাশভঙ্গিতে নতুনত্ব এসেছে। আধুনিক জীবন এবং সমাজের দাবি মেনে লিখন-সহায়ক প্রযুক্তির পরিবর্তন যাই হোক না কেন, যে কোনও লেখার জন্মকথায় দেশকালাতীতভাবে এক এবং অদ্বিতীয় একজন 'গণেশ' থেকেই যান। একটি পৌরাণিক ভাবসূত্রকে সম্বল করে সবসময় লেখকের 'অনুলিপিকার' হিসেবেই যে গণেশ সম্পর্কিত এই ধারণা খাটবে, তা নয়। ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম থাকলেও বেশিরভাগ সময়েই লেখক স্বয়ং লিপিকার। দ্বিতীয় কোনও অনুলেখকের প্রয়োজন পড়ে না। মানসিকভাবে অনুভব-ঋদ্ধ বাক্যবন্ধের নির্মাণ, উচ্চারণ এবং লিখনের মাধ্যমে সেই উচ্চারিত অনুভবমালার শৃঙ্খলামাফিক বিন্যাস লেখকই এককভাবে সম্পন্ন করেন। ফলে বাহ্যত একজন 'বলছেন' এবং অন্যজন 'লিখছেন', এই মহাভারতীয় চিত্রকল্প তৈরি হওয়া প্রায়শই সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে সেক্ষেত্রেও লেখকের অন্দরে একজন 'গণেশ' নিত্য বিরাজমান। লেখকেরই অন্তর্গত অবিচ্ছিন্ন এক সত্তা হয়ে গণেশ যেন তাঁর অনুভবময় উচ্চারণগুলিকে লিখিত রূপে অক্ষরমালায় প্রাঞ্জল করে তোলেন। যে কোনও রচনার জন্মকালই এই প্রক্রিয়ার অধীন। যদিও বর্তমান কবিতায় গণেশ লেখকের অন্তর্লীন সত্তা মাত্র নয়, পার্থিবভাবে পৃথক এক সচল অস্তিত্ব। কবির বর্ণনায় 'অনুলেখক' রূপেই তাঁর অবতারণা। এ কবিতার 'আমি' বা personae স্বয়ং লেখক এবং যিনি তাঁর লিখন-সহযোগী অর্থাৎ 'অনুলিপিকার' তাঁকেই 'গণেশ-সদৃশ' ভাবা হয়েছে। নামহীন এক লিপিকারের চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়েই কবিতায় দেবতা গণেশের মানবায়ন ঘটেছে। কবিতার 'আমি'-র মুখনিঃসৃত শব্দমালা সেই 'গণেশ'-তুল্য অনুলেখক-ই গ্রন্থিবদ্ধ করছেন। তাঁর উপস্থিতি এবং কার্যকারিতার সূত্রেই তাঁকে আদিদেব সিদ্ধিদাতা গণেশের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা হয়েছে। যে নির্দিষ্ট দিনের ছবি কবিতায় ধরা আছে, সেদিন সকাল থেকেই লেখক সাহায্যকারী অনুলেখককে সঙ্গে নিয়ে অভিজিৎবাবুর তেতলার নির্জন ঘরে বসে পূর্ণ উদ্যমে কাব্য

রচনায় ব্রতী হয়েছেন। কবিতার চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যাবে : 'যা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে সব বেদবাক্য।/ থামাথামি নেই, গড়গড় করে বেরুচ্ছে আর গণেশ লিখছে'। কবিতার 'আমি'-র মুখ-নির্গলিত অভিব্যক্তিগুলি এতখানি স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক যে তা বেদবাক্যের সঙ্গে তুলনীয় এবং গণেশ-রূপ জনৈক অনুলেখকই কার্যত সেই শ্রুতিবাক্যতুল্য উচ্চারণসমূহ লিপিকরণের যোগ্যতম আধার। তবে বহুক্ষণ একটানা লেখালেখির কারণে অনুলেখক-গণেশের বেশ কাতর অবস্থা। তাঁর হাত ব্যথা করছে, পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে, 'বেচারা' কান নেড়ে মশা-মাছি তাড়াচ্ছে। এত অস্বস্তির পরেও তাঁদের সাহিত্য সৃজনের আনন্দে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়েনি। লেখক-অনুলেখক একযোগে বিরতিহীনভাবে রচনাকার্য করেই চলেছেন। একজনের কাজ অনর্গল বলে যাওয়া, অন্যজন সেই মুখোচ্চারিত কথামালা অবিকল লিপি করে চলেছেন। এই যৌথ প্রক্রিয়ায় পাঠক কতকটা যেন মহাভারত রচনারই পুনর্জন্ম দেখতে পান। লেখকের অন্তরও প্রেরণাময়। এ প্রেরণা কোনও নারী-সংসর্গজাত অথবা বাইরে থেকে তৈরি হওয়া উদ্দীপনা নয়। সবটাই বড়ো বেশি আন্তরিক, অভ্যন্তরীণ এবং কতকটা অপার্থিবও বটে। সেই প্রেরণার অনিবার্যতায় লেখকের মুখনিঃসৃত শব্দমালা এমন সহজ স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত হচ্ছে যে লিপিকারের ক্লান্তির কথা টের পেয়েও তিনি বলা থামাতে পারছেন না। লেখক বেশ বুঝেছেন, তাঁর গণেশ-রূপ লিপিকারও যথেষ্ট পরিশ্রান্ত, সাময়িক বিরতি ('বুঝতে পারছি গণেশের একটু উঠি উঠি ভাব, অথচ আমি পারছি না থামতে') হয়তো তিনিও চাইছেন। কিন্তু লেখকের বলার তোড় এমনই যে তিনি অনুলেখককে তেমন আমল দিতে পারছেন না। শব্দ হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে সবেগে বলেই চলেছেন। লেখক এবং লিপিকারের যৌথতায় সাহিত্য-সৃষ্টির এক ছেদবিহীন পরম্পরা যেন কবিতায় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। এই মিলিত প্রচেষ্টার বিবরণটি কার্যত শেষ হয় উদ্দিষ্ট অনুলেখকের সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশের সাদৃশ্যপূর্ণ অভিন্নতায়। কবিতার শেষ তিনটি পঙ্‌ক্তি হল : "গণেশ ও গণেশ, গজানন, সিদ্ধিদাতা বাপ আমার,/ প্রেসকপি বানিয়ে তাড়াতাড়ি মুক্ত করো আমায়,/ প্রকাশকমশাই এসে পড়লেন বলে---।" এখানে কবিতার 'আমি' অর্থাৎ উদ্দিষ্ট লেখকের অনামা লিপিকারের সঙ্গে গণেশ দেবতার সরাসরি একাত্মকরণ ঘটেছে। লেখক তাঁর গণেশ-তুল্য লিপিকারের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছেন। অনুলেখক-গণেশের নিরন্তর লেখনী-চালনায় বর্তমান রচনাটির কলেবর সম্পূর্ণ হয়ে উঠুক, এটিই লেখকের ঐকান্তিক প্রত্যাশা। আসলে কবির অর্জন তো কেবল যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা বা সমকাল সম্পর্কিত ধারণাই নয়, জাতীয় স্মৃতির ভাঁড়ার থেকেও তিনি অনবরত রসদ সংগ্রহ করতে থাকেন। ব্যক্তি-কবির মানসভূমি অতিপ্রসারিত বলেই তা কেবল বর্তমানের অংশমাত্র নয়, অতীত ঐতিহ্য এবং পরম্পরারও সমান অংশীদার। ব্যাস এবং গণেশের যুগ্ম

প্রচেষ্টায় মহাভারত রচনার একটি বহুচলিত অতীত কিংবদন্তী কবির মগ্নচৈতন্যে সক্রিয় ছিল বলেই কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে তদনুরূপ উপস্থাপনা লক্ষ করে গেছে। আধুনিক যুগের কবি-মানসকেও পুরনো মিথকথা বা কিংবদন্তীমূলক কোনও প্রসঙ্গ যে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে, বর্তমান কবিতাটিই তার প্রমাণ। ভারতকথার লিপিকার গজানন গণেশ এই কবিতার জনৈক অনুলেখকের চরিত্রে এমনভাবে সংশ্লেষিত হয়েছেন যে আধুনিক সময়েও সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে দেবতা গণেশের প্রাসঙ্গিকতা একই মাত্রায় টের পাওয়া যায়। কবিতায় জনৈক লিপিকারের প্রচ্ছদে গণেশের এই archetypal reconstruction বাঙালির বৌদ্ধিক এবং সৃজনগত উৎকর্ষের সঙ্গে জড়িত। এই রূপায়ণে মানবায়িত গণেশ অবিশ্রান্ত, অক্লান্ত এক লেখক। সাহিত্য সৃজনের অবিকল্প সহযোগী।

৪.২

গল্প-উপন্যাস ও গদ্যধর্মী রচনায় গণপতি প্রসঙ্গ

আধুনিক সাহিত্যে গণপতি প্রসঙ্গের রূপায়ণ বহুমাত্রিক। গল্প-উপন্যাস বা গদ্যধর্মী রচনায় গণেশ প্রসঙ্গ যেভাবে গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে পুরাণকথার নবনির্মাণ অথবা দেবতার মানবায়ন যেমন একটা দিক, তেমনি দেবতার সঙ্গে মানুষের অন্তর্প্রকৃতির নানা মাত্রাকে মিলিয়ে গণেশ সংক্রান্ত মিথের সময়মাফিক উপস্থাপনও আর একটা দিক। বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গণেশ বা গণেশ সম্পর্কিত অনুষঙ্গ এক নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচনে ব্যবহৃত হয়েছে। সবসময় যে প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ঘটেছে, তা নয়। অনেকসময় গণেশ সরাসরি উপস্থিত না থেকেও অন্য কোনও চরিত্রের রূপায়ণে অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে। কখনও দেবতা পরেছেন 'মানুষের বেশ', কখনও বা 'দেবতা' হিসেবেই সরাসরি থেকেছেন তিনি, মূর্তিতে অথবা অলৌকিক কোনও কার্য সংঘটনের প্রেরণারূপে। আখ্যানে বিশেষ কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব প্রসঙ্গের জন্ম হয়েছে। আবার, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রেও গণেশ বা ওই জাতীয় ভূমিকা কিংবা দেবতার চারিত্রলক্ষণ সহায়ক উপাদান হয়েছে। আসলে দেবচরিত্র বা দেবতা বিষয়ক ভাবনা যাই হোক, আধুনিক সাহিত্যে তার রূপায়ণ যে একেবারেই মূলছেঁড়া হতে হবে এমন নয়। পৌরাণিক স্মৃতির ভাঁড়ার থেকেই তো তাঁর সারটুকু গৃহীত হবে। ফলে পূর্ণাবয়বেই হোক বা ইশারায়, সংকেতে অথবা সশব্দে, আখ্যানে যাঁর বিনির্মাণ ঘটানো হবে, তাঁকে মূলরূপে অর্থাৎ দেবতা বা দেবতা-অনুষঙ্গী কোনও বৈশিষ্ট্যে চেনবার সুযোগ থাকা চাই। এর অর্থ 'গণেশ' বিষয়ক মিথের পুনর্নির্মাণ বা নবরূপায়ণের

ক্ষেত্রে তা যে আদপে দেবতা 'গণেশের'-ই deconstruction, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আখ্যানে যথেষ্ট সূত্র থাকা প্রয়োজন। 'দেবতা' হিসেবে তাঁর অস্তিত্বমূলকে মাথায় রেখেই বিষয়প্রেক্ষিত অনুযায়ী কাটাছেঁড়া চলে, সময়নির্ভর কোনও তাৎপর্যের প্রলেপ লাগানো হয়। ঐতিহ্যের এই বিস্তারে দেবতা সংক্রান্ত ভাবনাই আখেরে সম্প্রসারিত হয়, নতুন কালের পরতে পরতে তাঁর জায়মানতা প্রমাণিত হয়। আধুনিক কথাসাহিত্যে গণপতির এই বহুবিচিত্র রূপায়ণের মধ্যে যেসব অন্তর্লীন মাত্রা কাজ করেছে, সেগুলিকে সূত্রবদ্ধ করা হল:

১। উপেন্দ্রকিশোরের *পুরাণের গল্প* (১৯১৯ খ্রিঃ) বইয়ের অন্তর্গত 'গণেশ' ও 'গণেশের বিবাহ' শীর্ষক রচনা দু'টিতে গণেশ প্রসঙ্গ মূলগতভাবে পুরাণচুম্বিত হলেও নবকলেবরে উপস্থাপিত।[৭] ভারতীয় সংস্কৃত পুরাণ সম্ভারের মধ্যে মুখ্যত *শিবপুরাণ*-এর গণেশের জন্ম ও বিবাহ সম্পর্কিত আখ্যান রচনা দুটির আশ্রয়। যদিও বর্ণনার ঢঙে গল্প বলায় নতুনত্ব এসেছে। কাহিনি সাধুগদ্যভাষায় বোনা হলেও আলাপের সহজ স্বাভাবিক মাত্রায় তা আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষত পুরাণের ভারিক্কি চাল ছেড়ে দেবতা ও তাঁদের অনুচরদের রূপায়ণ এক সরস কৌতুকের আবহ সৃষ্টি করেছে। পুরাণকথার এই নবতর উপস্থাপনা শিশু-কিশোরদের সামনে দেবতাকে প্রাঞ্জল ও জীবন্ত করে তুলেছে যেমন, তেমনই কচিকাঁচাদের সামনে দূরত্বভয়হীন এক দেবতার জন্মও দিয়েছে প্রকারান্তরে। দেবতার এই নির্মাণ মূলানুগ হয়েও রসগ্রাহী, কৌতুক উদ্রেককারী। কথাসার এক হলেও দেবতাদের কার্যকলাপের যেরূপ বিবরণ দিয়েছেন লেখক, তার মধ্যে সহজ জীবনরসের আমদানি এত বেশি মাত্রায় যে তা টানটান আকর্ষণে পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখে। যেমন, 'গণেশ' শীর্ষক রচনার একজায়গায় গণেশের জন্মের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে শিবের সঙ্গে তাঁর প্রথম সামনাসামনি দেখা হল যখন, সেই অংশের বর্ণনায় গদ্যকার লিখছেন, "গণেশ বলিলেন, "শিব আবার কে? তুমি কেন যাবে?" শিব বলিলেন, "এ তো দেখছি ভারি রোখা। আরে আমি পার্বতীর স্বামী।" বলিয়া তিনি যেই ঢুকিতে যাইবেন, অমনি গণেশ ধাঁই করিয়া তাঁর পিঠে লাঠি মারিয়া বসিয়াছেন।[৮] আবার, শিবের প্রধান দুই পার্ষদ নন্দী-ভৃঙ্গীর সঙ্গে লড়াইয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন লেখক এইভাবে, "নন্দী আর ভৃঙ্গী দুজনে আসিয়া তাহার দুই পা ধরিয়া দিল টান, আর গণেশ ঠাস্‌ঠাস্ করিয়া তাহাদের দুজনকে মারিলেন দুই থাপ্পড়। তারপর দরজার হুড়কা লইয়া ভূতের দলকে তিনি এমন ঠেঙ্গান ঠেঙ্গাইলেন যে কি বলিব!"[৯] নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, সিরিয়াস যুদ্ধপ্রকৃতির বর্ণনার মধ্যেও গদ্যকার এমন কিছু তরল কৌতুকের উপাদান যুক্ত করছেন যা একধরনের নির্মেদ হাস্যরস সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে গণেশ চরিত্রের de-devinisation তো হয়েছেই, উপরন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতি গুরুগম্ভীর চাল ছেড়ে সরস ও লঘুভার হয়েছে। নিখাদ বাঙালিয়ানায় জারিত হয়েছে পৌরাণিক

শিব-গণেশ যুদ্ধ বৃত্তান্ত। মধ্যযুগীয় মঙ্গলগীতের ঐতিহ্যেও দেবমাহাত্ম্য স্খলনের এমন উদাহরণ আমরা পেয়েছি। এই নিষ্পুরাণীকরণের প্রধান তাৎপর্যই হল সহজ রসের কারবারে দেব চরিত্রের বিবরণে এমন একটা জীবন্ত ভাব নিয়ে আসা, যাতে দেবতারা সুদূরলোকের অধরা অস্তিত্ব হয়ে না থাকেন, বাঙালির জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদেরও একধরনের সহজ সখ্য গড়ে ওঠে। পুরাণকথার এই নবায়ন আসলে ঐতিহ্যেরই এক নতুনতর আস্বাদন প্রক্রিয়া, দেবতাও যেখানে নব নব রূপে আবিষ্কৃত হন। তাঁর জন্ম-কর্মের বৃত্তান্ত তখন কেবল লোকশিক্ষাই দেয় না, দেবচরিত্রের সঙ্গে শিশু-কিশোরমনেরও এক সহজ সেতুবন্ধন ঘটায়।

২। ছবি লেখার কারিগর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বুড়ো আংলা*-য় (১৯৪১) গণেশ ও রিদয়ের সম্পর্কের মধ্যে শিশু-কিশোরমনের স্বপ্নকল্পনার রং লেগেছে যেমন, তেমনি একটি বিশেষ বয়সের কচিকাচাদের সঙ্গে দেবতা গণেশের সাহচর্যের মধ্যে এক অকৃত্রিম জীবনবোধ প্রতিফলিত।[১০] এই হাসি-কান্নার অনুভূতি দূরত্বের আড়াল ঘুচিয়ে দেবতাকে মর্ত্যমানুষের কাছাকাছি এনে দেয়। প্রয়োজনে মানুষের হাতে দেবতার ইচ্ছামাফিক ভাঙা-গড়াও চলতে থাকে। যেমন রিদয়ের মতো এক দুর্দান্ত কিশোরের হাতে সবাহন গণেশকে নাজেহাল হতে হয়। দেবতাও ছাড়বার পাত্র নয়। অভিশাপ দিয়ে ভুগিয়ে ছাড়েন তাকে। শাস্তি দিয়ে রিদয়কে রূপান্তরিত করেন বুড়ো আংলায়। এইভাবে বোধহয় তার দুরন্তপনারও ইতি ঘটান। অবাধ্যতা থেকে মুক্তি, অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারের অবসান--- রিদয় কী শুধু সেজন্যই গণেশকে পেয়েছিল স্বপ্নে? দেবতাকে স্বপ্নের মোড়কে মুড়ে এক দুর্দম কিশোরকে ঘুরপথে ঠাণ্ডা করলেন অবনীন্দ্রনাথ। শাসন করে শিক্ষা দেওয়ার ফলও ফলল। স্বপ্নে শায়েস্তা হয়ে বাস্তবেও রয়ে গেল তার রেশ। স্বপ্নের অভিজ্ঞতায় কখন যেন স্বর্গ-মর্ত্যের গাঁটছড়া এমনিই বেঁধে যায়। জীবনের মধ্যেই ধরা দেন দেবতা। কৈশোর কল্পনার অনাবিলতায় তাঁর আসন নিশ্চিন্তে পাতা হয়। দেবতা মানুষের থেকে আলাদা কোনও সত্তা নয়, বরং মানুষের জীবনের গল্পে তাঁকে অবলীলায় ঢুকিয়ে নেওয়া যায়। কোথাও কোনও বাধা নেই, এক অভিন্ন অন্তরঙ্গ মেশামেশি মানুষে-দেবতায়। স্বপ্নের মধ্যে রিদয় যখন কুলুঙ্গিতে রাখা মাটির গণেশ মূর্তিকে জীবন্ত হতে দেখে, তখন লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে:

রিদয় ইঁদুর অনেক দেখেছে, গণেশের গল্পও অনেক শুনেছে, কিন্তু জ্যান্ত গণেশ সে কখনো দেখেনি! এই বুড়ো-আঙুল যতটুকু, গণেশ ঠিক ততটুকু! পেটটি বিলিতি-বেগুনের মতো রাঙা চিকচিকে, মাথাটি শাদা, শুঁড়টি ছোটো-একটি কেঁচোর মতো পেটের উপর গুটিয়ে রয়েছে; কান-দুটি যেন ছোটো দুখানি কুলো, তাতে সোনার মাকড়ি দুলছে; গলায় একগাছি রূপোর তারের পৈতে ঝোলানো; পরনে লাল-পেড়ে পাঁচ-আঙুল একটি হলদে ধুতি, গলায় তার চেয়ে ছোটো একখানি

কোঁচানো চাদর; মোটা-সোটা এতটুকু দুটি পায়ে আংটির মতো ছোটো-ছোটো ঘুঙুর, গোলগোল চারটি হাতে বালা, বাজু, তাড়; গলা থেকে লাল সুতোয় বাঁধা ছিটমোড়া ছোট্ট ঢোলকটি ঝুলছে।[১১]

গল্পকথকের বর্ণনায় গণেশের physical structure বা দেহকাঠামো একধরনের পরিহাস-রসিকতার আমেজ নিয়ে এসেছে। এই অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতায় রিদয় কিছুটা আশ্চর্যও হয়েছে। কারণ, গ্রামের কথকঠাকুরের গণেশ বন্দনার ('গণেশায় নমঃ নমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম' ইত্যাদি) সূত্রে গণেশের বিশালত্ব সম্পর্কে তাঁর মনে অন্য ধারণা ছিল। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় তা অনেকটাই পালটে গেছে। এখানে রিদয়ের perspective থেকে গণেশের নাদুসনুদুস দেহকাণ্ডকে যেভাবে উপমিত করা হয়েছে (বিলিতি বেগুনের মতো পেট, ছোটো কেঁচোর মতো শুঁড় বা কুলোর মতো কান), তাতে তুচ্ছতার ভাবখানাও বেশ স্পষ্ট। যদিও গ্রামবাংলার উদারবিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বেড়ে ওঠা এক দামাল কিশোরের জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলালে এই জাতীয় উপমান প্রয়োগের অন্য বিশেষত্ব ফুটে উঠবে। এতে দেবতার চেহারার বর্ণনাও মানুষের চেনা জগতের খুঁটিনাটির সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থাকে। তবে পৌরাণিক দেবভাবনার নিরিখে বিবেচনা করলে মনে হয় বিশ শতকের গদ্য আখ্যানে গণেশের অবতারণা এ'ভাবেই দেবত্বের সম্ভ্রমসীমা পেরিয়ে গেছে। মানুষের কল্পনার সাম্রাজ্যে দেবতাও দেবত্ব খুইয়ে নবকলেবরে নির্মিত হয়েছেন। লেখকের বর্ণনার চটুলতায় বারো বছরের কিশোরমনের ভাবটিও পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। স্বভাবসুলভ দুর্দমতায় খানিকক্ষণের জন্য হলেও গণেশের বিরাটত্ব ভুলেছে রিদয়। তাঁর গৌরব বা চরিত্রমহিমা কোনওকিছুই তাকে সংযত করেনি। উলটে চিংড়ি মাছ ধরার আশ্‌টে কুঁড়োজালে জড়িয়ে গণেশকে এমন পর্যুদস্ত করেছে যে দেবতাকেও এক সামান্য কিশোরের বল্গাহীন দুরন্তপনার খেসারত দিতে হয়। জালবন্দী গণেশের চিৎকৃত আর্তনাদ বর্ণিত হয়েছে এইভাবে: "গণেশ জালের মধ্যে মাথা নিচু করে দু-পা আকাশে ছুঁড়তে লাগলেন আর বলতে থাকলেন --- 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি!' কিন্তু দাঁতে-শুঁড়ে-ঢোলকে-জালে এমনি জড়িয়ে গেছেন যে গণেশের নড়বার সাধ্যি নেই। তালের নুটির মতো জালের মধ্যে আটকা পড়ে গণেশ হাঁপাতে-হাঁপাতে মা-দুর্গাকে স্মরণ করতে লাগলেন;..."[১২] মায়ের নাম স্মরণ করলেই বিপদ উদ্ধার। এখানেও দুর্গানাম জপেই পরিত্রাণের পথ পেয়েছেন গণপতি। ইঁদুর এসে রিদয়ের পায়ে দংশনমাত্রেই অসহ্য যন্ত্রণায় সে জাল ফেলে দিয়েছে। এই সুযোগে গণেশও জাল কেটে পূর্ণ শক্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন। এতক্ষণ রিদয়ের হাতে দেবত্ব-খোয়ানো গণেশ স্বমহিমায় ফিরে এসে যারপরনাই শাস্তি দিয়ে শুধরেছেন এই দুরন্ত কিশোরকে। বর্ণনাটি এইরকম: "তিনি দাঁত কড়-মড় করে বললেন--- 'এতবড়ো আস্পর্ধা! ----ব্রাহ্মণ আমি, আমার গায়ে চিংড়ি-মাছের জাল ছোঁয়ানো! যেমন ছোটলোক

তুই, তেমনি ছোটো বুড়ো-আংলা যক্ হয়ে থাক!' বলেই গণেশ শুঁড়ের ঝাপটায় রিদয়কে সাত-হাত দূরে ঠেলে ফেলে ভুস করে চণ্ডীমণ্ডপের চাল ফুঁড়ে অন্তর্ধান হলেন।"[১৩] স্বপ্নের রং-রেখায় ইঁদুর বা গণেশ *বুড়ো আংলা*-য় এতখানি জ্যান্ত হয়ে উঠেছেন যে রিদয়ের সঙ্গে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও একটা সরস উপভোগের বাতাবরণ তৈরি করেছে, স্বপ্নকেও যেখানে স্বপ্ন বলে মনে হয় না। আসলে অর্ধেক-মানুষ অর্ধেক-পশুদেহযুক্ত অদ্ভুতদর্শন এই দেবতা গজমুখের আকর্ষণেই হোক বা ভোজনপ্রিয়তায়, শিশু-কিশোরমহলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। অন্যান্য পৌরাণিক দেবতার মতো এঁর সঙ্গে সম্বন্ধ দূরতর নয়। এই accessibility-র কারণেই গণেশের সঙ্গে শিশু-কিশোরমনের এত সহজ ও আন্তরিক মেলবন্ধন ঘটে যায়। ওই বয়সের অনুভবের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে, গণেশের মতো আর কোনও দেবতাকে বোধহয় এতখানি জীবন্ত করে আঁকা সম্ভব নয়। দেবতা-মানুষের এই বহুবর্ণিল উপস্থাপনার মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্যের সীমা ভেঙে অবনীন্দ্রনাথ এমন এক চলাচল তৈরি করে দেন, যেখানে জীবনের সহজরসে দেবতার মনুষ্যায়ন সম্পূর্ণ হয়।

৩। বনফুলের 'গণেশ-জননী' শীর্ষক ছোটগল্প পোষ্য-পালক সম্পর্কের এক মরমী আখ্যান।[১৪] পুরাণে গণেশ-জননী পার্বতী এবং পার্বতীপুত্র গজাননের মধ্যে যে বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত, তারই ছায়ায় গড়ে উঠেছে এই আখ্যান। এক মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে তার পালকের সম্পর্কের আশ্চর্য রসায়ন। হাতির প্রতীকে গণপতি প্রসঙ্গের এই নবনির্মাণের মধ্যে ফুটে ওঠে হাতি ও তার পালক মাতার এক মানবিক সম্পর্কের রূপরেখা। একধরনের সংবেদী অনুভব, মায়াটান কোথাও ঘুচিয়ে দেয় মানব-মানবেতর অস্তিত্বের ভেদরেখা। পালক-পোষ্যের নিবিড় পারস্পরিকতা তখন হয়ে ওঠে মা এবং সন্তানের সম্পর্কের অনুরূপ। মনে হয় দুটি হৃদয়ে একই গভীরতার স্পর্শ লেগেছে। এই আখ্যানে দেবতা গণেশ সরাসরি না থাকলেও এক হাতি ও তার পালক মাতার হৃদয়সম্পর্কের উন্মোচনে পৌরাণিক গণেশ ও গণেশ-জননীর ছায়া পড়েছে। গল্পনামে, এমনকি হাতির নামেও এই স্মৃতিসূত্রটি স্পষ্ট। গল্পে পশু চিকিৎসকের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের সময় গৃহকর্তা ভদ্রলোকের কথাসূত্রে জানা গেছে, জনৈক কচ্ছি ব্যবসাদারের কাছ থেকে এই অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত দম্পতি উপহার হিসেবে 'গণেশ' নামের পোষ্য হাতিটিকে পেয়েছেন। গৃহকর্তা বলেছেন, "হাতির বাচ্চাটি দেখতে চমৎকার তখন ছোট্ট ছিল দুষ্টু দুষ্টু চোখ, ছোট্ট শুঁড়, খুব ভালো লাগল তখন। গিন্নি তো একেবারে আনন্দে আত্মহারা। বললে--- "ও আমার গণেশ এসেছে। বলেই একবাটি দুধ তার সামনে এগিয়ে দিলে! বাস সেই থেকেই গণেশ থেকে গেল। আমাদের ছেলেপিলেও হয়নি, ওই গণেশই আমাদের সব..."।"[১৫] এমন বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় ওই গণেশ নামের হাতিটিই এই

নিঃসন্তান পরিবারের একমাত্র আশ্রয়স্থল। গল্পে এই হাতি-গণেশের সঙ্গেই তার পালক মাতার মান-অভিমানের খেলা চলেছে। বাগান থেকে আনা দুশোটি ল্যাংড়া আম গৃহকর্তা ও তার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে একা উদরসাৎ করেছে গণেশ। এই অভিযোগে গৃহিণী তাকে একটি চড় মেরে বলেছিলেন, "রাক্ষস, সব খেয়ে বসে আছ, একটি রাখতে পারনি আমাদের জন্যে।"[১৬] এই ভর্ৎসনার পর থেকেই আর জলস্পর্শ করেনি গণেশ, একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, তবু একটি দানাও মুখে তোলেনি। গৃহিণী যদিও চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি। কিন্তু গণেশের দুর্জয় মান। কোন এক মানুষী আবেগ কাজ করেছে ওই মূক অভিমানাহত পশুটির মধ্যেও। পশু চিকিৎসকের সামনে গৃহিণীর লেবু দিয়ে বানানো বার্লি পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করে গণেশ। এই অংশে তার শরীরী প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকথক জানাচ্ছেন, 'গণেশ কুলোর মতো কান দুটি নাড়িয়া ফোঁস করিয়া শব্দ করিল।'[১৭] এই 'কুলোর মতো কান' হাতির স্বাভাবিক দেহবৈশিষ্ট্য হলেও এই উল্লেখ এখানে শূর্পকর্ণ গজানন গণেশের পৌরাণিক অনুষঙ্গ মনে করায়। গল্পের একবারে শেষ বাক্যে নামহীন গৃহিণীকে 'গণেশ-জননী' ('বুঝিলাম গণেশ-জননী নিজের গহনা বন্ধক দিয়া আমার 'ফি' সংগ্রহ করিয়াছিলেন'[১৮]) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই জায়গায় গণেশ-মাতা পার্বতীর সঙ্গে বাৎসল্যপরায়ণ গৃহিণী সমানধর্মা হয়েছেন। আসলে বনফুলের এই গল্পে চরিত্রের নামহীনতার অন্যতম কারণ হল, বিশেষ একটি পৌরাণিক সম্পর্কের ছায়ায় চরিত্রদের ভাবরূপ নির্মাণ। এই নামবিরলতার সুবাদেই পোষ্য হাতি এবং পালক মাতা গৃহিণীর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক গণেশ ও গণেশ-জননী পার্বতীর ভাবকল্পনা ব্যঞ্জিত হতে পেরেছে।

৪। মহাশ্বেতা দেবীর *শ্রী শ্রী গণেশ মহিমা* (১৯৮৭) শীর্ষক উপন্যাসে দেবতা গণেশের শারীরিক বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র উচ্চবর্ণীয় রাজপুত গণেশ সিংয়ের জন্মকথায় ফুটে উঠেছে।[১৯] দেবতার নবরূপায়ণের এ এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। দেবাংশী গণেশ সিং যেন আকারে-প্রকারে গণেশরই মর্ত্যরূপ। আখ্যানে অসংখ্যবার গণেশের বাহিরঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গণেশ সিংয়ের দেহাবয়বের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। গণেশের নামকরণ প্রসঙ্গে পুরোহিত তার পিতা মেদিনীনারায়ণকে বলেছেন -

মেদিনীনারায়ণ অনেক সৌভাগ্য তোমার। এ ছেলে তোমার ঘরে জন্মাবার কথা নয়। রাজার ঘরে জন্মাবে সোনার বাটিতে মাট্টা মাখন খাবে, এ হলে ঠিক হতো।... ত্রিতীর্থনারায়ণ নাম ওর রাখতেই হবে। নইলে মা যে ত্রিতীর্থের জল খেয়েছিল সেটি বৃথা যায়। কিন্তু কে জন্মেছে তা জান?[২০]

গ্রামসমাজে মানুষ দেবতার প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য দেখায় বলেই পুরোহিতের পক্ষে তাদের মনে ধর্মভয় উসকে দেওয়া এত সহজ। তা ছাড়া নবজাতককে দেবাংশী বলে প্রচার করলে মেদিনীনারায়ণের মতো কর্তৃত্বসম্পন্ন মানুষের আনুকূল্য পাওয়া সম্ভব। পরপর পাঁচটি মেয়ে হওয়ায় মেদিনী এমনিতেই ক্ষুব্ধ ছিল। তদুপরি তৃতীয় স্ত্রীর মৃত্যু ঘটায় সদ্যোজাত পুত্রের লালন-পালন নিয়ে তিনি যথেষ্ট দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মাহাত্ম্য ঘোষণার চক্করে সেই সমস্যারও সমাধান হয়ে যায়।

মেদিনী সিংয়ের ঘর এখন পুণ্যভূমি হয়ে গেল। এহি গয়া এহি বারাণসী। কে জনম নিল তা আপনারা বুঝলেন না, এতেও আমার মনে খুব দুখ উঠে গেল।... কোন্ দেবতাকে দেবী পার্বতী আপনা অঙ্গ সে সৃজন কী ঔর কৌন লঢ়া শিব ঔর বিষ্ণুকা সাথ? বেদব্যাসের হয়ে মহাভারত লিখলেন কে? কার পূজা আগে না করা চলে না? কে পিতা মাতাকে ঘিরে ভ্রমণ করে দেখালেন যে পিতা মাতাই হচ্ছেন বিশ্ব ঔর ব্রহ্মাণ্ড? ইতি কৌন দেওতা? ... গণেশ মহারাজের ভি ইচ্ছা যায় ধরতি পর জন্ম লেঁ--- ঔর মানুষ কে আজ্ঞান্ সে উধার করে। এ ছেলেতে গণেশের অংশ আছে। নইলে একদন্তী শিশু হয়?[২১]

দেবতা গণেশের সঙ্গে মেদিনীপুত্রের এই একীকরণ শুধু জন্মসূত্রেই আটকে রইল না, জাতকের অঙ্গচিহ্নের সূত্রেও আরও খানিকটা দৃঢ়বদ্ধ হল। চমৎকৃত বাক্যচ্ছটায় পুরোহিত বলেছেন,

এ ছেলে রাখবে অক্ষয় কীর্তি, দেওতা বরাম্ভোনের মান উঠাবে, বংশ উজ্জ্বল করবে। কানের ওপর মাংস? বুড়ো আঙুল লম্বা, সব দেওতার লক্ষণ। এ ছেলেকে যে সেবাযত্ন করবে, তার ভালোই বাড়বে। যে এর বুরাই ভাববে, তার বুরাই বাড়বে।[২২]

তবে এই সাযুজ্যটুকু দেহাধারেই সীমিত, চারিত্র লক্ষণে আদিদেব গণেশের সঙ্গে উপন্যাসের গণেশ সিং সম্পূর্ণ বেমানান। মিলটুকু কেবল বাইরের, আচরণে বা মানসিকতায় গণেশদেবের সঙ্গে তার যোজন দূরত্ব। এই উপন্যাসে পৌরাণিক একদন্ত গণেশ কেবল দেহচিহ্নের সাদৃশ্যে উপন্যাসের নামচরিত্রের সঙ্গে একীকৃত হয়েছেন।

৫। অর্থলাভ, অর্থস্ফীতি এবং অর্থসঞ্চয়— এই ধরনের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অনেকসময় তৃতীয় রিপু লোভের যোগ ঘটে যায়। তখনই স্বধর্মচ্যুত হয়ে মানুষ অপরাধমূলক মানসিকতার অধীন হয়। প্রবৃত্তির অসংযমের কাছে হার মানে আত্মনিয়ন্ত্রণ বা নীতির বোধ। অর্থলিপ্সার চক্করে মনুষ্যত্বহীন জীবন-অভ্যাসে সামিল হয় মানুষ। এই ভোগমূলক বস্তুপৃথিবীর টানে নীতিধর্মের শাসন অগ্রাহ্য করে এক ন্যায়হীন, ধর্মহীন, সততাহীন অন্ধকার মানবচরিত্রকে গ্রাস করে। লক্ষ করার বিষয় হল, প্রাকৃত সমাজে এই অর্থনৈতিক লাভালাভের সঙ্গে গণপতিকে যুক্ত করতে প্রায়শই দেখা যায়। বিশেষত অর্থপ্রাপ্তি, আর্থিক স্ফীতি বা ধনসম্পদ বৃদ্ধির আশায় ব্যবসায়ীমহলে

গণেশের সমাদর। যদিও অপর্যাপ্ত ধনলিপ্সা বা প্রাচুর্যজনিত অহঙ্কার থেকে চারিত্রিক স্খলন বা বিচ্যুতি ঘটলে সেই অধোগামী ব্যক্তি গণপতির প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হন। বিশ্বাস অনুসারে গণপতি যেমন সম্পদসঞ্চয় বা ক্রমবর্ধনের অধিদেবতা, পাশাপাশি এ'টাও মনে রাখা প্রয়োজন যে তিনি কেবল ধনদান বা অবাধ ভোগবিলাসের ছাড়পত্রই দেন না, প্রয়োজনে প্রলুব্ধ চিত্তকে শাসন করে সংযমের পাঠও দেন। প্রচলিত ধারণায় গণেশ যতই অর্থক্ষেত্রের অধীশ্বর হোন না কেন, লাভালাভের প্রশ্নটাই এক্ষেত্রে একমাত্র বিবেচ্য নয়, ভক্তের ভোগস্পৃহা অনৈতিক পথে গেলে শাস্তিদানের মাধ্যমে তার সংশোধনও প্রয়োজন। আসলে অনিয়ন্ত্রিত প্রাচুর্যের বোধ অনেকসময় মানুষকে স্বেচ্ছাচারী ও অহংসর্বস্ব করে তোলে। অর্থলোলুপতা থেকে হামেশাই সে অন্যায়ের পথে পা বাড়ায়। এই চারিত্রিক নিম্নতার বিপরীতে গণপতি স্বয়ং একটা আদর্শের সঞ্চার করেন, সেই আদর্শ লাগাম টানার, চিত্ত সংযমের। সাধনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যানেও 'সিদ্ধিদাতা' গণপতি ভুক্তিমার্গের নন, মোক্ষমার্গের দেবতা। জাগতিক সম্পদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেহাতই আপাতস্তরের, তত্ত্বত তিনি মোক্ষপ্রদাতা। তাঁর প্রদেয় সিদ্ধি ঐহিক ততটা নয়, যতটা পারত্রিক। অথচ লোকসমাজে তাঁকে পার্থিব বিষয়-আশয়ের সঙ্গে যুক্ত করেই ভাবা হয়। সাধারণ্যে তাঁর স্বরূপ ইহজাগতিকতাময়। ফলে আর্থিক সমৃদ্ধি বা অর্থকরী প্রয়োজনেই সমাজে তাঁর গুরুত্ব নিরূপিত হয়। বিশ ও একুশ শতকীয় বাংলা ছোটগল্প-উপন্যাসে গণপতি এবং তৎসংক্রান্ত ধারণা এই নিরিখেই প্রধানত চর্চিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য এবং শ্রীবৃদ্ধির মানসিকতা থেকেই ভক্তেরা গণেশের দ্বারস্থ হন। এর প্রতিফলন সাহিত্যেও ঘটেছে। সমাজসমস্যামূলক ছোটগল্প (যেমন, 'জার্মান গণেশ'[২৩], 'গণেশের মূর্তি'[২৪]), গোয়েন্দা আখ্যান(যেমন, 'জয় বাবা ফেলুনাথ'[২৫], 'অষ্টধাতুর গণেশমূর্তি'[২৬], 'সিদ্ধিদাতার অন্তর্ধান'[২৭]) অথবা দুর্ধর্ষ অভিযাত্রামূলক কাহিনিতে (যেমন, *সোনার গণপতি হীরের চোখ*[২৮]) বেশিরভাগ সময়ই জাগতিক আকাঙ্ক্ষাপূরণের উপায় বা মাধ্যম হিসেবে গণপতির উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। আগেই বলেছি, এই রূপাঙ্কন আখ্যানে কখনও সরাসরি ঘটে গণেশমূর্তির উপস্থিতির মধ্য দিয়ে, কখনও আবার গণেশ দৈব ক্ষমতায় অর্থলিপ্সু মনকে সংযত করে। লালসা এক্ষেত্রে একটা প্রধান factor, আকাঙ্ক্ষা বেলাগাম হলে বা চরিত্র বিপথগামী হলে গণপতির দৈব ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আগল টানা হয়। এক অর্থে তিনি মাত্রাজ্ঞানেরও দেবতা। ধনলাভ, ধনসঞ্চয় বা প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলেই তো হল না, তার ব্যবহারের যোগ্যতা থাকা চাই। যারা তার ঠিক ব্যবহার জানে, তাদের জন্য তিনি মঙ্গলপ্রদ বিঘ্নহর্তা। অন্যথায় অন্যায়কারীর ভাগ্যে তাঁর কোপ মারাত্মক। এক্ষেত্রে তিনি বিঘ্নকর্তা, উপদ্রবসৃষ্টিকারী। কে কীভাবে তাঁকে ব্যবহার করছে, পরিচালনা করছে, তার ওপরেই কার্যত নির্ভর করে ফললাভের প্রসঙ্গ।

যোগ্যতাবিশেষেই তিনি ফলদান করেন। গণেশের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে একধরনের ambivalence বা দ্বৈধবৃত্তি, যা বিঘ্ন থেকে অবিঘ্নের স্তরে ক্রমোত্তীর্ণ হয়েছে।

অনেকসময় গোয়েন্দা কাহিনি বা অভিযানমূলক আখ্যানে গণেশ প্রসঙ্গ বা গণেশমূর্তির রমরমা দেখে মনে হয় এত দেবতার ভিড়ে কেবল গণেশই কেন বার বার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে? এক্ষেত্রে কারণ হিসেবে অন্তত তিনটি সম্ভাবনার কথা বলা যায়।

প্রথমত, গণেশের আধা-মানুষ আধা-পশুর অদ্ভুতদর্শন মূর্তিতে একধরনের বৈচিত্র্য আছে, একটা স্বাভাবিক আকর্ষণের ক্ষমতা যা তাঁর দেহবিভঙ্গ, গজমুখ, কুলোর মতো কান, স্থূল উদর, একদন্ত, সর্পোপবীত, অলঙ্কারযুক্ত দেহ বা ইঁদুরবাহনের বিশিষ্টতায় মূর্ত হয়ে ওঠে। এই ধরনের আবয়বিক সংস্থান বিশেষ ক্ষেত্রে রহস্যের উপাদান সৃষ্টিতে সক্ষম। তা ছাড়া অলঙ্কার বাহুল্যে, প্রসাধনের আড়ম্বরে কিংবা বহুমূল্য ধাতুর সমাবেশে অনেকসময় গণেশমূর্তির এতখানি মূল্যবৃদ্ধি ঘটে যে তা অর্থলোভীর লালসা উদ্রেক করে। এই প্রলোভন থেকেই ক্রমে অপরাধের জন্ম হয়।

দ্বিতীয়ত, গণেশের উপবেশনের মধ্যে একধরনের স্থাণুত্বের ভঙ্গি আছে, যেমন অর্থসঞ্চয়ের মানসিকতার মধ্যেও থাকে একটা স্থির অনড় দৃষ্টিভঙ্গি। গণেশের মূর্তিতত্ত্ব অনুসরণ করলে দেখা যায়, অনেক মূর্তিতেই তিনি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় যেন প্রায় গ্যাঁট হয়ে বা জড়ো হয়ে বসে আছেন। এমন অচঞ্চল, অবিচলিত স্বভাব ধনিক শ্রেণির সঞ্চয়কাম মানুষের মধ্যে দেখা যায়। কাজেই, পুঁজিপতি ব্যবসায়ীর আখড়ায়, স্বার্থ-সজাগ শেঠজি বা মাড়োয়ারি ব্যবসাদারের গদিতে গণেশমূর্তির অবস্থানের সঙ্গে এই ধনস্ফীতি ও ধনসঞ্চয়ের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। এই সম্পর্ক কখনও রিপুতাড়িত মানুষকে দুষ্কর্মে ইন্ধন দেয়। আবার, অন্যভাবে দেখলে লোকসমাজে গণেশপূজার গুরুত্বের সঙ্গে আর্থিক লাভালাভ বা সাফল্য-ব্যর্থতার প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে বলেই ব্যবসায়ীমহলে গণেশমূর্তির প্রভূত কদর। যে গণেশ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রক, ব্যবসাবিশ্বে ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্কের নিয়ন্তা, তাঁকে কেন্দ্র করে একদল স্বার্থমোদী কামপ্রমত্ত মানুষের লালসার তাণ্ডব স্বভাবতই চলে। এই লালায়িত মনোবৃত্তি থেকেই অপরাধের মুখবন্ধ তৈরি হয়।

তৃতীয়ত, পৌরাণিক সিদ্ধিদাতা গণেশ তুখোড় বুদ্ধিধারী। এই বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে গোয়েন্দা কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র অর্থাৎ গোয়েন্দারও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। কারণ, মগজাস্ত্রে শান না দিলে গোয়েন্দার সত্যানুসন্ধান তদন্তের যে কোনও

পর্যায়ে ব্যর্থ হতে পারে। ফলে সিদ্ধিদাতার গুণবৃত্তির সঙ্গে গোয়েন্দার বুদ্ধিমত্তার একটি স্বাভাবিক সংযোগ থাকায় কখনও কখনও গণপতির উপস্থিতির সঙ্গে গোয়েন্দার চরিত্রায়ন বেশ মানিয়ে যায়। তবে এটি কোনও স্বতঃসিদ্ধান্ত নয়, ক্ষেত্রবিশেষে হতে পারে। প্রসঙ্গত সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'জয় বাবা ফেলুনাথ' চলচ্চিত্রের শেষদৃশ্যের একটি সংলাপ মনে পড়তে পারে– ফেলুদা যখন তাঁর পারিশ্রমিক হিসেবে নকল গণেশমূর্তিটি নেওয়ার কথা অম্বিকা ঘোষালকে জানান, তখন সহাস্যমুখে গৃহকর্তা বলেন: "নেবেন বৈকি, যার এত বুদ্ধি তার সিদ্ধিলাভ হবে না তো কার হবে মিত্তিরমশাই?" এই অংশটি অবশ্য সত্যজিৎ চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে রচনা করেন। মূল উপন্যাসের শেষটা অবশ্য এমন নয়। তবে এই সংলাপ থেকে শীর্ষবুদ্ধি গণপতির সঙ্গে ডিটেকটিভ চরিত্রের অন্তর্গত সাদৃশ্য টের পাওয়া যায়।

৬। জনপ্রিয় সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের *জার্মান গণেশ* শীর্ষক গল্প সংকলনের প্রথম সংস্করণ ২০১১ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়।[২৯] এই সংকলনের প্রথম গল্প 'জার্মান গণেশ'-এর নামেই লেখক সমগ্র গল্প সংকলনটির নামকরণ করেছেন। উদ্দিষ্ট গল্পের বিষয় উচ্চবিত্তের প্রদর্শনকামিতা এবং আত্মঘোষণার হাস্যকর নিষ্ফলতা। সম্পদ সংগ্রহের উদগ্র নেশাই কেবল নয়, করতলগত সম্পদ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে উচ্চবিত্ত সমাজে নাম-কেনার চেষ্টা এবং আত্মজাহির করার প্রবণতা গল্পে একটি নির্লজ্জ সামাজিক ব্যাধির আকার নিয়েছে। রুচিশীলা বসুর চরিত্রটি নামে রুচিশীলা হলেও কামে একান্তভাবেই রুচিবিগর্হিত আচরণের পরিচয় দিয়েছে। তার মিথ্যে আভিজাত্যের প্রদর্শন এবং কৃত্রিম দেখানেপনার শিকার হয়েছে জগন্নাথ নামের ছেলেটি। মামা-মামির বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে থাকা নাদুসনুদুস জগন্নাথ লেখাপড়ায় একেবারেই লবডঙ্কা। মাধ্যমিকে দু'বার ফেল করার পর কিলচড়হীন মামাবাড়ির ভারি মজার কাল তার ঘুচেছে। বর্তমানে সে মামা-মামিদের পাইকারি হুকুমবরদারে পরিণত, মুখ বুজে ঘাড় কাত করে সকলের যথাসাধ্য ফরমাশ খাটাই তার ভবিতব্য। একে মাথায় বুদ্ধির ধার নেই, নিরেট মস্তিষ্ক; তার ওপর আবার সবসময় খাই-খাই ভাব। মাঝেমধ্যেই তার খিদের তোড়ে বাড়িসুদ্ধ লোক নাজেহাল হয়ে যায়। যদিও এর জন্য তাকে বিস্তর খোঁটাও শুনতে হয়। এ'ভাবেই একরকম করে কেটে যাচ্ছিল জগন্নাথের জীবন। হঠাৎ চোখে পড়ে যায় কর্মখালির কলামে রুচিশীলার দেওয়া বিজ্ঞাপন। ভবিষ্যৎ বদলানোর চেষ্টায় জগ্ননাথও সেই বিজ্ঞাপনের লোভনীয় ফাঁদে পা বাড়ায়। কাজ না করে ভালোমন্দ খাওয়া ও চুপচাপ বসে থাকার এমন কর্মহীন আলস্যের প্রলোভন তো বড়ো একটা আসে না। তা ছাড়া 'বিনা পরিশ্রমে অঢেল সুখ'-এর এমন চাকরি জোটাতে পারলে মামারবাড়ির লোকেদের একটা যোগ্য জবাব দিতে পারবে জগন্নাথ। কাজেই,

দিগ্বিদিক না ভেবেই সে রুচিশীলার বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ির সান্ধ্য পার্টিতে জার্মান গণেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। কার্যত এই অংশটিই গল্পের প্রধান প্লট, জগন্নাথ যেখানে পরিণত হয়েছে ঘর সাজানোর উপকরণে, জার্মানী থেকে কেনা এক বহুমূল্য গণেশমূর্তির নকল অস্তিত্বে। চাকরি করতে গিয়ে এক অসহায় গোবেচারা ছেলেকে কীভাবে উচ্চবিত্তের দেখনদারির সামনে নাস্তানাবুদ হতে হয়, মিথ্যে গণেশ সাজার খেসারত দিতে হয়, জগন্নাথের বৃত্তান্তের গভীরে লেখক সেই ইঙ্গিত রাখতে চেয়েছেন। এর মধ্যে মিশেছে বিত্তশালীর প্রদর্শনস্পৃহা, অগাধ প্রাচুর্যজনিত অহঙ্কার, আত্মপ্রচারের উৎকট লিপ্সা এবং ঊর্ধ্বতনের স্বার্থ-সজাগ মনুষ্যত্বহীন আচরণ।

৭। গণেশের উপস্থাপনার সঙ্গে কখনও ধর্মীয় কুসংস্কার বা যুক্তিবোধহীন ধর্মান্ধতার এক আশ্চর্য সমীকরণ তৈরি হয়ে যায়। প্রসঙ্গত স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'গণেশ' গল্পের কথা মনে পড়তে পারে।[৩০] অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এক পরিবারের কিছুটা শারীরিক জড়তাগ্রস্ত গণেশ নামের ছেলেটি কীভাবে তার বাবা মহাদেবের লোভের ফাঁদে পড়ে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হল, তারই নির্মম পরিণতি এই গল্পে দেখানো হয়েছে। ইঞ্জেকশন ফুঁড়ে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় এক মানবসন্তান গণেশে রূপান্তরিত হল। গ্রামীণ অনক্ষর মানুষের ভক্তি-বিশ্বাসের অন্ধ সাম্রাজ্যে ধর্মের মোহে মনুষ্যত্বরেও বলি হয়ে যায়। অর্থলিপ্সার চক্করে পড়ে এক সাধারণ নিরীহ ছেলেকে গণেশ বানিয়ে তোলা হয়। দেবতা গণেশ এ কাহিনিতে সরাসরি নেই। যদিও বিষয়ভাবনা ও চরিত্রনির্মাণের মধ্যে তাঁর অনুষঙ্গ এসেছে। মানুষকেই এ গল্পে দেবতা সাজিয়ে ভণ্ডামির ব্যবসায় সামিল করা হয়। শেষে মানুষ গণেশের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্ধবিশ্বাসের কাছে যুক্তিবোধহীন মানুষের পরাজয় ঘটেছে। দেবতার বেশধারী মানুষের মৃত্যুই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ধর্মব্যবস্থার প্রতি নিষ্প্রশ্ন আনুগত্য মানুষের কোন শোচনীয় পরিণাম ঘটাতে পারে। এই আখ্যান। ধর্মীয় অন্ধতার বিপক্ষে লেখকের মূর্তিমান প্রতিবাদ।

৮। কোনও কোনও আখ্যানে গণেশের ভূমিকা পথনির্মাতার, অবলম্বনকারীর। এ প্রসঙ্গে ২০১৯ সালে আনন্দ থেকে প্রকাশিত কিশোর কাহিনি সিরিজের অন্তর্গত অরুণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *গণেশ* শীর্ষক রচনাটির উল্লেখ করা যায়।[৩১] এখানে গণেশ উপস্থিত দেবতা হিসেবেই, যদিও তিনি পরেছেন মানুষের ছদ্মবেশ। মর্ত্যের জীবনকে কাছ থেকে দেখবার বড়ো সাধ তাঁর। কৈলাসে মা দুর্গার সঙ্গছাড়া হয়ে পৃথিবীতে এলেন ঠিকই, কিন্তু ছেলের অদর্শনে মায়ের উদ্বেগ বেড়েই চলে। সর্বক্ষণের সুরক্ষাবলয়ে গণেশকে ঘিরে রাখতে মা স্বর্গ থেকেই নজরদারি চালিয়ে যান। গ্রামজীবনের ছোট ছোট অসাম্য, চক্রান্ত, ভেদবুদ্ধির দাপাদাপি মিটিয়ে, অ-সম জীবনযাত্রায় যথাসম্ভব সমতা

এনে, সবার সব সমস্যা মিটিয়ে, হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে সবশেষে মানুষরূপী গণেশ ফিরলেন স্বর্গে, মায়ের কাছে। মর্ত্যের হারিয়ে যাওয়া গণশা যেমন ফিরে এল মায়ের কাছে, তেমনি মানুষবেশী দেবতাও এতদিনের মর্ত্যবাস সাঙ্গ করে কৈলাসে ফেরত গেলেন। এই আখ্যান তাই উৎসে ফেরার গল্প বলে। ঘরের ছেলের ঘরে ফেরার গল্প। মাঝে শুধু কেটে যায় মানুষরূপী গণেশের মর্ত্যযাপনের বেশ কিছু দিন। নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া গণশার জায়গা নেয় দেবতা গণেশ। গ্রামে রটে যায় গণশার বাড়ি ফেরার কথা। হারিয়ে যাওয়া ছেলের এ যেন এক নতুন জন্ম। না আবির্ভাব? ছেলের দল বিবরণ দিয়েছে এইভাবে: "এখন সে আর সেই গণেশটি নেই। এখন যে তার বাঁশির মতো নাক, কুলোর মতো কান, আর তার ডাগর চোখদুটোর জায়গায় কে যেন একজোড়া কুঁতকুতে চোখ বসিয়ে দিয়েছে।... এখন সে ভাই ঠিক যেন গণেশ ঠাকুরটি হয়ে ফিরে এসেছে নিজের ঘরে।... এখন সেই লিকপিকে গণশাটা গায়ে গতরে এমন নাদুসনুদুস হয়েছে না যে কি বলব?"[৩২] কেউ বুঝতেই পারছেন না সবার অলক্ষ্যে মানুষের সঙ্গলোভী দেবতা জন্ম নিচ্ছেন মানুষেরই বেশে। মানুষের জীবনের সংস্পর্শে এসে দেবতার অভিজ্ঞতার ঝুলিও ভরে ওঠে। এর সবটাই অবশ্য সুখকর নয়। গ্রামজীবনের আনাচে-কানাচে জমা হয়ে আছে কত কুসংস্কার, ভাঁওতাবাজি, ফন্দিফিকির, সরল নিরীহ মানুষদের চোখে ঠুলি পরিয়ে কাজ হাসিল করে নেওয়ার স্বার্থমূলক অভিপ্রায়। জীবনের এইসব অন্ধ অলিগলি ঘুরে চোরাগোপ্তা কত ভাঁজ সামলে, অন্যায়কারীর মুখোশ খুলে গণেশ যেন হয়ে উঠেছে মানুষের পরিত্রাতা, দুঃখদিনের অবলম্বন। একটা ব্যবস্থার ভোলবদল করে দিয়েছে সে। সাধাসিধে মানুষগুলোর আত্মশক্তি বাড়িয়ে সমাজ সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে, গঠনমূলক কাজের প্রেরণা দিয়েছে, এমনকি মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তাদের ঔচিত্যের পাঠও দিয়েছে। প্রায় 'friend, philosopher and guide'-এর মতো করেই গণেশ যেন গ্রামের মানুষদের আশা-ভরসার স্থল হয়ে উঠেছিল। এই যে সাধারণ মানুষের আশ্রয় হয়ে উঠে তাদের মার্গদর্শন করা, জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে তোলা, দুর্বৃত্তের পর্দাফাঁস করে ন্যায় ও সততার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা---- এর মধ্যে এক সঞ্চালকের, নেতার, গণপ্রধানের বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে আছে। গণপতিত্বের গুণে, সংগঠকসুলভ নেতৃত্বদানের ক্ষমতায় এখানেই তিনি বিশিষ্ট। যেখানে যত গণ্ডগোল, বেঠিক হিসেব, জীবনের উলটো, বাঁকা ছবি, সব অসংগতির নিরাময় করে কোনও এক শারদ সকালে এই মানুষ-দেবতার মর্ত্যজন্মের শেষ হয়। এখানেও স্বর্গ-মর্ত্যের সেতুবন্ধনের প্রধান কাণ্ডারী গণেশ। মানুষের জীবনের গল্পে দেবতা ঢুকে পরেছেন অবলীলায়, কোথাও কোনও সীমারেখা নেই। মানুষের হাসি-কান্নার, দুঃখ-সুখের অংশীদার হতে হতে দেবতাও

কখন যেন মানবজন্ম পেয়েছেন। মানুষ যে কেবল দেবতার মুখাপেক্ষী নয়, দেবতারও যে মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার সাধ হয়, দেবতা-মানুষের সেই পরস্পর-নির্ভরতার আখ্যান বুনে দেয় গল্পের গণেশ।

৪.৩

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে গণপতি বিষয়ক চিন্তা-চর্চার হালহকিকত

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে গণপতি বিষয়ক চিন্তা-চর্চার প্রথম প্রতিফলন দেখা যায় উনিশ শতকের শেষ দশকে। সিদ্ধিদাতা গণেশের ভাবাভিব্যক্তির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রথম স্তরে যে আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল, সময়ান্তরে গণেশের প্রাচীনত্ব, রূপভেদ, মূর্তি বা স্থাপত্য-ভাস্কর্যে তাঁর বৈচিত্র্য, পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে গণেশের রূপায়ণ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় অবলম্বন করে বাঙালির গণপতি-চর্চা উনিশ শতক থেকেই এক সুসংবদ্ধ discourse-এর জন্ম দিয়েছে। ভারতীয় ধর্মচিন্তায় গণেশের ঐহিত্য এক সুদীর্ঘ পথরেখা ধরে ধর্ম-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেভাবে বিস্তৃত রূপলাভ করেছিল, নানা দিক থেকে তার চলন তথা বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিবেচনা করার অনিবার্য তাগিদ এই পর্বের বাঙালি চিন্তকদের মধ্যে কমবেশি দেখা গিয়েছিল। সিদ্ধিদাতা গণেশের ভাবরূপের তাৎপর্য বাদ দিলে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে তাঁর আবির্ভাব এবং প্রতিষ্ঠার সময়মাফিক বিচারই কার্যত গণপতি বিষয়ক সমালোচনার একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল। বেশিরভাগ প্রাবন্ধিকই মূলত ধর্মীয় ঐতিহ্যের দিক থেকে গাণপত্য ধর্মসমাজ ও তাঁর কুলদেবতার চরিত্র বুঝতে চেয়েছেন। কোনও প্রাবন্ধিক আবার গণপতির সঙ্গে গণসমাজ বা গণসংঘের সংযোগ, গণদেবতার মুণ্ডচ্ছেদের মধ্যে আধিপত্যকারী অংশের তরফে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উত্থানকে অবদমিত রাখার অভিপ্রায় প্রভৃতি রাজনৈতিক বয়ান জুড়ে গণপতি-তত্ত্বকে শ্রেণিসংঘর্ষপূর্ণ সমাজের নিরিখে বুঝতে চেয়েছেন। বেশিরভাগ বিশ্লেষণই একটানা গদ্যে এগিয়েছে। কখনও কখনও পত্রিকার পৃষ্ঠায় গণপতির প্রাচীনত্ব বিষয়ে চাপান-উতোরের মতো বাদানুবাদ চলেছে। এই সকল চিন্তকদের রচনা থেকে গণপতি বিষয়ক চর্চার যে অভিমুখগুলি উঠে আসে, সেগুলি নিচে বিশ্লেষণ করা হল।

১। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে (১২৯৭ ব.) বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি থেকে চন্দ্রনাথ বসুর *ত্রিধারা* নামক প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়।[৩৩] এই সংকলনের ‘তৃতীয় ধারা’-র অন্তর্গত ‘সিদ্ধিদাতা গণেশ’ শীর্ষক প্রবন্ধটিকে বাংলা ভাষায় গণপতি-কেন্দ্রিক প্রথম সমালোচনামূলক প্রবন্ধ বলা যায়। ঐতিহাসিকতার দিক থেকেই নয় কেবল, বিষয়-ভাবনার নিরিখেও এই প্রবন্ধের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য। গণপতি বিষয়ক গতানুগতিক কোনও ধর্মতাত্ত্বিক সমীক্ষা এই রচনার

লক্ষ্য নয়, বরং এর বিষয়ভিত্তিতে আছে সিদ্ধিদাতা গণেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাব-মূর্তিকে ঘিরে এক ব্যতিক্রমী সন্ধান। চরিত্রে যিনি সিদ্ধিদাতা, তাঁর ভাবরূপের অভিব্যক্তির মধ্যে এমন কোন কোন বৈশিষ্ট্য আছে যা আপামর ভক্তের অনুসরণযোগ্য বা কার্যসিদ্ধির সহায়ক হতে পারে? উদ্দিষ্ট রচনায় প্রাবন্ধিক এইসব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজেছেন। সিদ্ধিদাতার অনুগামীদের সিদ্ধিলাভের আদর্শ parameter কী হতে পারে অর্থাৎ কী ধরনের গুণবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বাস্তবক্ষেত্রে সফলকাম হন, বর্তমান প্রবন্ধ লেখক এই বিষয়ে স্পষ্ট দুটি category নির্দেশ করেছেন। যাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্যম ক্ষিপ্রতা অপরিমিত, যারা ব্যস্ততা ব্যগ্রতা চঞ্চলতায় সর্বদা ভরপুর, তারাই কি সিদ্ধিলাভে সমর্থ? নাকি, যারা স্থির ধৈর্যশীল নিয়ন্ত্রিত-স্বভাব, সংযমে গাম্ভীর্যে বিবেচনায় স্থিতপ্রজ্ঞ, প্রকৃত সিদ্ধি তাদেরই আয়ত্তাধীন হয়? প্রাবন্ধিক এই দুই বিপরীতভাবাপন্ন মানুষের মধ্যে গণেশমূর্তির ভাবব্যঞ্জনার সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরের মানুষের-ই যোগবন্ধন সম্ভব বলে মনে করেছেন। বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে তিনি এই পার্থক্যের ভিত্তিটি স্পষ্ট করেছেন। যারা তীব্রভাবে গতিময়, দুর্দান্ত বা অনেকক্ষেত্রেই হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় স্থিতিহীনতার কারণে তারা সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছেও অসফল হন। আবার, স্বভাবতই যারা সংযমী ধৈর্যশীল বিবেচক এবং স্থিরবুদ্ধি, তারা সবসময়ই গভীরভাবে চিন্তা করে অথবা পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে পা ফেলেন। কাজেই, তাদের বেপথু হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রাবন্ধিক তাঁর সমকালেও নানা ক্ষেত্রে দেখেছেন এমন অনিয়ন্ত্রিত-স্বভাব মানুষের দাপাদাপি। উনিশ শতকীয় কলকাতার সর্বত্র সত্যিকারের প্রস্তুতির অভাব দেখেছেন। সদ্য কলেজ-উত্তীর্ণ ছাত্রদের ওকালতির ব্যবসায় ভিড় জমানো, সীমিতসামর্থ্য ব্যক্তির মুহূর্তের উন্মাদনায় লেখক হয়ে ওঠার অভিলাষ, সামান্য ইংরেজি শিখেই দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা, গৃহসংস্কার, সমাজসংস্কার বা ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রেও একধরনের চিন্তাহীন বিশ্লেষণহীন অপরিপক্কতা, আগুপিছু না ভেবেই ঝটিতি যে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা, চিকিৎসকরাও যেখানে রোগীর অসুখের ধাত না বুঝেই চটজলদি একটা diagnosis করে দেন, ফলে অনেকসময় রোগীর জীবনহানি পর্যন্ত ঘটে যায়— নাগরিক জীবনের এই স্থিতিহীন উন্মার্গগামিতার সঙ্গে সিদ্ধিলাভের যে প্রকৃতই দূরসমন্ধ, প্রাবন্ধিক তা স্পষ্টই জানিয়েছেন। সমকালের এই অবক্ষয়ী মূল্যবোধের বিপরীতে প্রাবন্ধিক অনুসরণ করতে চেয়েছেন সিদ্ধিদাতার আদর্শকে। মনে হয় এই দ্বন্দ্ব গতি বনাম স্থিতির। একদিকে গতির দানবীয় প্রচণ্ডতা, অন্যদিকে স্থিতিতত্ত্বের শান্ত সুগভীর সংযম। ব্যক্তির ধাতুগত অস্থিরতা বা অতিমাত্রায় তৎপরতা যতই থাকুক, কার্যক্ষেত্রে ধীরগামী এবং সংযত হওয়াটাই জীবনের শিক্ষা, সিদ্ধিলাভের যথার্থ লক্ষণ। কর্মসিদ্ধির ক্ষেত্রে এ কারণেই হয়তো গণেশমূর্তি আদর্শস্থানীয়। তাঁর ভাবরূপের মধ্যে চপলতা,

উগ্রতা, ঔদ্ধত্য বা হঠকারিতার বদলে একধরনের প্রশান্ত গাম্ভীর্য প্রতিভাত হয় বলেই এই সুন্দরমূর্তি মঙ্গলময় এবং সিদ্ধিপ্রদ। শেষ অনুচ্ছেদে প্রাবন্ধিক গণেশমূর্তিকে এক পারমার্থিক ব্যাপ্তি, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিস্তার দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'গণেশ মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডপতিরই এক বিস্ময়কর মূর্ত্তি। জলে স্থলে মহাশূন্যে যখন তুমূল ঝটিকা বহিতে থাকে---আকাশে বজ্রের ঝন্ঝনা, জলে তরঙ্গ গর্জ্জন, জলে স্থলে আকাশে পঞ্চভূতের প্রলয়াস্ফালন তখনও জল স্থল বায়ু বহ্নি ব্যোম সকলেরই সকল নিয়মগুলি সম্পূর্ণ সূক্ষ্মতম প্রণালীতে প্রতিপালিত হয়, কাহারো কোন নিয়মের কণামাত্র ব্যর্থ বা বিপর্যস্ত হয় না। ইহাই ব্রহ্মাণ্ডপতির বিস্ময়কর গণেশমূর্ত্তি।'[৩৪] উদ্দাম গতিময়তার মধ্যেও যেমন একটি স্থির অ-বিচলিত কেন্দ্র নিত্য বর্তমান, তেমনই কার্যসিদ্ধির কারণ বুঝতে হলে কার্যক্ষেত্রের অন্তরালে প্রবেশ করতে হয়। বাইরের চাঞ্চল্যে বিশৃঙ্খলা যতই ঘটুক, অন্তর্গত সংযমের গভীরতার মধ্যেই সিদ্ধির প্রকৃত কারণ লুকিয়ে থাকে। গণেশের মূর্তিকল্পনার মধ্যে এই নিত্যসত্যের উপলব্ধিই সিদ্ধিদাতার প্রাসঙ্গিকতা বুঝিয়ে দেয়।

২। *বঙ্গদর্শন* (নবপর্য্যায়) পত্রিকায় গণপতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত প্রতর্ক : বিজয়চন্দ্র বনাম রামেন্দ্রসুন্দর

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ/ ১৩১০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে *বঙ্গদর্শন* (নবপর্যায়) পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'সিদ্ধিদাতা গণেশ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।[৩৫] ভারতীয় ধর্মের প্রেক্ষাপটে ঠিক কোন সময়ে এবং কি প্রকারে সিদ্ধিদাতা গণেশের উদ্ভব হয়েছিল, বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রমাণের নিরিখে তা বিবেচনা করে প্রাবন্ধিক সিদ্ধান্ত করেছেন, 'গণেশের বয়স প্রায় ১৩শত বৎসর।'[৩৬] এর সমর্থনে বিজয়চন্দ্র যেসব কারণ দেখিয়েছেন, তার চুম্বকসার নিম্নরূপ:

ক। বৈদিক সাহিত্যে গণেশের নিরস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও মার্কণ্ডেয়পুরাণ এবং স্কন্দপুরাণ সংকলনের পূর্বকালে গণপতির চিহ্ন পাওয়া যায় না।

খ। মহাভারতের অনুক্রমণিকায় গণেশ প্রসঙ্গ পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ বলে মনে হয়। কাজেই, হস্তীমূর্তি গণপতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মহাভারত সংকলনের পর্বে অনুপস্থিত।

গ। রামায়ণেও পৃথক দেবতা হিসেবে গণেশ অনুপস্থিত। উত্তরকাণ্ডের একটি শ্লোকে গণেশ শব্দটি পাওয়া গেলেও তা অন্যার্থবোধক এবং পরবর্তী সময়ের প্রক্ষেপ বলে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন।

ঘ। পঞ্চম শতাব্দী যদি গণেশের উদ্ভবকাল হত, তবে পঞ্চতন্ত্রে গণেশ কখনওই অনুল্লিখিত থাকতেন না।

ঙ। বৎস, ভট্টি, কালিদাস, ভারবি প্রমুখ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর কবির রচনায় বা সমকালীন প্রস্তরলিপিতে গজমুখ গণেশের নাম পাওয়া যায় না।

চ। ভরত নাট্যশাস্ত্রেও গণেশের নামচিহ্ন অনুপস্থিত।

ছ। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর উত্তরপ্রদেশের কবি বাণভট্টের কাদম্বরীতে হস্তীমুখ গণেশের প্রথম সাহিত্যিক উল্লেখ বলে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন। যদিও সেখানে 'গণ'-দের গাত্রমার্জনচিহ্ন প্রসঙ্গে তাদের অধিপতির অবগাহনচিহ্নের কথা বলা হয়েছে। এখানে গণপতি উল্লিখিত 'গণদিগের সহচর' এবং 'অন্যান্য গন্ধর্ব্বকিন্নরদিগের' সঙ্গে একদলভুক্ত। বিপরীতে ওই একই শতকের দক্ষিণপ্রদেশীয় কবি ভবভূতির মালতীমাধব নাটকে গণেশ সর্বপ্রথম পূজ্যপদ লাভ করেছেন। সূত্র দু'টির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে দাক্ষিণাত্যেই গণেশপূজা প্রথমে প্রচলিত হয়ে পরে উত্তরভারতে বিস্তৃত হয়। কারণ, বাণভট্টের গ্রন্থে গণপতির 'অস্তিত্বমাত্র উপলব্ধ হয়'।

জ। রাষ্ট্রকূট ও চালুক্য রাজাদের বিজয়ের পূর্বে দক্ষিণভারতে আর্যসংস্রব ঘটেনি। দক্ষিণে আর্যপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যেসব পুরাণ রচিত ও সংকলিত হয়েছে, তাতে গণপতি প্রসঙ্গ বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত। মার্কণ্ডেয় এবং স্কন্দপুরাণেও গণেশ ও স্কন্দের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। এ থেকে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য, উদ্দিষ্ট পুরাণগুলি কখনওই অষ্টম শতকের পূর্বকালীন হতে পারে না। সপ্তম শতকে ভবভূতির সময়ে গণপতি-কেন্দ্রিক পৃথক কোনও পুরাণের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তবে মালতীমাধবের সাক্ষ্যে মনে হয়, অব্যবহিত পরেই যাঁর উদ্দেশে পুরাণ রচিত হবে, নিশ্চয়ই দক্ষিণপ্রদেশে তাঁর পূজা একটু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল।

উপরোক্ত তথ্যাদির ওপর নির্ভর করেই বিজয়চন্দ্র 'গণেশের বয়স প্রায় ১৩ শত বৎসর' নির্ধারণ করেছেন। তাঁর বিবেচনায় 'ইনি দেববর্গের মধ্যে শিশু হইলেও, এখন একটু বয়স্ক; তাই এখন ইনি অতি নির্ব্বিরোধী এবং সিদ্ধিদাতা মাত্র।' বিজয়চন্দ্র যে তাঁর প্রস্তাবে গণেশকে প্রায় অর্বাচীনকালের দেবতা ঠাওরেছেন, সেই সিদ্ধান্তকে ঘিরেই পরবর্তী সময়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ভারতীয় ধর্মসাহিত্যে গণেশের উপস্থিতি কতখানি প্রাচীন, নাকি তিনি নিতান্ত পরবর্তী সময়ের দেবতা--- মূলত এই সংক্রান্ত বোঝাপড়া থেকেই বিশ শতকের বাংলায় গণপতি-তত্ত্বকেন্দ্রিক চিন্তা বা চর্চার ধারা এগিয়েছিল।

৩। বিজয়চন্দ্রের সিদ্ধান্তের প্রত্যুত্তর হিসেবে ওই একই বছরে (১৯০৩ খ্রি.) *বঙ্গদর্শন* (নবপর্যায়) পত্রিকায় দুটো সংখ্যা বাদ দিয়ে একাদশ সংখ্যায় বিশিষ্ট পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'গণেশপূজা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা

করেন। প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদেই তিনি তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে লিখেছেন, '...[বিজয়চন্দ্র মজুমদার] আমাদের দেবমন্দিরে গণপতির আবির্ভাবের যে কাল নিরূপণ করেছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। তিনি গণপতিকে যত আধুনিক বলিতে চাহেন, গণপতি ততটা আধুনিক নহেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে গণপতি পূজা পাইতেন, তাহা অনুমানের কারণ আছে।'[৩৭] বর্তমান প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর কার্যত গণেশের প্রাচীনত্বের সপক্ষে সেই প্রমাণগুলিই পেশ করেছেন। দেখে নেওয়া যাক -

ক। গণপতির উৎস সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি ঋগ্‌বেদের প্রমাণ ব্যবহার করেছেন। যদিও শ্লোকে উল্লিখিত 'গণপতি' শব্দ যে অন্যার্থবোধক, হস্তীমুখ গণেশের পরিচয়সূচক নয়, এ'কথা মান্য করেও 'গণপতি' শীর্ষক উপাধির প্রাচীনত্ব স্বীকার করেছেন।

খ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠক যাজ্ঞিকী বা নারায়ণীয়া উপনিষদের অন্তর্গত 'গণেশ গায়ত্রী' রূপে বহুচলিত একটি মন্ত্র ('তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি।/ তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ') এবং তৎসম্বন্ধিত সায়ণাচার্যের ভাষ্যের সূত্রে মনে হয় যাজ্ঞিকী উপনিষদের সময়ে বক্রতুণ্ড মহাদন্ত গজাননের পূজা প্রচলিত ও তাঁর সঙ্গে শিবের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। পাশাপাশি প্রাবন্ধিক ওই দশম প্রপাঠকের প্রথম অনুবাক-ধৃত আরেকটি গায়ত্রী মন্ত্রের ('কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি।/ তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ') সাক্ষ্যে 'কন্যাকুমারী' আখ্যাতা 'দুর্গি'-কেও 'গণেশজননী কাত্যায়নী দুর্গা' বলে মনে করেছেন।

গ। প্রাবন্ধিক নিজেই যাজ্ঞিকী উপনিষদের কালনির্ণয় তর্কসাপেক্ষ বলে এর প্রাচীনত্ব বিষয়ে সন্দিহান হয়েছেন। পাশাপাশি সায়ণাচার্যের সময় দক্ষিণভারতে চলিত এই উপনিষদের চৌষট্টি অনুবাকের সুত্রে এর মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রক্ষেপ অংশের ফলে গ্রন্থটিকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাঁর অস্বস্তিবোধ হয়েছে। পরক্ষণেই আবার অপৌরুষেয় শ্রুতিবাক্য হিসেবে যাজ্ঞিকী উপনিষদ দীর্ঘকাল ধরে গৃহীত হয়ে আসছে বলে এই গ্রন্থ যে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের তুলনায় বহু প্রাচীন, প্রাবন্ধিক সেই ব্যাপারেও নিঃসংশয় হয়েছেন।

৪। *বঙ্গদর্শন* (নবপর্যায়) পত্রিকায় ঠিক এর পরের সংখ্যাতেই অর্থাৎ চৈত্র মাসের দ্বাদশ সংখ্যায় বিজয়চন্দ্র মজুমদার রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্যকে নস্যাৎ করে 'গণেশর পূজা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[৩৮] এ প্রবন্ধে তাঁর আলোচ্য বিষয়ের চুম্বকসার নিম্নরূপ -

ক। যাজ্ঞিকী উপনিষদ 'অত্যন্ত অর্ব্বাচীন', 'পৌরাণিক যুগের গ্রন্থ', ও 'সমুদায় পৌরাণিক দেবতাদের নাম এবং একালের স্বরূপগুলি' গ্রন্থমধ্যে থাকায় এর নিরিখে গণেশের প্রাচীনত্বের নিরূপণ সম্ভব নয়। কারণ, পৌরাণিক যুগের দেবতারা বৈদিক নয় বলেই তাঁদের বিশুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে অনেক চাতুর্যপূর্ণ কৌশল গৃহীত হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে প্রাবন্ধিক শিবের দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর মতামত স্পষ্ট করেছেন। শিব যখন 'সমুদায় পৌরাণিক অবয়বে পরিপূর্ণ' হয়েছিলেন, তখন কতকগুলি প্রাচীন বৈদিক শ্লোকের সঙ্গে সমকালের রচনা মিশ্রিত করে এবং জায়গায় জায়গায় বৈদিক রচনারীতির অনুকরণ করে রুদ্রাধ্যায় লেখা হয়েছিল। এমনকি সায়ণাচার্য চতুর্দশ শতাব্দীতে এর ভাষ্যও রচনা করেছিলেন। সকল দেবতার ক্ষেত্রেই এই ধরনের গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ফলে এই গ্রন্থের সাক্ষ্যে যে গণেশকে সুপ্রাচীনকালের দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, তা বলাই বাহুল্য।

খ। দ্রাবিড়দেশে গনেশাথর্ব্বশীর্ষ নামে একটি গণপতি-কেন্দ্রিক বৈদিক গ্রন্থ প্রণীত হয়। গ্রন্থনামেই অথর্ববেদের সঙ্গে এর সংযোগ স্পষ্ট। অথর্ববেদে উল্লিখিত ভূতাপ্রেতাদির পূজার জন্য তা বহুকাল ধরে আর্যরা অগ্রাহ্য করেছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ ভূতপ্রেতের পূজা করতেন, তাঁরা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হত। প্রাবন্ধিক মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬৪ নং শ্লোকের বিষয়বস্তু উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে এই ভূতগুলিই 'গণ' নামে পরিচিত ছিল। মনুর 'গণনাঞ্চৈব যাজকঃ' কথাটির অর্থ প্রসঙ্গে টীকাভাষ্যেও 'বিনায়কাদিগণযাগকৃৎ' লেখা হয়েছে। গণেশের উৎপত্তি ওই ভূতের বংশে বলেই পরম্পরায় 'গণ' এবং 'বিনায়ক' অচ্ছেদ্য সম্পর্কে রয়ে গেছেন। পৌরাণিক সাহিত্যে গণেশের দেবত্বের বিকাশলাভের পর অথর্ববেদের সঙ্গে একে যুক্ত করে 'জাল অথর্ব্বশীর্ষ' লেখা হলেও গ্রন্থটি যে অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তী পুরাণের পরে রচিত, প্রাবন্ধিক স্পষ্টতই তার প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর বিচারে গণেশাথর্বশীর্ষ যেমন পরবর্তীকালীন 'জাল রচনা', নারায়ণোপনিষৎ তারও পরবর্তী সময়ের গ্রন্থ। এতে 'লালীল'-নামা অগ্নির চিহ্ন যেমন বর্তমান, তেমনই একেবারে সমকালের শব্দও সন্নিবিষ্ট। এ ছাড়া গ্রন্থে পৌরাণিক গরুড়, নন্দী প্রভৃতির সঙ্গে এমন কিছু কথা আছে যা পরবর্তী সময়ের বলে গণ্য হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ব্যবহৃত 'কন্যাকুমারী' শব্দটির সূত্রে বিজয়চন্দ্রের বক্তব্য, কন্যারূপে পার্বতীর কল্পনা 'তান্ত্রিকযুগের একটা বিশেষত্ব' এবং তান্ত্রিক পদ্ধতি দ্রাবিড়গোষ্ঠী থেকে হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হয়েছিল। তাঁর মতে, গণেশাথর্বশীর্ষের কাল যেমন অনির্ণেয়, তেমনি রামেন্দ্রসুন্দর প্রস্তাবিত নারায়ণোপনিষদও প্রাচীন নাকি অর্বাচীন তা সম্পূর্ণ স্থির হয়নি। ফলে ওই গ্রন্থপ্রমাণের সূত্রেও গণেশের উদ্ভবের ইতিহাস লেখা যায় না।

৫। *বঙ্গদর্শন* (নবপর্যায়) পত্রিকায় ওই একই সংখ্যায় (চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও ‘গণেশ প্রসঙ্গ’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে বিজয়চন্দ্রের বক্তব্যের তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন।[৩৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বিষয়ে বিজয়চন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দর চাপান-উতোরের প্রেক্ষিতে এইটিই অন্তিম প্রস্তাব। এরপর অবশ্য এই বিতর্ক অন্য এক পক্ষ সামিল হবেন। আপাতত বিজয়চন্দ্রের বিপক্ষে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্যের মূল দিকগুলি দেখে নেওয়া যাক -

ক। নারায়ণোপনিষদের সময়কালগত নির্দিষ্টতা অনুধাবন করতে পারলেই গণেশের বয়সের কিনারা করা সম্ভব। বিজয়চন্দ্র এর রচনাকাল যেমন ‘খ্রীষ্টের অন্তত আট শত বৎসর পরের’ বলে মনে করেছেন, তা যেমন অসম্ভব নয়, তেমনই বিজয়চন্দ্রের প্রমাণগুলি মেনে নিলেও গ্রন্থটি যে কোনওমতেই ‘আট শত বৎসর পূর্ব্বে হইতেই পারে না’, এমন সিদ্ধান্তও হলফ করে বলা যায় না। কাজেই অন্তর্বর্তী ফারাক হাজার দেড়েক বছরের মাত্র, যা ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের বিচারে ধর্তব্যের মধ্যেই আনবার নয়। ফলে এ প্রসঙ্গে বিজয়চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ‘যৎসামান্য’ মনে হয়েছে।

খ। বিজয়চন্দ্রের বিচারপ্রণালী প্রাবন্ধিকের ‘কিঞ্চিৎ আশঙ্কাজনক’ মনে হয়েছে। কারণ, তাঁর মতে বিজয়চন্দ্র প্রথমেই গণপতিকে অর্বাচীন কালের দেবতা বলে স্থির করে নিয়ে এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি সাজিয়েছেন। তিনি এক্ষেত্রে যেসব গ্রন্থে গণেশের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে সেগুলিকে অর্বাচীন বলে দেবতাটিকেও পরবর্তীকালীন বলে ঘোষণা করেছেন। কাজেই, পৌরাণিক বা তান্ত্রিক দেবতাদের অষ্টম শতকের পরবর্তী ধরে নিয়ে যে যে বৈদিক গ্রন্থে তাঁদের উল্লেখ আছে, সেগুলিকেও অষ্টম শতকের পরবর্তী বলে দেওয়া— এই ধরনের ভাবনায় প্রাবন্ধিকের সম্মতি নেই। বিশেষত পুরাণ ও তন্ত্রের উৎপত্তিকালই যখন অনির্ণীত, তখন এই বিষয়ে সহজে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। বেদের সময়েও পুরাণের অস্তিত্ব ছিল। আবার বোপদেবও পুরাণ রচনা করেছেন। তন্ত্রাচারের প্রাদুর্ভাব হর্ষচরিতের পাশাপাশি আকবরের আমলেও লক্ষ করা গেছে।

গ। নারায়ণোপনিষদোক্ত অগ্নিমন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য, ‘লালীল’ নামটি গণেশাথর্বশীর্ষ থেকে গৃহীত নাকি তার উলটো, এ ব্যাপারে নিঃসংশয় হওয়া মুশকিল। বিশেষত আচার্য সায়ণ যখন এই মন্ত্রের ভাষ্য করেননি, তখন একে প্রক্ষিপ্ত ধরেও নারায়ণোপনিষদের প্রাচীনত্ব বজায় থাকতে পারে। পাশাপাশি গণেশাথর্বশীর্ষের রচনাকাল অনির্দিষ্ট হওয়ায় সেই বিচারও নিরর্থক।

ঘ। আকবরের সময়ে জাল উপনিষদ রচিত হলেও উপনিষদ মাত্রেই জাল হয় না। যে কয়েকটি উপনিষদ শ্রুতিশাস্ত্রমধ্যে সর্ববাদিসম্মত, তাদের প্রাচীনত্বে সন্দেহের পূর্বে আরও জোরালো প্রমাণ থাকা দরকার। জাল উপনিষদের রচনা বর্তমান সময়েও হতে পারে, কিন্তু তা শ্রুতিবাক্যরূপে গণ্য হওয়া সহজ নয়। ফলে নারায়ণোপনিষদ কতখানি প্রাচীন, তা যখন নির্ণয় করা সম্ভব নয় এবং এই বিষয়ে বিজয়চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য-ও 'যৎসামান্য', স্বভাবতই এ নিয়ে অনর্থক বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন।

ঙ। শেষ অনুচ্ছেদে রামেন্দ্রসুন্দর পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 'ভারতবর্ষ-ঘটিত পুরাতত্ত্বের বিচারে অবলম্বিত প্রণালী' সম্পর্কে অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন। আসলে বিজয়চন্দ্র যে ধারায় ভারতীয় পুরাতত্ত্বের উপাদানগুলির বিচার করেছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দরের মতে তা বহুলাংশেই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অবলম্বিত চিন্তন-প্রণালীর অনুসারী। কাজেই, মতাদর্শগত ফারাকের কারণেও এই জাতীয় বিচারধারা রামেন্দ্রসুন্দরের পরিত্যজ্য মনে হয়েছে।

৬। গণেশের উদ্ভব সংক্রান্ত বিতর্কের পরিশিষ্ট : সখারাম গণেশ দেউস্করের 'সিদ্ধিদাতা গণেশের বয়স'

১৩১৭ বঙ্গাব্দের (১৯১০ খ্রিস্টাব্দ) শ্রাবণ সংখ্যার *আর্য্যাবর্ত* পত্রিকায় প্রকাশিত সখারাম গণেশ দেউস্করের 'সিদ্ধিদাতা গণেশের বয়স' শীর্ষক নিবন্ধটিকে বিজয়চন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দর বিতর্কের উত্তরপর্যায় বলা যায়।[৪০] তাত্ত্বিকভাবে সখারাম গণেশ বিজয়চন্দ্রের মতামতের পরিপন্থী। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তিপথ অনুসরণ করেই 'ভারতবর্ষ-ঘটিত পুরাতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অনেকে যেরূপ বিচার-প্রণালীর অবলম্বন করিয়া থাকেন'— সেই ঘরানারই অনুবর্তী বিজয়চন্দ্রের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তসমূহ প্রমাণসহ খণ্ডন করে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি গণেশের বয়স বিজয়চন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী '১৩ শত বৎসর' মেনে নিতে নারাজ। আলোচনার গোড়াতেই প্রাবন্ধিক বিজয়চন্দ্রের গণপতির উদ্ভব সংক্রান্ত মতামতগুলিকে দশটি সূত্রে বিন্যস্ত করেছেন। এরপর একে একে তাঁর সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যুক্তি সাজিয়েছেন। অনেকক্ষেত্রে বিশেষ কোনও একটি প্রসঙ্গে প্রতিপক্ষের যুক্তি কল্পনা করেও নিজে প্রতিযুক্তির অবতারণা করেছেন। তাঁর চিন্তার অভিমুখগুলি নিম্নরূপ:

ক। মার্কণ্ডেয় পুরাণাদির রচনাকাল সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বিজয়চন্দ্রের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। বিশেষত মার্কণ্ডেয় ও স্কন্দপুরাণের রচনাকাল বিজয়চন্দ্র দ্বিতীয় সত্যাশ্রয় পুলকেশীর পরবর্তী, এমনকি 'অষ্টম শতাব্দীর অ-পূর্ববর্তী' বললেও গণেশের বয়স যে তেরোশো বছরের বেশি নয় তা স্বীকার করা অসম্ভব। কারণ, প্রাবন্ধিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের পূর্ববর্তী বায়ুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করে ('গণেশস্য পদে শ্রাদ্ধী') সেখানে গণপতির উল্লেখ

দেখিয়েছেন। এ ছাড়া বায়ুপুরাণ যে সপ্তম শতকের পূর্ববর্তী তা প্রমাণের জন্য ৬২০ খ্রিস্টাব্দে রচিত বাণভট্টের হর্ষচরিত থেকেও সাক্ষ্য পেশ করেছেন। হর্ষচরিতকার বাণভট্টের সময়েও যখন বায়ুপুরাণ পাঠের প্রচলন ছিল বলে প্রাবন্ধিক জানাচ্ছেন এবং সেখানে গণেশের উদ্দেশে পিণ্ডদানের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে, তখন এ'টা নিশ্চয়ই স্পষ্ট যে বাণভট্টের অন্তত একশো বছর আগেই গণেশ উত্তর ভারতে পূজ্যপদ লাভ করেছেন।

প্রসঙ্গত, বায়ুপুরাণোক্ত গণেশ-সম্পর্কিত শ্লোকাংশটিকে যদি প্রক্ষিপ্ত বলে অনুমান করা হয়, তবে তার বিপক্ষে প্রাবন্ধিকের যুক্তি হল - এক, শ্লোকটি বায়ুপুরাণে পরে সংযোজিত কিনা এ নিয়ে তথ্যতল্লাশ করার দায়িত্ব প্রতিপক্ষের ওপরেই বর্তায়। দুই, বাণভট্ট-পূর্ব লেখকদের রচনায় গণেশের দেবত্বের উল্লেখ পাওয়া গেলে বায়ুপুরাণের ওই শ্লোকটিকে প্রক্ষেপ ভাবা তত সহজ নয়। উদাহরণ হিসেবে প্রাবন্ধিক দণ্ডীর দশকুমারচরিতের 'অদৃশ্যত স্বপ্নে হস্তিবক্ত্রো ভগবান্' শীর্ষক শ্লোকাংশটি উল্লেখ করেছেন। দণ্ডী বাণভট্ট-পূর্ব সময়ের (৫৯০ খ্রিঃ) কবি। এখানেও প্রশ্ন উঠতে পারে, যেহেতু দণ্ডীকে অনেকেই দাক্ষিণাত্যের কবি বলে মনে করেন, স্বভাবতই বিজয়চন্দ্রের বিচারে দক্ষিণভারতে গণেশের প্রথম পূজ্যপদবী লাভের সম্ভাবনাটিও এই সূত্রে যুক্তিগ্রাহ্যতা পেয়ে যায়। বিজয়চন্দ্রের মতে দক্ষিণেই গণেশপূজার প্রথম প্রচলন ঘটে, উত্তরভারতে বাণভট্টের কাদম্বরী-র কেবল একটি জায়গায় গণেশের অস্তিত্বমাত্র উপলব্ধ হয়। যদিও এই সিদ্ধান্তের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে সখারাম গণেশ বাণভট্টের-ই অন্য আরেকটি রচনা হর্ষচরিত থেকে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করে গণেশের উপস্থিতি প্রমাণ করেছেন। এ ছাড়া উত্তরভারতীয় নরপতি শ্রীহর্ষের নাগানন্দ নাটকের চতুর্থ অঙ্কেও গণেশের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।

খ। উত্তরভারতীয় রচনায় গণেশের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তাঁর দেবত্বের সুপষ্ট নিদর্শন নিয়ে প্রতিপক্ষের মনে যদি কোনও সংশয় জন্মায়, তার প্রত্যুত্তর হিসেবে প্রাবন্ধিক প্রাচীন কোষকাব্য অমরকোষের দ্বারস্থ হয়েছেন। বাণ ও শ্রীহর্ষের পূর্বকালীন উত্তরভারতীয় লেখক অমরসিংহের কোষগ্রন্থে চণ্ডিকার পরে এবং দেবসেনাপতি কার্তিকের আগেই একটি অষ্টনামযুক্ত গণেশ বিষয়ক শ্লোক পাওয়া যায়। বাণভট্টাদির সময়ে গণেশের অগ্রমুখ্যতা নাকি স্বীকৃত-ই হয়নি--- বিজয়চন্দ্রের এই বক্তব্য অমরকোষের প্রমাণের সূত্রেই প্রাবন্ধিক খারিজ করে দিয়েছেন। তদুপরি অমরসিংহ যদি কালিদাসের সমকালীনও হন, তাহলেও কালিদাসের রচনায় গণেশের অনুপস্থিতি দেখিয়ে তাঁর অস্তিত্বকে মোটেই অপ্রমাণ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে অমরসিংহের সময়কাল সম্পর্কে বহুবিধ বিতর্ক ও মতপার্থক্যের অবতারণা করে প্রাবন্ধিক অমরকোষকে পঞ্চম শতাব্দীর গ্রন্থ বলে স্বীকার করেছেন। এই গ্রন্থে হেরম্ব নামে গণেশ যখন সুচিহ্নিত, তখন হেরম্ব নামের উৎপত্তি যে গ্রন্থরচনার অন্তত এক শতাব্দী পূর্বেই হয়েছিল

এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না অর্থাৎ সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে গণেশের উদ্ভব যে চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতেই ঘটেছিল এ বিষয়ে একরকম নিশ্চিত হওয়া যায়। যদিও এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে অমরকোষের গণেশ বিষয়ক শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত কিনা সেটা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। প্রাবন্ধিক অমরকোষের অতি প্রাচীন টীকাকার কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের গুরু ক্ষীরস্বামীর লিখন-প্রবণতা এবং ভূমিকায় অমর-লিখিত 'সমাহৃত্যান্যতন্ত্রাণি' (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোষগ্রন্থসমূহের সারসংকলন করে আলোচ্য কোষগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন) শব্দের সূত্রে মনে করেছেন অমরসিংহের পূর্ববর্তী কোষগ্রন্থেও গণেশের হেরম্বাদি নামের উল্লেখ ছিল।

গ। বরাহপ্রণীত বৃহৎ সংহিতা-র সাক্ষ্যে ষষ্ঠ শতকে উত্তরভারতে গণেশের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। এই গ্রন্থের ৫৮ অধ্যায়ে দেবপ্রতিমালক্ষণ অংশে গণেশের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকভাবে বরাহের সময়কাল ৫০৫ খ্রিস্টাব্দ হলে এবং বিজয়চন্দ্র তাঁকে দক্ষিণ ভারতীয় গ্রন্থকার বলে না চালালে ৫০০ খ্রিস্টাব্দে যে উত্তর ভারতে প্রতিমা গড়ে গণেশের পূজা হত, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

ঘ। মহাভারতের আদিপর্বের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে গণেশের হেরম্ব, গণাধিপ, গণনায়ক প্রভৃতি নাম পাওয়া গেলেও বিজয়চন্দ্রের মতে ওই অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত বলে এর প্রমাণগুলিও পরিত্যাজ্য। যদিও প্রাবন্ধিক এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় এবং ইউরোপীয় চিন্তকদের মতামত উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, বর্তমান প্রচলিত মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়োক্ত গণেশের জন্মকাল খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকেরও পূর্ববর্তী। কাজেই, এই বিচার অনুসারে গণেশের বয়স 'অন্যূন ১৮ শতাব্দী' মনে হয়।

ঙ। বিজয়চন্দ্র স্কন্দপুরাণে গণেশের বিস্তৃত উপস্থিতি দেখে একে অষ্টম শতকের গ্রন্থ বলে সিদ্ধান্ত করলেও প্রাবন্ধিক তাঁর যুক্তি নস্যাৎ করে দেখিয়েছেন যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগেই বঙ্গদেশ থেকে গুপ্তাক্ষরে লিখিত স্কন্দপুরাণের একটি প্রতিলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। এরই সূত্রে মনে হয় মহারাষ্ট্র বা দক্ষিণাপথে সপ্তম শতকের বহুপূর্বে স্কন্দপুরাণ রচিত হয়েছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণও বাণের হর্ষচরিত রচনার সময়(৬২০ খ্রিঃ) উত্তরভারতে প্রচলিত ছিল। বায়ুপুরাণকেও খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের পরবর্তী বলে মনে করা অসঙ্গত। এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে প্রাবন্ধিক ভিনসেন্ট স্মিথের গ্রন্থপাঠের প্রস্তাব রেখেছেন। অতএব বিজয়চন্দ্র স্কন্দ, মার্কণ্ডেয়, বায়ু প্রমুখ পুরাণগুলিকে যতখানি পরবর্তী সময়ের বলে দাবি করেন, আদৌ সেগুলি তত 'আধুনিক'(পরবর্তীকালীন অর্থে) নয়। প্রসঙ্গত, বিজয়চন্দ্রের আরেকটি গুরুতর ভ্রান্তি সম্বন্ধে এখানে প্রাবন্ধিক সোচ্চার হয়েছেন। রাষ্ট্রকূট ও চালুক্য রাজাদের বিজয়ের পূর্বে নাকি দক্ষিণভারতে আর্যসংস্রব ঘটেনি-- বিজয়চন্দ্রের

এই বক্তব্য সর্বৈব ভুল। উপরন্তু এই বক্তব্যের সমর্থনে ভাণ্ডারকরের যে গ্রন্থকে তিনি সাক্ষী মেনেছেন, পাঠক খেয়াল করলেই দেখবেন তাতে স্পষ্টাক্ষরেই আছে যে, 'খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণাপথের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত সুশৃঙ্খল আর্য্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট ও চালুক্য রাজাগণ ইহার বহু শতাব্দী পরে দক্ষিণাপথ বিজয় করেন।' গণেশের 'আধুনিকত্ব' ও 'অনার্য্যত্ব' প্রতিষ্ঠায় অতি তৎপর বিজয়চন্দ্রের এই ঐতিহাসিক তথ্যভ্রান্তি প্রাবন্ধিকের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক মনে হয়েছে।

চ। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত গাথাসপ্তশতীর পঞ্চম শতকের তৃতীয় গাথায় হস্তীশুণ্ডধারী গণপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাবন্ধিক ভাণ্ডারকর ও ভিনসেন্ট স্মিথের সমর্থনে এই গ্রন্থের রচনাকাল ৪০ খ্রিস্টাব্দ ধরে গাথাসপ্তশতীর প্রমাণে গণেশের অস্তিত্ব প্রায় দু'হাজার বছরেরও বেশি, এমন প্রমাণ করছেন।

পৈশাচী প্রাকৃতে লিখিত অধুনালুপ্ত গুণাঢ্যের বৃহৎকথা খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর সংকলন বলে অনুমেয়। সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগর এই গ্রন্থ অবলম্বনেই সংকলিত হয়েছিল, যার ষষ্ঠ ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ তরঙ্গে গণেশপূজার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সূত্র থেকে এমন মনে হওয়া অসঙ্গত নয় যে মূল বৃহৎকথা থেকেই সোমদেব গণেশপূজা বিষয়ক অংশগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। বৃহৎকথার আবিষ্কার অনির্ণীত হওয়ায় এর সমসাময়িক গাথাসপ্তশতীর গণেশ প্রসঙ্গটিকে যদি গ্রহণ করা যায়, তাহলে সিদ্ধিদাতা গণেশের অস্তিত্ব 'দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।' অতএব গণেশের জন্ম যে এরও কত পূর্বে ঘটেছিল, সাল-তারিখের চিহ্নে তা প্রকাশ করা অসম্ভব। কারণ, গাথাসপ্তশতীর অব্যবহিত পূর্ববর্তী দু-তিনশো বা তিন-চারশো বছরের মধ্যে যেসব গ্রন্থ ভারতে রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও কাত্যায়নের বার্ত্তিক ছাড়া আর কোনও গ্রন্থই তেমন প্রচলিত নয়। কাজেই, এই দুই গ্রন্থে উল্লেখ না থাকলেই যে কোনও বিষয় অস্তিত্বহীন বিবেচিত হবে এমন নয়। ফলে প্রাবন্ধিকের বিচারে গণেশের আবির্ভাবকাল 'সার্দ্ধ দুই সহস্র বর্ষ' হওয়ায় খুব অস্বাভাবিক নয়।

৭। বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং চিন্তক অতুলচন্দ্র গুপ্তের *শিক্ষা ও সভ্যতা* গ্রন্থটি ১৩৩৩ (১৯২৩ খ্রি.) বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয়।[৪১] এই গ্রন্থান্তর্গত 'গণেশ' শীর্ষক প্রবন্ধটি গণপতি বিষয়ক বিশ শতকীয় সমালোচনা ধারায় এক ব্যতিক্রমী সংযোজন। এক্ষেত্রে গণেশের ধর্মমূলক পরিচয়ের পরিবর্তে সামাজিক শ্রেণি-সংঘর্ষের নিরিখে তাঁর অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে। হিন্দুর পূজা-পার্বণে বিঘ্নবিনাশক এবং সিদ্ধিদাতা রূপে যে গণেশ পূজিত হন, তাঁর বহিরায়ব লক্ষ করলেই দেখা যায় নরমুণ্ডের বদলে গণেশের মস্তক হিসেবে গজমুখ সংযোজিত। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের বিচারে এই ধরনের আবয়বিক সংস্থান যতই theri-anthropomorphic স্তরের আধা-মানুষ আধা-

পশুদেহযুক্ত দেবতার বৈশিষ্ট্যবাহী হোক না কেন, তথাকথিত anthropomorphic বা মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট দেবতাদের ভিড়ে হস্তীমুখ গণেশ যে স্পষ্ট এক ব্যতিক্রম, তা বলাই বাহুল্য। মানবমুণ্ডের স্থানে এই পশুমুণ্ড প্রতিস্থাপনের কারণ হিসেবে প্রাবন্ধিক পুরাণবর্ণিত কোনও আধ্যাত্মিক উপলক্ষ বা প্রেরণার নয়, বরং দ্বারস্থ হয়েছেন একটি সমাজ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির। বোঝা যায়, এই দৃষ্টিকোণ লেখকের মার্কসবাদী বীক্ষার প্রেরণাসঞ্জাত। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রেণিবিভক্ত সমাজের এক জটিল ঘাত-প্রতিঘাতময় সম্পর্কের বিন্যাস খেয়াল করেছেন। তাঁর মতে গণেশোৎপত্তির মূল যেহেতু প্রাচীন ভারতের কোনও উপজাতি বা জনজাতির টোটেম-ধারণা প্রসূত, ফলে নরমুণ্ডের বদলে গজমুখ প্রতিস্থাপনের প্রকল্পে dominant class বনাম subordinate class-এর একটি অন্তর্গত দ্বন্দ্ব কাজ করেছে। এক্ষেত্রে দেবতা গণেশ গণসংঘ অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ কমনার বা লোকসাধারণের প্রতিনিধিত্বকারী। সমাজপতিদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার তাগিদে এই বৃহত্তর অংশের প্রতিভূ গণেশকে মানবমুণ্ড খুইয়ে গজমুখ করা হয়েছে। তাঁর স্বাভাবিক স্বতঃপ্রকাশকে রুদ্ধ করে আধা-মানুষ আধা-পশুর বৈশিষ্ট্যযুক্ত করা হয়েছে। গণপতি সম্পর্কিত কোনও আধ্যাত্মিক তত্ত্বায়নের বদলে গজমুখ গণেশের এই মুণ্ডচ্ছেদের পৌরাণিক প্রকল্পটিকে প্রাবন্ধিক দেখতে চেয়েছেন একান্ত সমাজচিন্তামূলক অভিমুখ থেকে। কীভাবে গণেশকে গজানন করে রেখে তাঁর মানবায়নের সম্পূর্ণতায় ছেদ টেনেছে ক্ষমতাসীন শ্রেণি এবং এদের স্বার্থসিদ্ধির চক্করে গণেশেরও পূর্ণপ্রকাশ হয়েছে সীমিত, বর্তমান প্রবন্ধ সেই সমাজসত্যেরই দিগ্‌দর্শন করেছে। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারাংশ নিম্নরূপ:

ক। প্রাবন্ধিক প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের দৃষ্টান্ত সহ দেখিয়েছেন যে গণেশের ধারণার মূলে কর্মসিদ্ধির নয়, কর্মবিঘ্ন সৃষ্টিকারীর ভূমিকা কাজ করেছে। বিঘ্নকর্তাকে শান্ত রাখতে পূজার মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করা হয়েছে। যিনি ভয়ের কারণ, ভক্তির দ্বারা সেই তাঁকেই তুষ্ট করে কার্যসাধন করা হয়।

খ। গণেশের ধড়ে গজমুখ সংস্থাপনের মধ্যে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বা জনসংঘের প্রতি ক্ষমতাবান কেন্দ্রীয় অংশের একধরনের অবজ্ঞেয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই মানসিকতা প্রাচীন হিন্দুর একচেটিয়া নয়, সকল সভ্যতা ও সমাজের কর্তারাই জনসংঘকে 'লম্বোদর গজানন' ভেবেছেন। লম্বোদর হলেও তাঁকে বুদ্ধিহীন রেখে তাঁর 'বিরাট উদরের যতটা খালি রেখে সারা যায়', সমাজপতিরা নিয়ত সেই চেষ্টাই করেছে। কারণ তা না হলে 'যাদের কাঁধের উপর মানুষের মাথা, তাদের সুখ-সুবিধার উপকরণ অবশিষ্ট থাকে না'। ফলে দেহকাণ্ডের ওপর মানবেতর প্রাণীর মাথা চাপানোর মধ্য দিয়ে তাঁর 'মগজে মানুষের পরিবর্তে জানোয়ারের নির্বুদ্ধিতা' নিশ্চিন্তে ঢুকে গেছে। কখনও তাঁকে অঙ্কুশে ক্লিষ্ট হতে হয়েছে, কখনও বা স্তোকবাক্য শুনিয়ে তোষামোদ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, 'গণদেবতা' গণেশের এই দেহাবয়বের কল্পনা নিতান্ত অশোভন। এর মধ্যে কোনও নন্দনবোধ বা সৌন্দর্যকল্পনার অবকাশ তো নেই-ই, বরং একধরনের অবমানবসুলভ নিম্নতার বোধ কাজ করেছে। পৃথিবীর সব সমাজেই আধিপত্যকারী অংশ কৌশলে বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রান্তিক অংশকে সীমাবদ্ধ করে রাখে। এক্ষেত্রেও গজবদন গণেশকে আধা-মানুষ আধা-পশুদেহের মধ্যে আটকে রেখে তাঁর প্রকাশের সম্পূর্ণতাকে ব্যাহত করা হয়েছে, ঠিক যেভাবে প্রভুত্বকারী অংশ জনসংঘের সার্বিক অভ্যুত্থানকে চিরকালই খর্ব করতে চায়।

গ। জ্ঞানের শক্তি দ্বারাই গণেশের গজমুখের নরমুণ্ডে রূপান্তর সম্ভব। একমাত্র বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীই এই অসম্ভব সম্ভব করতে পারেন। কাজেই, গণদেবতার শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রধান কাজ 'এই দেবতাটির মাথার ভিতরে জ্ঞানের তড়িৎ সঞ্চালন করা'। গণসংঘ যে কেবল সভ্যতার ভারবহনকারী মাত্র নয়, তারাও যে সভ্যতার সুফলের ভাগীদার হতে পারে, সংখ্যাগরিষ্ঠ অবদমিত অংশের মধ্যে এই বোধের উন্মেষের জন্য জনসাধারণকে জ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

ঘ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই আধিপত্যকারী অংশের অন্তর্গত অল্প সংখ্যক মানুষ বহু সংখ্যক কমনারের অভ্যুত্থানকে এই যে কৌশলে চেপে রাখতে চেয়েছে, এর সঙ্গে লড়তে গেলে বিবেচনাপূর্বক এগোতে হবে। সাধারণ অংশের মধ্যে জ্ঞানের সঞ্চার কেবল বাহুবলী-ই করবে না তাদের, এর ফলে তারা প্রকৃতই চক্ষুষ্মান হয়ে উঠবে। চিনতে শিখবে ঠিক-বেঠিকের তফাত, ধরতে পারবে সমাজপতিদের স্বার্থপূরণের সবক'টা গোপন অন্ধি-সন্ধি। একমাত্র শিক্ষার প্রসারের দ্বারাই এই মানোন্নয়ন সম্ভব। শুধুমাত্র উদরপূর্তির প্রয়োজন পূরণটুকুই নয়, তাদের সভ্যতার যাবতীয় উৎকর্ষের সংস্পর্শে আনতে হবে। গণসংঘের এই অভ্যুত্থান সম্ভব হলে লোকসমাজের প্রতিভূ উদরসর্বস্ব গজমুখ গণেশও তাঁর হস্তীমুখ খসিয়ে নরদেহ লাভ করবে। সেদিন এই প্রান্তিক অংশের বিজয়লাভ নিশ্চিত।

৮। প্রবাসী পত্রিকায় বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের গণেশ বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি 'গণেশ' শিরোনামে ১৩৩৬ (১৯২৯ খ্রি.) বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় এবং দ্বিতীয়টি একই বছরে 'মূর্তিতত্ত্বে গণেশ' শিরোনামে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৪২] দুটি আলোচনাতেই লেখক কার্যত ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণেশের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং মূর্তিতত্ত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গের মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণের চুম্বকসার নিম্নরূপ:

ক। বিদ্যাভূষণের ‘গণেশ’ প্রবন্ধটি আরম্ভ হয়েছে পৌরাণিক গণপতির চরিত্রমহিমা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। পুরাণবর্ণিত গজানন গণেশ সিদ্ধিদাতা এবং বিঘ্নবিনাশক বলে আপামর ভক্তের যে কোনও কার্যের প্রারম্ভে তাঁর স্মরণ অনিবার্য। একমাত্র মৃতদেহ সৎকার বা দাহকার্য ছাড়া অন্যান্য শুভানুষ্ঠানে (ধর্মীয় কাজে, গ্রন্থ রচনাকালে, যাত্রার সূচনায়, ব্যবসায়ীর কর্মস্থলে) সিঁদুরলিপ্ত গণেশের অর্চন ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। প্রাবন্ধিকের মতে শ্রীকুলের বৈষ্ণব ছাড়া সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই পঞ্চদেবতার আদি দেবতা রূপে গণপতি স্বীকৃত। বঙ্গদেশে গণেশের একভক্ত সম্প্রদায়ের শক্তিবৃদ্ধি ততখানি না হলেও স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাসনায় গণেশ প্রথমপূজ্যের সম্মানলাভ করেছেন। প্রাবন্ধিক শিবপুরাণের জ্ঞানসংহিতার শ্লোক উদ্ধার করে স্বয়ং ত্রিদেবের মুখ দিয়ে সর্বাগ্রে গণেশ পূজার প্রমাণ পেশ করেছেন। ফলে আদিতে গণেশ বন্দনা শাস্ত্রসম্মত। লেখক এরপর রক্তিমাভ গণেশের গাত্রবর্ণ প্রসঙ্গে সিঁদুরের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন। বহুনামা গণপতি কেবল পুরাণসিদ্ধই নন, তন্ত্রমার্গেও সুপ্রতিষ্ঠ। বঙ্গদেশীয় শারদাতিলকতন্ত্রে একান্নটি গণেশ মূর্তির আলোচনা পাওয়া যায়। এমনকি বহির্বঙ্গীয় পুরাণ হলেও গণপতির বত্রিশটি রূপভেদ মুদ্‌গলপুরাণেও লভ্য। এঁরা বহুরূপেই কেবল নয়, গুণেও বিশিষ্ট। উদাহরণ হিসেবে লেখক চিত্রসহ ‘কেবল গণেশ’ বা ‘নৃত্ত-গণেশ’-এর সামান্য পরিচয় এবং উচ্ছিষ্ট গণেশের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

খ। কেবল গণেশ বা নৃত্য গণেশের আয়ুধের বর্ণনা করা হলেও তাঁর ধ্যানমন্ত্র পাওয়া যায়নি। এমনকি তাঁর প্রাচীন কোনও মূর্তি না পাওয়ায় গোপীনাথ রাও-এর গ্রন্থধৃত একটি গজদন্তনির্মিত নৃত্য গণেশের চিত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ দিয়েছেন। ক্রিয়াক্রমদ্যোতি এবং মন্ত্রমহার্ণব অনুসরণে লেখক উচ্ছিষ্ট গণেশমূর্তির পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর দেহবিভঙ্গ, আয়ুধ, গাত্রবর্ণ এবং দেবতা হিসেবে গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। গণেশের অঙ্কাসীনা নগ্না বিঘ্নেশ্বরী দেবী উচ্ছিষ্টের শক্তিরূপে কল্পিত। এ ছাড়া উত্তরকামিকাগম নামক তন্ত্রশাস্ত্রগ্রন্থের সমর্থনে উচ্ছিষ্ট গণেশমূর্তির অবস্থান, হস্তসংখ্যা, আয়ুধ এবং দেহরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও গ্রন্থলিখিত বর্ণনার সঙ্গে খোদিত গণেশমূর্তির বিশেষ পার্থক্য আছে বলে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন। এই অংশের শেষে ক্রিয়াক্রমদ্যোতি ও মন্ত্রমহার্ণব অনুসরণে সশক্তিক উচ্ছিষ্ট গণেশের ধ্যানমন্ত্র উল্লিখিত হয়েছে।

গ। গণেশোৎপত্তি বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, স্কন্দ, বরাহ, মৎস্য, শিব, লিঙ্গ, ভবিষ্য প্রমুখ পুরাণ এবং দক্ষিণভারতীয় তন্ত্রগ্রন্থ সুপ্রভেদাগমের উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী অংশে লেখক বহির্ভারতীয় ক্ষেত্রে গণেশ-সংস্কৃতির বিবরণ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে নেপাল, জাপান, শ্যামদেশ বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন মন্দিরে গণেশ মূর্তির অবস্থান আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে।

ঘ। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গণপতির ছয়টি প্রধান রূপ এবং তাঁদের পৃথক ছয়টি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রাবন্ধিক স্কন্দপুরাণোক্ত বারাণসীস্থিত ঢুণ্ডিরাজ গণেশ বা সাক্ষী-বিনায়কের কথাও জানিয়েছেন।

ঙ। পরের অংশে গণপতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। এক্ষেত্রে অমূল্যচরণ পূর্বোক্ত বিজয়চন্দ্র- রামেন্দ্রসুন্দর প্রতর্কের সূত্রে বিজয়চন্দ্রের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করেননি অর্থাৎ সরাসরি নাম না করেও গণপতির উদ্ভব সম্পর্কিত বিতর্কে তাত্ত্বিকভাবে অমূল্যচরণ রামেন্দ্রসুন্দর বা সখারাম গণেশ দেউস্করের পক্ষেই থেকেছেন। তাঁর বিচারে গজানন গণেশ ততখানি 'আধুনিক দেবতা'-ও নন। প্রাচীন সাহিত্য ও মূর্তিতত্ত্বের প্রমাণে তিনি গণেশকে যথেষ্ট পূর্বকালীন মনে করেছেন। ঋগ্‌বেদের গণ এবং গণপতি বিষয়ক ধারণার সঙ্গে হস্তীমুখ গণেশ বিসদৃশ হলেও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মন্ত্রপ্রমাণে তিনি বক্রতুণ্ড ও দন্তী রূপে আখ্যাত। কাজেই এই সূত্রটিকে মান্যতা দিয়ে প্রাবন্ধিক গণেশের প্রাচীনত্বের সমর্থন করেছেন।

চ। বিঘ্নবাচক ধারণা থেকেই গণপতির উদ্বর্তন ঘটেছে। বিশেষত বৌদ্ধধর্মে গণেশ প্রসঙ্গ আলোচনা করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। প্রাবন্ধিক এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধশাস্ত্র সাধনমালা থেকে বিঘ্নরূপী গণেশ এবং তাঁর বিঘ্ননাশের জন্য বিঘ্নান্তক নামের এক স্বতন্ত্র দেবতার সচিত্র উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি বৌদ্ধদেবী পর্ণশবরীর ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করে তাঁর লাঞ্ছন দেবতা হিসেবে বিঘ্নরূপ গণেশের উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া সাধনমালার বর্ণনা অনুসরণে গণপতির গাত্রবর্ণ, হস্তসংখ্যা, বাহন, মূর্তিবিভঙ্গ এবং ধ্যানমন্ত্রের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

ছ। বৌদ্ধধর্মে বিঘ্নরাজ রূপে যেমন গণেশের প্রতিষ্ঠা, তেমনি বেদের অব্যবহিত পরবর্তী সূত্রসাহিত্যের স্তরেও বিনায়ক রূপে গণেশ বিঘ্নপ্রদ দেবতা। প্রাবন্ধিক মানবগৃহ্যসূত্র ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার অনুসরণে এই বিঘ্নেশ গণপতির বিঘ্নসৃষ্টির বর্ণনা করেছেন। একদা বিঘ্নকর্তা রূপে যিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন, স্তব-স্তুতির মাধ্যমে তাঁর বিঘ্নসংঘটনের ক্ষমতা কমিয়ে, তাঁকে সন্তুষ্ট করে বিঘ্নহর্তায় পরিণত করা হয়েছে। ফলে বিঘ্নের স্তর থেকেই গণেশের অবিঘ্ন বা মঙ্গলময় দেবতার স্তরে উত্তরণ বলা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অমূল্যচরণের 'মূর্তিতত্ত্বে গণেশ' প্রবন্ধটি কার্যত ভারতব্যাপী গণেশের রূপভেদ, মূর্তি এবং মন্দিরের তথ্যমূলক সংকলন। এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের নিম্নরূপ:

ক। গণের অধিপতি হওয়ায় গণেশ সার্থকনামা। যদিও যক্ষগণের তালিকায় গজমুখ গণেশ অনুপস্থিত। তবে গণেশের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যক্ষের সামীপ্য লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত, জার্মান পণ্ডিত শেরমানের নামোল্লেখ করে

প্রাবন্ধিক তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের (গণেশকে যক্ষকুলোদ্ভব মনে করে তাঁর যক্ষত্বের প্রমাণ বিষয়ক গবেষণা) । গণেশ খর্বদেহ এবং স্থূলোদরবিশিষ্ট হওয়ায় যক্ষের সঙ্গে এই সামঞ্জস্য আরও চোখে পড়ে। পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে 'সুন্দর' বললেও এমন অবয়ব নিতান্ত বেমানান। গণেশের বিভিন্ন নামের সূত্রেও তাঁর গণাধিপত্যের ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হয়। যেমন, বিনায়ক, গণপতি প্রমুখ। গণেশ বিশেষভাবে শিবগণ। কারণ, শিবগণদের মুখ ও কান হাতি ও গরুর মতো অর্থাৎ আধ-মানুষ আধা-পশুদেহযুক্ত গণেশের সঙ্গে অন্যান্য শিবগণদের একটা বাহিরঙ্গিক সাদৃশ্য বোঝা যায়। আবার, বিঘ্নেশ নামের সূত্রে গণেশ দেবশত্রু অসুরদের বিঘ্ন-উৎপাদী।

খ। ভারতীয় প্রেক্ষিতে গুপ্ত-পূর্বযুগে গণেশমূর্তির বিশেষ কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি। প্রাবন্ধিক এই প্রসঙ্গে দেওগড় ও ভূমরের গণেশমূর্তির দৃষ্টান্ত টেনেছেন। এই ধরনের মূর্তির পূর্বসূত্রের সন্ধানে লেখক যাজ্ঞিকী উপনিষদোক্ত শুঁড় ও দাঁতযুক্ত এক হাতিমুখ দেবতার উল্লেখ করেছেন। এই সাহিত্যপ্রমাণ ছাড়া অমরাবতীর মূর্তিপ্রমাণেও হস্তীমুখ, খর্বদেহ, পুষ্পমাল্যধারী যক্ষদের আবয়বিক সংস্থানের মধ্যে হস্তীমুখ গণেশের গুপ্তযুগীয় মূর্তিকল্পনার পূর্ববীজ থাকতে পারে। এরই সূত্রে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে গণেশের বিশিষ্ট দেহাবয়বের কল্পনা বৈদিক ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি নয়। যক্ষকুলোদ্ভব রূপেই তাঁকে বিবেচনা করা সমীচীন।

গ। পরবর্তী 'গণেশ-মন্দির' শীর্ষক উপবিভাগে প্রাবন্ধিক ভারতের নানা প্রদেশের গণেশ মন্দির এবং গণেশমূর্তির উল্লেখ করেছেন। অঞ্জনেরীর নিম্নদেশস্থ নানা আকারের ভগ্ন গণেশমূর্তির নিদর্শন থেকে শুরু করে রাজপুতানার উদয়পুরের ভৈঁসরোরগড়ে, মাদ্রাজের চিদাম্বরমে, গোয়ালিয়র দুর্গের তেলি-মন্দিরে, উড়িষ্যার কটকের যাজপুর সাবডিভিসনের বরিউনিবুন্ত পাহাড়ের শৃঙ্গদেশে, মধ্যপ্রদেশের সুরগুজা স্টেটে রামগড় পাহাড়ে, ত্রিচিনোপলির পর্বতে, বোম্বাইয়ের চন্দোরদুর্গ পাহাড়ের খননকৃত জৈনগুহায়, হুলিতে, বগেবদি উপত্যকায়, এরগুলে, সপ্তশৃঙ্গ ও তওগাঁও-এ, পুণা জেলার চিন্চোয়াড় গ্রামে, পুণা মগধে ব্রাহ্মণ্য ভগ্নাবশেষে, গয়ার বরাবর পাহাড়ে এবং কাশ্মীরের অবন্তীপুর গ্রামে গণেশ মন্দির এবং মূর্তির বিবরণ দিয়েছেন। এ ছাড়া বঙ্গদেশে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে রামসাহী দেব ও তাঁর ভাই যে পাঁচ-ছয়টি গণেশ মন্দির নির্মাণ করেছিল, প্রাবন্ধিক সেই তথ্যও পেশ করেছেন। এই উল্লেখগুলি থেকে সমগ্র ভারতব্যাপী গণপতির প্রাধান্য এবং প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়।

ঘ। বঙ্গদেশীয় শারদাতিলকতন্ত্রে গণেশের পঞ্চাশটি রূপভেদ শক্তিসহ উল্লিখিত হয়েছে। যদিও তাঁদের পৃথক পৃথক মূর্তির ধ্যানমন্ত্র পাওয়া যায়নি। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক উদ্দিষ্ট তন্ত্রগ্রন্থের সম্পূর্ণ তালিকাটিই (পাদটীকায় মূল শ্লোকগুলি সন্নিবিষ্ট) উদ্ধার করেছেন। যদিও ভারতীয় পুরাণকথায় গণেশের বা তাঁর শক্তির এতগুলি নাম পাওয়া

যায় না। প্রসঙ্গত, গণেশের নামে পরিচিত 'গণেশাথর্বশীর্ষ-উপনিষৎ'-এও গণেশের এই বহুপ্রকারভেদ নেই। প্রাবন্ধিকের মতে গণেশাথর্বশীর্ষ উপনিষদ আদৌ কোনও প্রাচীন রচনা নয়। অগ্নিপুরাণে অবশ্য গণেশের গায়ত্রী, পূজাপদ্ধতি, পবিত্রারোহন মন্ত্র এবং গণেশের আটটি প্রকারভেদ ও তাঁদের অষ্টশক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঙ। প্রাবন্ধিক পূর্ববর্তী রচনায় কেবল-গণেশ ও উচ্ছিষ্ট গণেশের পরিচয় দিয়েছেন বলে আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি গণেশের অন্যান্য রূপভেদগুলির বিবরণ দিয়েছেন। এঁরা হলেন মহাগণপতি, লক্ষ্মী-গণেশ, প্রসন্ন-গণেশ, হেরম্ব-গণেশ এবং নৃত্ত-গণেশ। এই অংশের রচনায় প্রাবন্ধিক বিশিষ্ট লিপিবিশেষজ্ঞ ও পুরাতত্ত্ববিদ H. Krishna Sastry-র *South Indian Images of Gods and Goddesses* (1916) এবং মান্য পুরাতাত্ত্বিক ও লিপিতত্ত্ববিদ T. A. Gopinatha Rao-এর *Elements of Hindu Iconography* (1914) গ্রন্থদুটির সাহায্য নিয়েছেন। গণেশের প্রত্যেক রূপভেদ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের অঙ্গসৌষ্ঠব, গাত্রবর্ণ, মূর্তিবিভঙ্গ, হস্তসংখ্যা, আয়ুধ, বাহন এবং ধ্যানমন্ত্রের সচিত্র পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখসূচি :

১। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *কোমল-কবিতা (প্রথম ভাগ),* কাটোয়া : কাটোয়া এড্ওয়ার্ড প্রেস (জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত), ১৩১৭ ব., পৃ. ২

২। দেবেন্দ্রনাথ সেন, *গণেশ-মঙ্গল,* কলকাতা : নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস (জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত), ১৩১৯ ব., পৃ. ৫-১৬

৩। গোরা সিংহরায়, সম্পাদক, 'ভূমিকা', *দেবেন্দ্রনাথ সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* ভারবি, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৮

৪। অধীশ চন্দ্র সাহা, *দেবেন্দ্রনাথ সেন : জীবনী ও কাব্যবিচার,* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি (বাংলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা গ্রন্থ, ১৯৮০, পৃ. ১৩১

দ্রষ্টব্য: http://hdl.handle.net/10603/73440 accessed on 17. 11. 2020

৫। জয় গোস্বামী, *কবিতা সংগ্রহ* (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২৬০

৬। রূপক চক্রবর্তী, *যখন মহাভারত লিখছিলাম,* আনন্দ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৫৮

৭। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, 'গণেশ', *উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র,* সুনীল জানা সম্পাদিত, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ২০৬

৮। ওই, পৃ. ২০৬

৯। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বুড়ো আংলা', *অবনীন্দ্র রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা: প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৫৮, পৃ. ১৮৬-১৮৭

১০। ওই, পৃ. ১৮৭

১১। ওই, পৃ. ১৮৮

১২। বনফুল, 'গণেশ জননী', *বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা: বাণীশিল্প, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৬৪

১৩। ওই, পৃ. ১৬৪

১৪। ওই, পৃ. ১৬৫

১৫। ওই, পৃ. ১৬৫

১৬। মহাশ্বেতা দেবী, ‘শ্রী শ্রী গণেশ মহিমা’, *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র* (দশম খণ্ড), কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, মাঘ ১৪১৯, পৃ. ৪২

১৭। ওই, পৃ. ৪৩

১৮। ওই, পৃ. ৪৩

১৯। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, ‘জার্মান গণেশ’, *জার্মান গণেশ,* কলকাতা: আনন্দ, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ৭-২৪

২০। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, ‘গণেশের মূর্তি’, *ঝাড়ি কুড়ি গল্প,* কলকাতা: পত্রভারতী, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৯-১৬

২১। সত্যজিৎ রায়, ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’, ফেলুদা সমগ্র ১, কলকাতা: আনন্দ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৪৩০-৪৯৫

২২। অদ্রীশ বর্ধন, ‘অষ্টধাতুর গণেশমূর্তি’, *গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্র সমগ্র* ৫, কলকাতা: নাথ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১৪২-১৫৪

২৩। চিত্রা দেব, *সিদ্ধিদাতার অন্তর্ধান,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ৯-১০৮

২৪। ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, *সোনার গণপতি হীরের চোখ,* কলকাতা: আনন্দ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, পৃ. ৯-২১৯

২৫। স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ‘গণেশ’, *পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: আনন্দ, নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ৯১-১০২

২৬। অরুণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, *গণেশ,* কলকাতা: আনন্দ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৩

৩৩। চন্দ্রনাথ বসু, ‘‘সিদ্ধিদাতা গণেশ’’, *ত্রিধারা,* কলকাতা : বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী থেকে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রকাশিত, ১২৯৭ ব., পৃ. ৯১-৯৬

৩৪। ওই, পৃ. ৯৬

৩৫। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, “সিদ্ধিদাতা গণেশ”, *নবপর্য্যায়-বঙ্গদর্শন*, তৃতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১০ ব., পৃ. ৩৮৭-৩৯১

৩৬। ওই, পৃ. ৩৯১

৩৭। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, “গণেশপূজা”, *রামেন্দ্র-রচনাবলী* (ষষ্ঠ খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, চৈত্র ১৩৬৩, পৃ. ১২১

৩৮। প্রাগুক্ত, “গণেশের পূজা”, দ্বাদশ সংখ্যা, চৈত্র, পৃ. ৬০১-৬০২

৩৯। প্রাগুক্ত, “গণেশ প্রসঙ্গ”, পৃ. ১২৩-১২৫

৪০। সখারাম গণেশ দেউস্কর, “সিদ্ধিদাতা গণেশের বয়স”, *আর্য্যাবর্ত* (প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড), হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত, কলকাতা : দুর্গানাথ বসু প্রকাশিত, ১৩১৭ ব., পৃ. ২৩২-২৪১

৪১। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, “গণেশ” (‘শিক্ষা ও সভ্যতা’), *অতুলচন্দ্র গুপ্ত রচনা সংগ্রহ*, আনন্দ, আগস্ট ২০১০, পৃ. ৬৬-৬৮

৪২। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, “গণেশ”, *প্রবাসী*, ২৯শ ভাগ, ২য় খণ্ড, কার্তিক ১৩৩৬ ব., পৃ. ১৪৬-১৫১

৪৩। ওই, “মূর্তিতত্ত্বে গণেশ”, পৌষ ১৩৩৬ ব., পৃ. ৪৩৭-৪৪৩

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্গসংস্কৃতির নানা পরিসর এবং গণপতি

এ পর্যন্ত আমরা বঙ্গদেশের ধর্ম-সমাজ ও সাহিত্যের ঐতিহ্যে গণপতি এবং তদ্বিষয়ক প্রসঙ্গের রূপায়ণ লক্ষ করেছি। সাহিত্যক্ষেত্রেই কেবল নয়, সংস্কৃতির অন্যান্য প্রকরণেও সিদ্ধিদাতা গজমুখের গ্রহণযোগ্যতা স্বীকৃত। গণপতি-গণেশ স্মার্ত হিন্দুর ধর্মজীবনে প্রাসঙ্গিক যতখানি, সংস্কৃতির অন্যান্য পরিসরেও তিনি একইভাবে আদৃত। লোকশিল্পের বিভিন্ন উপকরণে, ছৌ প্রভৃতি লোকনৃত্যের প্রারম্ভিক পর্যায়ে বন্দনা-নৃত্যের মধ্যে, পটচিত্রকলায়, এমনকী ধ্রুপদী চিত্রকলাতেও গণপতি সমান অর্থে প্রাসঙ্গিক। হিন্দুর দেবায়তনে গণেশ ছাড়া বোধহয় আর কোনও দেবতা নেই যিনি গৃহসজ্জার উপকরণ থেকে মাঙ্গলিক দ্রব্যে, প্রসাধন-বিশ্ব থেকে অলংকার-সজ্জায়, পোশাক-পরিচ্ছেদ থেকে শিল্পচর্চার অন্দরমহলে এত তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। সংস্কৃতির প্রায় সমস্ত প্রকরণে এই অন্তর্ভুক্তির কারণ সম্ভবত ওই বিশেষ আকর্ষণীয় দেহসৌষ্ঠব এবং ভাবরূপের মধ্যে থাকা এমন একটি সারল্যের উদ্ভাস, যার সঙ্গে ভক্ত-সাধারণ সহজেই সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। দেবতা বলতেই যে ভয়-ভক্তিমিশ্রিত একটা দূরত্বের বোধ অনেকের মধ্যেই কাজ করে, গণেশের সহজ স্বাভাবিক প্রকাশরূপের ক্ষেত্রে সেটা অনায়াসেই অতিক্রান্ত হয়ে যায়, যে কারণে শিশু-মনস্তত্ত্বের সঙ্গেও গণেশের অবারিত সংযোগ। এককথায় বাল গণেশ বাংলার সংস্কৃতি-শিল্পে এতই অমোঘ যে, একমাত্র কৃষ্ণ বা গোপাল ছাড়া তাঁর আর কোনও দ্বিতীয় প্রতিযোগী পাওয়া দুষ্কর। গণেশ সর্বত্রগামী এবং সহজসাধ্য বলেই শিল্পের বিভিন্ন প্রকরণে হরেককিসিমের মুদ্রায়, বিচিত্র সব ভঙ্গিতে তাঁর রূপদান করা সম্ভব। এই ধরনের রূপায়ণ সবসময়ই যে শাস্ত্রীয় ধাঁচা মেনে হয়, তা নয়, অনেকক্ষেত্রেই শিল্পীমনের কল্পনা মিশে থাকে এর গড়নে। দেহসৌষ্ঠবের চমৎকারিত্বই হোক বা ভোজনপটুতা, সুরলোকের আঙিনাই হোক বা ব্যবসার কারবারি বুদ্ধি--- গণেশের ভাবমূর্তির সঙ্গে বাঙালির আবেগের একটা সহজ সেতুবন্ধন হয়েই যায়। স্থূলত্বের ভার ডিঙিয়েও এক দেবতা বাঙালির নন্দনলোকে স্থায়ী আসন পেতে বসেন। নিরন্তর ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে তাঁর দেহকাণ্ড হয়ে ওঠে শিল্পের সামগ্রী। গণেশের মতো এতখানি flexible বোধহয় আর কোন দেবতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর মধ্যে 'সর্বজনপ্রযোজ্য' হয়ে ওঠার এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা শিল্পকর্ম-নির্বিশেষে সিদ্ধিদাতার অনিবার্য উপস্থিতির নেপথ্যকারণ। গণেশ যে 'কলাপতি', তা তো ওই 'কলাবউ'-এর পতি বা স্বামী অর্থে নয়, আসলে চৌষট্টি কলার অধিপতি তিনি। ললিতকলা বা Fine arts-এর যে কোনও শাখাতেই তিনি পরমপূজ্য। শাস্ত্রীয় নৃত্য থেকে লোকনৃত্য, সর্বত্রই বিঘ্নবিনাশকের বন্দনার মাধ্যমেই শুভসূচনা ঘটে।

আবার, বাঙালির ব্যবহারিক জীবনে গণেশ এই হারে মানবায়িত হয়েছেন যে আদিদেবের আভিজাত্য খুইয়ে একেবারে বিপরীত ব্যঞ্জনায় চিহ্নিত করা হয়েছে তাঁকে। যেমন, 'গোবর গণেশ' শীর্ষক বাগধারাটি লক্ষ করলে

দেখা যাবে, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ গণেশকে এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে বোধবুদ্ধিহীন বলা হয়েছে। নির্বোধ শব্দটি মোটা মাথা হিসেবেও সাধারণ্যে প্রচলিত। শরীরিক বৈশিষ্ট্যে গজমুখ ও স্থূলদেহবিশিষ্ট হওয়ায় তাঁর সঙ্গে তুলনীয় করে জনৈক ব্যক্তিকে গোবর গণেশ বলা হয়েছে। সম্ভবত বাঙালিদের মধ্যে এমন ধারণা প্রচলিত যে, স্ফীতকায় মানুষমাত্রেই স্বল্পবুদ্ধি ও বিবেচনাহীন হন। আশ্চর্যের বিষয়, দৈহিক স্ফীতির সাদৃশ্যে এরা নির্বোধের তকমা পেয়েছেন। অথচ, যাঁর সঙ্গে তুলনীয় করে কোনও বুদ্ধিহীন মানুষকে গোবর গণেশ বলা হবে, দেবমণ্ডলে তিনি বুদ্ধিদাতা এবং পরমজ্ঞানীরূপে স্বীকৃত। কাজেই, ভাবসাযুজ্যে একেবারে বিপরীত বয়ান উঠে এসেছে বাগধারাটির মধ্য দিয়ে। এ ছাড়া আমবাঙালির বাণিজ্য জীবনের সঙ্গে সিদ্ধিদাতার সংযোগ টের পাওয়া যায় 'ব্যবসায় গণেশ উলটানো'-র মতো বাগধারার সূত্রেও। এর মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক লাভালাভের সঙ্গে গণেশের সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে। আমরা জানি, তিনি সাফল্য ও সমৃদ্ধির দেবতা। কোনও কারণে ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দিলে বা আর্থিক বিপর্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসাদারের গণেশ উলটেছে বলে বিশ্বাস করা হয়। গণেশ ব্যবসা বা অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত যে কোনও ক্ষেত্রেই সৌভাগ্যের প্রতীক বলে গণ্য হন। ব্যবসার গদিতে প্রায় গ্যাঁট হয়ে বসে থেকে তিনি যেন সমস্ত বিপদ থেকে কারবারটিকে রক্ষা করছেন। কখনও অলাভজনিত কারণে পরিস্থিতি বদলালে ব্যবসাদারের পক্ষে তা অমঙ্গলসূচক বলে তার 'গণেশ উলেটেছে' এমন মনে করা হয়। গেরস্থালি

এই পর্যায়ে আমরা শিল্প-সংস্কৃতির নির্বাচিত কয়েকটি ক্ষেত্রে গণেশের উপস্থাপনার বৈচিত্র্য ও প্রবণতাগুলিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। এর বাইরে থেকে গেছে হস্তশিল্পের বিবিধ সামগ্রী, গেরস্থালির দৈনন্দিন সরঞ্জাম, পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং অলংকারের বহুবিচিত্র নির্মাণে গণপতি-গণেশের প্রাণবন্ত উপস্থিতির আরও কত চিহ্ন।

লোকশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম ও গণপতি

ক. ঝাড়খণ্ড থেকে পুরুলিয়া হয়ে ক্রমশ পশ্চিমদিকে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, 'বীরভূম' প্রভৃতি অঞ্চল ডোকরা শিল্পের বিস্তৃত ক্ষেত্র। গত কয়েক দশক ধরে বাঁকুড়া ও বীরভূমের কয়েকটি গ্রামের ডোকরা শিল্পীরা অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের পাশাপাশি হরেকরকম গণেশের মূর্তি তৈরি করছেন। বাজারে এদের চাহিদাও প্রচুর। টেরাকোটার গণেশের থেকে ডোকরার গণেশ নির্মাণের ঐতিহ্য আরও প্রাচীন। অনেকের মতে, ডোকরা শিল্পের মূল যোগ আদিবাসী সমাজের লোকাচারের সঙ্গে। যদিও ডোকরা শিল্পীদের নির্মাণের ভুবন এখন আর শুধু ছোটো ছোট গণেশ ঘট বা একচালির গণেশ বানানোতেই আটকে নেই, ক্রেতাদের রুচি অনুসারে বিচিত্র সব মুদ্রায় আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যে তারা হাজির

করছেন সিদ্ধিদাতাকে। ছাতা-মাথায় কোঁচানো ধুতি পরা বাবু গণেশ থেকে নানা ভঙ্গিতে বাদ্যরত গণেশ পর্যন্ত এদের শৈল্পিক দক্ষতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এর কারণ, পরিবর্তিত সময়ে দেবতার মূর্তি বা বিগ্রহ কেবল ঠাকুরঘরের-ই সামগ্রী নয়, গৃহসজ্জার উপকরণেও পরিণত হয়েছে। কাজেই, ধর্মীয় পরিসরের বাইরে জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এর একটা অন্য গুরুত্ব আছে।[১] আগেই বলেছি, গণেশের দেহবৈশিষ্ট্যে অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক পশুর ভাব থাকায় শিল্পের যে কোনও মাধ্যামেই তাঁকে বিচিত্র অবয়বে উপস্থিত করা যায়। বেশিরভাগ নরাকার দেবতার ক্ষেত্রেই এই জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব হয় না। গজমুখ, একদন্ত, লম্বোদর গণেশের ভাবমূর্তির মধ্যে এই যে একধরনের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত চলমান জীবনের ছন্দ খুঁজে পাওয়া যায়, সেটাই তাঁর গ্রহণযোগ্যতার সবচেয়ে বড়ো কারণ। দেহের যে কোনও আয়তনে, হাত-পায়ের যে কোনও ভঙ্গিতে বা মুদ্রায় গণেশ এতই মানানসই যে শিল্পের নন্দনবোধ অক্ষুণ্ন রেখেও তাঁকে সব রকমের আকার দেওয়া যায়। যে কোনও প্রকাশমাধ্যমে তাঁর flexibility প্রশ্নাতীত বলেই জনাদর এত বেশি। তবে উপস্থাপনের ধরনে নতুনত্বের আমদানি যতই থাক, গণপতির ঐতিহ্যাগত বৈশিষ্ট্যগুলি সবসময়েই অপরিবর্তিত থাকে। ডোকরা শিল্পে কিছু ক্ষেত্রে তাঁকে আসনমূর্তিতে দেখা যায়, বদ্ধ পদ্মাসনে বা অর্ধপর্য্যঙ্কাসনে। (চিত্র ৪২) এই ধরনের চতুর্ভুজ মূর্তিকে আমরা 'গণেশ-নারায়ণ' বলতে পারি। ইতোপূর্বেই দেখেছি, বঙ্গদেশের ধর্মীয় ঐতিহ্যে *দেবীপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত* বা *মহাভাগবতপুরাণ*-এর দৌলতে বিষ্ণুপুত্র বা বিষ্ণু-কৃষ্ণের দ্বিতীয় মূর্তি হিসেবে গণেশের একটা স্বতন্ত্র identity রয়েছে। লোকশিল্পের অন্দরে সেই পুরাণ-প্রভাব এসেছে পরম্পরার সূত্রেই, সচেতনভাবে নয়। বাংলার গাঁ-গঞ্জ থেকে শহরের বারোয়ারি দুর্গাপূজায়, চারহাতের লালরঙা গণেশ, গজমুখ ও লম্বোদরের বৈশিষ্ট্যটুকু বাদ দিলে ঠিক যেন বিষ্ণুরই প্রতিরূপ। কুঠার-পাশ-অঙ্কুশ বা মোদকে নয়, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের পরিচিত হস্তভূষণেই বাংলার গণেশকে চিনি আমরা। ডোকরার কাজে এই ধরনের প্রথাগত মূর্তিতে গণেশকে যেমন পেয়েছি, তেমনই আছেন দুই হাতের প্রহরারত গণেশ। ঠিক যেন দ্বারপাল। হাতে ত্রিশূল নিয়ে দণ্ডায়মান। গণেশের এই ধরনের স্থানক মূর্তিতে অবশ্য শিবের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা চোখে পড়ে। (চিত্র ৪৩) এ ছাড়া আছেন মূষিকপৃষ্ঠে নৃত্যরত গণপতি। প্রাচীন বাংলায় ছয় বা আট হাতের নৃত্যগণেশের প্রস্তরমূর্তি অনেক পেয়েছি আমরা। ডোকরাশিল্পে অবশ্য গণেশের বেশিরভাগ নৃত্যমূর্তিই চারহাতের। (চিত্র ৪৪) এই চিরাচরিত উপস্থাপনার বাইরে আছে বিচিত্রভঙ্গির গণপতির আশ্চর্য সব উদাহরণ। কোথাও তিনি সানাই বাজাচ্ছেন। (চিত্র ৪৫) কোথাও বা বাঁ-হাত মাথার পেছনে রেখে টান টান হয়ে লম্বালম্বিভাবে শুয়ে ডান হাতে বই ধরে পড়ছেন। (চিত্র ৪৬) এই বিশেষ sleeping posture-এর সূত্রে

অনন্তশয্যায় শায়িত লক্ষ্মীপতি নারায়ণের যোগনিদ্রার অনুষঙ্গ মনে আসে। বাংলার গণেশ-নারায়ণের পরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য ক্ষেত্রে অবয়বের নিরিখে তিনি বিষ্ণুসদৃশ। হস্তধৃত 'পুস্তক'-এর সূত্রে অবশ্য গণেশ হিসেবেই বিশেষ। কারণ, পাণ্ডুলিপি, পুথি বা লেখনীর সঙ্গে গণপতির সংস্রব অবধারিত। লক্ষণীয়, যে যে গুণের বিভায় পৌরাণিক গণেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, রূপায়ণের যাবতীয় রকমফের সত্ত্বেও তাঁর ভাবমূর্তিতে recurring motif হিসেবে সে'গুলিই ফিরে ফিরে আসে। পাখা হাতে জিরোচ্ছেন, এমন স্বাভাবিক জীবনছন্দে ভরপুর গণেশ-ও ডোকরাশিল্পে পাওয়া যায়। (চিত্র ৪৭) মোট কথা, শিল্পনির্মাণের হাজারও ধরনে গণেশের রূপাঙ্কন হয়েই চলে। এ ছাড়া বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির গণেশেরও বেশ চাহিদা রয়েছে। (চিত্র ৪৮) ঘর সাজানোর উপকরণ হিসেবে এগুলি ব্যবহৃত হয়। টেরাকোটার গণেশ অবয়বগতভাবে সাধারণত চতুর্ভুজ, গজমুখ ও লম্বোদর হয়ে থাকে। তবে হাতগুলি আয়ুধশূন্য হয়। পায়ের দিকটাও স্পষ্ট নয়। মূর্তিগুলি বসানোর জন্য দেহের নিম্নভাগে পোড়ামাটির একটি অর্ধগোলাকার অংশ করা থাকে।

খ. বাংলার বিবিধ লোকশিল্পের অন্যতম উজ্জ্বল অংশ পুতুলশিল্প। পূর্ব বর্ধমানের নতুনগ্রাম নানা রংয়ের কাঠের পুতুল তৈরির জন্য বিখ্যাত।[২] সাদা টিক গাছের কাট কেটে, পরিষ্কার করে, সেগুলিকে খোদাই করে নানারকম পুতুলের আকার দেওয়া হয়। এরপর পুতুলের গায়ে করা হয় অপূর্বসুন্দর নকশা। শেষে জৈব রংয়ের সাহায্যে পুতুলের গা রাঙানো হয়। পুতুল নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেকসময় ধর্মীয় বিষয়বস্তু প্রাধান্য পায়। রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন সংগঠনের তরফে আয়োজিত নানা ধরনের মেলা বা প্রদর্শনীতে এইসব পুতুল বানানোর কারিগরেরা তাদের শিল্পসামগ্রী নিয়ে হাজির হন। একসময় কালীঘাট ও নবদ্বীপেও এই পুতুল বিক্রি হত। নতুনগ্রামের কাঠের পুতুলের মধ্যে গণেশমূর্তি বিখ্যাত। (চিত্র ৪৯) শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য মেনেই এরা চতুর্ভুজ কাঠের গণেশমূর্তি নির্মাণ করেন। গাত্রবর্ণ-ও নিয়ম অনুযায়ী উজ্জ্বল লাল রংয়ের হয়ে থাকে। গজমুখটি সাধারণত সাদা করা হয়। তাঁকে খর্বদেহ, লম্বোদর ও একদন্ত হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়। দেহের ওপর অংশ নিরাবরণ। কেবল কাঁধের পাশ দিয়ে রঙিন উত্তরীয় আঁকা হয়। গলায় মালা পরানো থাকে। মাথায় মুকুট পরিহিত। গণেশ-পুতুলের চারটি হাত থাকলেও হাতে কোনও অস্ত্র আঁকা হয় না। গাঢ় উজ্জ্বল রং-রেখায় পুতুলগুলিকে সাজানো হয় বলে ক্রেতার কাছেও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

গ. দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মজিলপুরের মাটির পুতুলের সম্ভারেও সিদ্ধিদাতা গণেশ পরিচিত উদাহরণ।[৩] টানা টানা চোখ, গোলগাল গড়নের সাবেক বাংলার পুতুল। দুই প্রকার পুতুল দেখা যায়, হাতে তৈরি এবং ছাঁচের।

বর্তমান চিত্রে চার হাতের গজমুখ গণপতি মৃত্তিকানির্মিত। (চিত্র ৫০) পরে পরিবেশবান্ধব রঙের সাহায্যে এদের রঙিন করে তোলা হয়। একটি ছোটো বেদীর ওপর গণেশ বদ্ধপদ্মাসনে বসে আছেন। সাধারণত মজিলপুরের মাটির গণেশের আসনমূর্তিই দেখা যায়। মাথার ওপর গোলাপি রং ও কালো রেখায় নির্মিত জ্যোতির্বলয়। দেহবৈশিষ্ট্যে তিনি লম্বোদর। ভুঁড়ির ওপর দিয়ে একটি সরু সাদা পৈতে আঁকা। হাতগুলি যথারীতি আয়ুধশূন্য। লাল, হলুদ ও সবুজ রঙ এইসব মূর্তির ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। একক গণেশমূর্তি ছাড়াও মজিলপুরের গণেশজননীর মূর্তি বিখ্যাত। শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে বসে থাকা সহাস্য জননীর রূপাঙ্কনে বাৎসল্য রস প্রকাশিত হয়েছে।

ছৌ ও গণপতি

আগেই বলেছি, বিঘ্ননাশক গণেশের বন্দনা-নৃত্য ছাড়া যে কোনও উপস্থাপনযোগ্য শিল্পমাধ্যমেরই নান্দীমুখ সম্ভব নয়। বাংলার সুদীর্ঘ ঐতিহ্যলালিত ছৌ-ও তার ব্যতিক্রম নয়। লোকনৃত্যের এই আঙ্গিকে যে কোনও নৃত্য উপস্থাপনার আগেই শিল্পীরা গণেশ বন্দনা পরিবেশন করে থাকেন। কারণ, এমনিতেই প্রথমপূজ্য ও সিদ্ধিদাতা বলে তাঁর গুরুত্ব সর্বত্র। তা ছাড়া পরিবেশনের সময় যাতে কোনও বিঘ্নসৃষ্টি না হয়, তাই সর্বাগ্রে সিদ্ধিদাতার বন্দনা করণীয়। বস্তুত, বিপদতারণের এই সাধারণ উদ্দেশ্যটিকে সামনে রেখেই সাফল্য-সমৃদ্ধির দেবতার দ্বারস্থ হন যে কোনও শিল্পমাধ্যমের কলাকুশলীরা। দক্ষিণভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা ভরতনাট্যমের ক্ষেত্রেও সূচনায় গণেশ বন্দনা অবশ্যকৃত্য। গীত, বাদ্য ও নাট্যের মতো নৃত্যের সঙ্গেও গণেশের সংযোগ ভারতীয় ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয় অধ্যায়েই আমরা বাংলার মূর্তিনিদর্শনে নৃত্যপটু গণেশের উপস্থাপনার সাক্ষী হয়েছি। কাজেই, নৃত্যের বিভিন্ন ধারায় গণেশ যে বন্দিত হবেন, এতে আর আশ্চর্য কী! ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ ও ঝাড়খণ্ডের সরাইকেল্লা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ছৌ নাচের প্রধান ক্ষেত্র। দীর্ঘ সময় ধরে ছৌ নাচ ছোটনাগপুর মালভূমি সাঁওতাল-শবরদের বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম। আদিবাসী যুদ্ধনৃত্য হিসেবে পরিচিত ছৌ প্রকৃতিতে বীররসাত্মক। বিশেষ একধরনের মুখোশ পরে শিল্পীরা এখানে নৃত্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তবে সরাইকেল্লা ও পুরুলিয়ার ছৌ-এর ক্ষেত্রেই কেবল মুখোশের ব্যবহার চোখে পড়ে। পুরুলিয়ার গণেশ ছৌ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মুখোশটি পৌরাণিক গণেশের মুখের আদলে নির্মিত। আকারেও এগুলিও যথেষ্ট বড়ো হয়। তিনি গজমুখ ও একদন্ত হিসেবে উপস্থিত হন। হাতের সংখ্যাও কোনও সময় চার হয়ে থাকে। প্রয়োজনে অস্ত্রও ধরা থাকে। 'সিঁদুরের বিন্দু বিন্দু মূষিক বাহন/ নমঃ নারায়ণ/ গণেশদেব হর গৌরীর নন্দন...। তাক ধিন না ধিন'--- এইভাবে একটি নির্ধারিত তালমান

অনুসরণ করে গণেশের বন্দনানৃত্য উপস্থাপিত হয়।[৪] (চিত্র ৫১) বন্দনায় তাঁকে শিব ও গৌরীর পুত্র বলা হয় যেমন, তেমনই কখনও কখনও নারায়ণের সঙ্গেও তাঁর যোগসূত্র সামনে আসে। বস্তুত, বঙ্গদেশে গণেশ পৌরাণিক ভিত্তিতে তো বটেই, এমনকী লোকসংস্কৃতির পরিসরেরও নারায়ণের সঙ্গে অন্বিত। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের আয়ুধসাদৃশ্য বাংলার বিষ্ণু-কৃষ্ণের সঙ্গে গণেশের যোগবন্ধন দৃঢ় করেছে। ঢোল-ধামসার বাজনার সঙ্গে একতাল ঝুমুরে গণেশ বন্দনা শুরু হয়। নাচের তালে পা মিলিয়ে হেলে-দুলে, ভুঁড়ি নাচিয়ে আসরে নামেন গণপতি। ঢোল-ধামসা ছাড়াও সানাই, শিঙে, চড়াচড়ি, মাহুরী ও করতালের সংগতে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। কখনও সারা রাত ধরেও এক-একটি পালা অনুষ্ঠিত হয়। পালার শুরুতেই গণেশের বন্দনা-নৃত্য যেমন একটি প্রথাগত ব্যাপার, তেমনই অনেকসময় পালা সমাপ্তও হয় গণেশের বন্দনার মাধ্যমে। ছৌ নাচের মৌল প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গণেশের হাব-ভাব বা অঙ্গভঙ্গির মধ্যেও একধরনের বীরভাবের প্রতিফলন দেখা যায়। সে'সব ক্ষেত্রে তাঁর বালকত্বকে ছাপিয়ে প্রাধান্য পায় যোদ্ধৃসত্তা। আদিপূজ্য গণেশকে শুধু বালরূপে নয়, বীররূপে উপস্থাপন করতেও ভালোবাসেন ছৌ নৃত্যের শিল্পীরা। আবার, কখনও গণেশজন্মের পৌরাণিক প্রসঙ্গ-ও নৃত্যের বিষয় হিসেবে উঠে আসে। ছৌ নাচে ব্যবহৃত গণেশের মুখোশের বাজার চাহিদা ব্যাপক। বিভিন্ন সরকারি বিপণনশালায় এই জাতীয় গণেশের মুখোশ বিক্রির জন্য রাখা থাকে।

কালীঘাটের পটে গণেশ

প্রাথমিক অবস্থায় কালীঘাটের পট তীর্থপণ্য হিসেবেই বিকশিত হয়েছিল। ১৮০৯ সালে কালীঘাট মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর থেকেই সন্নিহিত অঞ্চলে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত পটচিত্রীদের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। শুরুতে কালীঘাট মন্দিরের মাইল খানেক এলাকার মধ্যে মূর্তি গড়ে পূজার প্রচলন ছিল না, পটের ওপর অঙ্কিত মূর্তিচিত্র-ই এতদঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশেষত দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কনের ক্ষেত্রে কালীঘাটের পট উনিশ শতকের কলকাতায় একটি লোকপ্রিয় শিল্পমাধ্যমে পরিণত হয়। মন্দির চত্বরে ক্রমশ ভক্তসমাগম বাড়তে থাকায় আঞ্চলিক চাহিদা মেটাতে শিল্পীরা দ্রুত গতিতে চৌকো পট আঁকতে শুরু করেন। বিচিত্র সব রংয়ের উজ্জ্বল পটচিত্র ক্রেতার কাছেও এমন এক সারল্যের আবেদন নিয়ে আসে, যেখানে দেবতার অবয়ব একইসঙ্গে আকর্ষণীয় এবং প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। লক্ষণীয় যে, কালীঘাটের পটচিত্রে দেবদেবীর উপস্থাপনায় ভারিক্কি চাল নেই, বদলে একধরনের স্বতঃস্ফূর্ত নিরলংকার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। দ্রুততার কারণে রেখাঙ্কন, বর্ণলেপনের বিশেষ রীতি এবং সরলীকরণ কালীঘাটের পটকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছে। পটে সাধারণত বর্তুলাকার দ্বিমাত্রিক রেখার টান

দেখা যায়। রেখাগুলি কখনও মোটা, আবার কখনও সরু। লক্ষ্য আলো-ছায়ার খেলা ফুটিয়ে তোলা। ফলস্বরূপ আপাত দ্বিমাত্রিকতার মধ্যেই ত্রিমাত্রিক ব্যঞ্জনার আভাস পাওয়া যায়। দেবদেবীর রূপাঙ্কনের ক্ষেত্রে গোল বা পানপাতা গড়নের ভারি মুখ ও টানা টানা বড়ো চোখ লক্ষ করা যায়। যদিও বড়ো করে চোখ আঁকা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা মুখমণ্ডলের রেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কালীঘাটের পটে অঙ্কিত দেবদেবীর চোখগুলি আবেদনযুক্ত এবং ভাবালুতাময়। ব্যবসায়িক কারণে হাতে গোনা অল্প কয়েকটি রং অপেক্ষাকৃত পাতলাভাবে পটুয়ারা ব্যবহার করেন। এই জাতীয় পটে ডৌল বা রিলিফ দেখানোর জন্য একই রং বা বিভিন্ন রং হালকাভাবে লেপন করা হয়। ছবির মূল বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পটুয়ারা পশ্চাদ্‌পটে হালকা রংয়ের ব্যবহার করে। এমনকী তারা কখনও কখনও দেবতার অবয়বটিকে প্রাধান্য দিতে পশ্চাদ্‌পট একেবারে ফাঁকা রেখে দেন।[৫] সাধারণত পটচিত্রে দেব-দেবীর পরিচ্ছেদ এবং অঙ্গ-সংস্থান একটি নির্দিষ্ট গতে বাঁধা। প্রথাগত উপস্থাপনার ক্ষেত্রে গণেশের আসনমূর্তি চোখে পড়ে। পদ্মাসনে তিনি উপবিষ্ট। চারটি হাতে বঙ্গদেশীয় বিষ্ণু-গণেশের ঐতিহ্য অনুসারে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম থাকে। গজমুখ শুভ্রবর্ণ, গাত্রবর্ণ প্রায়শই লাল। অলংকৃত বা সুসজ্জিত দেহ। মাথায় মুকুট। সঙ্গে ইঁদুরবাহন। সব মিলিয়ে পৌরাণিক একদন্ত লম্বোদর গণেশের বর্ণোজ্জ্বল চিত্র। (চিত্র ৫২) তবে অনেকসময় সমকালের দাবি মেটাতে চিত্রে দেবদেবীর এমন সব আকর্ষণীয় দেহ-সৌষ্ঠব ফুটে ওঠে, যেখানে প্রথানুগ চিত্রণের পরিবর্তে সামাজিক বিষয় বা প্রসঙ্গগুলি অন্যতম parameter হয়ে ওঠে। দেবতার দেহাকৃতির এই জাতীয় বিন্যাসের মধ্যে সমকালের দাবিপূরণ যেমন একটা factor, তেমনই mythical structure-এর সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেও কীভাবে দেবতার রূপায়ণে আধুনিক জীবন ও মনের প্রতিফলন ঘটানো যায়, তাও প্রধান বিবেচ্য হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, মালকোঁচা মেরে সাদা ধুতি পরা, হাতে গোলাপ ফুল নিয়ে চেয়ারে বসা বাবু গণেশের চিত্রটি মনে পড়ে। (চিত্র ৫৩) উনিশ শতকের কলকাতার বাবু কালচারের প্রতিনিধি তিনি। বাবুটি সেজে আরামবিলাসের ভঙ্গিতে এমনভাবে বসে আছেন গণেশ, দেখে মনে হচ্ছে আদৌ কোন দেবতা নন, সময়েরই প্রতিবিম্ব হয়ে ফুটে উঠেছেন যেন। সমকালীন কলকাতার সামাজিক প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এই বাবু শ্রেণির প্রতিনিধিদের রূপাঙ্কন কালীঘাটের পটে আকচার ঘটেছে। কিছুটা শ্লেষ বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভঙ্গিও এর মধ্যে রয়ে গেছে। বর্তমান চিত্রে গণেশের উপস্থিতি-ও কতকটা তাঁকে উনিশ শতকীয় সামাজিক ইতিহাসের উপকরণে পরিণত করেছে।

চিত্রকলায় গণপতি

ক. অবনঠাকুরের চিত্রশিল্পের ঘরাণায় পরম্পরাকে ফিরে দেখার স্বাদ একধরনের নস্টালজিক অ্যাপ্রোচ নিয়ে আসে। ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট' আধুনিকতার এক অন্য বয়ান প্রস্তাব করেছিল। কেবল সময়ের দাবিপূরণেই আধুনিক মনের প্রতিফলন ঘটে না, সমকালের সঙ্গে ঐতিহ্যের মেলবন্ধনও জরুরি। দারুণ বিক্ষোভের কালে বেঁচেও সৃষ্টিকর্মের মধ্যে একটা প্রশান্ত অভিব্যক্তি চিরদিন জিইয়ে রেখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। পুরাণকথার নির্যাস থেকে কী অনায়াসে সৃষ্টি করেছেন 'গণেশ জননী'-র (চিত্র ৫৪) মতো অনবদ্য শিল্পকর্ম। জাতীয় স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে তুলে আনা নিতান্ত সহজসরল প্রসঙ্গও তাঁর রং ও রেখায় লিখনরূপের স্থবিরতাটুকু পেরিয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠেছিল। ঐতিহ্যবাহিত রচনার একটি বিশেষ মুহূর্তকে শিল্পীর কল্পনায় এমনভাবে সপ্রাণ অবয়ব দেওয়া সহজ নয়। অবনীন্দ্রের অনাড়ম্বর শিল্পনির্মাণের মধ্যে অতীতচারণা, ঐতিহ্যের নবরূপায়ণ, পুরাণানুগত্য এত স্বতোৎসারিত এবং মানবিক দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত যে আলাদা করে চেষ্টাকৃত বা অনুকরণাত্মক মনে হয় না। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ইউরোপীয় চিত্রকলায় নিরন্তর ভাঙা-গড়ার প্রক্রিয়া দেখেছেন যিনি, সঙ্গে বুঝেওছেন সেই পথ তাঁর নয়, সেই অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার অন্দরে প্রাচ্য বড়ো গভীরভাবে উপস্থিত। ঐতিহ্যের-ই নবরূপকার তিনি, শিকড়সন্ধানী, পরম্পরায় লালিত। লাগামছাড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার অস্থিরতা তাঁর শিল্পদর্শনের সঙ্গে খাপ খায়নি কখনও। ফলে সময়ের সীমাবদ্ধ বেষ্টনী দিয়ে অথবা হিন্দু জাতীয়তাবাদী স্বার্থবোধের জিগির তুলে তাঁর গুণপনার নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

আলোচ্য 'গণেশ জননী' শীর্ষক চিত্রকর্মে মাতা পার্বতী এবং শিশুপুত্র গণেশকে এক পর্বতবেষ্টিত কাননভূমিতে দেখা যাচ্ছে। মায়ের সাহায্যে গণেশ শুঁড়টিকে কাজে লাগিয়ে গাছের ডাল থেকে ফল পাড়ছেন। কয়েকটি ফল তিনি ইতোমধ্যেই পেড়েছেন, পার্বতীর কোঁচড়ে তার মধ্যে দুটি অন্তত দৃশ্যমান। রক্তবর্ণ, একদন্ত (একটি দাঁত চিত্রে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, অপরটি ভগ্নদন্ত বলে দন্তমূলটুকু দৃশ্যমান) ও গজানন গণেশ এখানে বালমূর্তিতে উপস্থাপিত। পদস্খলন এড়াতে গণেশের বাঁ-হাতটি ও পা দু'খানি মাতা পার্বতী শক্ত করে ধরে আছেন। ছবিতে গণেশ দ্বিভুজ, মস্তকে মুকুট, সর্বাঙ্গ অলংকারে ভূষিত। যেমন, কর্ণকুণ্ডল, হার, বাজুবন্ধ, বালা, নূপুর প্রভৃতি দৃশ্যত স্পষ্ট। দেহের উপরিভাগ অনাবৃত, নিম্নাঙ্গে কৌপীন পরিহিত। গণেশ এখানে ঠিক যেন মায়ের আদরের খোকাটি, বাংলার শিশু-সন্তানদের প্রতিমূর্তি। পার্বতী স্নেহার্দ্র বঙ্গজননীর মতোই পরম যত্নে ও মমতায় সন্তানের লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করছেন। এই চিত্রকর্মটির রূপায়ণে পৌরাণিক ভিত্তি থাকলেও বিশেষ একটি মুহূর্তের কল্পনা যখনই

শিল্পবস্তুর নির্বিশেষতায় পৌঁছেছে; তখনই বঙ্গদেশ, বাংলার মায়ের চিরন্তন স্নেহস্নিগ্ধ ভাবমূর্তি, মা ও শিশুর অমলিন নির্মলতামাখা শৈশবযাপন— দেবতার ঐশ্বর্যরূপের গুরুত্ব কমিয়ে তাঁদের মাটি-পৃথিবীর সংলগ্ন করে তুলেছে। অবশ্য শাস্ত্রীয় ধাঁচে দেহবৈশিষ্ট্যে গণেশকে হস্তীমুখ, একদন্ত ও রক্তবর্ণ-ই রাখা হয়েছে। কারণ, শিল্পকর্মে দেবচরিত্রের মানবোচিত সহজ রূপায়ণ যতই ঘটুক, গণেশকে চেনানোর ক্ষেত্রে তাঁর complete identification-ও প্রয়োজন। পরম্পরাগতভাবে বাল গণেশ চতুর্ভুজ হলেও দেবতার মানবায়নের সঙ্গে লাগসই করে এখানে তাঁকে দ্বিভুজ দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়েই বলা হয়েছে, *শ্রীতত্ত্বনিধি* অনুসারে সন্তান গণেশের হস্তধৃত দ্রব্যাদির মধ্যে আম, কলা, কাঁঠাল, ইক্ষু প্রভৃতি ফল থাকে। বাল গণেশের শাস্ত্রীয় রূপের সঙ্গে ফলের এই আবশ্যকীয় সংযোগটির কথা অবনঠাকুর জেনেছিলেন কিনা বলা শক্ত, তবে সন্তান গণপতির সঙ্গে ফল ধারণের যে একটা পূর্বতন শাস্ত্রীয় ভিত্তি আছেই, তা অস্বীকারের উপায় নেই। বস্তুত, রসালো ফল শিশুদের অতিপ্রিয় আহার্য হওয়ায় এবং ফল পাড়া প্রভৃতি কর্ম বাল্যক্রীড়ায় অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে হয়তো শৈশবকালীন মাধুর্য ফুটিয়ে তুলতেই চিত্রে এই ধরনের বিষয় বেছেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ।

খ. নন্দলাল বসুর আঁকা গণপতির চিত্রটি (চিত্র ৫৫) মূলত রেখানির্মিত বা স্কেচধর্মী। একসময় অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিল্পের পাঠ নিতে এসে প্রথম দিনেই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরতে হয়েছিল নন্দলালকে। কালিদাসের শকুন্তলা এঁকেছিলেন তিনি। সেই ছবি ভালো লাগেনি অবনীন্দ্রনাথের। *জোড়াসাঁকোর ধারে*-তে স্মৃতিচারণ করে অবন ঠাকুর লিখেছেন, 'এই আজকালকার ছেলেদের মতোন একটু জ্যাঠামি ছিল তাতে।' অসন্তুষ্ট গুরু ছাত্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'কাল বরং একটি সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি এঁকে এনো।'[৬] সেইমতো পরদিনই গণেশ ঠাকুরের ছবি এঁকে শিল্পগুরুকে দেখিয়েছিলেন নন্দলাল। নন্দলালের 'সিদ্ধিদাতা' দেখে খুব কৌতুক হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের। তিনি লিখেছেন, "একটি কাঠিতে ন্যাকড়া জড়ানো, সেই ন্যাকড়ার উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি। বেশ এঁকেছিল প্রভাতভানুর বর্ণনা দিয়ে। বললুম, 'সাবাস'!"[৭] এ'ভাবেই গণেশের ছবি এঁকে গুরুর কাছে শিল্পশিক্ষার পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন নন্দলাল। বর্তমান আলোচনায় ব্যবহৃত নন্দলালের আঁকা গণেশের চিত্রটি দিল্লির ন্যাশানাল মিউজিয়ামের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত। গণপতি এখানে বালরূপে উপস্থিত নন। তাঁর ভাবরূপের মধ্যে প্রবীণতার ছাপ স্পষ্ট। চেহারায় একটা আভিজাত্যের দ্যুতি ফুটে বেরোচ্ছে। বিলাসাসনে উপবিষ্ট তিনি। তাঁর দেহভাগ অলংকৃত ও সুসজ্জিত।

গ. যামিনী রায়ের গণেশ বিষয়ক চিত্রকর্মে গণেশ প্রসঙ্গ এক বিশিষ্ট মাত্রা লাভ করেছে। পটচিত্রের তথাকথিত অ-নাগরিক ধারাটি তাঁর উন্নততর শিল্পরুচির স্পর্শে আরও শীলিত ও মার্জিতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পটুয়াদের চিত্রশৈলীর সঙ্গে তাঁর শিল্পনির্মাণের সাদৃশ্য থাকলেও যামিনী রায়ের হাতে বাংলার ঐতিহ্যবাহিত পটচিত্রের ধারা যে একধরনের নাগরিক বৈদগ্ধ্য ও আভিজাত্যের স্পর্শ লাভ করেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রথমেই আসি 'গণেশ-জননী' শীর্ষক চিত্রভাবনার প্রসঙ্গে। যেহেতু মা ও সন্তানের আর্কিটাইপের অনুসরণে গণেশের রূপাঙ্কন করেছেন, ফলে বাল গণেশের মূর্তিটিই এই জাতীয় চিত্রে সবচেয়ে বেশি ধরা পড়েছে। (চিত্র ৫৬) গণেশ এখানে মাতৃসংসর্গে সুরক্ষিত, মাতা পার্বতীর স্নেহাঞ্চলধন্য। অঙ্গসংস্থানের ক্ষেত্রে শাস্ত্রবদ্ধ ধাঁচা অনুসারেই তাঁর অবতারণা করা হয়েছে। তিনি গজানন ও একদন্ত। যদিও সন্তান গণপতির শাস্ত্রীয় বর্ণনামাফিক তিনি চতুর্ভুজ নন, দ্বিভুজ। এক্ষেত্রে মানবশিশুর বাস্তবতাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখতেই সম্ভবত ক্রোড়গত গণেশের দ্বিভুজে উপস্থাপনা। দেবতা হিসেবে নয়, প্রাকৃত জগতের মানবশিশুর স্বাভাবিকতায় গণেশ হাজির হয়েছেন। মায়ের স্নেহচ্ছায়া সর্বদা তাঁকে ঘিরে রেখেছে বলেই বালরূপে সাধারণ্যে তিনি এত জনপ্রিয়। আসলে বঙ্গদেশে মা ও সন্তানের বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য সম্পর্কের উদযাপন সাহিত্যের প্রকরণে এতখানি জায়গা জুড়ে হয়েছে যে, চিত্রের বিষয়বস্তু হিসেবেও সেই থিমটি রসিকদের কাছে অচিরেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। তা ছাড়া শিশু গণেশ ও মাতা পার্বতীর বাৎসল্যরসময় স্নেহসঙ্গের আবেদন বাঙালি দর্শককেও যথেষ্ট স্মৃতিমেদুর ও স্পর্শকাতর করে তোলে। শৌর্যবীর্যবান গণেশের পরিবর্তে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের মূলধারায় পার্বতীর আদরের নাদুসনুদুস খোকাটি এই যে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে, সেই তুমুল জনপ্রিয়তার প্রবাহে অবনঠাকুর বা যামিনী রায়দের 'গণেশ-জননী' বা 'গণেশ ও জননী' গোত্রের চিত্র-ভাবনা অবধারিতভাবেই অনুঘটকের কাজ করেছে। এই স্নেহসঞ্চার, নৈকট্যের অভিব্যক্তি, যা কার্যত বাঙালি-মানসেরই প্রতিবিম্বন, চিত্রকর্মের মধ্যে তাকেই চিরন্তন রূপ দিতে চেয়েছেন শিল্পী।

তবে যামিনী রায়ের গণেশ বিষয়ক চিত্রভাবনায় কেবল মা-সন্তানের আর্কিটাইপ-ই যে অনুসৃত হয়েছে তা নয়। শিবের সঙ্গে বাল গণেশের চিত্রও পেয়েছি আমরা। (চিত্র ৫৭) এই ধরনের চিত্রে পিতা-পুত্রের বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য সম্পর্কের রূপায়ণে শিব ও গণেশের চারিত্রিক দার্ঢ্যের বদলে একধরনের নমনীয় রূপ ফুটে উঠেছে। তা ছাড়া পৌরাণিক ঐতিহ্যে গণেশ তো কেবল মাতৃকামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত নয়, শিবাংশে জাত-ও বটে। তবে মায়ের ব্যাটা হিসেবে সর্বত্র তিনি সম্মানিত। শিল্পী সম্ভবত বাঙালির পারিবারিক জীবনের চিরকালীন রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতেই বাপ-ব্যাটার এমন স্নেহমধুর চিত্র অঙ্কন করেছেন। শৌর্যবীর্য প্রকাশ-ই যে পৌরুষের একমাত্র অভিব্যক্তি

নয়, পিতার অপত্য স্নেহের চিত্রে সেই ভাবনাও পরোক্ষে প্রকাশ পেয়েছে। শিব যেখানে পিতা, সেখানে তাঁর বলবত্তাকে ছাপিয়ে উঠেছে স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়। সন্তানরূপে গণেশও সেই স্নেহসঙ্গ উপভোগ করেছেন।

গণেশের একক চিত্রগুলিতেও তিনি অত্যন্ত নমনীয়ভাবে উপস্থিত। (চিত্র ৫৮) তিনি কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ। তাঁর ভাবমূর্তির মধ্যে একধরনের কোমলভাব ফুটে উঠেছে। গণেশের বালকত্বের উদ্‌যাপন-ই যামিনী রায়ের গণেশ বিষয়ক চিত্রনির্মাণের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। কি চেহারায়, কি বাহুভূষণে, সবেতেই এত মাধুর্যের সঙ্গে গণেশের রূপাঙ্কন করেছেন তিনি, শাস্ত্রবদ্ধ বর্ণনাও যেখানে জীবনগত অনুভূতির সঙ্গে সমতা তৈরি করে। পটচিত্রের আদল এলেও যামিনী রায়ের নিজস্ব শৈলীর গুণে প্রতিটি ছবিই এত উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে যে, গণেশের সঙ্গে বাঙালির পরিবার জীবনের একটি স্বচ্ছন্দ যোগসূত্র গড়ে ওঠে।

ঘ. যোগেন চৌধুরী এক স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন, শৈশবে ফরিদপুরের গ্রামে দুর্গামূর্তি তৈরির সময় কুমোরের হাতে প্রথাগত গণেশমূর্তি গড়ে উঠতে তিনি দেখেছেন।[৮] পরবর্তী সময়ে প্রাচ্য শিল্পদুনিয়ার থেকে বহু দূরে প্যারিসে পাঠগ্রহণকালে পাশ্চাত্য শিল্পচর্চার খুঁটিনাঁটি বৈশিষ্ট্য, প্রকরণগত নিজস্বতা, প্রকাশভঙ্গির মধ্যে গতানুগতিকতার বিপরীত একধরনের ভাঙাচোরা বা এলোমেলো বুননের অভ্যাস শিল্পী যোগেনকে এতদূর আকৃষ্ট এবং প্রভাবিত করে যে, বিভিন্ন সময়ে তাঁর আঁকা ছবির মধ্যে সেই আদর্শের প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। তাঁর রং ও রেখার ছোঁয়ায় দেবচরিত্রের পুরাণানুগ রূপায়ণ-ও বদলে গিয়ে দর্শককে এক ভিন্নতর আবহে টেনে নিয়ে যায়। গণেশের চিরাচরিত দেহরূপের অন্ধ অনুবর্তনের পরিবর্তে তাঁর চিত্রকলায় পাওয়া যাবে এক বিপন্ন সময়ের বয়ান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা হয়ে ওঠে যুগযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। (চিত্র ৫৯, ৬০) এই প্রসঙ্গে সমালোচক অরুণ সেন লিখছেন,

> ... তেমনি তাঁর পুনরাবৃত্ত বিষয় এক-এক কালপর্বে একেকরকম--- কখনো জন্তু জানোয়ার, কখনো জন্তু জানোয়ার সদৃশ নুয়ে-পড়া মানুষ। সেরকমই একটি বিষয় ‘গণেশ’। সারা জীবনই, মনে হয়, তিনি যে কত ভাবে কত রূপাবয়বে গণেশকে ছবিতে এনেছেন, তা অনুসরণ করাও হবে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। ‘গণপতি দি লর্ড’, ‘গণপতি দি ওয়ারিয়র’, ‘গণেশ উইথ ক্রাউন’ ইত্যাদি। শুধু ‘গণপতি’ এই নামেই ছবি আছে অজস্র। প্রত্যেকটিতে ভিন্ন-ভিন্ন জোর পড়েছে, আবার অনেক সময়ে একই ছবিতে নানান অনুভবের সমাবেশ ঘটেছে। রূপগত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই বিষয়গত ও শিল্পগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে।[৯]

১৯৭৭ সালে আঁকা ‘Ganapati the Warrior’ (চিত্র ৬১) বা ১৯৭৯ সালে আঁকা ‘Ganesh with crown’ (চিত্র ৬২) প্রভৃতি চিত্রে গণেশকে এতটাই sur-real-ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নির্মাণের গতানুগতিকতা থেকে একেবারে মুক্ত বলা যায়। তবে sur-realism-এর প্রভাব বা fantasy-জনিত distortion যাই বলি না কেন, তা অবশ্যই ভারতীয় নন্দনবোধ বাহিত হয়েই শিল্পের বিষয়ে এসে মিশেছে। বিশেষত আশি-একাশি সাল থেকে শিল্পীর আঁকা ছবিতে মানুষের দেহভঙ্গি, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মুখের নানারকম ভাঙাচোরা, হাত-পায়ের ভঙ্গি, ওঠার, দাঁড়ানোর বা বসার ধরন প্রভৃতি বিষয়গুলি আমাদের দেশের মানুষের অভ্যস্ত জীবন-বাস্তবতার প্রেক্ষিতে অনুসৃত হয়েছে। মনে হয়, পাশ্চাত্য রীতির থেকে পৃথক হয়ে এই যে পরিচিত জীবনের ব্যবহারিক অভিব্যক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিত্রে মানুষের দেহরূপের নির্মাণ, এর শুরুটা বোধহয় হয়ে গিয়েছিল দেবতার অঙ্গভঙ্গির বিনির্মাণের মধ্য দিয়েই। একটু লক্ষ করলেই গণেশের classical appearance-এর সঙ্গে শিল্পীর পরীক্ষামূলক চিত্রনির্মাণের বৈপরীত্য সহজেই টের পাওয়া যায়। অবয়ব বা গড়নেই যে এরা কেবল পৃথক তা নয়, চিত্রে গণেশের সামগ্রিক উপস্থিতিটাই হতাশাব্যঞ্জক। গণপতি-গণেশের প্রথামাফিক উপস্থাপনায় তাঁর দেহস্ফীতি নিঃসন্দেহে একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়, বর্তমান চিত্র-নিদর্শনগুলিতে যা বারবার খণ্ডিত হয়েছে। ধ্রুপদী গণেশ শিল্পে যতখানি হৃষ্টপুষ্টদেহ, তৃপ্তশরীর ও নিরুদ্বেগ তথা নিশ্চিন্তরূপে অঙ্কিত, যোগেন চৌধুরীর শিল্পকর্মে ঠিক বিপরীতক্রমে তিনি ততটাই অপুষ্টশরীর, ক্ষুৎকাতর ও উৎকণ্ঠাগ্রস্ত। এই বৈপরীত্যের বিন্যাস একভাবে উলটপুরাণ তো বটেই। দেবতার দেহরূপের উপস্থাপনায় পাশ্চাত্য-প্রভাবিত একধরনের sur-real approach লক্ষণীয়, যা গণেশের চিরাচরিত প্রাচ্য-মূর্তির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। গণেশের শরীরের এই কৃশতা, অপুষ্টি কালগত যন্ত্রণার দ্যোতক। হয়তো ছিন্নমূল মানুষের সংকটকেই এই জীর্ণশীর্ণদেহ, অভুক্ত, অবসন্ন গণেশের ভাবরূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন শিল্পী। দেশভাগ ও উদ্বাস্তু মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাতেও দেখেছেন শিল্পী। হয়তো যাপিত জীবনও কখনও কোনওখানে উঁকি দিয়েছে শিল্পের ভেতর থেকে। গজমুখ এবং চতুর্বাহুর সাদৃশ্যটুকু ছাড়া এঁদের পৌরাণিক গণেশের সঙ্গে মেলানো ভারি শক্ত। রং, রেখা, বিন্যাস— সবেতেই depressing element এত বেশি যে কোথাও কোনও দীপ্তোজ্জ্বল সম্ভাবনা নেই, নেই উজ্জীবনের আহ্বান। মনে হয় এক অবসাদক্লিষ্ট, যন্ত্রণাকাতর গজমুখ দেবতা একবুক নৈরাশ্য ও শূন্যতা নিয়ে চতুর্ভুজ মূর্তিতে পদ্মাসনে আসীন। দেবতাও কি বলা যায়? এক চিলতে ঐশীভাব কোথাও নেই। দারিদ্র্য, ব্যাধি, অপুষ্টির কবলীভূত এক নিঃস্ব অস্তিত্বের আর্তনাদ শুনি আমরা। রসনাবিলাস বা মোদকাসক্তির যে

বৈশিষ্ট্যে গণপতি সর্বত্র চিহ্নিত, যোগেন চৌধুরীর শিল্পভাবনায় তা আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত। কৃশতাপ্রাপ্ত চিরবুভুক্ষু গণেশ এখানে আধুনিক যুগযন্ত্রণার প্রতীক। গণেশের আধারে এক অন্ধকার সময়কেই যেন ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন শিল্পী। বলতেই হবে, গণেশের রূপাঙ্কনের ক্ষেত্রে এই জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা বঙ্গীয় চিত্রশিল্পের পরম্পরায় আগে-পরে খুব বেশি দেখা যায়নি।[১০]

ঙ. ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের আঁকা গণেশ মূর্তিটি (চিত্র ৬৩) পৌরাণিক গণেশের অতিপরিচিত মূর্তির থেকে আলাদা। সাধারণ্যে গণেশ চতুর্বাহু রূপে বিখ্যাত হলেও তাঁর দশভুজ মূর্তি পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাহিত্য-শাস্ত্রে পাওয়া যায়। চিত্রে গণেশ খর্বদেহ। তাঁর গজমস্তক শ্বেতবর্ণ ও গাত্র রক্তবর্ণ। এই রক্তবর্ণের অনুষঙ্গ নিশ্চিতরূপেই শাস্ত্রানুগ। তিনি মুকুট, অলংকার ও নূপুর পরিহিত। মুকুটে অর্ধচন্দ্র শোভিত। মাথার পেছনে জ্যোতির্বলয় পরিদৃশ্যমান। তাঁর দেহের উর্ধ্বদেশ নগ্ন, নিম্নভাগে ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানরত। গলায় কণ্ঠহার শোভিত। চিত্রে গণেশের বাহন ইঁদুর অনুপস্থিত। বাম দিকের হাতগুলিতে রয়েছে ওপর থেকে যথাক্রমে ত্রিশূল, নাগপাশ ও পদ্ম। চতুর্থ হস্তটি নিজ কটিদেশে, এর মধ্যে একধরনের প্রত্যয়দৃপ্ত ভঙ্গি আছে। সম্মুখস্থ পঞ্চম হস্তে মোদকপূর্ণপাত্র ধারণ করেছেন। ডান দিকের তিনটি হাতে ওপর থেকে যথাক্রমে অক্ষমালা বা জপসূত্র, পুথি ও দণ্ডবদ্ধ ডম্বরু দেখা যায়। বাম ও ডান দিকের হাতে ত্রিশূল ও দণ্ডবদ্ধ ডম্বরুর উপস্থিতি গণেশের সঙ্গে শিবের সদৃশতার প্রমাণ। এই সাদৃশ্য কেবল পিতৃসূত্রেই নয়, গণপতি-গণেশ যে আদপে শিবের-ই অন্যমূর্তি, চিত্রধৃত বাহুভূষণ-ই সেই শাস্ত্রীয় সম্বন্ধের প্রমাণ। চিত্রে গণেশের চতুর্থ হস্তটি শূন্য, হয়তো অভয়দান বা আশীর্বাদক হস্ত হতে পারে। ডান দিকের সামনের হাতটিতে একটি মোদক জাতীয় মিষ্টান্ন ধরে আছেন, প্রায় ভক্ষণোদ্যত বলা যায়। বাম হস্তধৃত মোদকপাত্র থেকে ডান হাত দিয়ে একটি মিষ্টান্ন তুলে নিয়ে অর্ধনিমীলিত চোখে পরম তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করছেন। উল্লেখ্য, গণেশের অন্যান্য হাত যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হলেও সম্মুখস্থ হাত দুটির মাধ্যমে তিনি যে পরমপ্রিয় মোদক (বা লাড্ডু) আস্বাদনে রত, তাঁর প্রীতিপূর্ণ আধবোজা চাহনির মধ্যেই সেই ভাবটি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। কার্যত মোদক ভক্ষণের মধ্যে এই যে পরিতৃপ্তির আনন্দ, এইটিই গণেশের অঙ্গসৌষ্ঠবের মৌল বৈশিষ্ট্য। বক্ষ্যমাণ চিত্রে দশভুজ গণেশের বাহুবল বা শক্তিমত্তার উদযাপন ধরা থাকলেও খাদ্যরসিক গণপতির ভোজনবিলাসের মুদ্রাটিই প্রধান হয়ে উঠেছে।

চ. রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা গণেশের চিত্রগুলি শাস্ত্রানুগ হয়েও রঙের ব্যবহারে এবং শারীরিক বিন্যাসের চমৎকারিত্বে বেশ অভিনব। (চিত্র ৬৪) রক্তবর্ণ গণেশের শাস্ত্রবৈশিষ্ট্য অনুসারে শিল্পী তাঁকে লালরঙা করে

এঁকেছেন। সপল্লব আম্রগুচ্ছের মতোই মাথার পেছনে সবুজ কলাগাছের উপস্থিতি সিদ্ধি ও ফলদায়কত্বের প্রতীক। কলাগাছ যেহেতু যে কোনও শুভ অনুষ্ঠানেও দ্বারোদঘাটন বা অন্যান্য কাজে মাঙ্গলিক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ফলে সিদ্ধিদাতার সঙ্গে কলাগাছের ভাবনাগত ঐক্য থাকাটা স্বাভাবিক। তা ছাড়া গজানন-গণেশের হস্তীমুখের সূত্রে কলাগাছ হাতির একটি প্রিয় আহার্য হওয়ায় এর উপস্থিতির গুরুত্ব টের পাওয়া যায়। আবার, বাংলায় প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কলা গাছকে 'কলা বউ' হিসেবে গণেশের পত্নী (যদিও দুর্গা পূজায় গণেশের পার্শ্বস্থিত 'কলা বউ' গণেশপত্নী নন, 'নবপত্রিকা', ভগবতী দুর্গার বৃক্ষপ্রতীক) বলে মনে করা হয়। সেই সূত্রেও গণেশের সঙ্গে কলাগাছ অন্বিত। গণেশ হলুদ ধুতি, উত্তরীয় ও অলংকার পরিহিত। চিত্রে তিনি দ্বিভুজ। পায়ের কাছে ইঁদুরটিকে দেখা যাচ্ছে। মনে হয় কোনও একটি মঙ্গলানুষ্ঠানে তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁকে ঘিরে কলাগাছের উপস্থিতি মঙ্গলানুষ্ঠানের আবহটিকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছে।

পরবর্তী চিত্রটিতে (চিত্র ৬৫) গণেশ বালরূপে অবতীর্ণ। প্রায় গ্যাঁট হয়ে বসে থাকার ভঙ্গি তাঁর। বাবু হয়ে এমনভাবেই বসেছেন যে, হাত এবং পা'গুলিকে প্রায় তফাত করা যাচ্ছে না। তিনি ধুতি, উত্তরীয় ও অলংকার পরিহিত। এখানেও হলুদ ও লাল রঙের ব্যবহার দেখা যায়। চিত্রে হাতের সংখ্যা চার। সামনের দুটি হাত জোড় করে আছেন তিনি। ওপরের দুটি হাতে মাথায় শিবলিঙ্গ ধরেছেন। শিবপুত্র হিসেবেই শিল্পী তাঁকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন সম্ভবত। শিবের উদ্দেশে বালক গণেশ হয়তো যুক্তকরে প্রণিপাত করছেন। তাঁর চোখদুটি অর্ধ-নিমীলিত।

পূজাবার্ষিকী ও গণেশ

বাংলা পত্র-পত্রিকার শারদসংখ্যা বা পূজাবার্ষিকীতেও দুর্গা পরিবারের সদস্য হিসেবে গণেশ এক চিরপরিচিত চরিত্র। মূলত পত্রিকার প্রচ্ছদে বিভিন্ন ভঙ্গিতে তাঁর উপস্থাপনা ঘটে। বঙ্গদেশে গণেশের বিচ্ছিন্ন এককত্ব যত না প্রচারিত, তার চেয়েও বেশি দুর্গা পরিবারের অন্তর্গত হয়েই গণেশ আমবাঙালির মনের কাছাকাছি পৌঁছোন। শারদসংখ্যার রঙিন-উজ্জ্বল প্রচ্ছদপটে অন্যান্য দেবদেবীদের সঙ্গে দেবত্বের ভারমুক্ত এক জীবন্ত চরিত্রের দেখা পাই আমরা। শুরুর পাতা দেখামাত্রেই গণেশকে ঘিরে স্নিগ্ধ-মনোমুগ্ধকর কৌতুক অথবা পরিহাস-রসিকতার আবহ মুহূর্তেই যেন তৈরি হয়ে যায়। তাঁর উপস্থিতিটাই এত সহজ জীবনরসের সঞ্চার করে আমাদের মধ্যে যে, পাঠকের সঙ্গে গণেশের মেলবন্ধনও একটা অকৃত্রিমতায় পৌঁছে যায়। গণেশের গজমুখ ও স্থূলদেহের বিশেষত্বটাই

তাঁর লোকপ্রিয়তার সবচেয়ে বড়ো মানক। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইঁদুরের প্রসঙ্গটিও। অত বড়ো চেহারার ভারবাহী নাকি নিতান্ত ক্ষুদ্র এক প্রাণী! সবকিছু মিলিয়ে বাঙালির গণেশদাদার ভাবমূর্তিটাই এমন যে, সব দেবদেবীদের ভিড়েও আলাদা করে প্রথম নজর কাড়েন তিনিই। লক্ষণীয়, এই ধরনের উপস্থাপনায় গণেশের মানবরূপেরই প্রাধান্য বলে অধিকাংশক্ষেত্রে মানুষের মতোই তাঁর দুটি হাত থাকে। তবে গণেশকে চেনার ক্ষেত্রে মুখ ও পেটের বৈশিষ্ট্যটুকুই যথেষ্ট। সঙ্গে ইঁদুর বাহন থাকলে তো আর কথাই নেই। গজমুখ ও লম্বোদর হিসেবেই তাঁর রূপাঙ্কন সর্বত্র। এ ছাড়া গায়ের রং-ও শাস্ত্রের নিয়মকানুন মেনে মোটের ওপর লাল বা গোলাপি ধরনেরই রাখা হয়। কখনও হয়তো গজমুখ অঙ্কনের ক্ষেত্রে হালকা লাল বা গোলাপির সঙ্গে সাদা রং ব্যবহার করা হয়। এই শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি অপরিবর্তিত রেখে উপস্থাপনার ঢঙে নতুনত্ব এনে বৈচিত্র্যসৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। এই পর্যায়ে আমরা বিশেষ কয়েকটি পূজাবার্ষিকীর প্রচ্ছদপত্রে গণেশের উপস্থাপনার ভঙ্গিগুলো লক্ষ করব। যেমন,

ক. ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীর প্রচ্ছদে দ্বিভুজ গণেশ মা দুর্গার সঙ্গে অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন। রণসাজে সেজে গণেশ মায়ের বাঁদিকে দণ্ডায়মান। তাঁর বাঁ হাতে পুথি বা পাণ্ডুলিপি, ডান হাতে গদা। গজমস্তকে মুকুট। তিনি একদন্ত ও গজমুখ। দেহের উর্ধ্বভাগে নীলরঙা জামার ওপর যুদ্ধের উপযুক্ত বর্ম পরেছেন। নিম্নাংশে সাদা ধুতি। বাল গণপতির কুসুমকোমল ভাবমূর্তিকে ছাপিয়ে এক সশস্ত্র যোদ্ধার আবির্ভাব দেখছি আমরা। হস্তধৃত পুথি যেমন বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক, তেমনই গদাধারী গণেশ শৌর্যবীর্যের প্রতীক। এখানে একইসঙ্গে বীর এবং বিদ্বান গণেশকে তুলে ধরা হয়েছে। (চিত্র ৬৬)

খ. ১৩৯৫ বঙ্গাব্দের শারদীয়া শুকতারার প্রচ্ছদে গণেশজননী মা দুর্গাকে দেখি আমরা। গণেশ এখানে সন্তান রূপে হাজির। সামনের বাঁ হাত দিয়ে গণেশকে কোলে আগলে রেখে দশভুজে দুর্গা মেঘের মধ্যে লড়াই করছেন। রূপপরিবর্তন করে মহিষাসুর পরিণত হয়েছেন গজাসুরে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মধ্যেও গণেশ কিন্তু মাতৃক্রোড়ে সুরক্ষিত। তিনি গজমুখ ও লম্বোদর। তাঁর উর্ধ্বভাগ অনাবৃত, নিম্নাংশে ছোটো সাদা ধুতি। মাথায় মুকুট পরিহিত। গণেশজননীর রূপাঙ্কনে যুদ্ধের ভয়াবহতাকে ছাপিয়েও এক স্নিগ্ধ-মধুর বাৎসল্যরসের প্রকাশ ঘটেছে। (চিত্র ৬৭)

গ. ১৪০৩ বঙ্গাব্দের শারদীয়া শুকতারার প্রচ্ছদে এক লড়াকু গণেশের দেখা পাই আমরা। বক্সিং ক্রীড়ায় তিনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সামিল হয়েছেন। দুই হাতে boxing gloves পরে উলটোদিকে থাকা পেশিশক্তিসম্পন্ন এক সমর্থ কিশোরের মোকাবিলা করছেন তিনি। গণেশ যে কেবল মায়ের নাদুসনুদুস খোকাটিই নন, প্রয়োজনে বক্সিং-এ অংশগ্রহণ করে শক্তি পরীক্ষাতেও অবতীর্ণ হতে পারেন, এই বাহুবলী গণেশের চিত্রাঙ্কনের মধ্যে সেই ভাবটি-

ই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাল গণেশের নমনীয়তার বাইরে বাঙালি এক শক্তিধর বীর গণপতির রূপায়ণের সাক্ষী হয়ে রইল। (চিত্র ৬৮)

ঘ. ১৪২৩ বঙ্গাব্দের আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীর প্রচ্ছদে এক বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজায় গণেশ নিজেই বাদক হিসেবে উপস্থিত। ঢাকির বদলে তাঁকেই দেখছি আমরা। ঢাকের কাঠিতে বোল তুলে পুজোর আনন্দ দ্বিগুণ করছেন তিনি। ঢাকের বাদ্যি ছাড়া বাঙালির দুর্গাপূজা অসম্পূর্ণ। সংগতে ইঁদুর বাহনটিও রয়েছে। ধুতি-ফতুয়া পরে সেও কাঁসর বাজাচ্ছে। ঠাকুরদালানে কাঠামোয় পূজিত হচ্ছেন যাঁরা, বারান্দায় বা উঠোনে তাঁরাই সব মানুষের বেশে উপস্থিত। ঐশিত্ব ঘুচিয়ে মাটি-পৃথিবীর টানে সব দেব-দেবীরই যেন মানবজন্ম দেখছি আমরা। আনন্দে মশগুল হয়ে সকলেই পুজোর কাজে হাত লাগিয়েছেন। চারুকলার সমস্ত শাখাতেই গণেশের পটুত্ব স্বীকৃত বলে বাদক হিসেবে এখানে তাঁর চিত্রনির্মাণ আরও প্রাসঙ্গিক হয়েছে। (চিত্র ৬৯)

ঙ. ১৪২৫ বঙ্গাব্দের আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীর প্রচ্ছদে গণেশ সর্বকনিষ্ঠ এবং বালরূপে উপস্থিত। মায়ের আর দুই মেয়ে ও এক ছেলে পায়ে হেঁটে পথ চললেও গণেশ উঠেছেন মায়ের কোলে। তিনি গজমুখ ও লম্বোদর। পথের দু'ধারে কাশফুল ফুটে আছে। গ্রামবাংলার উদারবিস্তৃত প্রেক্ষাপটে এক শান্ত সহজ জীবনের ছবি। গণেশের দেহের উর্ধ্বভাগ অনাবৃত, নিম্নাংশে ছোটো সাদা ধুতি। চিত্রে মা এবং সন্তানেরা সকলেই সাদামাটা আটপৌরে পোশাক পরেছেন। গণেশ ডানহাতে মায়ের গলা ধরে আছেন। সারা দেহে কোথাও কোনও আভরণ নেই। এখানে মাতৃক্রোড়গত গণেশের উপস্থাপনায় বাৎসল্য-রস প্রকাশিত হয়েছে। (চিত্র ৭০)

চ. ১৪২৬ বঙ্গাব্দের শারদীয়া শুকতারার প্রচ্ছদে মা দুর্গা নিজেই শুকতারা-র পূজা সংখ্যাটি থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন ছানাপোনা ও তাঁদের বাহনদের। মধ্যে বসেছেন মা। ছেলে-মেয়েরা ঘিরে আছেন তাঁকে। মায়ের ডানদিকে গণেশ ইঁদুরকে নিয়ে বসেছেন। ইঁদুর-ও একমনে শুনে যাচ্ছে। গণেশের মাথায় মুকুট, হাত-কান-গলা অলংকারে সুসজ্জিত। কপালে ত্রিশূলচিহ্নের তিলক আঁকা। তিনি একদন্ত। একটি হাতে গদা ধরে আগডুম বাগডুম হয়ে বসে আছেন। শুকতারা থেকে মা এমনই কোনও আকর্ষক বর্ণনা পড়ে শোনাচ্ছেন যে গণেশের চোখদুটি উৎসাহে-উদ্দীপনায় জ্বলজ্বল করে উঠেছে। টানটান উত্তেজনা তাঁর চোখে-মুখে প্রকাশ পাচ্ছে। এক মনোযোগী শ্রোতার একাগ্রতা এ হেন অংশগ্রহণে ধরা পড়েছে। দেবমণ্ডলে 'পরমজ্ঞানী' বলে বিদ্যাবত্তায় বিশেষ রুচি গণেশের। একসময় ব্যাসোক্ত ভারতকথা শুনে শুনে লিখেছেন। কাজেই, শ্রোতা হিসেবে তাঁর অখণ্ড মনোযোগ প্রশ্নাতীত। এখানেও কনটেন্টের আকর্ষণে গভীর মনোযোগে শুনছেন মায়ের পড়ে যাওয়া অংশগুলো। পত্রিকা হিসেবে

বিষয়বস্তুর আকর্ষণে শারদসংখ্যাটির গুণগত মান পাঠকদের কাছে বিজ্ঞাপিত করার জন্যই এমনভাবে দেবচরিত্রদের সাজানো হয়েছে। (চিত্র ৭১)

ছ. ১৪২৬ বঙ্গাব্দের পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলার প্রচ্ছদে গণেশ বালকবেশে হাজির। তিনি এখানে কলকাতার কোনও একটি ফ্লাইওভারে দাঁড়িয়ে মা ও ভাই-বোনেদের সঙ্গে নিজস্বী বা সেলফি তুলছেন। কার্তিকের হাতে সেলফি স্টিকটি ধরা। বেশ গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারা গণেশের। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবির মতো কোনও প্রথাগত পোশাক নেই। কচিকাচাদের হালফিলের পোশাকের সঙ্গে মানানসই করে তাঁকেও বাদামি রঙের হাত কাটা গেঞ্জি ও বেগুনি রঙের পকেটওয়ালা বারমুডা প্যান্ট পরানো হয়েছে। গজমস্তকে লাল টুপি ও পায়ে কাবলিসু জুতো পরেছেন। লম্বোদর বলে যথারীতি ভুঁড়িদাস তিনি। দু'হাতে দুটো আইসক্রিম ধরে শুঁড়ের সাহায্যে খাচ্ছেন। ছবি তুলছেন বলে কোনও বিরাম নেই। আইসক্রিম খাওয়া সমান তালে চলছে। নিজস্বী বা সেলফি তুলছেন বলে বেশ প্রসন্ন মুখেই ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছেন। আধুনিক প্রযুক্তি মাধ্যমের উপভোক্তা বা ব্যবহারকারী হিসেবে দেবতাদের এখানে পেয়েছি আমরা। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁদেরও সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। (চিত্র ৭২)

জ. ১৪২৮ বঙ্গাব্দের পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলার প্রচ্ছেদে ধোপদুরস্ত বাবুটি সেজেছেন তিনি। ভিক্টোরিয়ার সামনে ঘোড়ার গাড়ির দরজা খুলে মা'-কে নামতে সাহায্য করছেন। মনে হয় মা দুর্গাকে নিয়ে চার ভাইবোন কলকাতার পুজো দেখতে এসেছেন। পরিবারিক চিত্রের মধ্যেও ভিক্টোরিয়াকে ব্যাকগ্রাউণ্ডে রেখে এক টুকরো শহর জেগে রয়েছে। গণেশ ছবিতে মালকোঁচা মেরে ধুতি পরেছেন। বাঁ হাতে কোঁচাটি ধরে আছেন, ডান হাতে গাড়ির দরজা খুলছেন। পরনে তাঁর হলুদরঙা পাঞ্জাবি, বুকের কাছে নকশা করা। সঙ্গে সাদা হলুদপাড় ধুতি। পায়ে নাগড়াই জুতো পরেছেন। কপালে লাল তিলক, হাতে বালা। উৎসবের দিনে বেশ খোশমেজাজেই আছেন মনে হচ্ছে। একগাল হাসি তাঁর মুখে। দুর্গাকে গাড়ি থেকে নামানোর দৃশ্যে দায়িত্ববান ছেলের মায়ের প্রতি যত্ন-ও প্রকাশ পেয়েছে। (চিত্র ৭৩)

বাংলা পূজাবার্ষিকীর প্রচ্ছদে গণেশের উপস্থাপনার ধরন-ধারণ থেকে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে, এইসব ক্ষেত্রে দেবতার কোনও স্থিরনির্দিষ্ট রূপ নেই। পরিবর্তিত সময়, রুচি এবং মূল্যবোধের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁকে নিত্যনতুন চেহারায় হাজির করা হচ্ছে। আসলে, সময়ের দাবিটুকু প্রকাশ করতেই দেবতা এখানে medium বা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত। যেমন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দের আনন্দমেলা বা শুকতারার পূজাবার্ষিকীতে দেখব, সমসময়ের দাবি মেনে গণেশ সহ দুর্গা পরিবারের প্রত্যেকেই করোনাসুরকে নির্মূল করতে ব্যস্ত। বিশেষত আনন্দমেলার প্রচ্ছদে গদা

হাতে এক বলদৃপ্ত গণেশের রূপায়ণ দেখি আমরা। আসলে সময়ের প্রলেপ পড়েছে দেবচরিত্রের উপস্থাপনায়। আধুনিকতার মাত্রাবদলের সঙ্গে দেবতার ভাবমূর্তির মধ্যেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। তবে দেবতাকে যতই সমকালীন করে প্রকাশ করার চেষ্টা থাক না কেন, তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মৌল দিকগুলিকে অব্যাহত রাখা চাই। না হলে বিশেষ কোনও দেবতার চিহ্নিতকরণ-ই সম্ভব হবে না। যেমন, গণেশের ক্ষেত্রে শারীরিক স্থূলত্ব বা খাদ্যাসক্তির মতো প্রবণতাগুলিকে বাদ দিয়ে তাঁর রূপাঙ্কন অসম্ভব। দেবতার নবীকরণ বলতে আমরা যা বুঝি, সবটাই আসলে সময়ের পরিবর্তিত ভাষ্যের সঙ্গে কিংবা জীবনের চলমান ছন্দের সঙ্গে দেবতার ভাবমূর্তিকে বুনে নেওয়া, এর বেশি কিছু নয়। কারণ, যতই নতুনতর করে তাঁকে রঙে-রেখায় উপস্থিত করি না কেন, শাস্ত্র তাঁর গুণপনার যে যে ক্ষেত্রগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, সত্যিই কি অতি বড়ো ভাঙা-গড়ার কারিগরও তার থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যেতে পারেন? নাকি ঐতিহ্যক্রমে যে ধরনের গুণবৈশিষ্ট্য বিশেষ ওই দেবতার সঙ্গে লাগসই, তাকে অনুসরণ করেই শিল্পীকে দেবচরিত্রের নবনির্মাণ করতে হয়। যেমন, আমাদের আলোচনাতেই শারদীয়া পূজাসংখ্যার প্রচ্ছদে গণেশের উপস্থাপনার যে কয়েকটি রকমফের দেখলাম, ক্রমান্বয়ে সাজালে দেখব, গণেশের শক্তিমত্তা, মায়ের কোলের আশ্রয় ও নির্ভরতা, বাদনপটুত্ব, শোনার একাগ্রতা, খাদ্যাসক্তি এবং মায়ের প্রতি যত্ন ও মনোযোগ— এর সবকটিই তো পরম্পরাসূত্রে গণেশের ভাবরূপের সঙ্গে অন্বিত। তাহলে নবীকরণ কোথায় ঘটছে? ঘটছে কেবল বিষয় অনুযায়ী উপস্থাপনের ঢঙে। বহিরঙ্গে বদল এলেও গুণ ও কর্মের শাস্ত্রানুমোদিত বৈশিষ্ট্য অন্তঃস্রোতের মতো থেকেই যায়। তবে, একটা কথা ঠিক, শুধুমাত্র ধর্মীয় বেষ্টনীটুকুতে সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের দেবতাকে এই যে আমরা সমকালের যাবতীয় সম্ভাবনা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সঙ্গে একাকার করে ফেলেছি, এতে দেবতা-ও আর দূরের নেই, একেবারে কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন। মানুষ দেবতার হাতে সৃষ্ট কিনা জানা নেই, তবে মানুষের হাতে নব নব আঙ্গিকে দেবতার রচনা এক ছেদবিহীন পরম্পরায় হয়েই চলেছে। ফলে প্রচ্ছদশিল্পীর দক্ষতা বা সৃজন কুশলতায় দেবতারাও জ্যান্ত হচ্ছেন অনবরত। গণেশের ক্ষেত্রে এমন জন্মান্তর সুখের কথা বৈকি!

উল্লেখসূচি :

১। http://www.srishtisandhan.com/Srishtisandhan/Magazine/content/DS, accessed on 22. 5. 21

২। "প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলার লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে কাঠের শিল্প", ২৮ জুন ২০২৩ http://www.bongodorshon.com/home/story_detail/bengals-own-handmade-wooden-crafts, accessed on 28. 06. 2023

৩। বিভূতিসুন্দর ভট্টাচার্য, "পুতুল নেবে গো, পুতুল", *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১২ জানুয়ারি ২০১৪, http://archives.anandabazar.com/archive/1140112/12special-story.html, accessed on 27. 9. 21

৪। তিয়াষা গুপ্ত, " 'ছৌ' যখন আদিবাসী যুদ্ধনৃত্য' ", ১৬ নভেম্বর ২০২২ http://www.bongodorshon.com/home/story-detail/whenchhau-is-a-tribal-war-or-folk-dance, accessed on 18.11.2022

৫। "বাঙালির নিজস্ব শিল্প অভিব্যক্তির এক বিশেষ প্রকাশ কালীঘাটের পট", ৩১ জানুয়ারি, ২০২০ http://www.bongodorshon.come/home/story_detail/urban-art-kalighat-pot-painting, accessed on 1. 2. 2020

৬। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রানী চন্দ, *জোড়াসাঁকোর ধারে,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কার্তিক ১৩৫১, পৃ. ১২৯

৭। ওই, পৃ. ১২৯

৮। 'ও চাঁপা, ও করবী', *আনন্দবাজার অনলাইন,* http://www.anandabazar.com/patrika/review-of-an-art-exhibition-at-devbhasa-gallary/cid/1413309, accessed on 12.3.2023

৯। অরুণ সেন, 'যোগেন চৌধুরীর ছবি', *Jogen Chowdhuri Special issue*, Nandimukh Publication, 2002, p. 131

উপসংহার

'গণপতি-তত্ত্ব এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গণপতি প্রসঙ্গ'— বিষয়টি নিয়ে রচিত অভিসন্দর্ভে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে গণপতি বা গজানন গণেশের 'দেবতা' হিসেবে উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের স্তরগুলি যেমন প্রথম পর্যায়ে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনই দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্দিষ্টভাবে বঙ্গদেশের ধর্ম, সমাজ এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে গণপতি প্রসঙ্গের নানা মাত্রা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় লেখপ্রমাণ, মূর্তিপ্রমাণ এবং সাহিত্যপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় গণপতি উপাসনার চিহ্নগুলি সন্ধান করা হয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অন্যান্য প্রকরণে গণপতি প্রসঙ্গের পরিগ্রহণ কীভাবে এবং কোন কোন মাত্রায় ঘটেছে, তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ধারাবাহিকভাবে কাজটি করতে গিয়ে গণপতির ভাব-শাস্ত্র-তত্ত্ব অধ্যয়নের পাশাপাশি বঙ্গদেশের ধর্মীয় ঐতিহ্যে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন সংরূপে গণপতির আত্তীকরণের ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রবণতা আমরা লক্ষ করেছি, সেগুলিকে সংহতভাবে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

প্রথমত, প্রাচীন বঙ্গে সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকেই অভিলেখ-প্রমাণে গণপতির পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া গেছে। কাজেই, ধারণা করা যেতে পারে সর্বভারতীয় পুরাণমণ্ডলে চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকেই ধারাবাহিকভাবে গণেশের প্রতিষ্ঠার যে স্তরগুলি লক্ষ করা যাচ্ছিল, তার সঙ্গে সংগতি রেখেই সপ্তম শতকের বঙ্গদেশে গণেশ মুখ্যত শৈবগোষ্ঠীর দেবতা হিসেবেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূলধারায় গৃহীত হন। এ ছাড়া বৃহৎবঙ্গে শাক্ততন্ত্র এবং শক্তিমুখ্য উপাসনা সূত্রেও মাতৃকাপ্রকৃতির সঙ্গে গণেশের সংস্রব দৃঢ়বদ্ধ হয়।

দ্বিতীয়ত, অষ্টম থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ— এই সময়পর্বে বঙ্গীয় পুরাণাদির সূত্রে পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে বিঘ্নবিনাশক ও সিদ্ধিদাতারূপে গণেশের একটি বিশিষ্ট স্থান তৈরি হতে থাকে। প্রাথমিকস্তরে শিব ও শক্তির পার্শ্ব বা সহদেবতা রূপে বিদিত গণেশ এই সময় মূর্তিতেও এককভাবে রূপায়িত হন। তাঁর নিজস্ব শক্তি ও মহিমার একটি স্বতন্ত্র বৃত্ত তৈরি হতে থাকে। তবে ভুললে চলবে না, বাংলার পৌরাণিক আখ্যানে গণেশজন্মের ক্ষেত্রে শিব, পার্বতী ও বিষ্ণুর অংশগ্রহণ এই হারে ঘটেছে যে, প্রায় সবক্ষেত্রেই গজানন তাঁদের পুত্র পরিচয়ে উপস্থাপিত। *দেবীপুরাণ*-এ শিবের ইচ্ছায় বিষ্ণুর দেহজাত, *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এ শিব ও বিষ্ণুর অংশোৎপন্ন, *মহাভাগবত*-এ পার্বতীর অঙ্গমলনির্মিত হলেও বিষ্ণুর-ই দ্বিতীয় মূর্তি এবং *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এ শিবাশীষে পার্বতীর পরিধেয় লালরঙা

বস্ত্রখণ্ড থেকে আবির্ভূত। উল্লেখ্য, *দেবীপুরাণ* বা *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*-এর পরশুরাম বনাম গণেশ প্রসঙ্গে গণপতি-বিনায়কের যোদ্ধৃসত্তার উদ্‌যাপন ঘটলেও 'বীর গণপতি'-র তুলনায় 'বাল গণপতি'-ই বঙ্গদেশের ভূমিপ্রকৃতি ও মানসিক আবহাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে প্রসিদ্ধ হয়েছেন বেশি। ফলে বঙ্গীয় পুরাণ-পরম্পরায় গণপতির চরিত্র নির্মাণের যে আরেকটি সমান্তরাল পরত-ও ছিল, সেই শৌর্যবীর্যপ্রধান গণেশ ক্রমশ শিব-পার্বতীর নাদুসনুদুস আদরের খোকাটির আইডেনটিটির মধ্যে আত্মলোপ করেছে।

তৃতীয়ত, এই শক্তিরঙ্গবঙ্গভূমিতে শাক্ততন্ত্রে এবং অন্যান্য ধর্মাচারে গণেশের সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক এত প্রকট ও উদ্‌যাপিত যে, শিব-পার্বতী পরিবারে 'পুত্রব্রহ্ম'-রূপেই তাঁর সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। গণেশের স্বরূপগত বিরাটত্ব জেনেও তাঁকে সন্তান গণপতি হিসেবেই করা হয়েছে সর্বত্র।

চতুর্থত, ইসলাম-পূর্ব যুগে পূর্ববঙ্গের তান্ত্রিকী পরম্পরায় গণেশ সাধনা অত্যন্ত সুপ্রচলিত ছিল। তন্ত্রমার্গের সূত্রে গণেশের শক্তি বা দেবীর সঙ্গে সংস্রব অবধারিত। শাক্ততন্ত্রে দশমহাবিদ্যার প্রত্যেক বিদ্যার সঙ্গে দাসরূপে, প্রভুরূপে, স্বামীরূপে বা সন্তানরূপে গণেশের এক-একটি রূপভেদের সংযোগ বিদ্যমান। তন্ত্রসাধনায় গণেশ বিষ্ণু, শিব বা পার্বতীপুত্রের পরিচয় ছাপিয়ে পূর্ণশক্তিধর রূপেই গৃহীত হয়েছেন। গণপতির তান্ত্রিক রূপভেদগুলির মধ্যে হেরম্ব ও উচ্ছিষ্ট গণেশের উপাসনাই বঙ্গে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রসঙ্গত, রামপালের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত পঞ্চমুখ হেরম্বমূর্তি ও সুন্দর শর্মা লিখিত *উচ্ছিষ্ট গণপতি কল্প*-এর তথ্যসমর্থন মিলবে। বঙ্গীয় তন্ত্রমার্গে *প্রাণতোষিণী*, *পুরশ্চরণরত্নাকর* প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের সূত্রে গণপতির বিভিন্ন রূপের উপাসনার কথা জানা যায়। পুরশ্চরণাদিকর্মে গণেশের অগ্রাধিকার সম্মত। সর্বাগ্রে চৌর গণেশের পূজা না করলে তিনি সাধনার ফল হরণ করেন। কাজেই, সাধনবিঘ্ন এড়াতে চৌর গণেশ ন্যাস অবশ্যকৃত্য। এ ছাড়া তান্ত্রিকী সাধনায় দেহস্থ ষট্‌চক্রের মধ্যে মূলাধারে ভূতত্ত্বময় গণেশের অধিষ্ঠান। মূলাধারস্থিত গণেশের আনুকূল্য না পেলে পরবর্তী চক্রগুলিতে প্রবেশের অধিকার লাভ করা যায় না। এ ছাড়া চৈতন্যের সমকালে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের *বৃহৎ তন্ত্রসার*-এ *শারদাতিলক*-এর প্রমাণ নির্ভরতায় যেভাবে বিস্তৃতরূপে তান্ত্রিক গণেশের পরিচয় ও উপাসনা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা থেকেও বাংলার কৌলমার্গে গণেশের দৃঢ়মূল অবস্থান টের পাওয়া যায়।

পঞ্চমত, গুপ্তোত্তর যুগে বঙ্গদেশে পৌরাণিক দেব-দেবীদের মহিমাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গণপতি-ও স্মার্ত হিন্দুর ধর্মমানসে গৃহীত হয়েছেন। যদিও বঙ্গীয় স্মৃতিনির্ভর ধর্মচর্যায়, বিশেষত পঞ্চোপাসনার বৃত্তে গণেশের প্রবেশাধিকার প্রথমাবধি ছিল না। গবেষণায় তা দেখানো হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ রঘুনন্দন-পূর্ব প্রাচীন

বঙ্গদেশে গণপতি প্রথম দেবতার আসনলাভ করেননি। মৈথিল স্মৃতিনিবন্ধ প্রমাণে তিনি দক্ষিণস্থ দিকপাল। দিকবন্ধনে তাঁর পূজা আবশ্যক। যদিও বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যত্র আদিদেব রূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকেই ধারাবাহিকভাবে ঘটেছে। পঞ্চোপাস্যের ক্রমে ব্যতিক্রম কেবল এই বঙ্গেই লক্ষণীয়। প্রাচীন বঙ্গে বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ানির্ভর ধর্মচর্যায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় প্রথম উপাস্যরূপে অগ্নির-ই উপস্থিতি সর্বত্র, গণেশের প্রথমোল্লেখ কোথাও নেই। ভবদেব ভট্ট বা তৎপরবর্তী স্মৃতিকাররা কেউই প্রথম দেবতা রূপে গজানন-গণেশকে গ্রহণ করেননি। ফলে পঞ্চদশ শতকের আগে পঞ্চোপাসনায় ব্রাত্য-ই ছিলেন গণপতি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন-ই সর্বপ্রথম তাঁর *আহ্নিকতত্ত্ব*-এ এই গাঙ্গেয় সমভূমিতে স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাসনায় গণপতি-বিনায়ককে প্রথমপূজ্য রূপে করেন। এই শক্তিরঙ্গবঙ্গভূমিতে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের অসম্ভাব্যতা এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মের নিয়মতান্ত্রিক অসারতা বুঝে শ্রুতির অগ্নিকে তিনি গণেশের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করেন। প্রত্নকল্পের ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যাবে বেদোক্ত অগ্নির পৌরাণিক সাপ্লিমেন্ট বা সম্পূরক ব্রহ্মা। কিন্তু পুরাণ-প্রমাণে ব্রহ্মা কলিতে একমাত্র পুষ্করতীর্থ ছাড়া অন্যত্র অপূজ্য বলে এবং ব্রহ্মা পূজায় শাপমোচনাদির সমস্যা থাকায় স্মৃতিকার ব্রহ্মাকে গণেশ দিয়ে ব্যবস্থিত করেন। রঘুনন্দনের *তিথিতত্ত্ব* গ্রন্থেও ভাদ্রকালীন গণেশ চতুর্থীর পূজাবিধান এবং চন্দ্রদর্শন জাতীয় নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তদশ শতকে গোবিন্দানন্দ মিশ্রের *বর্ষক্রিয়াকৌমুদী*-তেও রঘুনন্দনের মতোই গণেশ চতুর্থীর বিধান সমর্থিত হয়েছে। অতএব স্মার্ত হিন্দুর ধর্মাচারে আদিপর্বের বাংলায় প্রথমপূজ্যরূপে অগ্নির শাস্ত্রীয় মান্যতা থাকলেও মধ্যযুগের বঙ্গদেশে পঞ্চদশ শতক থেকে ধারাবাহিকভাবে স্মার্ত বিধিমতে গণেশ আদিপূজ্যতা স্বীকৃত হয়।

ষষ্ঠত, মধ্যযুগের বঙ্গদেশে মূলত তিনটি সাহিত্যশাখাকে আশ্রয় করে গণপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। অনুবাদ সাহিত্যে গণেশের চিত্রণ গতানুগতিক এবং শাস্ত্রানুগ। *কৃত্তিবাসী রামায়ণ*-এর গণেশ জন্ম প্রসঙ্গে *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ* ও *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এর আখ্যান অনুসৃত হয়েছে। ভারতকথার অনুলেখক হিসেবে গণেশের যে প্রসিদ্ধি ভারতব্যাপী ঘটেছে, মূল *মহাভারত*-এর অনুসরণে *কাশীদাসী মহাভারত*-এও সেই প্রসঙ্গ গৃহীত হয়েছে। অতএব, মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ কাব্যে গণেশের প্রথাবদ্ধ উপস্থাপনা লক্ষ করা গেছে।

মঙ্গলগীতের সংরূপেও গণেশের ভূমিকান্তর ঘটেনি। এক্ষেত্রে তাঁর উপস্থাপনা শাস্ত্রীয় বিধিপালনের দায়বদ্ধতা থেকেই ঘটেছে। 'আদিপূজ্য' হিসেবে গণেশের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় বিপ্রদাস পিপিলাই-এর *মনসামঙ্গল* বা *মনসাবিজয়* শীর্ষক মঙ্গলগীতে। বস্তুত, বন্দনায় গণেশের স্বরূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে মঙ্গলগীতের কবিদের মধ্যে

একধরনের dilemma কাজ করেছে। অধিকাংশ কবি-ই গাণপত্য কুলদেবতার পরমতা বিষয়ে সজাগ থেকেও ক্ষেত্রবিশেষে তাঁকে শিব-গৌরীর গার্হস্থ্যযাপনের সূত্রে 'বাল' বা 'সন্তান গণপতি' রূপেই প্রতিষ্ঠা করেছে। বেদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মরূপ গণেশকে তত্ত্বসারমাত্র উপলব্ধি করেও বাঙালি-মানসের স্বাভাবিক প্রবণতায় মঙ্গলগীতকার তাঁকে 'পুত্রব্রহ্ম' রূপেই উপস্থাপিত করেছেন। তবে শিব-পার্বতীর পুত্র হিসেবে গণেশের পরিচয়লাভ বন্দনায় সচরাচর ঘটলেও তাঁর মহিমাপ্রকাশে কবিরা এতটুকু কার্পণ্য করেননি। সিদ্ধিদাতা এবং বিঘ্নহর্তারূপে গণেশের পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক ধ্যানমন্ত্রের নানা অনুষঙ্গ এইসব বন্দনার ভাষ্যে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়েছে। বন্দনার বিবরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পরিচ্ছেদ, অলংকার, বাহুভূষণ ও বাহন সহ গণপতির এক সর্বাঙ্গসম্পন্ন মূর্তি। এই জাতীয় গণপতি-স্মরণের উদ্দেশ্য বিঘ্নহরণ এবং সাফল্যলাভ। উদ্দিষ্ট মঙ্গলগীতের পালাটি আসরে যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত হতে পারে, তাই শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে প্রথমেই গণপতির আরাধনা কর্তব্য। তবে সব কবিই যে একই হারে গণেশকে দিয়েই বন্দনাংশের নান্দীমুখ সেরেছেন তা নয়, টেক্সট অনুযায়ী এক-একসময় আগে-পরে হয়েছে। তবে বন্দনার ক্রম যাই থাক, সকলেই যে গণেশের ঐতিহ্যগত ভূমিকাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই বর্ণনা করেছেন, এ ব্যাপারে নিঃসংশয় হওয়াই যায়।

মঙ্গলগীতে গণেশের প্রকাশরূপের উপস্থাপনায় যে ধরনের টানাপোড়েন স্পষ্ট, শাক্ত পদাবলীর ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। এখানে মেনকা-উমার বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য সম্পর্কের একটি সমান্তরাল স্তর উঠে এসেছে গৌরী ও গণেশের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। মঙ্গলগীতের মতোই শাক্তগীতেও গণেশের রূপায়ণ 'পুত্রব্রহ্ম' ('যিনি পুত্র তিনিই ব্রহ্ম' বা 'পুত্র অথচ ব্রহ্ম' অর্থে) হিসেবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্বতীর সন্তানরূপে হাজির হলেও পূর্ণতত্ত্ব গণেশের ঐশ্বর্যরূপ সম্বন্ধে পদকর্তারা অবগত। একটি-দুটি জায়গায় গৌরীর জবানিতে অথবা পদকর্তার বিবরণে উমাপুত্র গজানন গণেশের সেই পরমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে। ফলত, গণেশকে সর্বতত্ত্বসার জেনেও বঙ্গদেশের ভৌম প্রকৃতি ও মানস-প্রবণতা অনুযায়ী একটি পারিবারিক আবহাওয়ায় 'পুত্র'-সম্পর্কে যুক্ত করা হয়েছে।

সপ্তমত, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গণপতি ও তদ্বিষয়ক প্রসঙ্গের উপস্থাপনা বহুমাত্রিক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণে গণপতি প্রসঙ্গের পরিগ্রহণ বহুমাত্রিক। উনিশ-বিশ শতকের কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে যেমন মঙ্গলগীতের আদর্শ অনুসারে 'বন্দনা'-জাতীয় রচনার নিদর্শন পাওয়া গেছে, তেমনি সময়ের দাবি মেনে গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে গণেশের কাছে ব্যক্তি-কবির জীবনবোধের exposition বা উন্মোচনও একটা আলাদা ধরন হয়ে উঠেছে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও বিষয়বস্তুর মধ্যে গণেশ সরাসরি আছেন, এমন কবিতায় একদিকে যেমন

পৌরাণিক অনুষঙ্গের তলায় তলায় জীবনের নানা জটিল-গভীর পরত ঢুকে গেছে, তেমনই বঙ্গদেশের পরিবার-সম্পর্কের এক সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াময় ছবিও কবিতার বয়ানে উঠে এসেছে। আবার, ভারতীয় পুরাণ-মহাকাব্যের ঐতিহ্য থেকে কোনও একটি প্রসিদ্ধ কিংবদন্তিকে সমকালীন তাৎপর্যে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতেও দেখেছি আমরা। দেবতার নবরূপায়ণ বা পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে de-divinization-ই যে সবক্ষেত্রে হয়েছে তা নয়, অনেক জায়গায় তাঁর দেবত্ব স্বীকার করেও ইহজীবনের নানা অনুভূতি, পারিপাশ্বির্কের নানা চিহ্ন, মানুষের মনোবৃত্তির পৃথক পৃথক ধরন গণেশের উপস্থাপনার ভাঁজে ভাঁজে গুরুত্ব পেয়েছে।

বঙ্গদেশের ধর্মীয় ঐতিহ্যে শক্তি, শিব এবং বিষ্ণুর ভূমিকা এতটাই প্রবল এবং অনিবার্য যে, গণেশকে প্রথম থেকে শক্তিমান প্রতিপক্ষের সঙ্গে আসন সমঝোতা করেই এগোতে হয়েছে। গবেষণায় আমরা দেখিয়েছি, আদিপর্বের বাংলায় বিষ্ণু এবং শিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে শৌর্যবীর্যদৃপ্ত গণেশের একটি স্বতন্ত্র রূপায়ণ ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে এই ধারাটিরই পুষ্টিবৃদ্ধি হলে এক বীর গণেশের যোদ্ধৃসত্তার উদযাপনে বঙ্গদেশ মুখরিত হত। হয়তো শিব বা কৃষ্ণের মতো দুই পুরুষদেবতার প্রভাবাধীন হয়েই কালক্রমে এই বীর গণপতির একটা individual development-এর সাক্ষী থাকতাম আমরা। সেক্ষেত্রে পূর্ণ পুরুষ বা male soul হিসেবে শক্তি, শিব বা বিষ্ণুর সমান্তরালে গণপতি-ও সঙ্গতভাবেই প্রাধান্য দাবি করতেন। কিন্তু, বাস্তবে এমনটা ঘটেনি। বরং প্রথম পর্বে নটবর কৃষ্ণ বা নটরাজ শিবের দেহভঙ্গির সাদৃশ্যে নৃত্য গণপতির স্বতন্ত্র রূপায়ণের বহু নিদর্শন বাংলার নানা জায়গায় পাওয়া গেলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তিরঙ্গবঙ্গভূমিতে mother cult-এর অপ্রতিহত ক্ষমতার কাছে হার মানতে হয়েছে গণেশকে। কখনও শক্তির অনুচর বা পার্ষদরূপে, কখনও পুত্ররূপে দেবীর সঙ্গে সহাবস্থান করেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বীর গণেশের আদিধারাটি বঙ্গীয় জনস্মৃতিতে বিলীয়মান হতে হতে একসময় মায়ের ব্যাটা হিসেবেই অস্তিত্বরক্ষা করেছেন গজানন। বেদপ্রতিপাদ্য স্বানন্দনাথ গণপতি-গণেশের পরমতাকে খর্ব করে কখনও শিব-পার্বতী, বা কখনও বিষ্ণুর সঙ্গে অন্বিত হয়ে এই যে বঙ্গীয় প্রেক্ষিতে বাল গণেশের উপস্থাপনা করা হল, এ নিয়ে মধ্যযুগের বাংলায় শাস্ত্র-পারঙ্গম কবিরাও যথাসম্ভব দ্বিধান্বিত ছিলেন। বিশেষত মঙ্গলগীতের প্রকরণে গাণপত্য কুলদেবতার ভারতব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা সত্ত্বেও বারবার তাঁকে শিব বা গৌরীপুত্রের পরিচয়ে কিছুটা subordinate করে রাখতে দেখা যায়। বাংলার সাধক-কবিরা যে পরব্রহ্মরূপ গণেশের বিরাটত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন না তা নয়, পরিপার্শ্বস্থ ধর্মকাল্টগুলির চাপে বঙ্গদেশের পক্ষে মানানসই একটি পারিবারিক বেষ্টনীর মধ্যে তাঁরা গণেশের অবস্থান সীমাবদ্ধ করেছেন। ফলে বঙ্গদেশে শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত কাল্টের মতো dominant

power-এর সামনে গণেশের গৌণ দেবতায় পর্যবসিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। শিব-পার্বতীর আদরের নাদুসনুদুস খোকাটি সন্তান পরিচয়েই সাধারণ্যে এত পপুলার হয়েছেন যে, গাণপত্যের গণেশ হিসেবে বঙ্গদেশে তাঁর স্বাতন্ত্র্য অনায়ত্ত থেকে গেছে। তার ওপর পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাস্যের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েও non-sect দেবতা হিসেবেই থাকতে বাধ্য হয়েছেন।

বাংলায় এক ভাদ্র চতুর্থীর গণেশ পূজা বাদ দিলে পয়লা বৈশাখ বা অক্ষয় তৃতীয়ায় লক্ষ্মীর সঙ্গে এবং শারদীয় দুর্গোৎসবে দুর্গার সঙ্গে সহ-দেবতা হিসেবেই তাঁকে পূজিত হতে হয়। স্বভাবতই সামাজিক উৎসব বা আড়ম্বরের নিরিখে গণেশের একক উদ্‌যাপন বাংলায় বেশ সীমিত। বঙ্গদেশীয় *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ* ও *পুরোহিত দর্পণ*-এর সমর্থনে আষাঢ় বা ফাল্গুন মাসের 'গণেশব্রত' এবং শ্রাবণ, ভাদ্র, মাঘ ও অগ্রহায়ণ মাসের গণেশপূজা শাস্ত্রের অনুমোদন পেলেও ভাদ্র চতুর্থী ব্যতিরেকে অন্যান্য মাসের চতুর্থীগুলি বঙ্গদেশের বৃহত্তর পটভূমিকায় আদৌ কি গুরুত্বপূর্ণ হতে পেরেছে? মাঘী চতুর্থী অর্থাৎ শ্রীপঞ্চমীর পূর্বদিনটিরই *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ* প্রমাণে বঙ্গদেশে স্মার্ত বা পৌরাণিক কৃত্য হিসেবে গৃহীত হওয়ার কথা। যদিও সরস্বতী পূজার প্রস্তুতিজনিত বহুব্যস্ততার ভিড়ে মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীর গুরুত্ব সাধারণ বাঙালি আজ বহুলাংশেই বিস্মৃত। তুলনায় শারদীয় পূজার প্রাক্কালে ভাদ্র চতুর্থীর গণেশ পূজা বঙ্গদেশের প্রেক্ষিতে জনপ্রিয়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ভাদ্র মাস সূর্যের দক্ষিণায়নভুক্ত বলে তন্ত্রকাল বলে স্বীকৃত। কাজেই, শাস্ত্রীয় বিচারে ভাদ্র চতুর্থীর গণেশ পূজা বঙ্গীয় ধর্ম-পরম্পরায় তান্ত্রিকী গুপ্তকৃত্য হিসেবেই প্রশস্ত। তবে বুধমণ্ডলীকে বাদ দিলে আমজনতার মধ্যে অবশ্য কোনটা স্মার্ত-পৌরাণিক বা কোনটা তান্ত্রিক কৃত্য হিসেবে পালনীয়, এ নিয়ে তেমন সচেতনতা চোখে পড়ে না। দুর্গার আগমনের পূর্বে ভাদ্র চতুর্থীর গণেশ পূজা বঙ্গদেশে লোকপরম্পরায় চলে এলেও একে ঘিরে তেমন কোনও জাঁকজমক বা আয়োজনের আড়ম্বর কোনওকালেই ছিল না। শাস্ত্রভিত্তিতে ভাদ্র চতুর্থী বঙ্গদেশে অনৈতিহাসিক না হলেও বৃহত্তর সামাজিক উৎসব হিসেবে এর তেমন কোনও রমরমা বেশ কয়েক বছর আগেও চোখে পড়েনি। এই চতুর্থীর প্রকোপ নেহাতই হালফিলের কার্যক্রম। মহারাষ্ট্রে এর ব্যাপকতা থাকলেও বঙ্গীয় ধর্ম-সমাজে চতুর্থীর এই সাড়ম্বর উদ্‌যাপনের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু? আসলে এর মধ্যে মিশে আছে অনেক সূক্ষ্ম-জটিল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক propaganda, আছে হিন্দুত্বের নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পের সঙ্গে সংগতি রেখে বহির্বঙ্গীয় সংস্কৃতিকে সুযোগমতো বাংলায় চারিয়ে দেওয়ার প্রবণতা। তবে ভাদ্র চতুর্থীর এই বাহুল্য নিতান্ত purposive হলেও বঙ্গদেশে গণেশ কাল্‌টের সাম্প্রতিকতম trend বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। এর সাম্প্রদায়িক ঝোঁকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দূর ভবিষ্যতে

বাংলায় যদি ভিন্ন কোনও রাজনৈতিক পটভূমি তৈরি হয়; তবে সেদিনের বঙ্গদেশে গণপতি-গণেশের এই চতুর্থীকেন্দ্রিক হিড়িক যে বাড়বেই, তাতে সন্দেহ নেই। পাশাপাশি বাঙালির ধর্মজীবনে দেবতাদের আসনরফার খতিয়ানটাও পরিস্থিতি সাপেক্ষে হয়তো বদলে যাবে। বঙ্গদেশীয় গণেশ কাল্‌টের বিবর্তন সেদিন নতুন করে বিবেচনার প্রয়োজন পড়বে। হয়তো শিব, বিষ্ণু বা দুর্গার চেয়েও তাৎকালিক গুরুত্বে আরও বেশি করে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবেন গজানন-গণপতি। সেই অনাগত সময়ের মুখবন্ধটুকু আপাতত ধরা রইল।

একভক্ত সম্প্রদায়ের নিরিখে বঙ্গদেশে গজানন-গণেশের স্থান-সংকোচ হলেও এ'টা ঠিক যে, প্রতিস্পর্ধী ধর্মকাল্‌টগুলির নিরন্তর প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে প্রথমপূজ্য হিসেবে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে তিনি অনড় আসনেই রয়ে গেছেন। যে কোনও দেবতার পূজায় আজও তিনি সর্বাগ্রগণ্য। একক কাল্‌ট হিসেবে হয়তো তাঁর তেমন বিস্তার ঘটেনি, তবে বাঙালির প্রাত্যহিক ধর্মাচারে বা বিশেষ পূজাবিধির ক্ষেত্রে গণপতি-গণেশ বাধ্যতামূলক বলেই অনতিক্রম্য। ঠিক এখানেই সিদ্ধিদাতার জয়লাভ।

দেবতা-কেন্দ্রিক যে কোনও সন্ধানেই একটা আংশিকতা থেকে যায়। হয়তো সেটা তাঁর তত্ত্বগত বিস্তার এবং ধর্ম-দার্শনিক ব্যাপকতার কারণেই ঘটে। সেই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস জড়িয়ে থাকায় বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করতেই হয়। বিশেষ এক দেবতা ঠিক কোন কোন রূপে এবং ভাবে নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিগত থেকে অধুনায় জায়মান থেকে যান; শুধুমাত্র অভিলেখ, মূর্তি বা সাহিত্য-প্রমাণের কালিক দলিলীকরণের মধ্যেই তা বেঁধে ফেলা সম্ভব নয়। সাহিত্যে দেবচরিত্র বা তাঁর সম্বন্ধীয় বিষয়ের উপস্থাপনা সমকালেও হয়ে চলেছে, আগামীতেও হবে। এক ছেদবিহীন পরম্পরায় মানুষের সঙ্গে দেবতা এবং দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তৈরি হতেই থাকে। আমরা কেবল যুগখণ্ডের নিরিখে বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রকাশমাধ্যমগুলিকে শনাক্ত করতে পারি মাত্র। আগেই বলা হয়েছে, ভারতীয় ধর্মমানসে গণপতি-গণেশের দেবত্বের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের বহুশাখায়িত স্তরের ওপর ভিত্তি করে বঙ্গদেশের ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তাঁর পরিগ্রহণের তাৎপর্য বর্তমান অভিসন্দর্ভের অন্বিষ্ট। এক্ষেত্রে আমরা অভিলেখ, মূর্তি এবং সমকালীন সাহিত্য-সংরূপে উদ্দিষ্ট দেবতার প্রকাশরূপের পৃথক পৃথক ধরনগুলিকে বুঝতে চেয়েছি। প্রাচীন এবং মধ্যযুগসীমা পেরিয়ে স্মার্ত হিন্দুর দেবায়তনে গণপতি-ই সম্ভবত সেই দেবতা, আধুনিক বঙ্গে পরিবর্তিত সময়েও যাঁর গুরুত্ব তিলমাত্র কমেনি। বরং বেড়েছে। উনিশ-বিশ শতকের সাহিত্য-সংস্কৃতির চালচিত্র বেয়ে এই বহমান একুশ শতকের তৃতীয় দশকেও গণেশ বাঙালির প্রিয় আরাধ্যের জায়গা জুড়েই রয়েছে। কেবল পরিণত মানুষের চেতনাতেই নয়, নিতান্ত

কচিকাঁচাদের মধ্যেও তাঁর কদর প্রশ্নাতীত। বস্তুত, জনপ্রিয়তার নিক্তিতে এক গোপাল ছাড়া গৃহস্থ হিন্দুর প্রাত্যহিক ধর্মে-কর্মে গণেশের আর দ্বিতীয় কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আবার, বঙ্গীয় পুরাণ-সংস্কৃতির ঐতিহ্য মাথায় রাখলে গণেশ গোপালের-ই দ্বিতীয় মূর্তি। কাজেই, রূপগত ঐক্যে অথবা ভিন্নতায় গোপাল বা গণেশের জনপ্রিয়তার সঙ্গে টক্কর বাস্তবিক অসম্ভব। খেয়াল করলে দেখা যাবে, রূপাবয়বে গোপাল অনেকখানি fixed বা constant হলেও গণেশ এতটাই flexible যে শিল্পের সমস্ত প্রকরণেই তাঁর অবাধ গতায়াত। নিত্যনতুন ঢঙে, বিচিত্র উপস্থাপনায় তিনি এতখানি সুলভ হয়ে ধরা দেন যে, দেবতা সম্বন্ধীয় দূরত্বের বোধ কখন যেন হেলায় অতিক্রম করে যান। এই সর্বত্রগামিতা, accessibility গণেশের জনাদরের অন্যতম কারণ। তা ছাড়া গড়পড়তা বাঙালি গণেশের ভাবমূর্তির সঙ্গে খুব সহজে নিজেদের মিলিয়ে ফেলতে পারে। ফলে একটা সেতুবন্ধন হয়েই যায়। গণেশের দেহরূপের মধ্যে থাকা একধরনের স্থূলতা, ভোজনাসক্তি, আয়েশী ভাব বাঙালিরও ধাতুগত। একটু হেলে-দুলে কাজ করা অথবা ভুঁড়ি বাগিয়ে পরিতৃপ্তির জানান দেওয়া সব বাঙালির না হলেও স্টিরিওটাইপ ‘অন্নপায়ী বঙ্গবাসী’-র পছন্দের মুদ্রা। আবার, গণেশের একভাবে গ্যাঁট হয়ে বসবার রূপকল্পে হয়তো বিশ্রামবিলাসী বাঙালির বুদ্ধির একটা প্রশ্রয় আছে। বাঙালির অর্থকরী জীবনে যে কোনও লেনদেন বা বিনিময়ের নিয়ামক-ও যে তিনিই। তাঁর ধীরতা, একাগ্রতা, বিবেচনাবোধ, সর্বোপরি টাকা-কড়ির ব্যবহার কোন পথে হওয়া উচিত সেই বিষয়ে দিকনির্দেশনা ব্যবসায়িক সাফল্য বা সিদ্ধির প্রশ্নে এতই অনিবার্য যে তাঁকে এড়াবার জো নেই। এই অর্থনৈতিক লাভালাভের গুরুত্ব থেকেই সিদ্ধিদাতার আসনটি দিনে দিনে আরও পোক্ত হয়েছে। তা ছাড়া দেবতা তো সুদূরলোকের কোনও বায়ুভূত অস্তিত্ব নন, মানব-মনস্তত্ত্বের অলিতে-গলিতে নিত্য জন্ম তাঁর। আসলে, মানুষ নিজের স্বভাবধর্মের অভিব্যক্তিই নিয়ত খুঁজে বেড়ায় দেবতার মধ্যে। গণপতি-গণেশের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তাত্ত্বিক স্তরে ‘গণপতি’ যিনি, বহুত্বের দর্শনেই তাঁকে পাওয়া সম্ভব। তিনি ‘এক’ হয়ে আছেন ‘বহু’-র মধ্যেই। অন্তহীন অনেকের মধ্যেই পরম একরূপী গজানন-গণেশের অধিষ্ঠান। ধর্ম-দর্শনের বিচারে এই ‘গণ’ অবশ্য mass বা মানবীয় অর্থে সমূহ মাত্র নয়। সমস্ত জগৎব্যাপার-ই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ইহ বা পরজগতের সমগ্র তত্ত্বজ্ঞানের-ই মালিক বা প্রধান তিনি। কার্যত এই অর্থেই ‘গণপতি’-নামা। আমাদের মনে হয়, আবয়বিক নির্দিষ্টতার বাইরে গিয়ে পরিব্যাপ্ত অর্থে গণপতি-গণেশ একটি ধারণার সারাৎসার। এমনটা আরও বেশি মনে হওয়া সম্ভব গণেশের ভূমিকাটিকে মাথায় রাখলে। মানুষের বেঁচে থাকায় বা তার প্রতিটি পদক্ষেপে বিঘ্নের সম্ভাবনা এবং বিঘ্ননাশের আকাঙ্ক্ষা থেকেই গণপতি-গণেশের রূপধারণ। তাঁর প্রকাশরূপের মধ্যেও বিঘ্নকারী থেকে বিঘ্নহারী অর্থাৎ নেতি

থেকে ইতিতে সঞ্চরণের তাৎপর্য নিহিত আছে। ব্যবহারিক জীবনেও দেখা যায়, যে কোনও কাজের ক্ষেত্রেই বাধা-বিপত্তির সম্ভাবনা এবং তা থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিত্তলোকে অনুভূতি হিসেবে এতখানি অবধারিত যে, মানুষের সেই জীবনসত্যই দেবতার নির্মাণকে সম্ভব করে তুলেছে। বিঘ্নকর্তা গণেশের বিঘ্নহর্তায় রূপান্তরের মধ্যে নির্বিশেষ মানুষের এই ইহজাগতিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে, সন্দেহ নেই। জাগতিক অর্থে বিঘ্নপ্রদ যা কিছু, তা অতিক্রম করেই মানুষ সিদ্ধিলাভের দরজায় পৌঁছোয়। সাধনমার্গে এরই অর্থ প্রাকৃত অস্তিত্বের বন্ধনজাত বিঘ্ন খণ্ডন করে উপাসককে সিদ্ধি তথা মোক্ষের অভিমুখী করে তোলা। গণপতি-গণেশ বিঘ্নজর্জর মানুষকে মোদকরূপ মোক্ষফল দান করে ঈপ্সিত পথের সন্ধান দেন। যদি বাধা-বিপদ বা পীড়ন-যন্ত্রণা বিঘ্নের বেশে মানুষের জীবনে নিত্য অনুভূত হয়, তবে যাবতীয় বিঘ্নাদি অপনোদন করার ক্ষমতাও মানুষ চরিত্রসামর্থ্যেই অর্জন করে। গণপতি-গণেশ কার্যত এই জীবনদর্শনেরই মূর্ত প্রতিমা।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

সংস্কৃত :

উপনিষদ গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ), স্বামী গম্ভীরানন্দ, সম্পাদক, উদ্বোধন কার্যালয়, জুলাই ২০২২।

ঊনবিংশতি সংহিতা, পঞ্চানন তর্করত্ন সংকলিত ও অনূদিত, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সদেশ, ২০১৮,

ঋগ্‌বেদ-সংহিতা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম খণ্ড, দশম খণ্ড, রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত, আব্দুল আজিজ আল আমান সম্পাদিত, হরফ, ২০১১

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, হরি নারায়ণ আপটে ও কাশীনাথ শাস্ত্রী আগাশে সম্পাদিত, আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৮৯৬

অগ্নিপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৯

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, *বৃহৎ তন্ত্রসার,* রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার অনূদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ২০১০

গণেশপুরাণ, মহেশচন্দ্র যোশী অনূদিত ও সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ২০১৪

দেবীপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ পরিদৃষ্ট, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪০০

নারসিংহপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২৫

পঞ্চানন শাস্ত্রী, সম্পাদক ও অনুবাদক, *আগম-তত্ত্ব-বিলাস,* নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৫

পদ্মপুরাণ, 'সৃষ্টিখণ্ড', পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪১২

প্রাণতোষণী তন্ত্র, রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার সংকলিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯২৮।

পুরশ্চরণরত্নাকর, জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তন্ত্ররত্নের পদ্ধতি অবলম্বিত, মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য সংকলিত, নবভারত পাবলিশার্স, ২০১১

বরাহপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪০১

ব্রহ্মপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪০৯

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৮

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত ও সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২২

বামনপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০

বীরমিত্রোদয় সময়প্রকাশ, বিষ্ণুপ্রসাদ ভাণ্ডারী সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৮৫

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০

ভবিষ্যপুরাণ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), পরমাত্মানন্দনাথ ভৈরব (গিরি) অনুদিত ও সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০

মদনপারিজাত স্মৃতিসংগ্রহ, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন অনূদিত, কলকাতা: গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে শশিভূষণ ভট্টাচার্যের দ্বারা মুদ্রিত, ১৮৯৬

মনুসংহিতা, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১০

মৎস্যপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০

মুদ্গলপুরাণ, মুম্বাই: মুদ্গল পুরাণ প্রকাশন মণ্ডল, অক্টোবর ১৯৭৬

যজুর্বেদ-সংহিতা, শুক্ল ও কৃষ্ণ, বিজনবিহারী গোস্বামী অনুদিত ও সম্পাদিত, হরফ, ১৯৬০

যাস্ক, *নিরুক্ত,* তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড, অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, ২০০৫

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, *অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব,* নলিনীকান্ত মিশ্র ও অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সদেশ, ১৪১৭

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, *আহ্নিকতত্ত্ব,* ত্রৈলোক্যনাথ ভাগবতভূষণ সম্পাদিত, কলকাতা: বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেশিন প্রেসে বিহারীলাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৯৪

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, *তিথিতত্ত্ব,* অমরকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, সদেশ, ১৪১৭

লিঙ্গপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৬

শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি, *ভবদেবপদ্ধতি,* বেণীমাধব শীলস্ লাইব্রেরি, চতুর্থ সংস্করণ, সাল অনুল্লিখিত

শারদাতিলকতন্ত্র, পঞ্চানন শাস্ত্রী, অনূদিত ও সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪১৮

শিবপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ পরিদৃষ্ট, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২২

স্কন্দপুরাণ, 'মাহেশ্বরখণ্ড', 'ব্রহ্মখণ্ড', 'নাগরখণ্ড' এবং 'প্রভাসখণ্ড', পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৭, ১৪১৮, ১৪২১, ১৪২০

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, *স্মৃতিচিন্তামণি,* বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৮৮

হরিহরানন্দ ভারতী, *মহানির্বাণতন্ত্র,* জগন্মোহন তর্কালঙ্কার অনূদিত ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪০৯

হৃষীকেশ শাস্ত্রী, সম্পাদক, *বারাহপুরাণ,* চৌখাম্বা অমরভারতী প্রকাশন, ১৯৮২

বাংলা :

অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, *বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল,* অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০০৯

অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল,* রত্নাবলী, ২০০২

অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *রচনা সংগ্রহ,* আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০

অদ্রীশ বর্ধন, *গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্র সমগ্র* ৫, নাথ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৬

অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

অমরনাথ চক্রবর্তী সংকলিত, *অঘোর সদন,* মঞ্জু চক্রবর্তী প্রকাশিত (লালকুঠি, কলকাতা), ১৪২৬

অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত,*শাক্ত পদাবলী [চয়ন],* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১

অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল,* লেখাপড়া, ১৩৮৪

অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, *রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল,* ভারবি, ২০১১

অর্দ্ধেন্দুশেখর রায় সম্পাদিত, *দাশরথি রায়ের পাঁচালি,* মহেশ লাইব্রেরী, ১৯৬০

অরুণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, *গণেশ,* আনন্দ, জানুয়ারি ২০১৯

আশুতোষ দাস সম্পাদিত, *দ্বিজ রামদেব-বিরচিত অভয়ামঙ্গল,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭

গোরা সিংহরায়, সম্পাদক, *দেবেন্দ্রনাথ সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* ভারবি, জানুয়ারি ২০০২

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,* যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সম্পাদিত, কলকাতা: 'বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন'-প্রেসে শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

চন্দ্রনাথ বসু, *ত্রিধারা,* কলকাতা: বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী থেকে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রকাশিত, ১২৯৭

চিত্রা দেব, *সিদ্ধিদাতার অন্তর্ধান,* আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, আগস্ট ১৯৮৯

জয় গোস্বামী, *কবিতা সংগ্রহ* (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ, জানুয়ারি ২০১০

তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সম্পাদক, *নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭

দ্বিজ মাধব, *গঙ্গা-মঙ্গল,* মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২৩

দেবেন্দ্রনাথ সেন, *গণেশ-মঙ্গল,* কলকাতা: নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস, জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩১৯

পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, *ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২

পরশুরাম, *কৃষ্ণমঙ্গল,* নলিনীনাথ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৬

বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বাণীশিল্প, ডিসেম্বর ২০১৪

বলরাম কবিশেখর, *কালিকামঙ্গল,* চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫০

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী,* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪২১

বিজয়রাম সেন, *তীর্থ-মঙ্গল,* নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির, ১৩২২

বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, *মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত ধর্মমঙ্গল,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০

বিশ্বম্ভর দাস, *জগন্নাথ-মঙ্গল,* পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা: গুপ্তপ্রেশ, ১৩১২

ভবানীপ্রসাদ রায়, *দুর্গামঙ্গল,* ব্যোমকেশ মুস্তাফী সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২১

মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র (দশম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৯

মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *কোমল-কবিতা (প্রথম ভাগ),* কাটোয়া: কাটোয়া এড্ওয়ার্ড প্রেস, জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩১৭

মুক্তারাম সেন, *সারদা-মঙ্গল বা অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী,* আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৪

যোগীনাথ হালদার সম্পাদিত, *রামেশ্বর ভট্টাচার্য-বিরচিত শিব সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭

রাধাকৃষ্ণ দাস, *গোসানী-মঙ্গল,* ব্রজচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, কলকাতা: ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত, ১৩০৬

রাধানাথ রায়চৌধুরী, *পদ্মাপুরাণ,* দেব সাহিত্য কুটীর, এপ্রিল ২০১৭

রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র, *শিবায়ন,* দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৩

রামদাস আদক, *অনাদি-মঙ্গল বা শ্রীধর্ম্মপুরাণ,* বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, আষাঢ় ১৩৪৫

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, *রামেন্দ্র-রচনাবলী* (ষষ্ঠ খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, চৈত্র ১৩৬৩

রূপক চক্রবর্তী, *যখন মহাভারত লিখছিলাম,* আনন্দ, জানুয়ারি ২০০৩

রূপরাম চক্রবর্তী, *রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল* (প্রথম খণ্ড), সুকুমার সেন সম্পাদিত, কলকাতা: সাহিত্য-সভা বর্দ্ধমান, ১৩৫১

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, *ঝুড়ি কুড়ি গল্প,* পত্রভারতী, জানুয়ারি ২০১৩

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, *সোনার গণপতি হীরের চোখ*, আনন্দ, ১৪২৬

সত্যজিৎ রায়, ফেলুদা সমগ্র ১, আনন্দ, জানুয়ারি ২০০৫

সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১

স্বপ্নময় চক্রবর্তী, *পঞ্চাশটি গল্প*, আনন্দ, নভেম্বর ২০১৪

স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, *স্তব কুসুমাঞ্জলি*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৫৬

সুকুমার সেন, সম্পাদক, *কবিকঙ্কণ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৩

সুচিত্রা ভট্টাচার্য, *জার্মান গণেশ*, আনন্দ, নভেম্বর ২০১৯

সুধীভূষণ ভট্টাচার্য, সম্পাদক, *দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২

সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত, *রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল*, কলকাতা: সাহিত্যলোক, এপ্রিল ২০০২

সুনীল জানা সম্পাদিত, *উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৪

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, *কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ*, সাহিত্য সংসদ, ২০১১

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, *দাশরথি রায়ের পাঁচালী*, কলকাতা: বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেস, ১৯০২

প্রবন্ধ :

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, 'গণেশ', *প্রবাসী*, ২৯শ ভাগ, ২য় খণ্ড, কার্তিক ১৩৩৬

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, 'মূর্তিতত্ত্বে গণেশ', ২৯শ ভাগ, ২য় খণ্ড, পৌষ ১৩৩৬

বিজয়চন্দ্র মজুমদার, 'সিদ্ধিদাতা গণেশ', *নবপর্য্যায়-বঙ্গদর্শন*, তৃতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১০

বিজয়চন্দ্র মজুমদার, 'গণেশের পূজা', *নবপর্য্যায়-বঙ্গদর্শন*, তৃতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, চৈত্র ১৩১০

সখারাম গণেশ দেউস্কর, 'সিদ্ধিদাতা গণেশের বয়স', *আর্য্যাবর্ত্ত* (প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড), হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত, কলকাতা: দুর্গানাথ বসু প্রকাশিত, ১৩১৭

ইংরেজি আখ্যাপত্রে ও ভূমিকা-অনুবাদসহ সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাংলা আকর গ্রন্থ

সংস্কৃত :

Durgaprasad and Kasinath Pandurang, editors. *The Arya-Saptasati of Govardhanacharya*,

Bombay: Nirnaya-Sagara Press, 2nd revised edition, 1895

Govardhanacharya. *Aryasaptasati. The Aryasaptasati of Govardhanacharya with The Commentary (Rasapradipika).* Mishra, Sachal (ed.). published by Keshi Mishra, 1931

Govindananda. *Varsa Kriya Kaumudi.* Edited by Kamala Krishna Smritibhusana, Asiatic Society, 1902

Isanasivagurudevapaddhati of Isanasiva. II. 16. 1-16. Edited by Sastri, T. Ganapati. Trivandrum Sanskrit Series, vol. 72, 1923

Jayaratha. *The Haracharitachintamani* (chap. 18). Edited by Sivadatta & Parab, Pandurang Kasinath. Bombay: Nirnaya Sagara Press, 1897

Kamal Krisna Smritibhusana, editor. *Varsa Kriya Kaumudi*, The Asiatic Society, 1902

Sankaravijaya of Anandagiri. Edited by Vidyasagar, Jibananda. Calcutta, 1881

Saunaka. *The Brihad-Devata.* Edited by Macdonell, Arthur Anthony. Harvard University, 1904

Sridhardasa. *Sadukti-Karnamrta. Sadukti-Karnamrta of Sridhardasa.* Banerjee, Sures Chandra (ed.). Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, January 1965

Tattvavidananda Saraswati, Commentator, *Ganapati Upanisad*, DK Print World, 2nd revised edition in 2006, 4th impression of the revised edition, 2021

The Brahmanda Mahapuran ('Madhyama Bhaga'). Edited by Sharma, K. V. Varanasi: Krishnadas Academy, 2000

The Mitakshara with Visvarupa and commentaries of Subodhini and Balambhatti. Edited by S. S. Setlur. Madras: Brahmavadin Press, Georgetown, 1912

The Yajnavalkyasmriti with the commentary of Visvarupacharya. Edited by Sastri, T. Ganapati. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1982

The Vajasaneyi-Samhita in the Madhyandina and the Kanva-Sakha with the commentary of Mahidhara. Edited by Weber, Albrecht. The Chowkhamba Sanskrit Seris Office, 1972

Vidyakara. *Subhasitaratnakosa. The Subhasitaratnakosa.* D. D. Kosambi and V. V. Gokhale (ed.). Cambridge: Harvard University Press, 1957

Voja & Lakshmana Suri. *The Champu-Ramayana.* Edited by Parab, Panurang Kashinath.

Bombay: Nirnaya-sagar press, 1898

প্রাকৃত :

Radhagovinda Basak, editor. *The Prakrita Gatha Saptasati*, The Asiatic Society, 2010

বাংলা :

Gauri Mangala. Edited by Biman Behari Majumdar, The Asiatic Society, 1971

Visnu Pala's Manasa-Mangala. Edited by Sukumar Sen, The Asiatic Society, 2002

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা :

অক্ষয়কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (দ্বিতীয় ভাগ), কলকাতা: নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮৯

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *গৌড়লেখমালা* (প্রথম স্তবক), রাজশাহী: বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৩১৯

অধীশ চন্দ্র সাহা, *দেবেন্দ্রনাথ সেন : জীবনী ও কাব্যবিচার*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি (বাংলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা গ্রন্থ, ১৯৮০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রানী চন্দ, *জোড়াসাঁকোর ধারে*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কার্তিক ১৩৫১

অমরনাথ চক্রবর্তী, সংকলক, *অঘোর সদন*, মঞ্জু চক্রবর্তী প্রকাশিত (লালকুঠি, কলকাতা), ১৪২৬

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা (প্রথম খণ্ড), ফার্মা কে. এল. এম. প্রা. লি., ২০০১

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা (দ্বিতীয় খণ্ড), ফার্মা কে. এল. এম. প্রা. লি., ১৯৮৮

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *দেবতাদের খোঁজে*, বইচই পাবলিকেশন, নভেম্বর ২০২২

অর্জুনদেব সেনশর্মা, *হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ*, ভারবি, এপ্রিল ২০১৫

অর্জুনদেব সেনশর্মা, 'ভূমিকা', *দেবতাদের খোঁজে*, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বইচই পাবলিকেশন, নভেম্বর ২০২২

অশোক মিত্র, *পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১

অশোক চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী, *পাল অভিলেখ সংগ্রহ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগষ্ট ১৯৯২

অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়, *পুরাণ পরিচয়*, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা: লি:, ১৯৭৭

অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *আদর্শ শ্রীশ্রীগণেশ পূজা পদ্ধতি*, শ্রী প্রকাশনী, ১৪২৮

আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ২০০৯

আশুতোষ ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, *সুবর্ণলেখা/ স্মারক গ্রন্থ,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, *মেয়েদের ব্রতকথা,* অমিত ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পারুল, ২০১৩

উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা* (প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী, ১৩৭৩

উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা* (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী, ১৩৯৫

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, *প্রতিমাশিল্পে হিন্দু দেবদেবী,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, সংকলক, *কামরূপশাসনাবলী,* রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ, ১৩৩৮

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলার তন্ত্র,* বিমলেন্দু চক্রবর্তী সম্পাদিত, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আশ্বিন ১৩৪৯

গিরীন্দ্রশেখর বসু, *পুরাণ প্রবেশ,* বিবেকানন্দ বুক স্টোর, ২০০৭

গোপীনাথ কবিরাজ, *তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগদর্শন,* সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬৩

গোপীনাথ কবিরাজ, *তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫

গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি,* ঢাকা: অবসর, জুলাই ২০১৪

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, *তন্ত্রকথা,* বিশ্বভারতী, সাল অনুল্লিখিত

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, *বাংলার পালাপার্বণ,* বিশ্বভারতী, ১৩৫৯

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, *হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান,* প্যাপিরাস, ২০১৪

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, *তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি ও রহস্যপূজা পদ্ধতি,* নবভারত পাবলিশার্স, ১৪১৮

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, *পঞ্চতত্ত্ব বিচার,* নবভারত পাবলিশার্স, ১৪১৪

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ,* সান্যাল অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৩৭৮

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা,* ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৪১৩

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পঞ্চোপাসনা,* কে. এল. এম. প্রা. লি., ১৯৬০

দীনশচন্দ্র সরকার, *পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত,* সাহিত্যলোক, আগস্ট ২০১৭

দীনশচন্দ্র সরকার, *শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ,* সাহিত্যলোক, মে ২০১৯

দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ,* খণ্ড ১-২, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন,* নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত, *বিশ্বকোষ* (পঞ্চম খণ্ড), কলকাতা ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত, ১৩০১

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস,* জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০০০

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ধর্ম ও সংস্কৃতি : প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট,* আনন্দ, ২০১৩

নির্মলানন্দ, *দেবদেবী ও তাঁদের বাহন,* ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ১৪২৪ ব.

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *দেবতার মানবায়ন,* আনন্দ, ২০১২

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, সম্পাদক, *পুরাণকোষ,* প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ডিসেম্বর ২০১৭

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, সম্পাদক, *পুরাণকোষ,* দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, মে ২০১৮

পবিত্র চক্রবর্তী, *চাকদহ : ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* নবপত্র প্রকাশন, ২০১৭

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, *বৈদিক দেবতা,* বিশ্বভারতী, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, *নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত,* নবদ্বীপ: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, জানুয়ারি ২০১৩

মোঃ মোশারফ হোসেন, *হিন্দু জৈন বৌদ্ধ মূর্তিতাত্ত্বিক বিবরণ (পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ),* দিব্যপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, *রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* নবদ্বীপ: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ডিসেম্বর ২০০৮

যশোধরা বাগচী, *নারী ও নারীর সমস্যা,* অনুষ্টুপ, মার্চ ২০১২

শম্ভুনাথ কুণ্ডু , *প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা,* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬

শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য,* শিশু সাহিত্য সংসদ, বৈশাখ ১৩৯২

সচ্চিদানন্দ সরস্বতী, *পূজা-প্রদীপ,* সৌম্যানন্দ নাথ সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২০

সুকুমারী ভট্টাচার্য, *বিবাহপ্রসঙ্গে,* ক্যাম্প, জুলাই ২০১৫

সুনীতিকুমার পাঠক, *বৌদ্ধতন্ত্র : রূপ ও বিকাশ,* বইওয়ালা বুক ক্যাফে, ডিসেম্বর ২০২১

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, *পুরোহিত-দর্পণ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: হরিদাস বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩১

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* (প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব), ফার্মা কে. এল. (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৯৬০

ইংরাজি :

Apte, Vaman Shivram, editor. *The practical Sanskrit Dictionary.* Motilal Banarasidass Publishers, fourth revised and enlarged edition, 1965

Bailey, Greg, editor and translator. *Ganesapurana : Introduction, translation, notes and index.* Motilal Banarasidass, 2017

Bailey, Greg. *The Mythology of Brahma.* Oxford University Press, 1983

Bandyopadhyay, Ray Sudipa. *Nataraja Images of Bengal.* University of Calcutta, 2017

Banerjee, Jitendranath. *The Development of Hindu Iconography.* Munshiram Monoharlal Publishers, 1956

Banerjee, S. C. *Tantra in Bengal.* Manohar Publications, 1992

Bhattacharya, Haridas, editor. *The Cultural Heritage of India*, vol. 4, The Ramkrishna Mission Institute of Culture, 1956

Bhattasali, N. K. *Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum.* Dacca, 1929

Brown, Robert, editor. *Ganesh: Studies of an Asian God.* Sri Satgaru Publications, 1997

Bussagli, H. & Sivaramamurti, C. *5000 years of Indian Art.* New York, 1971

Chinmayananda, Swami. *Glory of Ganesa.* Central Chinmaya Mission Trust, 1987

Courtright, B. Paul. *Ganesa: Lord of Obstacles, Lord of Beginnings.* Oxford University Press, 1985

Dalal, Roshan. *Hinduism: An Alphabetical Guide.* Penguin Books Limited, 2014

Debiprasad Chattopadhyaya. *Lokayata : A study in Ancient Indian Materialism.* People's Publishing House, 1959

Eliade, Mircea. *Yoga, Immortality, and Freedom.* Princeton University Press, 2d ed., 1969

Eliot, Charles. *Hinduism and Buddhism: An Historical Sketch* (Vol. I). Routledge & Kegan Paul Ltd., 1962

Farquhar, J. N. *Outline of the Religious Literature of India*

Getty, Alice. *Ganesa: A Monograph on the Elephant-Faced God.* Pilgrims Publishing, 2006

Goudriaan, Teun. *Maya Divine and Human.* Motilal Banarasidass Publishing House, 1978

Grewal, Royina. *Book of Ganesha.* Penguin Books Limited, 2009

Grierson, G. A. "Ganapatyas". *Encyclopaedia of Religion and* Ethics. Edited by James

Hastings, 2nd impression, vol. 6, T. & T. Clark, 1919

Grimes, John A. *Ganapati: Song of the Self.* SUNY series in Religious Studies. State University of New York, 1995

Haridas Mitra, *Ganapati*, Vishvabharati, 1959

Haque. Enamul. *Bengal Sculptures: Hindu Inconography upto c. 1250 A. D.* . Bangladesh National Museum. 1992

Hazra, R. C. *Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs.* The University of Dacca, April 1940

Hazra, R. C. *Studies in the Upapurans.* Vol. II (Sakta and Non-sectarian Upapurans). Sanskrit College, Calcutta Sanskrit College Research Series No. XXII, 1963

Heras, H. *The Problem of Ganapati.* Indological Book House, 1972

Jagannathan, Shakunthala, and Krishna, Nanditha. *Ganesha: The auspicious... The beginning.* Vakils Feffer and Simons Limited, May 2009

Jagannathan, T. K. *Sri Ganesha: Elephant-headed God of Mangalam.* Pustak Mahal, 2009

Jan Gonda (ed.). *A History of Indian Literature: The Ritual Sutras* (Vol. I). Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1977

Jarow, E. H. Rick. *Tales for the Dying: The Death Narrative of the Bhagavata-Purana.* State University of New York Press, March 2003

Kane, P. V. *History of Dharmasastra* (Vol. II, Pt. I). Poona: BORI, 1941

Karmakar, A. P. *The Religions of India: The Vratyas or Dravidian Systems* (vol. 1). Mira Publishing House, Lonavala, 1950

Kennedy, Vans. *Researches into the Nature and Affinity of Ancient and Hindu Mythology.* Printed for Longman, Rees, Orme, Brown and Green, 1831

Krishan, Yuvraj. *Ganesa: Unravelling an Enigma.* Motilal Banarasidass Publishers, 1999

Krishna, Murthy, K. *Mythical Animals in Indian Art.* Abhinav Publications, 1985

Kunal Chakrabarti. *Religious Process: The Puranas and the making of a Regional Tradition*, New Delhi: Oxford Univery Press, 2001

Macdonell, A. A. *A vedic Reader for Students.* Motilal Banarasidass, 2001

Mani, Vettam. *Puranic Encyclopaedia.* Motilal Banarasidass, 1975

Mate, M. S. *Temples and Legends of Maharashtra.* Bharatiya Vidya Bhavan, 1962

Mitra, Haridas. *Ganapati.* Visva-Bharati, January 1960

Nagar, Shantilal. *Cult of Vinayaka.* Intellectual Publishing House, 1992

Nani Gopal Majumdar. *Inscriptions of Bengal.* Rajshahi: The Varendra Research Society. 1929

Pal, Pratapaditya. *Hindu Religion and Inconography (According to Tantrasara).* Vichitra Press, Los Angeles, 1981

Pattanaik, Devdutt. *The Man Who was a Woman and Other Queer Tales of Hindu Lore.* UK: Routledge, 2012

Pattanaik, Devdutt. *Thoughts on Ganesha.* Jaico Publishing House, 2014

R.C. Hazra. *Studies in the Upapuranas* (Vol. II). Kolkata: Sanskrit College, 1963

R. G. Bhandarkar. *Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems.* Varanasi: Indological Book House, 1965

Rao, Saligrama Krishna Ramchandra. *Ganapati 32 Drawings from a 19th Cent. Scroll.* Karnataka Chitrakala Parishath, 1989

Rao, Saligrama Krishna Ramchandra. *Pratima Kosha: Descriptive Glossary of Indian Iconography.* IBH Prakashana, 1989

Rao, T. A. Gopinatha. *Elements of Hindu Iconography* (Vol. I – Part I). MLBD, 2017

Sivaramamurti, C. *The Art of India.* New York, 1977

Subramuniyaswami, Satguru Sivaya. *Loving Ganesha.* Himalayan Academy Publication, 2019

Thapan, Anita Raina. *Understanding Ganapati: Insights into the dynamics of a cult.* Manohar Publishers, 2022

Vanita, Ruth. Kidwai, Saleem (ed.). *Same-Sex Love in India: Readings from Literature and History.* Palgrave Macmillan, Sept. 2001

Wilkins, W. J. *Hindu Mythology, Vedic and Puranic.* Thacker, Spink & Co., Government Place, Illustrated, 1882

Wilson, H. H. *Sketch of the Religious Sects of the Hindus* (1832/1846), Bishop's College Press, M. D CCC. XLVI

Wodeyar, Krishnaraja. *Sritattvanidhi* (vol. 3, *Sivanidhi*). Edited by Ramesh, K. V. Mysore: Prachya vidya sangshodhanalaya, 2004

Yadav, Nirmala. *Ganesa in Indian Art and Literature.* Publication Scheme, 1997

পত্রিকা (Journal)-য় প্রকাশিত প্রবন্ধ

বাংলা :

অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় নতুন গণেশ মূর্তির সন্ধান', *বিশেষ গণেশ সংখ্যা*, টেরাকোটা, আগষ্ট ২০২১

অরুণ সেন, 'যোগেন চৌধুরীর ছবি', *Jogen Chowdhuri Special issue*, Nandimukh Publication, 2002

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, 'দেব-দেবী বিবর্তনে গণপতি', *বিশেষ গণেশ সংখ্যা*, টেরাকোটা, পুনর্মুদ্রিত, আগস্ট ২০২১

সনৎকুমার মিত্র, সম্পাদক, 'গণেশ ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা, *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৪০৮

ইংরাজি :

Arunachalam, M. 'Vinayaka Chaturthi'. *Vivekananda Kendra Patrika* 6, no. 1, 1977, 63-68

B. A. Gupte. 'Harvest Festivals in Honour of Gauri and Ganesh'. *The Indian Antiquary.* (Vol. XXXV). Richard Carnac Temple, 2nd Baronet (ed.), Bombay : Bombay Education Society's Press, July 1906

Banerji, R. D. 'Barrackpur Grant of Vijayasena: the 32nd year'. *Epigraphia Indica.* Edited by Thomas F. W. Vol. XV, Pt. I, Archaeological Survey of India, 1925

Hazra, R. C. 'Ganapati-Worship, and the Upapuranas Dealing with it'. *The Journal of the Ganganatha Jha Research Institute*, vol. 5, Issue 4, Ganganath Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeeth, 1948

Hazra, R. C. 'Ganesa-Purana'. *The Journal of the Ganganatha Jha Research Institute*, vol. 9, Ganganath Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeeth, 1951-52

Michael, S. M. 'The Origin of the Ganapati Cult'. *Asian Folklore Studies*, vol. 42, No. 1, Nanzan University, 1983.

Sharma, Brijendra Nath. 'Unpublished Pala and Sena Sculptures in the National Museum, New Delhi.' *East and West*, vol. 19, no. 3 / 4, 1969

Sircar, D. C. 'Lucknow Museum Copper-plate Inscription of Surapala I, Regnal Year 3'. *Epigraphia Indica*. Edited by K. G. & Sircar, D. C. Vol. XL, Pt. I, Archaeological Survey of India, April 1973

Stevenson, R. 'Analysis of the Ganesa Purana with Special Reference to the History of Buddhism'. *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, vol. 8

Winternitz, M. 'Ganesa in the Mahabharata'. *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*. Cambridge University Press, 1898

ওয়েবসাইট

www.sahapedia.org, accessed 21. 8. 2020

http://www.srishtisandhan.com/Srishtisandhan/Magazine/content/DS, accessed 22. 5. 21

http://www.bongodorshon.com/home/story_detail/bengals-own-handmade-wooden-crafts, accessed 28. 06. 2023

http://archives.anandabazar.com/archive/1140112/12special-story.html, accessed 27. 09. 21

http://www.bongodorshon.com/home/story-detail/whenchhau-is-a-tribal-war-or-folk-dance, accessed 18.11.2022

http://www.bongodorshon.come/home/story_detail/urban-art-kalighat-pot-painting, accessed 01. 02. 2020

http://www.anandabazar.com/patrika/review-of-an-art-exhibition-at-devbhasa-gallary/cid/1413309, accessed 12. 3. 2023

http://vedicreserve.miu.edu/sthapatya_veda/suprabhedagama.pdf, accessed 19. 7. 2020

http://www.shaktibad.net, accessed 15. 5. 2022

http://www.milansagar.com, accessed 17. 5. 2021

http://hdl.handle.net/10603/68499, accessed 10. 07. 2019

https://www.sangbadpratidin.in/pujo/pujo2019/durga-with-ganesha-on-her-lap-kashipur-family-worships-devi-as-eternal-mother/, accessed 11. 07. 2020

https://socialbarta.in, accessed 11. 07. 2020

চিত্রসূচি

চিত্র ১

খাজুরাহোর লক্ষ্মণ মন্দিরে অগ্নি[১]

চিত্র ২

কুমিল্লার নারায়ণপুরের গণেশমূর্তি[২]

চিত্র ৩

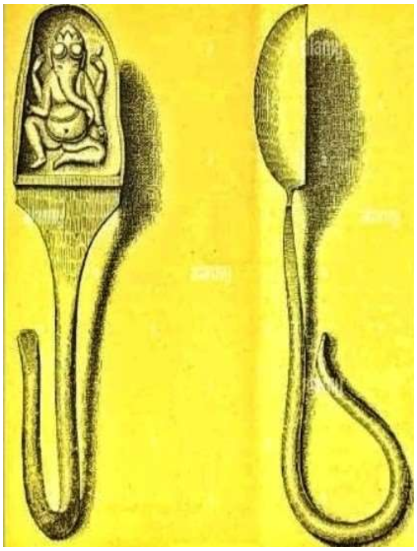

কমৌলি লিপিতে রাজমুদ্রারূপে অঙ্কিত গণেশমূর্তি[৩]

চিত্র ৪

ময়নামতী সংগ্রহশালায় মন্ধুকের গণেশমূর্তি[৪]

চিত্র ৫

পূর্ণেশ্বরীর পার্শ্বদেবতারূপে গণেশ[৫]

চিত্র ৬

গৌরীর হস্তধৃত কমলাসনে গণেশ[৬]

চিত্র ৭

গৌড়বঙ্গে উৎকীর্ণ বিশালাক্ষীর পার্শ্বচর গণেশ[৭]

চিত্র ৮

দেউলঘাটার গণেশ সহ মাতৃকামূর্তি[৮]

চিত্র ৯

ললিতামূর্তির পার্শ্বচর গণেশ[৯]

চিত্র ১০

মাতৃকামূর্তির পার্শ্বচররূপে গণেশ[১০]

চিত্র ১১

দশম শতকের ষড়ভুজ নৃত্যগণেশ[১১]

চিত্র ১২

দশম শতকের অষ্টভুজ নৃত্যগণেশ[১২]

চিত্র ১৩

একাদশ শতকের অষ্টভুজ নৃত্যগণেশ[১৩]

চিত্র ১৪

গঙ্গারামপুর থেকে প্রাপ্ত দ্বাদশ শতকের নৃত্যগণেশ[১৪]

চিত্র ১৫

উত্তরবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত দ্বাদশ শতকের অষ্টভুজ গণেশ[১৫]

চিত্র ১৬

দিনাজপুর থেকে প্রাপ্ত অষ্টভুজ গণেশ[১৬]

চিত্র ১৭

একাদশ-দ্বাদশ শতকের অষ্টভুজ নৃত্যগণেশ[১৭]

চিত্র ১৮

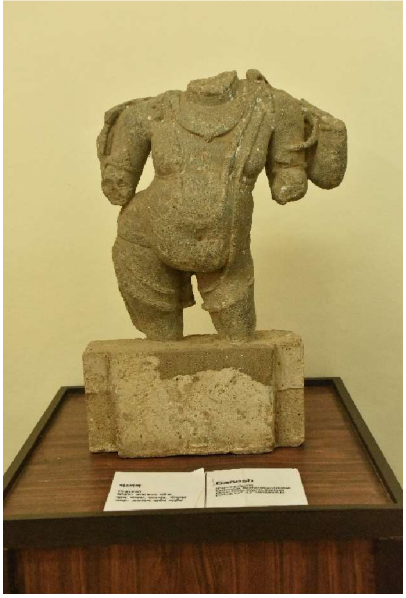

মুণ্ডহীন নৃত্যগণেশ[১৮]

চিত্র ১৯

বাঁকুড়ার মোলবোনার নরকপালধারী নৃত্যগণেশ[১৯]

চিত্র ২০

ঢাকার রামপাল থেকে প্রাপ্ত পঞ্চমুখ হেরম্ব গণেশ[২০]

চিত্র ২১

পাহাড়পুর সংগ্রহশালায় রক্ষিত একাদশ-দ্বাদশ শতকের গণেশের নৃত্য ও আসনমূর্তি[২১]

চিত্র ২২

বিক্রমশীলা মিউজিয়ামে রক্ষিত ষড়ভুজ নৃত্যগণেশ[২২]

চিত্র ২৩

পালযুগের চতুর্ভুজ গণেশের আসনমূর্তি[২৩]

চিত্র ২৪

ললিতাসনে পালযুগের চতুর্ভুজ গণেশমূর্তি[২৪]

চিত্র ২৫

বাঁকুড়ার দেমুশান্যায় চতুর্ভুজ গণেশের আসনমূর্তি[২৫]

চিত্র ২৬

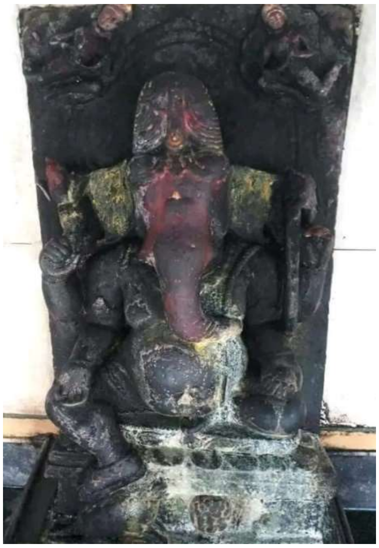

বাঁকুড়ার শৈবতীর্থ এক্তেশ্বরের চতুর্ভুজ গণেশ[২৬]

চিত্র ২৭

বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে অর্ধপর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট গণেশ[২৭]

চিত্র ২৮

বাঁকুড়ার হরিহরপুর শিবমন্দির লাগোয়া

চত্বরে অর্ধপর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট গণেশ[২৮]

চিত্র ২৯

বাঁকুড়ার নাড়িচার সর্বমঙ্গলা মন্দিরের

গর্ভগৃহে অর্ধপর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট গণেশ[২৯]

চিত্র ৩০

বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে

রক্ষিত চতুর্ভুজ অর্ধপর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট গণেশ[৩০]

চিত্র ৩১

পুরুলিয়ার দেউলঘাটায় চতুর্ভুজ গণেশের স্থানকমূর্তি[৩১]

চিত্র ৩২

পুরুলিয়ার বুধপুরে চতুর্ভুজ গণেশের আসনমূর্তি[৩২]

চিত্র ৩৩

পুরুলিয়ার বুধপুরে সমপদভঙ্গির চতুর্ভুজ গণেশ[৩৩]

চিত্র ৩৪

শান্তিপুরের সুত্রাগড়ের গণেশ মন্দির[৩৪]

চিত্র ৩৫

সুত্রাগড়ের মন্দিরে বাহনসহ চতুর্ভুজ গণপতি[৩৫]

চিত্র ৩৬

চতুর্ভুজ গণেশ আয়ধসহ[৩৬]

চিত্র ৩৭

সুত্রাগড়ের গণেশমন্দিরের মূল পূজারী শঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে বর্তমান গবেষক[৩৭]

চিত্র ৩৮

মনিহারায় পূজিত সপরিবার গণেশ-জননী মূর্তি[৩৮]

চিত্র ৩৯

শান্তিপুরের কাঁসারিপাড়ার গণেশ-জননী[৩৯]

চিত্র ৪০

চাকদহের গণেশ-জননী মূর্তি[৪০]

চিত্র ৪১

নবদ্বীপের পোড়ামা তলার বর্তমান ভবতারিণী মূর্তি (আদি গণেশ মূর্তির পরিবর্তিত রূপ)[৪১]

চিত্র ৪২

ডোকরার চতুর্ভুজ গণেশের আসনমূর্তি (বাহনসহ)[৪২]

চিত্র ৪৩

ডোকরার ত্রিশূলধারী শিবসদৃশ গণপতি[৪৩]

চিত্র ৪৪

নটরাজোচিত নৃত্যভঙ্গিমায় ডোকরার চতুর্ভুজ গণেশ[৪৪]

চিত্র ৪৫

ডোকরাশিল্পে সানাইবাদক গণেশ[৪৫]

চিত্র ৪৬

ডোকরাশিল্পে বিষ্ণুসদৃশ শয়নভঙ্গিতে পুস্তকপাঠরত গণপতি[৪৬]

চিত্র ৪৭

ডোকরাশিল্পে হাতপাখা হাতে জিরোবার ভঙ্গিতে গণপতি[৪৭]

চিত্র ৪৮

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার গণেশ[৪৮]

চিত্র ৪৯

বর্ধমানের নতুনগ্রামের কাঠের গণেশমূর্তি[৪৯]

চিত্র ৫০

মজিলপুরের চতুর্ভুজ মৃন্ময় গণেশ[৫০]

চিত্র ৫১

গণেশ ছৌ : গণেশের ভূমিকায় নৃত্যরত ছৌ শিল্পী[৫১]

চিত্র ৫২

কালীঘাটের পটে চতুর্ভুজ গণেশের আসনমূর্তি[৫২]

চিত্র ৫৩

কালীঘাটের পটে উনিশ শতকের বাবু গণেশ[৫৩]

চিত্র ৫৪

অবনঠাকুরের ‘গণেশ-জননী’[৫৪]

চিত্র ৫৫

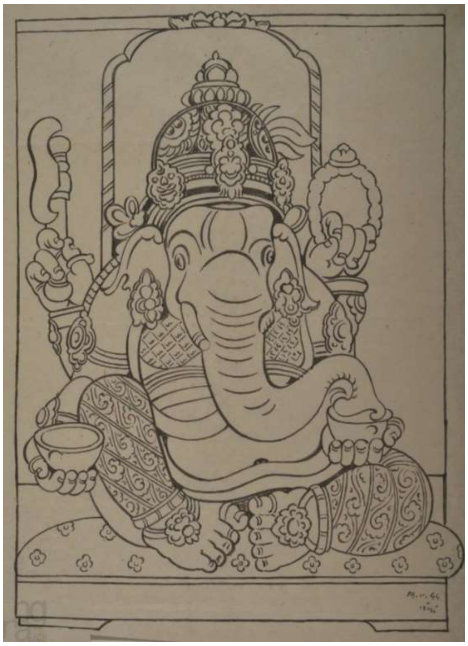

নন্দলাল বসুর রেখানির্মিত ‘সিদ্ধিদাতা’[৫৫]

চিত্র ৫৬

যামিনী রায়ের গণেশ-জননী : মা-ছেলে[৫৬]

চিত্র ৫৭

যামিনী রায়ের শিব ও গণেশ : পিতা-পুত্র[৫৭]

চিত্র ৫৮

যামিনী রায় অঙ্কিত দ্বিভুজ গণেশের আসনমূর্তি[৫৮]

চিত্র ৫৯

যোগেন চৌধুরীর ভাবনায় গণেশ[৫৯]

চিত্র ৬০

যোগেন চৌধুরীর ভাবনায় গণেশের ব্যতিক্রমী রূপ[৬০]

চিত্র ৬১

যোগেন চৌধুরী অঙ্কিত যোদ্ধা গণপতি[৬১]

চিত্র ৬২

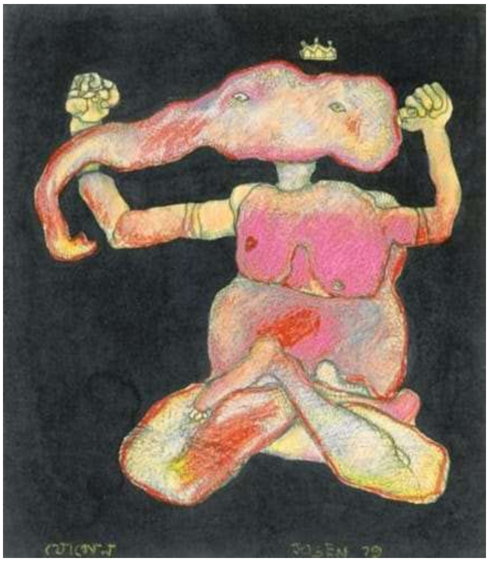

যোগেন চৌধুরী অঙ্কিত মুকুট পরিহিত গণেশ[৬২]

চিত্র ৬৩

ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম অঙ্কিত দশভুজ গণপতি[৬৩]

চিত্র ৬৪

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত গণেশ[৬৪]

চিত্র ৬৫

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত গণেশ[৬৫]

চিত্র ৬৬

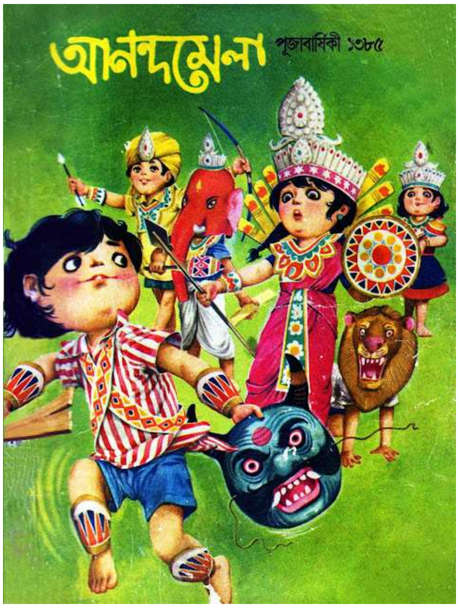

যোদ্ধা গণপতি[৬৬]

চিত্র ৬৭

আকাশপথে যুদ্ধে জননীক্রোড়ে সুরক্ষিত বালগণেশ[৬৭]

চিত্র ৬৮

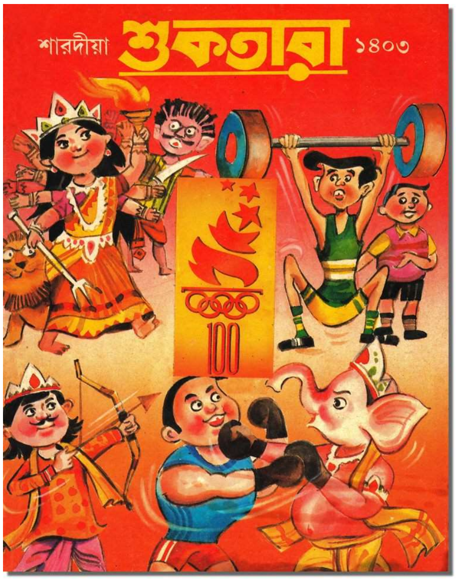

Boxing-এ অবতীর্ণ লড়াকু গণপতি[৬৮]

চিত্র ৬৯

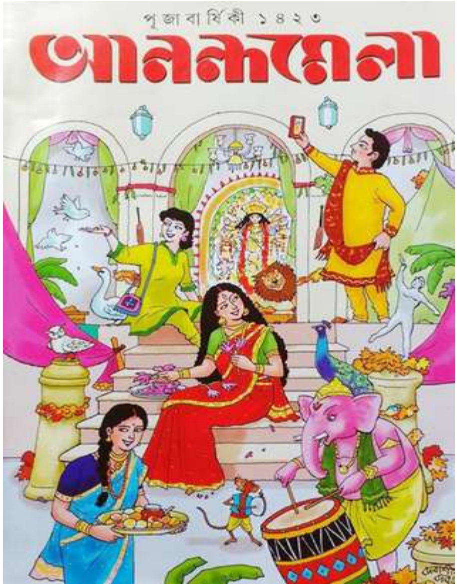

ঢাক-বাদক গণপতি[৬৯]

চিত্র ৭০

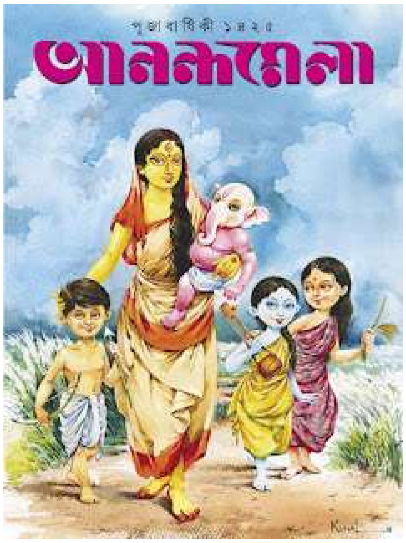

গ্রামবাংলার পটভূমিতে মাতৃক্রোড়গত বালগণেশ[৭০]

চিত্র ৭১

মনোযোগী এক শ্রোতার ভূমিকায় গণপতি[৭১]

চিত্র ৭২

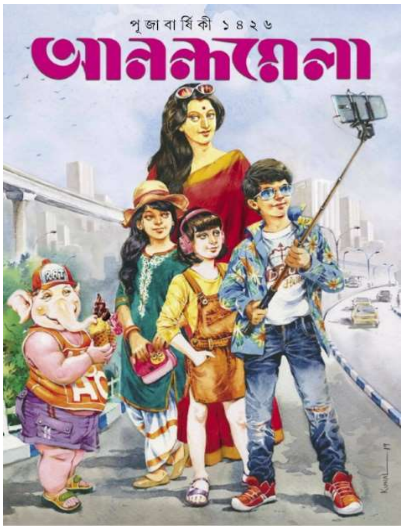

আইসক্রিম হাতে সেলফি তুলছেন

আজকের সময়ের স্মার্ট গণেশ[৭২]

চিত্র ৭৩

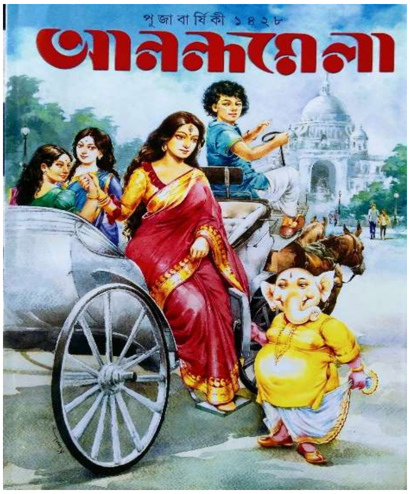

ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত গণেশ(পরিবারের

কর্তাব্যক্তির মতো মা'কে গাড়ি থেকে

নামতে সাহায্য করছেন)[৭৩]

সূত্রনির্দেশ :

১। Desai, Devangana. “Sculptural Representation on the Lakshmana Temple of Khajuraho in the light of Prabodhachandrodaya”, November 29, 2018, p. 105, www.sahapedia.org, accessed 21. 8. 2020

২। www.sahapedia.org/image-inscriptions-what-can-they-tell-us-about-our-cultural-history, accessed 12. 04. 2020

৩। https://Kamauli_copper_plate_inscription_of_Vaidyadeva_seal_01, accessed 12. 04. 2020

৪। www.sahapedia.org/image-inscriptions-what-can-they-tell-us-about-our-cultural-history, accessed 12. 04. 2020

৫। https://collections.vam.ac.uk/item/064195/purneshvari-sculpture-unknown/, accessed 13. 05. 2020

৬। https://www.metmuseum.org/art/collection/search/646421, accessed 14. 05. 2020

৭। https://invaluable.com/, accessed 21. 07. 2021

৮। পুরুলিয়ার দেউলঘাটায় ক্ষেত্রসমীক্ষাকালে ছবিটি তোলা হয়েছে। তারিখ: ১৬। ৫। ২০১৮

৯। https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1872-0701-54, accessed 13. 7. 21

১০। https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Hindu_deity_Parvati_with_her_sons_Ganesh_Indian_Art_-_Asian_Art_Museum_of_San_Francisco, accessed 18. 07. 2021

১১। https://www.indianculture.gov.in/asutosh-museum-calcutta-dancing-ganesha, accessed 15. 08. 2021

১২। Sharma, Brijendra Nath. ‘Unpublished Pala and Sena Sculptures in the National Museum, New Delhi.’ *East and West*, vol. 19, no. 3 / 4, 1969, p. 415

১৩। https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Dancing_Ganesha,*India_Pala_Period_late_11th_century_AD,_black_stone*-_Chazen_Museum_of_Art_DSC01706, accessed 8. 5. 2021

১৪। https://www.commons.m.wikimedia.org/(Dancing Ganesha - Black Stone - Circa 12th Century CE – Gangarampur - West Bengal - ACCN 5625 - A25203 – Indian Museum - Kolkata), accessed 17. 08. 2022

১৫। https://ramaarya.blog/2016/06/21/calcutta-kolkata-indian-museum/, accessed 05. 07. 20

১৬। https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:WLA_lacma_Bangladesh_Dinajpur_District, accessed 8. 5. 2021

১৭। https://www.sothby s.com/en/buy/auction/2021/indian-himalayan-southeast-asian-works-of-art/a-sandstone-figure-of-ganesha-pala-period-11th, accessed 21. 03. 22

১৮। বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন পরিদর্শনকালে ছবিটি তোলা হয়েছে (8. 2. 23)

১৯। বাঁকুড়ার মোলবোনার শিবমন্দির সংলগ্ন চত্বরটি পরিদর্শনকালে ছবিটি তোলা হয়েছে (7. 2. 23)

২০। Bhattasali, N. K. 'Heramba-Ganapati stone, Rampal, (Dhaka), (1454)'. *Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum.* Dacca, 1929, p. 562

২১। https://en.rattibha.com/thread/1498599558615482368/, accessed 18. 03. 2021

২২। https://in.pinterest.com/pin/335870084683531106/, accessed 18. 03. 2021

২৩। https://portlandartmuseum.us/mwebcgi/mweb, accessed 24. 05. 2022

২৪। https://www.ajspeelman.com/our-collections/indian-collection/, accessed 24. 5. 2022

২৫। বাঁকুড়ার দেমুশান্যায় ক্ষেত্রসমীক্ষাকালে ছবিটি তোলা হয়েছে (7. 2. 23)

২৬। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর শিবমন্দির পরিদর্শনকালে ছবিটি তোলা হয়েছে (2. 7. 22)

২৭। বাঁকুড়ার বহুলাড়ায় মন্দির পরিদর্শনকালে ছবিটি তোলা হয়েছে (2. 7. 22)

২৮। বাঁকুড়ার হরিহরপুর শিবমন্দিরের চাতাল পরিদর্শনকালে ছবিটি তোলা হয়েছে (7. 2. 23)

২৯। বাঁকুড়ার নাড়িচায় সর্বমঙ্গলা মন্দির দর্শনকালে ছবিটি তোলা হয়েছে (7. 2. 23)

৩০। বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন পরিদর্শনকালে ছবিটি তোলা হয়েছে (8. 2. 23)

৩১। পুরুলিয়ার দেউলঘাটায় ক্ষেত্রসমীক্ষাকালে ছবিটি তোলা হয়েছে (16. 05. 2018)

৩২। পুরুলিয়ার বুধপুরে মন্দির দর্শনকালে ছবিটি তোলা হয়েছে (16. 05. 2018)

৩৩। পুরুলিয়ার বুধপুরে মন্দির দর্শনকালে ছবিটি তোলা হয়েছে (16. 05. 2018)

৩৪। শান্তিপুর সুত্রাগড়ের গণেশমন্দিরে ক্ষেত্রসমীক্ষাপর্বে ছবিটি তোলা হয়েছে। তারিখ: 11. 01. 2023

৩৫। শান্তিপুর সুত্রাগড়ের গণেশমন্দিরে ক্ষেত্রসমীক্ষাপর্বে ছবিটি তোলা হয়েছে। তারিখ: 11. 01. 2023

৩৬। শান্তিপুর সুত্রাগড়ের গণেশমন্দিরে ক্ষেত্রসমীক্ষাপর্বে ছবিটি তোলা হয়েছে। তারিখ: 11. 01. 2023

৩৭। শান্তিপুর সুত্রাগড়ের গণেশমন্দিরে ক্ষেত্রসমীক্ষাপর্বে মন্দিরের মূল পূজারী শঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে ছবিটি তোলা হয়েছে। তারিখ: 11. 01. 2023

৩৮। https://www.sangbadpratidin.in/pujo 2019/durga-with-ganesha-on-her-lap-kashipur-family-worships-devi-as-eternal-mother/, accessed 11. 07. 2020

৩৯। https://socialbarta.in, accessed 11. 07. 2020

৪০। নদীয়ার চাকদহের পুরাতন বাজার এলাকায় ক্ষেত্রসমীক্ষাপর্বে 'গণেশ-জননী'-র পূজা ও মেলা উপলক্ষে ছবিটি তোলা হয়েছে। তারিখ: 17. 02. 2022

৪১। নবদ্বীপের ভবতারিণী মন্দিরে ক্ষেত্রসমীক্ষাকালে ছবিটি তোলা হয়েছে। তারিখ: 23. 02. 2021

৪২। https://necessityestore.in/shop/sitting-ganesh-on-mouse-dokra/, accessed 15. 5. 2022

৪৩। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ছবিটি তোলা হয়েছে।

৪৪। https://necessityestore.in/shop/dokra-ganesh/, accessed 15. 5. 2022

৪৫। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ছবিটি তোলা হয়েছে।

৪৬। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ছবিটি তোলা হয়েছে।

৪৭। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ছবিটি তোলা হয়েছে।

৪৮। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ছবিটি তোলা হয়েছে।

৪৯। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ছবিটি তোলা হয়েছে।

৫০। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ছবিটি তোলা হয়েছে।

৫১। http://www.bongodorshon.com/whenchhau-is-a-tribal-war-or-folk-dance, accessed 18. 11. 2022

৫২। http://collections.vam.ac.uk/item/0120220/ganesha-painting-unknown/, accessed 2. 05. 20

৫৩। কালীঘাটের পটচিত্রে গণেশের রূপাঙ্কন বিষয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষাকালে ছবিটি তোলা হয়েছে (05. 05. 2019)

৫৪। http://www.indianmuseumkolkata.org, accessed 19. 06. 22

৫৫। http://www.indianculture.gov.in/museum-paintings/lord-ganesh, accessed 12. 05. 20

৫৬। http://www.tallengestore.com, accessed 19. 06. 22

৫৭। http://www.tallengestore.com, accessed 19. 06. 22

৫৮। http://www.mutualart.com, accessed 19. 06. 22

৫৯। http://www.mutualart.com/Artwork/Ganesha/7CA9415A8B5F52C3, accessed 7. 05. 22

৬০। http://www.artnet.com/artist/jogen-chowdhury/ganesha-M15N0NN_0KLitC2nHF3zg2, accessed 9. 06. 22

৬১। http://artsandculture.google.com/asset/ganapati-the-warrior/JgErUsoXw1VT7w,

Accessed 9. 06. 22

৬২। http://www.artnet.com/artist/jogen-chowdhury/ganesha-with-crown-7pcFrRE1ZQqB-JteD-Wa4A2, accessed 9. 06. 22

৬৩। http://www.gallerieganesha.com/exhibition/ode-to-ganesha.html, accessed 21. 03. 22

৬৪। http://in.pinterest.com/pin/394487248622836691/, accessed 11. 07. 21

৬৫। http://in.pinterest.com/pin/679551031266982188/, accessed 11. 07. 21

৬৬। http://dhulokhela.blogspot.com, accessed 18. 06. 2022

৬৭। Ibid., accessed 18. 06. 2022

৬৮। Ibid., accessed 18. 06. 2022

৬৯। Ibid., accessed 18. 06. 2022

৭০। Ibid., accessed 18. 06. 2022

৭১। Ibid., accessed 18. 06. 2022

৭২। Ibid., accessed 18. 06. 2022

৭৩। Ibid., accessed 18. 06. 2022